ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন

গ্রন্থকারের অপর গ্রন্থ—

(১) ছন্দোবিজ্ঞান

(২) বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন পর্ব

ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন

—

ছন্দের স্বরূপ

এবং

বৈদিক হইতে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত

ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস

—

তারাপদ ভট্টাচার্য

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১

মূল্য—১৫·০০
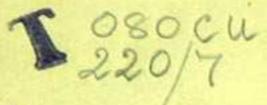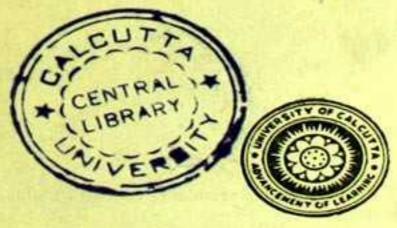
CHHANDA-TATTVA O CHHANDO VIVARTANA

By

TARAPADA BHATTACHARYA

Published by Sibendranath Kanjilal Superintendent, Calcutta University Press, 48 Hazra Road, Calcutta-19.
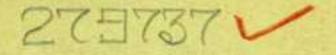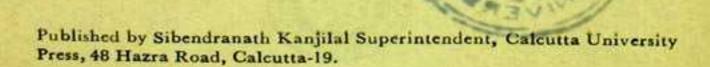
Printed by Kalidas Munshi at The Pooran Press
21, Balaram Ghose Street, Calcutta-4

ছন্দোব্রতী

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেন

ও

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

মিত্রদ্বয়ের

করকমলে

গ্রন্থকারের নিবেদন

'ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' গ্রন্থকারের দীর্ঘকালের ছন্দ-চিন্তার ফল। প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ছন্দের অধ্যাপনা-সূত্রে বঙ্গীয় ছন্দ-সমস্যার সহিত বর্তমান লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং সেই সময় হইতে ছন্দোরহস্য ভেদের ইচ্ছা প্রবল হয়। বাংলা ছন্দের সমস্যা কী কী এবং কী উপায়ে উহাদের সমাধান হইতে পারে তাহার খসড়া ১৯৪৩ সালে লেখকের 'বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয় এবং ঐ বৎসরেই এই অপরিণত চিন্তার পুস্তিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে। এই সাফল্য লেখককে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছন্দ-সমীক্ষায় উৎসাহিত করে।

ছন্দ সম্বন্ধে লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ছন্দোবিজ্ঞান'। ইহা ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহারও মূল্য স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'ছন্দোবিজ্ঞান' অপেক্ষাকৃত পরিণত চিন্তার ফল হইলেও পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-শাস্ত্র হইয়া উঠে নাই, কারণ বইখানি ছাত্রপাঠ্য ছন্দোব্যাকরণ রূপেই রচিত হইয়াছিল, উহাতে ঐতিহাসিক আলোচনার অবকাশ ছিল না। অথচ ঐতিহাসিক বিবর্তন না বুঝিলে একই ছন্দের বিভিন্ন রূপের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। সুতরাং এই 'ছন্দোবিজ্ঞানে'র দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় নাই। সেই অভাব পূরণার্থে তৃতীয় ছন্দোগ্রন্থ 'ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

'ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' নামের মধ্যে সংযোজক 'ও' থাকিলেও ইহা দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থকে কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে নাই। তত্ত্ব ও বিবর্তন একই বিষয়ের দুইটি দিক—পরস্পর-সাপেক্ষ ও পরস্পরের পরিপূরক। ইহাদের একটিকে ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে অপরটিকে অস্বীকার করা চলে না। ছন্দের বিবর্তন না বুঝিলে উহার একাধিক উচ্চারণভঙ্গি বুঝা যায় না, আবার উচ্চারণভঙ্গি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকিলে ছন্দের

ক্রম-বিকাশ বুঝাও কষ্টকর হয়। উপরন্তু ছন্দ-সমস্যার কতকগুলিতে ছন্দ-তত্ত্বের ও কতকগুলিতে ছন্দোবিবর্তনের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সেইজন্য বর্তমান পুস্তকে উভয়বিধ আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য ঐতিহাসিক আলোচনা এখানে সীমাবদ্ধ। প্রচলিত কালানুক্রমে বিভিন্ন কাব্যে কী কী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রণয়ন গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, আর্য ভাষার প্রধান প্রধান ছন্দের উৎপত্তি ও পরিণতি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কাব্যগুলির কালানুক্রম এখনও বহুলাংশে কেবল অনুমান-ভিত্তিক। ফলে ছন্দের বিবর্তনকে যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। তাই বর্তমান পুস্তকে ছন্দোরূপের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ে সাল তারিখের বাহ্য প্রমাণ অপেক্ষা গঠনগত আভ্যন্তর প্রমাণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অনলংকৃত, অমার্জিত ও স্বচ্ছন্দ গঠনকে অপরিণত পূর্বাবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত অলংকৃত, মার্জিত ও বিধিবদ্ধ রূপকে পরবর্তী পরিণত অবস্থা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অবশ্য এই আভ্যন্তর প্রমাণ কোথাও প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের বিরোধিতা করে নাই।

গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণকে মান্য করা হইয়াছে। তাই অতি-আধুনিক বৈপ্লবিক বানানের 'ছন্দ-মীমাংসা' 'ছন্দ-বিজ্ঞান', 'ছন্দ-বিবর্তন' প্রভৃতির পরিবর্তে সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্মত 'ছন্দো-মীমাংসা', 'ছন্দোবিজ্ঞান', 'ছন্দোবিবর্তন' প্রভৃতি লিখিত হইল। তবে সংস্কৃত ও বাংলার বিরোধের স্থলে বাংলারই বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা হইয়াছে। বঙ্গভাষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লালিত্যাভিমুখী ও সন্ধি-বিমুখী। সেইজন্য এখানে 'অক্ষরচ্ছন্দ', 'ছন্দশ্চিন্তা', 'ছন্দস্তত্ত্ব' প্রভৃতির পরিবর্তে 'অক্ষর-ছন্দ' 'ছন্দ-চিন্তা''ছন্দ-তত্ত্ব' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে —বাংলার 'মন-যোগ' 'বক্ষ-বেদনা' নহে, 'মনোযোগ' 'বক্ষোবেদনা'ই চলে, তবে 'মন-তরী' 'বক্ষ-পরীক্ষা' বুঝাইতে 'মনস্তরী' 'বক্ষঃপরীক্ষা' অচল। বর্তমান গ্রন্থে অর্থ-সৌকর্যের প্রয়োজনে কয়েকটি ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ লঙ্ঘিত হইয়াছে। তাই 'দাশমাত্রিক', ষাট্‌পর্বিক', 'আতিপর্বিক' প্রভৃতি বর্জন করিয়া অসংস্কৃত 'দশমাত্রিক,, 'ষট্‌পর্বিক', 'অতিপর্বিক' প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। 'ছন্দের আভাস যুক্ত' অর্থে বহুব্রীহি-বিশেষণ 'ছন্দোগন্ধ' প্রথমতঃ

বাংলায় অপ্রচলিত, দ্বিতীয়তঃ উদ্দিষ্ট মাধুর্য প্রকাশক নহে; সেইজন্য উহার পরিবর্তে 'সুগন্ধি' 'পুষ্পগন্ধি'র মতো 'ছন্দোগন্ধি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পর্বের ও শব্দের প্রথমাংশ বুঝাইতে 'পর্বাদি' 'শব্দাদি'র পরিবর্তে 'পর্বাগ্র' 'শব্দাগ্র' লেখা হইয়াছে; কারণ 'আদি' শব্দে অনভিপ্রেত 'প্রভৃতি'-অর্থের সম্ভাবনা বর্তমান। গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় ১।৯ সূত্রে লিখিত ব্যঞ্জনার্থক 'হস্' মনিয়ার-উইলিয়ামস্‌এর সংস্কৃত অভিধানে না থাকিলেও অ-সংস্কৃত শব্দ নহে; ইহা সুপ্রাচীন মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ এবং ইহাই বাংলায় প্রচলিত 'হসন্ত' শব্দের মূল। বর্তমান গ্রন্থে 'হসন্ত' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা অভিধান'-অনুযায়ী 'ব্যঞ্জনান্ত' ও 'ব্যঞ্জন-চিহ্ন' উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। 'ছন্দোবন্ধ' শব্দটি ছন্দের স্বয়ং-সম্পূর্ণ চরণ বা চরণমণ্ডলী অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে সংস্কৃত বৃত্তছন্দের, বাংলা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনায় এমন কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে যাহা প্রচলিত ধারণার বিরোধী। যুক্তির অনুসরণ না করিয়া কেবল সিদ্ধান্ত দেখিলে এইগুলিকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এই বই পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করা হইতেছে। "যুক্তিযুক্তং বচো গ্রাহ্যং, ন গ্রাহ্যং গুরুগৌরবাৎ"—যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষার এই শিক্ষাই বর্তমান লেখকের জীবনাদর্শ।

ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ও দূর-বিচ্ছিন্ন নূতন নূতন তথ্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠকের শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে এইগুলির সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে। এই পুনরুক্তি-দোষ পণ্ডিতগণের মার্জনীয়।

কয়েকটি স্থলে যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা 'মতে'রই বিরুদ্ধে, 'ব্যক্তি'র বিরুদ্ধে নহে। তাই সমালোচিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

এই গ্রন্থ রচনার মূলে রহিয়াছে আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ। তাঁহার এই দীনতম ছাত্রের গবেষণায় তমসাচ্ছন্ন ছন্দ-ক্ষেত্রে যদি কিছু আলোকপাত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারই প্রেরণায় হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির সম্মান প্রাপ্ত প্রথিত-যশাঃ পণ্ডিতদ্বয় ডঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক ও ডঃ শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করিয়া গ্রন্থশেষে উদ্ধৃত যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান লেখকের শিরোধার্য শ্রেষ্ঠ সম্মান। ইঁহাদের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদিত হইল।

গ্রন্থ প্রকাশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর ডঃ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন, এবং রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের আনুকূল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদক্ষ প্রেস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল লেখককে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের প্রতি লেখক কৃতজ্ঞ।

পরিতাপের বিষয়—মুদ্রিত গ্রন্থে কয়েকটি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। যে ভুলগুলি চোখে পড়িয়াছে তাহাদের শুদ্ধরূপ নির্ঘণ্টের পরবর্তী পৃষ্ঠায় 'শুদ্ধিপত্রে' নির্দেশিত হইল। পাঠক ইহার শুদ্ধ পাঠ লক্ষ্য করিয়া বইখানি পাঠ করিবেন—ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের নিম্নের রেখা ডাহিনে বা বামে সরিয়া গিয়াছে অথবা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। অবশ্য এইগুলি মনোযোগী পাঠকের নিকটে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। ত্রুটিগুলি পাঠকগণের মার্জনীয়।

৮২ এ, নবীন ঘোষাল রোড
কসবা, কলিকাতা ৪২
২৪শে ভাদ্র, ১৩৭৮

বিনীত
তারাপদ ভট্টাচার্য

সূচী

পূর্বার্ধ : ছন্দ-তত্ত্ব

উত্তরার্ধ : ছন্দোবিবর্তন

ক্রোড়পত্র ঃ ছন্দ-তালিকা

পৃষ্ঠা

পূর্বার্ধ

ছন্দ-তত্ত্ব

ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন

প্রথম অধ্যায়

প্রবেশিকা

১

ছন্দের অর্থ, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

§ ১. ছন্দ বলিতে বুঝায় গতি-সৌন্দর্য*।

গতি ও সৌন্দর্য একত্র মিলিত না হইলে ছন্দ বলা চলে না। নিক্ষিপ্ত তীরের বা উল্কার সরল গতি, ঘূর্ণিত চক্রের বক্র গতি, বানরের লাফ, উটের চলা, এইগুলি গতিমাত্র, ইহারা সৌন্দর্যজড়িত নহে। আবার শতদল পদ্ম, বিচিত্র বর্ণময়ী উষা-সন্ধ্যা, নক্ষত্রযুক্ত আকাশ, এগুলি সৌন্দর্যযুক্ত মাত্র, গতিযুক্ত নহে। এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্তের কোনটিই তাই ছন্দের প্রকৃত দৃষ্টান্ত নহে। অপরপক্ষে মাছের সাঁতার, ময়ূরের নাচ, রাজহংসের চলন, তরঙ্গায়িত নদীর প্রবাহ, উৎস জলের উচ্ছ্বাস, ধূপ-ধূমের সঞ্চরণ, ইত্যাদির মধ্যে যেমন গতি তেমনি সৌন্দর্য একসঙ্গে বর্তমান দেখা যায়, সেইজন্য এইগুলি ছন্দের সার্থক উদাহরণ।

ছন্দের অর্থ

অবশ্য সুন্দর বস্তুতে গতি যদি প্রত্যক্ষ রূপে না থাকিয়া প্রচ্ছন্ন রূপে—গতিভঙ্গির ইঙ্গিতে প্রকাশিত থাকে তাহা হইলে সেখানেও ছন্দকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। চিত্রের ও ভাস্কর্যের নর্তক-নর্তকীর মূর্তিগুলি গতিহীন নিশ্চল বস্তু বটে কিন্তু উহাদের লাস্যভঙ্গি নৃত্যের গতিযুক্ত সচল সৌন্দর্যই প্রকাশ করে। সেইজন্য এই

---

* ছন্দের 'সৌন্দর্য' অর্থ ব্যাকরণ-সম্মত। "চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ"
—উণাদি সূত্র

মূর্তিগুলিও ছন্দোময়ী। অর্থাৎ চঞ্চল ও অচঞ্চল সকল অবস্থাতেই গতি-সৌন্দর্য হইতেছে ছন্দ।

চক্ষুর ন্যায় কর্ণও সৌন্দর্য ভোগের ইন্দ্রিয়। গতি ও সৌন্দর্য যেমন রূপগত তেমনি ধ্বনিগত হইতে পারে। রূপ-সৌন্দর্য যেমন চোখে, ধ্বনি-সৌন্দর্য তেমনি কানে উপভোগ করা হয়। মেঘমন্দ্র, জলকল্লোল, পক্ষি-কাকলি, যন্ত্র-সঙ্গীত, কণ্ঠ-সঙ্গীত, কাব্য-ভাষার উচ্চারণ, এইগুলি ধ্বনিগত গতি-সৌন্দর্য বা ছন্দের উদাহরণ।

§ ২. সাহিত্যের ছন্দ ভাষাগত, ইহা উচ্চার্য ধ্বনি-প্রবাহের সৌন্দর্য। ভাষার নিয়মিত বিন্যাসেই ইহা উৎপন্ন হয়।

ভাষাগত ছন্দ

সাহিত্যিক রচনা লিপিবদ্ধ হয় বলিয়া দ্রষ্টব্য বস্তু নহে, উচ্চার্য বস্তু। উচ্চারণ করিয়া পড়িলে উহা ধ্বনিপ্রবাহে পরিণত হয়। এই ধ্বনিপ্রবাহের সৌন্দর্য প্রকৃত-পক্ষে ভাষাগত ছন্দ। বর্তমান গ্রন্থে ছন্দ শব্দে সাধারণতঃ এই ভাষাগত সাহিত্যিক ছন্দই বুঝিতে হইবে।

[ছন্দস্থষ্টির কৌশল ভাষাবিন্যাসের নিয়ম পরে আলোচ্য]

§ ৩. ভাষাকে গীতশ্রী-মণ্ডিত করাই ছন্দের কার্য।

ছন্দের প্রয়োজনীয়তা

সাহিত্যিক ছন্দ সঙ্গীতগোত্রীয়। ভাবের যে আবেগ গানে সুর স্থষ্টি করে, সেই আবেগই কাব্যভাষায় ছন্দ স্থষ্টির প্রকৃত কারণ।* এইজন্য আদিকবি বাল্মীকির শোকে ছন্দের জন্ম—এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। সঙ্গীতের ন্যায় আবেগজাত বলিয়াই ইহা কাব্য-ভাষায় বেগ সঞ্চার করিয়া কবিতাকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তোলে, ভাষাকে বাচ্যার্থের উর্ধ্বে লইয়া যায় এবং অর্থাতীত একটি নূতন ভাব-ব্যঞ্জনা দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করে। উৎকৃষ্ট কবিতায় রস-স্থষ্টিতে

---

* এই গ্রন্থের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ছন্দের দান অবশ্য স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় লিখিয়াছেন—

> মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
> ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে।......
> পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে।......
> উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন।......
> মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
> অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে বহু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে।

ছন্দের দ্বারা কাব্য-ভাষা শ্রীমণ্ডিত হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে কাব্যের বাহ্য অলংকার রূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছন্দ যথার্থ কবিতার কৃত্রিম অলংকার নহে, ইহা তাহার সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত দেহলাবণ্য। পালক যেমন পাখীর কৃত্রিম অলংকার নহে, রক্তমাংসের মতো উপাদানও নহে, অথচ উহা না থাকিলে পাখীর সৌন্দর্যহানি হয়, প্রকৃত কবিতার পক্ষে ছন্দও ঠিক তেমনি বস্তু। অকৃত্রিম কবিতায় একই ভাবাবেগ একদিকে ভাষা অন্যদিকে ছন্দ সৃষ্টি করে, ফলে ভাষা ও ছন্দের সাযুজ্য মিলন হয় এবং ছন্দ কবিতার ভাষাগত রসকে প্রগাঢ় করিয়া তোলে। অক্ষম কবিদের কবিতা ভাবোত্থিত নহে, কষ্টকল্পিত। সেখানে কবির ভাবজাত ছন্দ আবির্ভূত হয় না, বাহির হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া ভাষায় প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ কৃত্রিম ক্ষেত্রেই ছন্দকে বলা চলে ভাষার সৌন্দর্যবর্ধক কৃত্রিম অলংকার।

§ ৪. ছন্দ ভাষাগত হইয়াও ভাষাবদ্ধ নহে। ইহা অর্থনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

ব্যবহারিক ভাবে ভাষা হইতেছে ছন্দের বাহন বা 'মিডিয়াম', কিন্তু স্বভাবে উভয়ে পৃথক। ভাষা অর্থবদ্ধ, ছন্দ অর্থহীন ; ভাষার

অর্থবদ্ধতা ছন্দে সংক্রামিত হয় না। ধাতুনির্মিত তারের অবলম্বনে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলিয়া ধাতুর ধর্ম বিদ্যুতের ধর্ম হইয়া উঠে, তাহা নহে। এইভাবে ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলেও ছন্দ ভাষার অর্থ হইতে পৃথক ও নির্লিপ্ত থাকে। এইখানেই ছন্দের সঙ্গীতধর্মিতা। সঙ্গীতের সুর এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কথাকে অবলম্বন করিয়া অথচ তাহার অর্থকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়। এই নির্লিপ্ততার জন্য অক্ষর, উচ্চারণ ও বিশ্রাম স্থান বুঝিতে পারিলেই অজানা ভাষার ছন্দোবদ্ধ রচনা পাঠ করা যায়; অর্থবোধ না হইতে পারে, কিন্তু ছন্দোবোধে অসুবিধা হয় না। জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কোনো বাঙ্গালী কবি লিখিয়াছেন—

ভাষার সহিত ছন্দের সম্পর্ক

> জয়দেব তব 'গীতগোবিন্দ'—নাও যদি বুঝি মানে—
> তবু অমৃতের ধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে।

কবিতার ছন্দই এখানে 'অমৃতের ধারা'। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থের নিম্নলিখিত কবিতা দ্রষ্টব্য ঃ—

> ধিক্কদলণ থোংগদলণ তক্কদলণ রিংগএ
> ণংণুণুকট দিংগহ্নকট রংগচলতু রংগএ।

ইহার অর্থ সহজে বোধগম্য না হইতে পারে কিন্তু ছন্দ উপভোগ করিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। ছন্দ অর্থমুক্ত বলিয়া অর্থহীন ধ্বনিও ছন্দোবদ্ধ হইতে পারে, ধ্বনির অর্থহীনতায় ছন্দের কোন ক্ষতি হয় না, যথা—

> আজকে আমার মনের মাঝে
> 'ধাঁই ধপাধপ্' বাজনা বাজে।
> 'রাম খটাখট্' 'ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্'
> কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।

এই দৃষ্টান্তে 'ধাঁই ধপাধপ্' 'রাম্ খটাখট্' ও 'ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্'-

ধ্বনির অর্থহীনতা সত্ত্বেও ছন্দ অক্ষুণ্ণ আছে। ছন্দ অর্থসাপেক্ষ হইলে ইহা সম্ভব হইত না। ছন্দ ভাষার দ্বারা আবদ্ধ নহে বলিয়াই এক ভাষার ছন্দে অন্য ভাষারও শব্দ* ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ এই অদ্ভুত মিলনে ছন্দোবদ্ধ শব্দের জাতীয় উচ্চারণ বিকৃত হইয়া যায় কিন্তু ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না, যথা—

(ক) বাংলা ছন্দে সংস্কৃত ভাষা :—

'বুদ্ধং শর- ণং গচ্ছামি'—
বলিলাম মনে মনে।

(খ) সংস্কৃত ছন্দে বাংলা ভাষা :—

বিলাতে পালাতে | ছটফট করে নব্য গউড়ে।
অরণ্যে যে জন্যে | তরুণ বিহগ প্রাণ দউড়ে॥

(গ) বাংলা ছন্দে ইংরেজি ভাষা :—

(জেন্টল্ ম্যান্) টেক্ দি বটল্
(ফর্ ইয়োর্) রিক্রিয়েসন্।

(ঘ) চীনা ছন্দে বাংলা ভাষা :—

শিষ্ কে হ্যায়্ গো আজ্ ?
তার কি ভিন গাঁ ঘর ?
দুখ্ সে তার্ কি পর্ ?
চাঁদ্ সে তার্ কি তাজ্ ?

—কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা, ছন্দ-সরস্বতী

§ ৫. ছন্দ শব্দের অধীন নহে, শব্দই ছন্দের অধীন।

ছন্দোবদ্ধ রচনায় অর্থযুক্ত শব্দ ও ছন্দের মধ্যে ছন্দই বলবান। দুই ক্ষেত্রে শব্দে ও ছন্দে বিরোধ বাধে। প্রথমতঃ কোনো কোনো স্থলে কবির রচনাশৈথিল্যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়—শব্দ রক্ষা করিতে

---

* এই গ্রন্থে sound-অর্থে 'ধ্বনি' ও word-অর্থে 'শব্দ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

গেলে ছন্দ-পতন হয়, আবার ছন্দ রক্ষা করিতে গেলে শব্দবিকৃতি ঘটে। এইরূপ স্থলে ছন্দই জয়ী হয়—ছন্দ রক্ষার প্রয়োজনে শব্দকেই বিকৃত হইতে হয়; উচ্চার্য ধ্বনির সংকোচন, প্রসারণ বা একাধিক ধ্বনির সংযোজনের দ্বারা পাঠকই শব্দ বিকৃতি ঘটাইয়া কবির ত্রুটি সংশোধন করিয়া লন, ছন্দপাত হইতে দেন না। ছন্দশাস্ত্রে তাই শব্দ-সংকোচন, শব্দপ্রসারণ ও শব্দ-সংযোজনের বিধি আছে:—

ছন্দে শব্দবিকৃতি সাধন

(ক) শব্দ-সঙ্কোচন—ইহাতে শব্দের অন্তর্গত দুর্বল ধ্বনিকে বিলুপ্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়, যথা—

কে না বাঁশী বাএ 'বড়াই'
কালিনী 'নৈ' কূলে।

[মূল শব্দ 'বড়ায়ি' ও 'নই'

ছন্দের প্রয়োজনে উচ্চারণে শব্দসংকোচ করিতে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থে পাঠককে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

বণ্ণো বি তুরিঅ পড়িও
দো তিণ্ণি বি এক্ক জাণেহু।

[অর্থাৎ—তাড়াতাড়ি উচ্চারণে দুই বা তিনটি বর্ণকেও একত্র একটি অক্ষররূপে পড়িবে।]

(খ) শব্দ-প্রসারণ—ইহাতে শব্দের অন্তর্গত কোন স্বর-ধ্বনির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বা বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ করা হয়, যথা—

পরাজিতা তুই
সকল ফুলের কাছে
তবু কেন তোর
'অ-অ-পরাজিতা' নাম?

[মূল শব্দ 'অ-পরাজিতা'

ছন্দের প্রয়োজনে সংস্কৃতে শব্দ-প্রসারণ—

'ত্রিয়ম্বকং' সংযমিনং দদর্শ (কুমার ৩।৪৪)

[মূল শব্দ 'ত্র্যম্বকং'

বৈদিকে শব্দ-প্রসারণ—

তৎসবিতুর্বরে'নিয়ম্' [মূল শব্দ 'বরেণ্যম্'

(গ) শব্দ-সংযোজন—ইহাতে একাধিক শব্দকে কৃত্রিম ভাবে একত্র যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়, যথা—

'তাল্ পাতারৈ' পুঁথির ভিতর
ধর্ম আছে—বল্‌লে কে ?

[মূল শব্দ-দ্বয়—'তালপাতার', 'ঐ'

ছন্দের প্রয়োজনে সংস্কৃতে কৃত্রিম ভাবে শব্দ সংযোজন—

'এষৈষ' রথমারুহ্য মথুরাং যাতি কেশবঃ। (বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৮।১৯)

[মূল শব্দ-দ্বয়—'এষঃ', 'এষঃ'

দ্বিতীয়তঃ কখন কখন ছন্দকৌশল ও ছন্দোমাধুর্য সৃষ্টির পথে শব্দের অখণ্ডতা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে পাঠক নহেন, স্বয়ং কবিই ছন্দকে প্রাধান্য দেন এবং শব্দকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রয়োগ করেন, ফলে পাঠকও উহাকে দ্বিখণ্ডিত রূপে পড়িতে বাধ্য হন ; ছন্দশাস্ত্রে ইহার নাম শব্দ-খণ্ডন। বঙ্গসাহিত্যে বহুল পরিমাণে শব্দ-খণ্ডনের প্রয়োগ লক্ষণীয়, যথা—

(ঘ) শব্দ-খণ্ডন—

(১) একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে
মরি মরি 'অ | নঙ্গ' দেব | তা।

—রবীন্দ্রনাথ

(২) অন্নপূর্ণা উত্তরিলা | গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া 'ডা | কিলা' পাটুনীরে ॥

—ভারতচন্দ্র

(৩) চারি অগ্নি মিশ্রিত 'হ | ইয়া' এক হইল।
সমুদ্র হইতে 'আচম্‌ | বিতে' বাহিরিল॥

—কাশীরাম দাস

(৪) সন্দেহে 'সৌ | ভাগ্য' হারা | আমরা অভা | গী,
একটি শিশুর | একটু পরশ | ছয় বোনে মা | গি।

—সত্যেন্দ্রনাথ

(৫) করুণায় | বলে থাকো | আহা 'মন | দ' বা কি।
খুঁটে বের | করো না তো | কেন 'ছন | দ' ফাঁকি?

—রবীন্দ্রনাথ

দৃষ্টান্তগুলিতে যথাক্রমে 'অনঙ্গ', 'ডাকিলা', 'হইয়া', 'আচম্বিতে', 'সৌভাগ্য' 'মন্দ' ও 'ছন্দ' শব্দ দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে।

সংস্কৃতেও শব্দ-খণ্ডন দেখা যায়, যথা—

'প্রভ্রংশয়াং' যো নহুষং 'চকার' (রঘু ১৩।৩৬)

[মূল শব্দ অখণ্ড 'প্রভ্রংশয়াঞ্চকার'

এই শব্দ-বিকৃতি-সাধন ও শব্দ-খণ্ডন প্রমাণ করে—ভাষাই ছন্দের অধীন, ছন্দ ভাষার অধীন নহে।*

২

ছন্দ-শাস্ত্র ও ধ্বনি-বিজ্ঞান

§ ৬. ছন্দশাস্ত্র হইতেছে—ছন্দের তত্ত্ব ও ব্যবহার বিষয়ক বিজ্ঞান।

ছন্দশাস্ত্র রস-সাহিত্য নহে; ছন্দের উপাদান, গঠন, শ্রেণীভেদ,

---

*কোনো বিশিষ্ট ছান্দসিক প্রচার করিয়াছেন—"অর্থপূর্ণ অখণ্ড গোটা শব্দই বাংলা ছন্দের উপাদান।" তিনি এই শব্দের নাম দিয়াছেন 'পর্বাঙ্গ' এবং এই পর্বাঙ্গভিত্তিক থিয়োরির নাম দিয়াছেন 'পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ নহে, অক্ষরই (syllable) ছন্দের উপাদান। শব্দ ছন্দের উপাদান হইলে উল্লিখিত শব্দবিকৃতি-সাধন অর্থাৎ শব্দসংকোচন, শব্দ-প্রসারণ, শব্দ-সংযোজন ও শব্দ-খণ্ডন মোটেই সম্ভবপর হইত না।

বিধি-নিষেধ, সমস্যা প্রভৃতি চিন্তনীয় বিষয়ই ছন্দশাস্ত্রের উপজীব্য। তাত্ত্বিক আলোচনা বৈজ্ঞানিক হওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞান-পাঠের জিজ্ঞাসু মন লইয়া সেইজন্য ছন্দশাস্ত্র পাঠ কর্তব্য।

ছন্দশাস্ত্র ও ইহার প্রয়োজনীয়তা

ছন্দ সৌন্দর্য-জাতীয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ছন্দ ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু মাত্র এবং বিজ্ঞানের অধিকারভুক্ত নহে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। সৌন্দর্য-জাতীয় হইলেও ছন্দ দৈবঘটনার ন্যায় আকস্মিক ও ব্যক্তিগত নহে; ইহা সমাজগত, সর্বজনীন ও জাতীয় ব্যাপার। পাঠকসাধারণের উদ্দেশ্যেই ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচিত হয়। কবির জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, সমাজব্যবহৃত সাধারণ ধ্বনি ও প্রচলিত উচ্চারণ-ভঙ্গির অবলম্বনে কবি ছন্দ রচনা করেন। বহুজনব্যবহৃত বস্তুর নিয়মবদ্ধতা অনিবার্য; নিয়মবদ্ধতার জন্যই উহা বিজ্ঞানের অধিকারের মধ্যে আসিয়া যায়। তাছাড়া সৌন্দর্য কখনই উচ্ছৃঙ্খল হয় না; শৃঙ্খলার মধ্যেই সৌন্দর্যতত্ত্ব নিহিত। সেদিক দিয়াও ছন্দ নিয়মবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ছন্দের আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী জানিবার প্রয়োজনে ছন্দশাস্ত্রের উৎপত্তি।

ছন্দশাস্ত্রের বিষয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। ইহার ব্যবহারিক অংশ তাত্ত্বিক অংশেরই অন্তর্গত; কারণ তত্ত্ব জানা না থাকিলে ব্যবহারে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। ধ্বনিসৌন্দর্যের উপাদান ও লক্ষণ-নির্ণয় ও ছন্দোরচনায় ধ্বনিসমাবেশের ছন্দ-ত্ব নির্দেশ ছন্দশাস্ত্রের তাত্ত্বিক অংশের প্রধান বিষয়। ভাষাবিশেষের ছন্দের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, শ্রেণী, গঠন, উচ্চারণভঙ্গি প্রভৃতি তথ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা এই তাত্ত্বিক অংশের অন্তর্গত। অপরপক্ষে ছন্দোরচনা-শিক্ষা ব্যবহারিক ছন্দ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কীভাবে 'মুক্ত'ভাষাকে ছন্দে আবদ্ধ করা যায়, কী কৌশলে ধ্বনিপ্রবাহ অলংকৃত হইয়া উঠে, বিচিত্র ছন্দোবন্ধের

কোনটি বিশেষ ভাবপ্রকাশের উপযোগী, ইত্যাদি বিষয় ছন্দশাস্ত্রের ব্যবহারিক অংশের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রগুলির অধিকাংশই ব্যবহারিক, ইহাদের তাত্ত্বিক অংশ প্রায় উপেক্ষিত। সেইজন্য এইগুলিকে পূর্ণাঙ্গ ছন্দোবিজ্ঞান বলা চলে না।

§ ৭. ধ্বনিপার্থক্য উচ্চারণপার্থক্য ও উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্যহেতু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ছন্দের অলংকরণ পদ্ধতিও বিভিন্ন, ফলে ভাষাভেদে ছন্দশাস্ত্রও পৃথক পৃথক; সেইজন্য ছন্দশাস্ত্রে ভাষাবিশেষের ধ্বনির উচ্চারণের ও উচ্চারণভঙ্গির আলোচনা অপরিহার্য।

ছন্দের মূলতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে—সৌন্দর্যের মূল লক্ষণ অঙ্গবহুত্ব, অঙ্গসংহতি ও অঙ্গসঙ্গতি। এই লক্ষণগুলি সকল ভাষায় সকল ছন্দেই বর্তমান; তবে ভাষাভেদে ছন্দের অলংকরণপদ্ধতি পৃথক পৃথক। ইংরাজীতে নির্দিষ্ট অক্ষরে শ্বাসাঘাতে, সংস্কৃতে নির্দিষ্ট অক্ষরের গুরুত্বে ও প্রাকৃতে স্বর-দীর্ঘতায় ছন্দকে অলংকৃত করা হয়। এই অলংকৃত রূপই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে বড় হইয়া উঠে। এই অলংকরণ-ভেদের কারণ ভাষাভেদে ধ্বনি, উচ্চারণ ও উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য।

ছন্দশাস্ত্রে ধ্বনিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

সকল ধ্বনি সকল ভাষায় নাই; যেমন বাংলা ভাষায় z, q, w, ধ্বনি নাই, ইংরাজিতে ত, ধ, ড়, ঢ়, ঁ ধ্বনি নাই। সংস্কৃতের ঋ, ৯, ণ, ষ, য প্রভৃতি ধ্বনি বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে এবং ঐগুলির স্থলে বিকৃত নূতন ধ্বনি প্রচলিত হইয়াছে। বাংলায় ঋ হইয়াছে রি, ৯-এর ব্যবহার নাই, ণ হইয়াছে ন, ষ হইয়াছে শ এবং য হইয়াছে জ। বহুক্ষেত্রে লিখিত ধ্বনি ও উচ্চারিত ধ্বনিতে পার্থক্য ঘটিয়াছে। লিপিগত জ্ঞ, ক্ষ, ক্ষ্ম, ত্ম, দ্ম যথাক্রমে গ্যঁ, খ্য, ক্খঁ, ত্তঁ

দ্দ˚ হইয়া উচ্চারিত হয়। সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা ভাষায় লিখিত হয় যজ্ঞ, বৃক্ষ, সূর্য, পদ্ম, খঞ্জ কিন্তু উচ্চারিত হয় যথাক্রমে জগ্যঁ, ব্রিখ্য, শুর্জ, পদ্দ˚, খন্‌জ। লিপিগত হ্‌ম, হ্‌ল, হ্‌ন উচ্চারিত হয় ম্‌হ, ল্‌হ, ন্‌হ, যথা—ব্রাম্‌হন (ব্রাহ্মণ), প্রল্‌হাদ্‌ (প্রহ্লাদ), শায়ান্‌হ (সায়াহ্ন)। বাঙ্গালী লিখে দীর্ঘ আ, ঈ, ঊ, কিন্তু উচ্চারণ করে হ্রস্ব আ, ই, উ। ভাষাভেদে কেবল ধ্বনিভেদ বা উচ্চারণভেদ নহে, উচ্চারণভঙ্গিরও ভেদ আছে। কোনো ভাষায় সন্ধ্যক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ, কোথাও বিশ্লিস্ট উচ্চারণ, কোথাও বা শ্বাসাহত উচ্চারণ দেখা যায়।

সুতরাং বাংলা ছন্দ বুঝিতে কেবল সৌন্দর্যের নিয়মাবলী জানাই যথেস্ট নহে, বাংলা ভাষার ধ্বনি, উচ্চারণ ও বাঙ্গালীর উচ্চারণভঙ্গি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অত্যাবশ্যক।*

৩

ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষর

§ ৮. কণ্ঠতন্ত্রীর দ্রুত কম্পনে মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনির উৎপত্তি; ইচ্ছানুযায়ী কণ্ঠধ্বনি প্রকাশের নাম উচ্চারণ; উচ্চার্য ধ্বনিই ছন্দের আশ্রয়।

মানুষ ইচ্ছামতো তাহার পেশী সঞ্চালন করিতে পারে। পেশী-সঞ্চালনের ফলে ফুসফুস হইতে বহির্গামী নিঃশ্বাসবায়ুর কতকটা যদি মুখ দিয়া বাহির করা হয় ও সেই নিঃশ্বাস-বায়ুর আঘাতে যদি কণ্ঠতন্ত্রীকে কাঁপানো হয়, তবেই যথার্থ উচ্চারণ ঘটে। মানুষের কথা উচ্চারিত ধ্বনির দৃস্টান্ত। ইহার গতিশীলতার জন্য ছন্দ ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

ধ্বনি ও উচ্চারণ

*"বর্ণ, অক্ষর মাত্রা—এ সকলের ধ্বনিতত্ব বা ব্যাকরণ না জানিলেও চলে।"—কোনো বিশিষ্ট ছান্দসিকের এই উক্তি সমর্থনীয় নহে।

§ ৯. উচ্চার্য ধ্বনি দ্বিবিধ—স্বর ও ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জনের পারিভাষিক নাম হল্ বা হস্।

নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠতন্ত্রী কম্পিত করিয়া অবাধে বহির্গত হইলে স্বরধ্বনি এবং বাধাপ্রাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। জিহ্বা ও মুখের বিভিন্ন ভঙ্গি অনুসারে স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য ঘটে ও মুখ-গহ্বরে বাধার স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য হয়। স্বরধ্বনি স্বাধীনভাবে ও ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরাশ্রিত হইয়া উচ্চারিত হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ সাধারণ ব্যঞ্জনের মতোই পরাধীন, স্বরাশ্রয়েই উচ্চারিত হয়, যথা—আঃ, উঃ, ঠুং (উং), কোং (ওং) ইত্যাদি। সুতরাং অনুস্বার ও বিসর্গ হল্-মধ্যে গণ্য। ইহারা দুর্বল ব্যঞ্জন, ইহাদিগকে ভগ্ন ব্যঞ্জনও বলা চলে, ইহাদের পূর্ণরূপ ম্ এবং হ্।

স্বর ও ব্যঞ্জন

§ ১০. স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়েই দ্বিবিধ—মৌলিক ও যৌগিক।

একক ও অবিভাজ্য ধ্বনি হইতেছে মৌলিক এবং একাধারে সংযুক্ত একাধিক ধ্বনি হইতেছে যৌগিক। বাংলায় অ, অ্যা, আ, ই, উ, এ এবং ও হইতেছে মৌলিক স্বরধ্বনি এবং ক্, খ্, গ্, প্রভৃতি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি। যৌগিক ব্যঞ্জনকে চিনিতে পারা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ বাংলা লিপিতে নানা যুক্ত ব্যঞ্জনের হরফ আছে, যথা—ক্র (ক্‌র), ত্ম (ত্‌ম), ম্ল (ম্‌ল), শ্চ্য (শ্‌চ্‌য), স্ত্র (স্‌ত্‌র) ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ যৌগিক স্বরে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে; কারণ,ভাষায় অনেকগুলি যৌগিক স্বর (diphthong) প্রচলিত থাকিলেও লিপিতে দুইটি মাত্র যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ আছে—ঐ এবং ঔ; পৃথক অ-ই এবং অ-উ দ্রুত উচ্চারণে সংযুক্ত ও একাকার হইয়া যথাক্রমে ঐ ও ঔ মূর্তি ধারণ করে। এই প্রকার দ্রুত উচ্চারণে আই, আউ,

মৌলিক ও যৌগিক ধ্বনি

এই, উই, ইউ, ইয়ে, উয়ো প্রভৃতি অন্যান্য স্বরদ্বয় একাঙ্গ হইয়া এক একটি যৌগিক স্বরে পরিণত হয়। বাংলা হরফের অভাবে এই একাঙ্গত্ব চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কানে শুনিলে বুঝা যায়, যথা—

এই্ যে এলো | সেই্ আমারি | স্বপ্নে দেখা | রূপ।
কই্ দেউলে | দেউ্টি দিলি | কই্ জ্বালালি | ধূপ ?

এই দৃষ্টান্তের 'এই' 'সেই' 'কই' ইহারা প্রত্যেকে যৌগিক স্বরধ্বনি ; সাধারণ উচ্চারণের যুগ্মস্বর এখানে দ্রুত উচ্চারণে একাঙ্গ হইয়া এক একটি স্বরে পরিণত হইয়াছে। 'দেউলে'র 'দেউ' কিন্তু এই প্রকার দ্রুত-উচ্চারিত যৌগিক স্বর নহে, শব্দটি 'দেয়ুলে'র মতো পৃথক স্বরধ্বনিতে উচ্চার্য। তৎপরবর্তী 'দেউটি'র 'দেউ' অবশ্য দ্রুত-উচ্চারিত যৌগিক স্বর।

[দ্রুত-উচ্চারণ খেয়ালী ব্যাপার নহে, ক্ষেত্রবিশেষে অপরিহার্য। পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

§ ১১. যৌগিক স্বরধ্বনির অন্ত্যস্বর পূর্ণ স্বরধ্বনি নহে, ইহা ব্যঞ্জন-ধর্মী 'ভগ্নস্বর' ; সেইজন্য হল্-মধ্যে গণ্য।

যৌগিক স্বরধ্বনির দ্বিতীয়টি স্বয়ং উচ্চারিত নহে, পূর্বস্বরের সাহায্যে উচ্চারিত, সেইজন্য ইহা ব্যঞ্জনধর্মী ; ইহা অর্ধোচ্চারিত ও দুর্বল বলিয়া ইহাকে বলা হয় ভগ্ন স্বর। যেমন 'আজ্', ইস্' 'ওম্' প্রভৃতির জ্, স্, ম্ তেমনি ঐ (অই্), ঔ (অউ্) প্রভৃতির অন্ত্য ই, উ্ ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত দুর্বল ধ্বনি। সেইজন্য যৌগিক ঐ, ধ্বনির ই্, ঔ ধ্বনির উ্, ভগ্নস্বরের দৃষ্টান্ত। লক্ষ্য করিতে হইবে ভগ্নস্বর ই নহে, 'ই্' ; এবং উ নহে, 'উ্'।

ভগ্ন স্বর

§ ১২. উচ্চার্য ধ্বনির প্রতীকস্বরূপ লিখিত চিহ্ন বা চিত্রের নাম বর্ণ[১]।

১। বর্ণ letter বা হরফ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

বর্ণ ও ধ্বনি সজাতীয় নহে ; বর্ণ দৃষ্টিগ্রাহ্য, ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য। চোখের সাহায্যে কানের বিষয়ের পরিচয়লাভ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বায়স্কোপে সবাক চিত্র উপভোগের মতো একত্র দর্শন ও শ্রবণের অভিজ্ঞতা থাকিলে রূপের সহিত ধ্বনির যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং রূপ ধ্বনিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বর্ণ ও ইহার প্রয়োজনীয়তা

কণ্ঠোচ্চারিত মনোভাবপ্রকাশক ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী ; তাহাকে রূপের মধ্যে ধরিয়া না রাখিলে স্থায়ী হয় না। আধুনিক কালেই গ্রামোফোন রেকর্ডে বা টেপ রেকর্ডে ধ্বনিকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। সেকালে হস্তলিখিত দৃষ্টি গ্রাহ্য লিপিই ধ্বনি-রেকর্ডের কাজ করিয়াছে। ধ্বনিকে চিনিবার ও চিনাইবার তাগিদে এক একটি জাতি কাল্পনিক চিত্র বা চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ধ্বনি-বিশেষকে বুঝাইতে চাহিয়াছে। এই চিহ্ন বা চিত্র হইতেছে বর্ণ।

§ ১৩. উচ্চার্য হ্রস্বতম ধ্বনির নাম অক্ষর[২]। একস্বর[৩] ধ্বনিই হ্রস্বতম ; সুতরাং ইহাই অক্ষর।

অ-ব্যঞ্জন বা স-ব্যঞ্জন প্রতিটি স্বরধ্বনিই প্রকৃতপক্ষে অক্ষর। স্বরহীন ব্যঞ্জন বা হল্ উচ্চারণ-সাধ্য নহে, সেইজন্য ইহা ধ্বনিমাত্র, অক্ষর নহে। স্বরযুক্ত হইলেই হল্ উচ্চার্য হয় ও অক্ষরে পরিণত হয়। শুদ্ধ স্বর বা অ-ব্যঞ্জন অক্ষরের প্রকারভেদ নাই, কিন্তু স-ব্যঞ্জন স্বর বা অক্ষর বিচিত্র। অবস্থা ভেদে স্বরকে সম্মুখে পশ্চাতে বা উভয়দিকে হল্ বহন করিতে হয়, যথা—

অক্ষর

(১) ব্যা, কি, টু, স্ত, প্রা,—সম্মুখে হল্ বহনের দৃষ্টান্ত ; ইহাদের প্রথম তিনটিতে অ্যা, ই, উ, যথাক্রমে একটি করিয়া হল্

২। 'অক্ষর' শব্দ কেবল syllable অর্থে ব্যবহার্য।

৩। "স্বরা অক্ষর সংজ্ঞা স্যুর্হলন্তদনুযায়িনঃ"—রুদ্রযামলতন্ত্র।

(ব্, ক্, ট্) এবং পরবর্তী দুইটিতে অ (স্ত) এবং আ (প্রা) যথাক্রমে দুইটি করিয়া হল্ (স্ ত্ ও প্ র্) সম্মুখভাগে বহন করিতেছে।
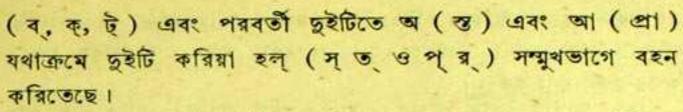
(২) আজ্, ইস্, উঃ, ওম্—পশ্চাতে হল্ বহনের দৃষ্টান্ত; এখানে আ, ই, উ, ও যথাক্রমে জ্, স্, ঃ, ম্‌কে পশ্চাতে বহন করিতেছে।

(৩) সৎ, নাম, দিক্, চুপ্—সম্মুখে পশ্চাতে উভয়দিকে হল্ বহনের দৃষ্টান্ত। এখানে অ, আ, ই, উ যথাক্রমে স্-ৎ, ন্-ম্, দ্-ক্, চ্-প্‌কে সম্মুখে-পশ্চাতে বহন করিতেছে।

তাছাড়া যৌগিক স্বরধ্বনিও (আই্, এই্, ইউ্, কেউ্ প্রভৃতি) দৃশ্যতঃ দুই-বর্ণে-প্রকাশ্য হইলেও একস্বর বা একাক্ষর ধ্বনি; কারণ ইহাদের অন্ত্য স্বর 'ভগ্নস্বর' মাত্র, পূর্ণোচ্চারিত স্বরধ্বনি নহে।

[বিঃ দ্রঃ—'সিলেব্‌ল' অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আধুনিক ছান্দসিকদের কেহ কেহ প্রবল আপত্তি জানাইয়াছেন। বাংলায় ও সংস্কৃতে কোন কোন স্থলে বর্ণ (letter) অর্থেও অক্ষরের প্রয়োগ আছে, সুতরাং কেবল 'সিলেব্‌ল' অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহারে অর্থ-বিভ্রাটের সম্ভাবনা আছে—ইহাই আপত্তির কারণ। তাঁহারা 'সিলেব্‌ল' বুঝাইতে অক্ষর শব্দের পরিবর্তে 'ধ্বন্যাঘাত' 'পাদক' 'শব্দ-পাপড়ি' বা 'দল' শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কিন্তু এই আপত্তি যুক্তিগ্রাহ্য নহে এবং এই প্রস্তাবও গ্রহণীয় নহে; কারণ :—

(১) 'সিলেব্‌ল'-অর্থে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ এদেশে নূতন নহে, পাঠকের অজ্ঞাতও নহে। বেদে ও সংস্কৃতে এই প্রয়োগ আছে। বৈদিক যুগে লিপি ও বর্ণমালার আবিষ্কার হয় নাই, অথচ অক্ষর শব্দ আছে,—"বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।২৪)। এই অক্ষরের অর্থ সিলেব্‌ল। গীতায় দুই-বর্ণে-প্রকাশ্য 'ওম্' ধ্বনিকে একাক্ষর বলা হইয়াছে—"ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" (৮।১৩)। পিঙ্গলাদি সমস্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন ছন্দোগ্রন্থে 'সিলেবিক' বৈদিক ছন্দকে অক্ষর-ছন্দই বলা হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থকে অস্বীকার করিয়া বৈদিক ছন্দকে 'পাদক-ছন্দ' বা 'দল-ছন্দ' বলিবার যুক্তি নাই। বৈদিক হউক বা বঙ্গীয় হউক, 'সিলেবিক' ছন্দকে অক্ষর-ছন্দই বলা কর্তব্য।

(২) ভাষায় কোন শব্দের একাধিক অর্থ প্রচলিত থাকিলেও যখন উহাকে পারিভাষিক শব্দরূপে শাস্ত্রবিশেষে গ্রহণ করা হয়, তখন উহার গ্রন্থনির্দিষ্ট বিশেষ অর্থ ছাড়া অন্য কোন প্রচলিত অর্থ চিন্তা করা হয় না। এই বিশেষ অর্থের নাম—রূঢ়ার্থ। 'শব্দ' কথাটির প্রচলিত অর্থ sound, কিন্তু ব্যাকরণে উহা কেবল word-অর্থেই ব্যবহৃত হয়; আবার অলংকারশাস্ত্রে 'ধ্বনি' মানে sound নহে, suggestiveness; অথচ বিজ্ঞানে ও ছন্দশাস্ত্রে ধ্বনির অর্থ sound। পারিভাষিক শব্দের রূঢ়ার্থ কখনই অর্থ-বিভ্রাট সৃষ্টি করে না।

(৩) letter অর্থে বর্ণ এবং syllable অর্থে অক্ষর বাংলা ভাষাতত্ত্ব-সম্মত। এই বিশেষ অর্থেই উহারা সকল ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অর্থবিভ্রমরূপ দুর্ঘটনার অভিযোগ এ-যাবৎ শুনা যায় নাই। ব্যবহারযোগ্য পুরাতন ও প্রচলিত শব্দ থাকিতে নূতন শব্দের প্রবর্তন ভাষায় জটিলতাই সৃষ্টি করে।]

অক্ষর একস্বর ধ্বনি বলিয়া যে-কোন বাক্যের স্বরসংখ্যা গণনা করিলেই উহার অক্ষরসংখ্যা পাওয়া যায়; যথা—'সর্বপাপহরো হরিঃ', ইহাতে যথাক্রমে অ (সর্), অ (ব), আ (পা), অ (প), অ (হ), ও (রো), অ (হ), ই (রিঃ)—এই আটটি স্বর থাকায় দৃষ্টান্তটিতে আটটি অক্ষর আছে বুঝিতে হইবে।

§ ১৪. অক্ষর দ্বিবিধ—স্বরান্ত ও হলন্ত। স্বর বলিতে কেবল পূর্ণস্বর এবং হল্ বলিতে ব্যঞ্জন ও ভগ্নস্বর বুঝিতে হইবে।

স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর

স্বরান্ত অক্ষরে নিঃশ্বাসের গতিপথ উন্মুক্ত থাকে, সেইজন্য ইহাকে বলা হয় বিবৃত বা মুক্ত অক্ষর। অপরপক্ষে হলন্ত অক্ষরে নিঃশ্বাসের গতিপথ ব্যঞ্জন বা ভগ্নস্বরের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, সেইজন্য ইহাকে বলা হয় সংবৃত বা বদ্ধ অক্ষর। দৃষ্টান্ত হিসাবে—অ্যা, ও, মা, কে, গো, শ্রী, ঘি প্রভৃতি

ধ্বনি স্বরান্ত বা মুক্ত অক্ষর এবং উঃ, রং, আজ্, ওম্, দিক্, সৎ প্রভৃতি (ব্যঞ্জনান্তিক) ধ্বনি ও এই্, ইউ্, বৌ, গাই্, ফাউ্, কৈ, যাও্ প্রভৃতি (ভগ্নস্বরান্তিক) ধ্বনি হলন্ত বা বদ্ধ অক্ষর।

ভগ্নস্বরান্তিক অক্ষরগুলিকে যৌগিক অক্ষর বা সন্ধ্যক্ষরও বলা হইয়া থাকে।

§ ১৫. বাংলা বর্ণের প্রকৃতি অক্ষরাত্মক, ধ্বন্যাত্মক নহে ; সেইজন্য বর্ণ-গণনা দ্বারা লিপিবদ্ধ অক্ষর সংখ্যার মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়।

রোমান লিপি ধ্বন্যাত্মক, কিন্তু ভারতীয় লিপি ও সেই হিসাবে বাংলা লিপিও অক্ষরাত্মক। একটি অক্ষরে যতগুলি ধ্বনি ততগুলি বর্ণ ব্যবহার করিয়া অক্ষরকে প্রকাশ করা ধ্বন্যাত্মক লিপির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লিপি-সংকোচন অক্ষরাত্মক লিপির ধর্ম। একটি অক্ষরের অন্তর্গত ধ্বনিগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি বর্ণে প্রকাশচেষ্টা এই রীতির লিপির বৈশিষ্ট্য। 'শ্রী' এই একটি অক্ষরে শ্ র্ ঈ এই তিনটি ধ্বনি আছে। ধ্বন্যাত্মক রোমান লিপিতে সেইজন্য sri (শ্ র্ ঈ) এই তিন বর্ণে একাক্ষর 'শ্রী'কে প্রকাশ করা হয়। বাংলায় তিনটি ধ্বনির বর্ণকে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি বর্ণে 'শ্রী'রূপে পরিণত করা হয় ; ফলে 'শ্রী' হইতেছে অক্ষরেও একটি বর্ণেও একটি।

বাংলা বর্ণের অক্ষর-ধর্ম

§ ১৬. বাংলা লিপিতে স্বরান্ত অক্ষর একটি বর্ণে এবং হলন্ত অক্ষর দুইটি বর্ণে প্রকাশিত হয় ; বর্ণ দেখিয়াই অক্ষর নির্ণয় করা চলে।

স্বরান্ত অক্ষরে হল্ সংযোগে হলন্ত অক্ষর উৎপন্ন হয় বলিয়া লিপিতে দুই বর্ণের সাহায্যে হলন্ত অক্ষর প্রকাশিত হয়।

[হলন্ত 'ভগ্নস্বর'যুক্ত ঐ, ঔ হইতেছে ব্যতিক্রম—ইহারা কখনো এক বর্ণে কখনো দুই বর্ণে লিখিত হয়, যথা—দৈ ও দই, বৌ ও বউ।]

অক্ষর নির্ণয় প্রণালী

বিশুদ্ধ স্বরধ্বনি (আ, অ্যা, ই প্রভৃতি) এবং স্বরান্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

(মা, হ্যাঁ, কি প্রভৃতি) দুই-ই স্বরান্ত অক্ষর বটে, কিন্তু উভয়ত্র স্বরের মূর্তি একপ্রকার নহে। আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এইগুলিই স্বরের পূর্ণ মূর্তি এবং া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ো, ৌ—এইগুলি স্বরের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। এই সংক্ষিপ্ত চিহ্নগুলি লিপিতে ব্যঞ্জনাঙ্গে 'লিপ্ত' হইয়া যায়। অ-বর্ণের কোন সংক্ষিপ্ত চিহ্ন নাই, ইহা একেবারে ব্যঞ্জনাঙ্গে 'লীন' হইয়া যায়। সেইজন্য হস্(্)-চিহ্ন-হীন বর্ণ দেখিলেই সাধারণতঃ তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলিয়া বুঝা হয়, যথা—ও, ত, দি ইত্যাদি। লিপিগত শব্দের মধ্যে এই প্রকার স্বরান্ত-অক্ষর-জ্ঞাপক বর্ণের পরে যদি হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহা হইলে এই দুই বর্ণ যোগ করিয়া একটি হলন্ত অক্ষররূপে বুঝা হয়, যথা—ওম্, তৎ, দিক্ ইত্যাদি।

বহুক্ষেত্রে ব্যঞ্জনকে উহার স্বাভাবিক পূর্ণরূপের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকারে (যথা 'স্ত'এর স) অথবা স্বরচিহ্নের মতো প্রতীক চিহ্নরূপে (যথা 'র্গ'এর র, 'ক্ত'এর ক ও ত) যুক্ত বর্ণের অন্তর্গত হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্থলেও পূর্ববর্তী স্বরান্ত সূচক বর্ণের সহিত যুক্ত বর্ণের প্রথম ক্ষুদ্রাকার 'খণ্ড'-বর্ণ লইয়া একত্র একটি হলন্ত অক্ষররূপে বুঝা হয়; যথা 'হস্তী'র 'হস্', 'বন্দী'র 'বন্'।

মোটের উপর, সাধারণতঃ প্রথমে হস্-চিহ্ন-হীন বর্ণকে স্বরান্ত অক্ষর বুঝিতে হইবে, উহার পরে হসন্ত বর্ণ বা যুক্তবর্ণ থাকিলে তখন বুঝিতে হইবে যে উহা হলন্ত অক্ষর সূচক। এই জন্য ছন্দশাস্ত্রে যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।*

হলন্ত অক্ষরের হল্ উচ্চারণে পূর্ব স্বরের আশ্রিত, অথচ লিপিতে পরবর্ণে আশ্রিত। যথা 'ছন্দ' উচ্চারণে 'ছন্-দ', কিন্তু লিপিতে 'ছ-ন্দ'। হলের এই প্রকার আশ্রয়-পরিবর্তনের জন্য চক্ষু যে কর্ণকে ঠকায়, তাহা নহে; লিপি অক্ষরাত্মক বলিয়া শেষপর্যন্ত বর্ণ-সংখ্যা ও

* "সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং"—শ্রুতবোধ।

অক্ষর-সংখ্যা প্রায়ই সমান হইয়া যায়। যথা অক্ষর ও বর্ণ উভয়ের হিসাবেই 'ছন্দ' শব্দে দুই ও 'মিষ্টান্ন' শব্দে তিন সংখ্যা বর্তমান—বর্ণে 'ছ-ন্দ' ও 'মি-ষ্টা-ন্ন', অক্ষরেও 'ছন্-দ' ও 'মিষ্-টান্-ন'।

[বিঃ দ্রঃ—সমস্ত ভারতীয় লিপি অক্ষরাত্মক বলিয়া ছন্দচরণে অনুস্বার বিসর্গ ও হসন্ত বর্ণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট বর্ণ গণনা করিলেই উহার অন্তর্গত অক্ষর-সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায় ; যতগুলি বর্ণ হয়, অক্ষরও হয় ততগুলি। যথা বর্ণের বিন্যাসে—

ত-দ্বৎ-কা-মা-যং-প্র-বি-শ-ন্তি-স-র্বে।
সঃ-শা-ন্তি-মা-প্নো-তি-ন-কা-ম-কা-মী ॥

ইহার প্রতি পংক্তিতে ১১ বর্ণ (ৎ, ং, ঃ হিসাব-বহির্ভূত)। ইহাই অক্ষর-বিন্যাসে—

তদ্-বৎ-কা-মা-যং-প্র-বি-শন্-তি-সর্-বে।
সঃ-শান্-তি-মাপ্-নো-তি-ন-কা-ম-কা-মী ॥

ইহাতেও প্রতি চরণে ১১ অক্ষর। উভয়ত্র সংখ্যা সমান। এই সমতার জন্য 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' প্রভৃতি কোন কোন ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষরবৃত্ত' স্থলে 'বর্ণবৃত্ত' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বর্ণবৃত্ত' নামের দ্বারা প্রমাণ হয় না যে প্রাচীন কবিরা কানে শুনিতেন না, চোখে বর্ণ দেখিয়াই ছন্দোরচনা করিতেন।]

৪

ছন্দের ভাষা

§ ১৭. ছন্দ প্রধানতঃ সাহিত্য-ভাষার সহিত সম্পর্কিত ; ইহার সহিত শ্রীহীন মৌখিক ভাষার যোগ নিবিড় নহে।

ছন্দ-উপযোগী ভাষা

ছন্দ হইতেছে ধ্বনি-সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্য-ভাষারই ধর্ম, মৌখিক কথ্যভাষা প্রয়োজনাত্মক ভাষা বলিয়া ধ্বনিসৌন্দর্য ইহাতে পরিস্ফুট হয় না ; ইহাতে বাক্যের অর্থ বা উদ্দেশ্যের দিকেই শ্রোতার সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও ধ্বনি-শ্রী উপেক্ষিত থাকে। অপর পক্ষে

সাহিত্যভাষার শ্রোতা রস গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাষাশিল্পী সেইজন্য সাহিত্যভাষাকেই ছন্দোবদ্ধ করিয়া উহাকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সৌন্দর্য-জগতে উন্নীত করেন।

§ ১৮. বাংলা সাহিত্য-ভাষার দুইটি রূপ—চলিত ও সাধু বাংলা। কিন্তু এইরূপ ভেদের দ্বারা বাংলা ছন্দ প্রভাবিত নহে।* বাংলা ছন্দ ভাষার উভয় রূপকেই আশ্রয় করে।

কথোপকথনে ব্যবহৃত মৌখিক বাংলা 'চলিত বাংলা' নহে, ইহা কথ্য বাংলা ; ইহা অঞ্চলভেদে বহুবিধ, সংকীর্ণতাই ইহার ধর্ম ; সেইজন্য কথ্য বাংলা সাহিত্যভাষা নহে। 'চলিত বাংলা' কিন্তু সাহিত্য-ভাষা ; ইহা গোষ্ঠীমুক্ত ও ব্যাপক। পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীতীরের কথ্য ভাষার মার্জিতরূপ সাহিত্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত বঙ্গের আদর্শ চলিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। অপরপক্ষে আঞ্চলিকতাবর্জিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাষাই সাধু সাহিত্য-ভাষা। সাধু ও চলিত ভাষায় ভেদ যৎ-সামান্য। সাধু বাংলার কয়েকটি দুরূহ শব্দ চলিত বাংলায় ব্যবহার হয় না এবং চলিত বাংলার আঞ্চলিকতা-দুষ্ট শব্দ সাধুবাংলায় বর্জিত হয়। সাধু বাংলার শব্দ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও অপরিবর্তিত, চলিত বাংলার শব্দ ঈষৎ পরিবর্তিত। যথা—সাধু ভাষার 'বৈষ্ণব, গৃহিনী, কার্য, খাইয়া, তাহার, করিতেছি' শব্দগুলি যথাক্রমে চলিত ভাষায় 'বোস্টম্, গিন্নী, কাজ, খেয়ে, তার, করছি' শব্দে পরিণত হইয়াছে। চলিত ভাষা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত, সাধুভাষা মন্থর ও দীর্ঘায়ত। ইহাই

চলিত বাংলা ও সাধু বাংলার সহিত ছন্দের সম্পর্ক

* কেহ কেহ সাধু ও চলিত বাংলার মধ্যে জাতিভেদ কল্পনা করিয়াছেন এবং ঐ ভেদের ভিত্তিতেই ছন্দ-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ভেদ বাহ্য রূপভেদ মাত্র, প্রকৃত জাতিভেদ নহে।

একমাত্র ভেদ, উচ্চারণ পদ্ধতি ও শব্দবিন্যাসে উভয়ের কোন ভেদ নাই।

বঙ্গসাহিত্যে যেমন সাধুভাষায় তেমনি চলিত ভাষায় একদিকে অর্থসৌন্দর্য বা অলংকার, অপরদিকে ধ্বনি-সৌন্দর্য বা ছন্দ দেখা যায় ; যথা—

(ক) 'সাধু' ভাষায় ঃ—

এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।

—আমার দুর্গোৎসব (বঙ্কিম)

এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মত অশ্রু-গম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে,—এখন এক এক দিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজ প্রাঙ্গণ হইতে বারে বারে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়—আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

—কাব্যের উপেক্ষিতা (রবীন্দ্রনাথ)

হে আমার কালো, হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি, হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চক্ষের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধ তমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি!

—শ্রীকান্ত (শরৎচন্দ্র)

(খ) 'চলিত' ভাষায় ঃ—

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা— বাসর ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো। কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা? জাগল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা!

—সন্ধ্যা ও প্রভাত (রবীন্দ্রনাথ)

আকাশের আধখানা জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ কাঁদো-কাঁদো ছুখানি চোখের পাতার মতো হয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতো বৃষ্টির এক-একটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর। তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন—দলে দলে লোক চলেছে, শাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে. বুকে করে।

—নালক (অবনীন্দ্রনাথ)

মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত সূর্যের মতো কিরণ দেয় —বিতরণে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত উদার কম্পিত আগ্রহে আপনাকে বিলাতে চায়—এ সেই মা।

—চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল)

এই দৃষ্টান্তগুলিতে মূল হৃদয়াবেগ একদিকে অর্থসৌন্দর্য ও অপরদিকে ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া একই ভাষার মধ্যে উভয়ের সহাবস্থান ঘটাইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৌন্দর্যতত্ত্ব*

সৌন্দর্যের স্বরূপ

§ ১. মানুষের সম্পর্কে জগতের বস্তু দ্বিবিধ—জ্ঞেয় ও ভোগ্য।

মস্তিষ্কের দ্বারা গ্রহণ বা বুদ্ধিতে বুঝার নাম জ্ঞান এবং গ্রহণীয় বস্তুর নাম জ্ঞেয় বস্তু। হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ বা অনুভব করার নাম ভোগ এবং গ্রহণীয় বস্তু ভোগ্য বস্তু। বস্তুটি 'কী' তাহা স্থির করা হইতেছে জ্ঞান, বস্তুটি 'কেমন' তাহা বোধ করা হইতেছে ভোগ। ভোগের অপর নাম আস্বাদন। সৌন্দর্য সাধারণতঃ ভোগ্য বস্তু, কিন্তু ভোগ কখনও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে, ভোগ ও ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করাই উদ্দেশ্য। 'ছন্দ-শাস্ত্রে' সৌন্দর্য জ্ঞানেরই বিষয়, ভোগের বিষয় নহে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সৌন্দর্য

§ ২. ভোগের ক্ষেত্র ইন্দ্রিয় ও মন; সেইজন্য ভোগ দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক হইতেছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ে স্নায়বিক ক্রিয়া হয় মাত্র। ইন্দ্রিয়ের নিজের চেতনা নাই, কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ সম্ভব নহে। মনই চেতন, মনেই সর্ববিধ ভোগ সম্ভব। মনের দুই অবস্থা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল মন দেহের অধীন, সূক্ষ্ম মন স্বাধীন ও দেহাতিক্রমী। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত স্থূল মনের সংযোগেই

দ্বিবিধ ভোগ্য

---

* ছন্দ-শাস্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মনোবিজ্ঞান পাঠে শরীর-তত্ত্বের জ্ঞান যতটা প্রয়োজনীয়, ছন্দোবিজ্ঞান পাঠে সৌন্দর্যতত্ত্ব জানার প্রয়োজন তদপেক্ষা অনেক বেশী। সৌন্দর্যতত্ত্বই আসলে ছন্দো-জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। ছন্দ হইতেছে ভাষার ধ্বনি-সৌন্দর্য। সাধারণ সৌন্দর্যের স্বরূপ ও সৌন্দর্যের সাধারণ লক্ষণ না জানিলে 'ধ্বনি-সৌন্দর্য' বা ছন্দ সম্বন্ধে মূল ধারণা সুস্পষ্ট হইতে পারে না।

মানুষের রূপ-রসাদির অনুভূতি ঘটে। সেইজন্য স্থূল মনের অপর নাম—অন্তরিন্দ্রিয় (এবং সেই হিসাবে চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়)। ইন্দ্রিয়-ভোগ অর্থে অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত বহিরিন্দ্রিয়ের ভোগই বুঝিতে হইবে। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের বোধই (perception) ইন্দ্রিয় ভোগ বা শারীর ভোগের দৃষ্টান্ত।

মানস ভোগ সূক্ষ্ম মনের ক্রিয়া। এই মন স্বাধীন, দেহনিরপেক্ষ ও শক্তির উৎস। চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছা ইহার বৈশিষ্ট্য। স্থূল মন দেহের দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম মন দেহকেই পরিচালিত করে। বোধ (perception) নহে, স্নেহ প্রেম বিরক্তি উৎসাহ প্রভৃতি অনুভূতিই (feeling) মানস ভোগের দৃষ্টান্ত।

ইন্দ্রিয়ে প্রিয়তাবোধের নাম আরাম, অপ্রিয়তাবোধের নাম যন্ত্রণা বা কষ্ট। মনে প্রিয়তাবোধের নাম আনন্দ, অপ্রিয়তাবোধের নাম বেদনা। একত্র শারীর ও মানস প্রিয়তা সুখ এবং অপ্রিয়তা দুঃখ।

সৌন্দর্যতত্ত্বে প্রিয়তাবোধ অর্থাৎ আরাম, সুখ ও আনন্দের আলোচনাই মুখ্য, অপ্রিয়তাবোধের আলোচনা গৌণ, উহা মুখ্য আলোচনা হইতে অনুমেয়।

প্রিয় ভোগ্য দ্বিবিধ—রম্যতা ও সৌন্দর্য।

§ ৩. বস্তুনিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আমাদিগের শরীরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে আরাম উপভোগ হয়, তাহার নাম 'রম্যতা'।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের পুষ্টতা পরিণতি ও ক্রিয়াশীলতার উপরেই আরামের তারতম্য নির্ভর করে।

নয়নে রূপের লাবণ্য, শ্রবণে ধ্বনির মাধুর্য, নাসায় গন্ধের স্নিগ্ধতা, জিহ্বায় রসের মিষ্টতা, গাত্রে স্পর্শের কোমলতা রম্যতার বিভিন্ন

রম্যতা

দৃষ্টান্ত। রম্যতা শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চার করে ও জীবনবর্ধনের অনুকূলতা করে বলিয়াই শরীরের আরামদায়ক। জৈবক্রিয়ার প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব। সেইজন্য

ইহা আমাদের মনে ইন্দ্রিয়সেবার বাসনা ও রম্যবস্তুতে মোহ উৎপাদন করে।

রম্যতা বস্তুগত ও ইহাতে ভোক্তা ভোগ্যবস্তুর অধীন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহিত রম্যতার সম্পর্ক নাই। যেমন অগ্নিসংস্পর্শে গাত্রে প্রদাহ, তেমনি মধুসংস্পর্শে জিহ্বায় মিষ্টতা বোধ হইবেই। ভোগের ইচ্ছা না থাকিলেও রম্যতার স্পর্শে ভোক্তামাত্রই কতকটা শারীরিক আরাম উপভোগ করে এবং ভোক্তার মনে ভোগবাসনা থাকিলে সেই আরামের সহিত বাসনাতৃপ্তির আনন্দ মিশ্রিত হইয়া একত্র দেহমনের সুখভোগ ঘটে।

রম্যতা সর্বজনীনও বটে। প্রাণিমাত্রই অল্পবিস্তর রম্যতা-ভোগে অধিকারী। বাঁশীর সুরে হরিণ উৎকর্ণ হয়, মেঘমন্দ্রে ময়ূর নাচে, পুষ্পগন্ধে ভ্রমর উন্মত্ত হয়, আগুনের রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গ পুড়িয়া মরে।

কোন কোন রম্যবস্তু সম্বন্ধে কখন কখন মানুষের রুচিভেদ দেখা যায়; এজন্য রম্যতার বস্তুধর্মে ও সর্বজনীনত্বে সন্দেহ করা অযৌক্তিক। কোন কোন সময়ে দেখা যায়—একের রসনায় যাহা প্রিয়, অপরের রসনায় তাহাই অপ্রিয়। লঙ্কার ঝাল কেহ পছন্দ করে, কেহ পছন্দ করে না। কিন্তু এই রুচিভেদ মানুষের স্বভাবজাত নহে, ইহা কৃত্রিম অভ্যাসের ফল বা বিকার। বিকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বভাবকে মিথ্যা বলা চলে না। বিশেষ সূত্রের দ্বারা সাধারণ সূত্রের খণ্ডন হয় না, সাধারণ সূত্র সীমাবদ্ধ হয় মাত্র।

§ ৪. বস্তুনিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে মানুষের স্বাধীন মনঃশক্তির উদ্বোধন ঘটে ও সেই উদ্বোধনে ভোক্তা মানস আনন্দ ভোগ করে, তাহার নাম 'সৌন্দর্য'।

—এই মন সূক্ষ্ম স্বাধীন মন, ইন্দ্রিয়াধীন স্থুল মন বা অন্তরিন্দ্রিয় নহে। মনঃশক্তি বলিতে পরিমার্জন, পরিবর্জন, সংযোজন,

সংরচন, সমঞ্জসীকরণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস ক্রিয়ার শক্তি বুঝিতে হইবে।

সৌন্দর্য

[মানুষ কেন সৌন্দর্যে আনন্দ পায় এবং বস্তু কি কি গুণে সুন্দর হয়, তাহার জন্য পরবর্তী 'সৌন্দর্যের উপাদান' আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

সৌন্দর্য রম্যতা নহে। রম্যতা প্রত্যক্ষ, সৌন্দর্য পরোক্ষ। রম্যতাভোগ ইন্দ্রিয়ে, সৌন্দর্য্যভোগ মনে। ভোক্তা রম্যতাভোগে ভোগ্যবস্তুর অধীন, সৌন্দর্যভোগে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। রম্যতাভোগে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, সৌন্দর্যভোগে আমরা পরিমার্জন, পরিবর্জন, সংযোজন, সমঞ্জসীকরণ, কল্পনার এবং বিচিত্র ভাব ও চিন্তার সংরচন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মানসিক ক্রিয়ার কর্তা। রম্যতাভোগে আমাদের দৈহিক জীবনের বর্ধন, সৌন্দর্যভোগে আমাদের চৈতন্য-জীবনের স্ফুরণ ও বিস্তার, রম্যতায় আমাদিগের আরাম, সৌন্দর্যে আমাদিগের আনন্দ।

সৌন্দর্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ সৌন্দর্য মানব চিত্তের ভোগ-সাপেক্ষ। প্রাণি-মধ্যে মানুষেরই মন সর্বাপেক্ষা সুপরিণত, সেইজন্য একমাত্র মানুষই সৌন্দর্যভোগের ও মানসিক আনন্দের অধিকারী।

সৌন্দর্যের কারণ থাকে যেখানে, প্রকাশ সেখানে নহে; প্রকাশ হয় অন্যত্র। সৌন্দর্য বাহ্য বস্তুগত, কিন্তু প্রকাশিত হয় মানুষের চিত্তে। ইহা শুনিতেই অদ্ভুত কিন্তু বস্তুতঃ অসাধারণ ব্যাপার নহে। ধ্বনি (sound) বা বর্ণ (colour) বাহ্যবস্তুগত বটে কিন্তু উহাদের প্রকাশ মানুষের কর্ণে ও চক্ষুতে। সৌন্দর্যের ব্যাপারও এই প্রকার। মানবচিত্তই সৌন্দর্যের গ্রাহকযন্ত্র (receiver); সেইজন্য মানবচিত্তের ভোগেই সৌন্দর্যের সার্থকতা।

সৌন্দর্যের বিচারে মানবচিত্তরূপ গ্রাহকযন্ত্রের সাক্ষ্যই প্রামাণিক।

যাহাতে স্বাভাবিক কোন মানুষ সুখভোগ করিতে পারে না, তাহা সুন্দর নহে। একটি শকুনের রূপ দেখিয়া শকুন-সম্প্রদায় তৃপ্ত হইতে পারে, অথবা একটি গাধার ডাক শুনিয়া অন্যান্য গাধা মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনও তৃপ্ত বা মুগ্ধ হয় না। সুতরাং পশুপক্ষীর মতামত উপেক্ষা করিয়াই বলা চলে—শকুনের রূপ বা গাধার ডাক সুন্দর নহে।

দ্বিতীয়তঃ মানব চিত্তসাপেক্ষ হইলেও সৌন্দর্য ব্যক্তিগত বা ক্ষণিক নহে, ইহা বস্তুগত স্থায়ী ও সত্য পদার্থ।

মানবচিত্তসাপেক্ষ হইলেই কোন কিছু ব্যক্তিগত বা বস্তুবিজ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া যায় না। আলোক, উত্তাপ, ধ্বনি—ইহারা মানবের অন্তরিন্দ্রিয় বা মানসবোধ সাপেক্ষ, তথাপি ইহারা বস্তুগত এবং বস্তুবিজ্ঞানের আলোচ্য। সৌন্দর্যও সেইরূপ।

সৌন্দর্যের বস্তুগত অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত হিসাবে একদিকে রাজহংসের রূপ ও অন্যদিকে শিশুর শিশুত্ব উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজহংসের সৌন্দর্য যদি ব্যক্তিগত খেয়াল হইত, তাহা হইলে দৈবাৎ একজন ইহাতে আনন্দ পাইতেন, কিন্তু মনুষ্যমাত্রই রাজহংস দেখিয়া খুসী হয়, বিভিন্ন যুগের কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে শিল্পী ও কবিগণ রাজহংসের সৌন্দর্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শিশুর সৌন্দর্য যদি একটি বিশেষ জননীর পক্ষে সত্য হইত, তাহা হইলে উহাকে ক্ষণিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা চলিত, কিন্তু সকল দেশের সকল কালের সকল জননীই শিশু সন্তানের সংসর্গে খুসী না হইয়া পারেন না।

সৌন্দর্য বস্তুগত বলিয়াই সাধারণের পক্ষে উহাতে 'খুসী হওয়া' সম্ভব হয়।

মানুষের দ্বারা আস্বাদিত না হইলে সৌন্দর্য ব্যর্থ হয় বটে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভূত হইবার

পূর্বে যে সৌন্দর্য ছিল না ও মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহা নহে। জগতের সৌন্দর্য বহুকাল মানুষের ভোগের জন্য অপেক্ষা করিয়াছে এবং এখনও অপেক্ষা করিতেছে; ইহাই সৌন্দর্যের যথার্থ ইতিহাস।

§ ৫. সৌন্দর্য দ্বিবিধ; বস্তুর প্রকৃতিগত সৌন্দর্য হইতেছে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং আকৃতিগত সৌন্দর্য হইতেছে স্থূল সৌন্দর্য।

সূক্ষ্ম সৌন্দর্য

(১) প্রকৃতিগত সৌন্দর্য বস্তুতে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে; সেইজন্য ইহার নাম সূক্ষ্ম সৌন্দর্য। অপরিণত-চিত্ত ব্যক্তির কাছে ইহা গুপ্তই থাকে, পরিণতচিত্ত অর্থাৎ সহৃদয় মনস্বী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলেই উহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়; ইহারই প্রভাবে সুপরিণত মন নূতন অর্থ-আবিষ্কার বা ভাবসৃষ্টিতে বাধ্য হয়; ফলে যাহা আপাত-দৃষ্টিতে শ্রীহীন বস্তু, সহসা তাহাতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং ভোক্তা সৃষ্টি ও আবিষ্কারের মানস আনন্দ উপভোগ করে। যেমন আলোকের কারণ-স্বরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি বৈদ্যুত-প্রবাহযুক্ত তারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করে, ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

শিশুত্ব সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টান্ত। হৃদয়হীন ব্যক্তির কাছে ইহার সৌন্দর্য পরিস্ফুট নহে। কিন্তু সহৃদয় পুরুষ ও স্নেহশীলা নারীর মধ্যে উহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়, তাহাদের চিত্তকে করুণা ও বাৎসল্য সৃষ্টিতে বাধ্য করে। সৃজনের এই আনন্দের মধ্য দিয়া দেখিলে তবেই তাহার অপরিস্ফুট সৌন্দর্য পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

যেমন পিতামাতার কাছে শিশুর সৌন্দর্য, তেমনি সুপণ্ডিত গণিতবিদের কাছে উচ্চতর গণিতের তত্ত্বসৌন্দর্য, সমজদার শ্রোতার কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের সৌন্দর্য—ইহারা সাহিত্য-বহির্ভূত

সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ বাহ্য ও সহজ সৌন্দর্য থাকে না বলিয়া ইহারা অনধিকারীর কাছে দুর্বোধ্য। পঙ্গু বা অপরিণত মনের সৃষ্টি-শক্তি থাকে না, সেইজন্য এই মনের দ্বারা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উপভোগ হয় না।

অন্ধ যেমন বর্ণকে সত্য ও বস্তুগত বলিয়া ভাবিতে পারে না, অনধিকারী ব্যক্তিরাও তেমনি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত ও মিথ্যা কল্পনাবিলাস বলিয়া মনে করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 'অন্ধের যুক্তি' স্বীকার্য নহে। সৌন্দর্য সূক্ষ্ম হইলেও সত্য ও চিরন্তন।

(২) আকৃতিগত সৌন্দর্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বা জীবদেহে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারা যায়; সেইজন্য ইহাকে বলে স্থূল সৌন্দর্য।

স্থূল সৌন্দর্য

স্থূল সৌন্দর্য দ্বিবিধ—দৃষ্টিগত ও শ্রুতিগত।

মন্দিরের গঠন, রাজহংসের চলন, বিল্বপত্রের আকৃতি, ময়ূরের নৃত্য—ইহারা দৃষ্টিগত স্থূল সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত এবং সঙ্গীতের রাগিনী, নদীর কল্লোল, কাব্যভাষার উচ্চারণ—ইহারা শ্রুতিগত স্থূল সৌন্দর্যের উদাহরণ।

স্থূল সৌন্দর্যে রম্যতার ন্যায় বর্ণ-লাবণ্য বা ধ্বনি-মাধুর্য প্রাধান্য পায় না, রূপের আকৃতি বা ধ্বনিপ্রবাহের গঠন অর্থাৎ 'ফর্ম' (form) উপভোগ্য হইয়া উঠে। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে গ্রন্থকার রূপ গোস্বামী নয়নাভিরাম বর্ণ বা শ্রুতিসুখকর ধ্বনিকে সুন্দর বলেন নাই। সৌন্দর্য বলিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ ও সুশ্লিষ্ট (মানানসই) সংযোগই বুঝাইয়াছেন—

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাঞ্চ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্ট সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে॥

ইহাই স্থূল সৌন্দর্যের প্রকৃত অর্থ। মহাভারতে কৃষ্ণাঙ্গী দ্রৌপদীকে গঠনেরই দিক দিয়া সুন্দরী বলা হইয়াছে।

স্থূল সৌন্দর্যের উপভোগে আমাদের চক্ষু উপভোগ্য রূপের আকৃতিকে এবং আমাদের কর্ণ ধ্বনিপ্রবাহের গঠনকে অনুসরণ করে। ইহারা উপভোগ্য বস্তুর অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ক্রমিক স্নায়বিক প্রবাহ সৃষ্টি করে। আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই প্রবাহগুলি বোধ করি। এইখানেই শারীরিক ক্রিয়ার সমাপ্তি ও স্বাধীন মনের ক্রিয়ার সূচনা। মন উক্ত দৃষ্টিলব্ধ বা শ্রুতিলব্ধ ক্রমিক স্নায়বিক প্রবাহগুলিকে বিন্যস্ত ঐক্যবদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া নিজের স্বাধীন কর্মশক্তির পরিচয় দেয়; ঐক্যের অনুকূল অংশগুলির সমঞ্জসীকরণ করে এবং প্রতিকূল অংশগুলির সংশোধন* বা উপেক্ষা করে। স্থূল সৌন্দর্যে মন কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নায়বিক প্রবাহের কতকটা দাসত্বই করে। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন মন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নূতন ভাব ও অর্থসৃষ্টির সূক্ষ্ম আনন্দ পায়, স্থূল সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সে আনন্দ পায় না, কেবল সক্রিয়তার সাধারণ জীবনানন্দই অনুভব করে। তবে ইহাতে দেহ ও মন উভয়ই পরিচালিত হয় বলিয়া আমাদের প্রাণধর্মও তৃপ্তিলাভ করে।

স্থূল সৌন্দর্য মানব মাত্রেরই উপভোগ্য, ইহাতে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ নাই।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ভোক্তার প্রিয়তা রম্যতায় বিষয়গত, স্থূল সৌন্দর্যে আকৃতিগত এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে ব্যঞ্জনাগত। রম্যতায় কেবল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে কেবল মনের ক্রিয়া এবং স্থূল সৌন্দর্যে ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সকলের মিলিত ক্রিয়া। রম্যতা অধিকাংশ জীবের, স্থূল সৌন্দর্য কেবল মানবের এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য কেবল 'অধিকারী' ব্যক্তির উপভোগ্য।

---

* ছন্দের ক্ষেত্রে মনের দ্বারা ধ্বনিপ্রবাহের গঠনগত সৌন্দর্যের প্রতিকূল অংশ সংশোধনের চেষ্টায় শব্দ-সংকোচন, শব্দ-প্রসারণ ও শব্দ-সংযোজনের উৎপত্তি। (প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম সূত্র দ্রষ্টব্য।)

§ ৬. আকৃতিগত স্থূল সৌন্দর্যই সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক সৌন্দর্য; ইহারই অন্তর্গত ছন্দ।

রম্যতা কেবল দেহধর্মকে মানিয়া চলে ও মনোধর্মকে অস্বীকার করে এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য দেহধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মনোধর্মকেই আশ্রয় করে। সেই জন্য ইহাদিগকে আংশিক বা খণ্ড সৌন্দর্যই বলিতে হয়। অপরপক্ষে স্থূল সৌন্দর্য অর্থাৎ আকৃতিগত সৌন্দর্য মানবের দেহ মন প্রাণ সকলকে মানিয়া চলে ও সকলকেই তৃপ্তিদান করে। অতএব স্থূল সৌন্দর্যই প্রকৃত অখণ্ড ও সামগ্রিক সৌন্দর্য।

ছন্দের স্থূল সৌন্দর্য-ত্ব

ছন্দ শ্রুতিগত স্থূল সৌন্দর্য, সেই হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক সৌন্দর্য।

[অতঃপর সৌন্দর্য বলিতে সাধারণতঃ আকৃতিগত স্থূল সৌন্দর্যই বুঝিতে হইবে। ছন্দ-শাস্ত্রে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের আলোচনা অবান্তর।]

সৌন্দর্যের উপাদান

§ ৭. ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের আকৃতিগত যে যে বৈশিষ্ট্য মানবের প্রাণ মন ও দেহের অনুকূল, তাহারাই সৌন্দর্যের যথার্থ উপাদান।

সৌন্দর্য মানবভোগ্য, সেইজন্য মানবজীবনের অনুকূল হইতে বাধ্য। কোন বিষয় যদি মানবের প্রাণধর্ম মনোধর্ম বা দেহ-ধর্মের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে মানব তাহাতে সুখবোধ করিতে পারে না। অপরপক্ষে যাহা প্রাণধর্ম মনোধর্ম ও দেহধর্মকে মানিয়া চলে, তাহা মানবের জীবন-বর্ধনের সহায়তা করে, প্রিয় হইয়া উঠে এবং সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। মানবভোগ্য বলিয়াই সৌন্দর্যের নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবের প্রাণ মন দেহ তিনটিরই দাবী তাহাকে মিটাইতে হয়। নারী বর্ণে গৌরাঙ্গী হইলেও

সৌন্দর্যের ত্রিবিধ উপাদান

যদি রুগ্‌ণ, কোটরাক্ষী ও কঙ্কালসার হয়, অথবা অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুন্দরী বলা চলে না।

§ ৮. ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের 'অঙ্গবহুত্ব' হইতেছে সৌন্দর্যের প্রাণধর্মী উপাদান।

প্রাণের ধর্ম কর্মচঞ্চলতা, দেহ ও মনকে পরিচালিত করাই প্রাণের কাজ। যে কোন ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় প্রাণ-ধর্মের অনুকূলতা হয় বলিয়াই সুখলাভ ঘটে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়েরই ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ; একেবারে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে; অতএব কেবল পরিমিত ভাবে ইন্দ্রিয় ভোগেই সুখলাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য বস্তুর রম্যতা আমাদের ভালো লাগে কিন্তু এই ভালো লাগা ক্ষণস্থায়ী; মুহূর্তের সুখ অল্প সুখ মাত্র। অল্প সুখে তৃপ্তি নাই; তাই অল্প সুখ প্রকৃত সুখপদবাচ্য নহে। সেইজন্য বস্তুর রম্যতাকে সৌন্দর্যের মধ্যে ফেলা চলে না। পরিমিত ভাবে অল্প অল্প করিয়া বহুবার ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যথার্থ সুখপ্রাপ্তি ঘটে। সেইজন্য বারংবার ইন্দ্রিয়ভোগের সুযোগ দান করিবার শক্তিই হইতেছে সৌন্দর্যের প্রাণধর্মী উপাদান।

(১) অঙ্গবহুত্ব

মানবের কেবল চক্ষু ও কর্ণ সুপরিণত বলিয়া যথার্থ সৌন্দর্য-ভোগের ইন্দ্রিয়। সুন্দর হইতে গেলে বস্তুকে তাই এরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইতে হয়, যাহাতে আকৃতির অনুসরণ করিতে গিয়া আমাদের চক্ষু বা কর্ণকে বারংবার পরিমিত শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

দ্রষ্টব্য বস্তু বা শ্রোতব্য বস্তু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অঙ্গ বিশিষ্ট না হইলে তাহার আকৃতি বা গঠন অনুসরণে চক্ষু বা কর্ণের বারংবার শক্তিপ্রয়োগ অপরিহার্য হয় না। এই জন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয়—

সৌন্দর্য অঙ্গগত বহুত্ব-সাপেক্ষ।

কেঁচোর আকৃতি সুন্দর নহে, কিন্তু সাপের আকৃতি সুন্দর। ইহার কারণ, কেঁচোর সরল-রৈখিক দেহভঙ্গিতে বহুত্ব-সূচক অংশ বুঝা যায় না; অপর পক্ষে সাপকে আঁকাবাঁকা রেখায় তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দেখা যায়, তাহার গঠনে অংশ-বহুত্ব সুস্পষ্ট।

[সুন্দর হইতে গেলে 'বহু'র প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু বহু থাকিলেই বস্তু সুন্দর হয় না। বহুজনের সমাবেশজাত জনতা সুন্দর নহে। নানাধ্বনির সমাবেশে উৎপন্ন হট্টগোল সুন্দর নহে।

প্রাণধর্মী উপাদান সৌন্দর্যের একটি উপাদান মাত্র। একটি উপাদানেই সৌন্দর্য গঠিত হয় না।]

§ ৯. অঙ্গসংহতি-মূলক শৃঙ্খলাই সৌন্দর্যের মনোধর্মী উপাদান।

চিন্তা অনুভব ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ক্রিয়া সত্ত্বেও মন একটি অখণ্ড সত্তা। এই মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা বস্তু বা বিষয়ের পূর্ণতা প্রত্যাশা করি। অপূর্ণতা মনোধর্মের প্রতিকূল ও সেইজন্য পীড়াদায়ক; পূর্ণতা মনোধর্মের অনুকূল ও সেইজন্য আনন্দপ্রদ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-যুক্ত একটি পূর্ণ-গঠিত মন্দির বা সম্পূর্ণাঙ্গ দেবমূর্তি সুন্দর, কিন্তু ভগ্নমন্দির বা অঙ্গহীন মূর্তি কুৎসিত। শূর্পনখার ন্যায় ছিন্ননাসা নারী কুৎসিতই বটে।

(২) অঙ্গসংহতি

[ভগ্ন মন্দিরে বা অঙ্গহীন মূর্তিতে কখন কখন শিল্পী ও কবি সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন; কিন্তু 'আবিষ্কৃত' সৌন্দর্যকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যই বলিতে হইবে। উহা সাধারণ সৌন্দর্য অর্থাৎ স্থূল সৌন্দর্যের অন্তর্গত নহে।]

সৌন্দর্য বহুত্ব-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু যেখানে এই 'বহু' পরস্পর স্বতন্ত্র, সেখানে মনোধর্মের প্রতিকূলতার জন্য মানুষ তৃপ্তি পায় না এবং সৌন্দর্য বোধ করিতে পারে না; সেইজন্য জনতা বা হট্টগোল সুন্দর নহে। কিন্তু—

বহু বস্তু যদি অন্য একটি বৃহত্তর বস্তুর অঙ্গস্বরূপ হইয়া

প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ঐক্যদায়ক বৃহত্তর বস্তুর জন্য উহারাও সৌন্দর্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। বহু শাখা প্রশাখা পত্রাদি যেখানে একটি বিশেষ বৃক্ষকে সূচিত করে, সেখানে উহারা সৌন্দর্যবোধের উৎপাদক হইতে পারে।

এমন কি একটি কুৎসিত বস্তুও যদি কোন সুন্দর বস্তুর অঙ্গীভূত হইয়া সমগ্রের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই কুৎসিত বস্তুরও কদর্যতা দূর হইয়া যায়। একটি ভগ্ন মন্দির একাকী অসুন্দর বটে কিন্তু বনের দৃশ্যের মধ্যে এই ভগ্ন মন্দিরের কদর্যতা দূর হয়। একটি বিচ্ছিন্ন সাওঁতাল হয়ত কুৎসিত হইতে পারে, কিন্তু সাওঁতালী নৃত্যচক্রের মধ্যে তাহার শ্রীহীনতা দূর হয়। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন—যে ব্যাঙের ডাক অন্য সময়ে কর্কশ, উহাই বর্ষার ধারা-পতন-ধ্বনির ঐকতানের মধ্যে চমৎকার। এই প্রকার কদর্যতা দূরীভূত হওয়ার মূলে রহিয়াছে ভোক্তার মনে বিকশিত সমগ্রতা-বোধ বা পূর্ণতা-বোধ।

একটি বস্তুর অন্তর্গত বহু অঙ্গকে কিংবা একত্র অবস্থিত বহু বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে—সম, আ-সম ও বি-ষম। পূর্ণ সাদৃশ্যে 'সম', ঈষৎ পার্থক্যে 'আ-সম' এবং অতিশয় পার্থক্যে 'বি-ষম' বুঝিতে হইবে।

যে নিয়ম বা ধর্ম শৃঙ্খলের ন্যায় সম, আ-সম, বি-ষম সকল প্রকার অঙ্গকে বা বস্তুকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী সংহত বা ঐক্যবদ্ধ করে তাহার নাম শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই হয় সংহতি। শৃঙ্খলা উপায়, সংহতি লক্ষ্য। এই শৃঙ্খলাই হইতেছে বস্তুর পূর্ণতা সূচক বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই সৌন্দর্যের মনোধর্মী উপাদান।

সুন্দর হইতে গেলে কোন বস্তুকে শুধু বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত হইলেই চলে না, যদি ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা

প্রকাশ পায়, তবেই বস্তুটি সুন্দর হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা চলে যে—

সৌন্দর্য অঙ্গগত শৃঙ্খলা-সাপেক্ষ।

জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা আসিলে তাহা সুন্দর ব্যূহে পরিণত হয়; হট্টগোলের মধ্যে শৃঙ্খলা আসিলে তাহা ঐকতান হইয়া উঠে।

[সুন্দর বস্তুতে শৃঙ্খলা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু শৃঙ্খলা থাকিলেই বস্তু সুন্দর হয় না। যে-কোন প্রাণী বা বৃক্ষের অঙ্গগুলি শৃঙ্খলার সহিত কর্ম করিয়া প্রাণী বা বৃক্ষকে বাঁচাইয়া রাখে; কিন্তু তাই বলিয়া যে-কোন প্রাণী বা গাছ সুন্দর নহে। সিংহ বা হরিণ সুন্দর, উট বা জিরাফ কুৎসিত; ময়ূর বা রাজহংস সুন্দর, শকুন বা হাড়গিলা পাখী অসুন্দর; বকুল বা বটগাছ সুন্দর, বাঁশ বা খেঁজুর গাছ কুৎসিত। অর্থাৎ কেবল প্রাণধর্মী ও মনোধর্মী উপাদান নহে, সৌন্দর্যের তৃতীয় উপাদানও বর্তমান।]

§ ১০. অঙ্গসামঞ্জস্যই সৌন্দর্যের দেহধর্মী উপাদান।

সম বা আ-সমের পরস্পর মিলনের (agreement) নাম সামঞ্জস্য। অঙ্গগুলির পরস্পর বি-ষমতা না থাকিলে তবেই অঙ্গ-সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। আমাদের দেহ সমপ্রকার স্নায়বিক অনুভূতিতে অভ্যস্ত। আ-সম প্রকার অনুভূতিও দেহ অল্পে অল্পে সহ্য করিতে পারে কিন্তু বি-ষম প্রকার অনুভূতি বা স্নায়বিক বিক্ষোভ দেহের পক্ষে কষ্টকর। ইহাই দেহধর্ম।

(৩) অঙ্গসামঞ্জস্য

আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, ধমনী-স্পন্দন 'সম' তালে হয়। চলিবার সময়ে পদক্ষেপেও সমতাল বজায় থাকে। সমপ্রকার স্নায়বিক বোধের পৌনঃপুনিকতায় মানবদেহ অভ্যস্ত এবং অভ্যস্ত ভঙ্গিই দেহের পক্ষে সহজ ও আরামদায়ক। উপভোগ্য রূপের বা ধ্বনি-প্রবাহের অঙ্গগুলি যদি পরস্পর সম

আকারের হয়, তাহা হইলে চক্ষুতে বা কর্ণে বিশেষ প্রকার স্নায়বিক বোধের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই পুনরাবৃত্তি দেহযন্ত্রের অভ্যস্ত ভঙ্গি বলিয়াই ইহাতে ভোক্তা দেহ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এবং উপভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে তাহার মনে সৌন্দর্যবোধ জন্মায়।

[ইহা পদ্যছন্দের মূল কথা।]

অপরপক্ষে দেহ অবস্থার দাস এবং জগৎ পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময়। জগতের অসমতা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেহের শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া দেহ ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া অসম স্নায়বিক প্রবাহ গ্রহণ করিতে পারে, তবে হঠাৎ পারে না। হঠাৎ-গ্রহণের সংঘাত অথবা বিষম স্নায়বিক প্রবাহের বিক্ষোভ স্বাস্থ্যভঙ্গ-কারক এবং যন্ত্রণাদায়ক। সেইজন্য আমাদের চক্ষু বা কর্ণ উপভোগ্য বস্তুর অঙ্গ সমূহের সমতায় বা আ-সমতায় সুখভোগ করিতে পারে, কিন্তু বিষমতায় কষ্ট পায়। মোটর গাড়ীর সমান গতিবেগ ভ্রমণকারী আরোহীর পক্ষে সুখকর, এমনকি অল্প অল্প বেগবৃদ্ধি বা বেগহ্রাসও সহনীয় ও সুখকর কিন্তু হঠাৎ অতিরিক্ত বেগবৃদ্ধি বা বেগহ্রাস অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক।

[ইহা গদ্যছন্দের মূল তত্ত্ব।]

অতএব সুন্দর হইতে গেলে বস্তু বা বিষয়ের কেবল অঙ্গবহুত্ব ও অঙ্গসংহতি বা শৃঙ্খলা থাকাই যথেষ্ট নহে, ভোক্তার চক্ষুতে বা কর্ণে যাহাতে স্নায়বিক বিক্ষোভ না হয়, সেই প্রকার গঠন বিশিষ্ট হওয়াও আবশ্যক। পর পর অঙ্গগুলির অনুসরণে চক্ষুতে বা কর্ণে কেবল সমপ্রকার স্নায়বিক বোধ অথবা ঈষৎ-পরিবর্তিত স্নায়বিক বোধ উৎপন্ন হইলে তবেই চক্ষু বা কর্ণ তৃপ্ত হয় এবং বস্তুকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, নচেৎ বি-ষম অঙ্গের অনুসরণে চক্ষু বা কর্ণ স্নায়বিক বিক্ষোভ অনুভব করে এবং বস্তুকে কুৎসিত বলিয়া মনে হয়।

ছন্দ-শাস্ত্রে প্রাণি-সৌন্দর্য নহে, বস্তু-সৌন্দর্যই প্রাসঙ্গিক ; কারণ ছন্দ হইতেছে ধ্বনি-প্রবাহের সৌন্দর্য এবং সেই হিসাবে ইহা বস্তু-সৌন্দর্যেরই অন্তর্গত। বস্তুসৌন্দর্য ও প্রাণিসৌন্দর্যে ভেদ আছে। বস্তুসৌন্দর্য সরল; কিন্তু প্রাণিসৌন্দর্য জটিল। প্রাণিদেহের সৌন্দর্য নির্ণয়ে ভোক্তার চক্ষুক্রিয়ার সহিত মনঃক্রিয়াও যুক্ত হয় ও সৌন্দর্য বিচারে মন অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠে। বস্তুসৌন্দর্য-ভোগে মন ক্রমিক অঙ্গগুলির কেবল রেখাগত (lineal) সামঞ্জস্য নির্ণয় করে কিন্তু প্রাণিসৌন্দর্য ভোগে উহা পৃথক পৃথক অঙ্গের সহিত মূলদেহের এবং প্রত্যঙ্গের সহিত অঙ্গের আয়তনগত (volumetric) সামঞ্জস্যও বিচার করে। কেবল বাহিরের রেখায় রেখায় মিলন নহে, পা মাথা গলা প্রভৃতি অঙ্গ এবং নাক চোখ আঙ্গুল প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ যথাক্রমে দেহ ও অঙ্গের সহিত উচ্চতায় স্থূলতায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মানানসই কিনা তাহারও বিচার হয়। ভোক্তা তাহার সংস্কারজাত একটা সাধারণ আদর্শের মান-দণ্ডে এই বিচার করে; আদর্শের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতা বা আ-সমতা থাকিলে প্রাণীকে সুন্দর এবং বিষমতা থাকিলে প্রাণীকে কুৎসিত বলিয়া মনে করে। এইজন্যই হরিণ সুন্দর ও জিরাফ কুৎসিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে। লম্বা কান ছাগলের পক্ষে সুন্দর কিন্তু বাঘের পক্ষে কুৎসিত। এক্ষেত্রে আমাদের অভ্যাসজ সংস্কার সাধারণ রূপদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। আবার মনুষ্যসৌন্দর্য নির্ণয়ে আরও অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি হয়— জাতিগত সংস্কার, স্বজাতি প্রিয়তা, যৌন বাসনা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সাধারণ রূপদৃষ্টিকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে। সেইজন্য চেপ্টা নাক কেবল চীনাদের কাছে ও স্থূল ওষ্ঠাধর কেবল কাফ্রী নিগ্রোর কাছে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, অথচ অন্য জাতির কাছে কুৎসিত ঠেকে। এইজন্যই বিড়ালাক্ষী (নীল নয়না) ইংরেজ নারী কেবল

ইংরেজের দৃষ্টিতে সুন্দরী। মনুষ্যসৌন্দর্য ভোক্তার মানস-জটিলতা সৃষ্টি করে বলিয়া উহাকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের মধ্যে গণনা করা উচিত।

আলোচ্য সৌন্দর্যবিচারে বস্তু বা বিষয়ের অঙ্গ-সামঞ্জস্য দ্বিবিধ—সঙ্গতি ও সম্মিতি।

§ ১১. বস্তু বা বিষয়ের সম ও আ-সম অঙ্গের আকৃতি-সামঞ্জস্যের নাম 'সঙ্গতি' (harmony)। বিষম অঙ্গগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে, সঙ্গতি থাকিতে পারে না।

সঙ্গতি

পর্বতের শিখর-মালায়, মেঘের গঠনে, উৎস-জলের উচ্ছ্বাসে, ধূমের সঞ্চরণে, নদীর গতিতে, মাছের সাঁতারে, রাগ-রাগিণীর আলাপে দেখা যায় সঙ্গতি।

এই দৃষ্টান্তগুলির অঙ্গেঅঙ্গে সমতা না থাকিলেও বিষমতা নহে, আ-সমতাই দেখা যায়; সেইজন্য এইগুলিতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয়—

সৌন্দর্য অঙ্গগত সঙ্গতি-সাপেক্ষ।

এই সঙ্গতিই সৌন্দর্যের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য।

['সঙ্গতি' গদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ।]

§ ১২. কেবল সম অঙ্গ সমূহের আকৃতি-সামঞ্জস্যের নাম সম্মিতি (symmetry)।

সঙ্গতি ও সম্মিতি পরস্পরের বিরোধী নহে, পরিপূরক। সাধারণ ক্ষেত্রের সঙ্গতি বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মিতি হইয়া উঠে।

বিল্ব পত্রের গঠনে, মন্দির বা মসজিদের আকারে, ঘড়ির দোলকে, সর্পের গমনে, ঝুলন দোলায়, ময়ূরের নাচে, নিতম্বিনীর

সম্মিতি

চলনে, তাল-মান-লয়-যুক্ত সঙ্গীতে দেখা যায় সম্মিতি। ত্রিপত্র বেলপাতার কেন্দ্রস্থ পত্রের উভয় পার্শ্বে পত্র-সাম্য, মন্দির বা মসজিদের মেরুদণ্ড-রেখার (axis)

উভয় পার্শ্বে ভার-সাম্য ও রেখা-সাম্য, ঘড়ির দোলকে ও ঝুলন দোলায় কেন্দ্রবিন্দু হইতে ডাহিনে বামে বা সামনে পিছনে দোলনের সমতা, ময়ূরের নাচে ও নিতম্বিনীর চলনে দক্ষিণাঙ্গ ও বামাঙ্গের সঞ্চালন-সাম্য ও তাল-মান-লয়-যুক্ত সঙ্গীতে তাল-সাম্য আমাদের সম্মিতি-বোধ উৎপন্ন করে বলিয়া এইগুলি আমাদের কাছে সুন্দর।

['সম্মিতি' পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ।]

§ ১৩. সংক্ষেপে সৌন্দর্যের লক্ষণ হইতেছে—(১) অঙ্গ-বহুত্ব, (২) অঙ্গ-সংহতি এবং (৩) অঙ্গ-সঙ্গতি বা অঙ্গ-সম্মিতি।

সৌন্দর্যের ত্রিবিধ লক্ষণ

এই তিনটির একটিরও অভাব ঘটিলে সৌন্দর্য উৎপন্ন হয় না।

অর্থাৎ—

সুন্দর হইতে গেলে রূপ বা ধ্বনিকে সুসঙ্গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-যুক্ত, শৃঙ্খলা-সমন্বিত ও সম্পূর্ণ হইতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ছন্দের গঠন

চরণ, যতি, পর্ব ও স্তবক

§ ১. সৌন্দর্য-লক্ষণের দিক দিয়া ভাষাগত ছন্দ হইতেছে—একাধিক-তরঙ্গ-যুক্ত পূর্ণ ধ্বনি-স্রোতের সুসমঞ্জস প্রবাহ।

ছন্দের এই অর্থ গদ্য ও পদ্য[১] উভয়ত্র প্রযোজ্য।

সকল ধ্বনিস্রোতে সৌন্দর্য বা ছন্দ থাকে না। সৌন্দর্য-তত্ত্বের[২] সিদ্ধান্ত অনুসারে সৌন্দর্যের ত্রিবিধ লক্ষণ—অঙ্গ-বহুত্ব, অঙ্গ-সংহতি ও অঙ্গ-সঙ্গতি ; ধ্বনিস্রোতে এই তিনটি লক্ষণ থাকিলে তবেই উহাতে ছন্দ আছে বলা চলে। ধ্বনি-প্রবাহ একাধিক তরঙ্গ যুক্ত হইলে তবেই উহাতে অঙ্গ-বহুত্ব প্রকাশ পায়, প্রবাহের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতি-দৈর্ঘ্যই তরঙ্গগুলির ঐক্যবদ্ধতা বা অঙ্গ-সংহতি প্রকাশ করে এবং পর পর ক্রমিক তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য-সামঞ্জস্য থাকিলে প্রবাহের অঙ্গ-সঙ্গতি সুস্পষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে অঙ্গ হইতেছে ধ্বনিতরঙ্গ, অঙ্গী হইতেছে পূর্ণ প্রবাহ এবং সঙ্গতি হইতেছে ক্রমিক তরঙ্গগুলির অ-বিষমতা[৩]।

ছন্দের উপাদান

§ ২. পূর্ণ-প্রবাহিত সমগ্র ধ্বনি-স্রোতের নাম চরণ।

চরণের মৌলিক অর্থ 'চলন'। 'পা'-অর্থে চরণ এখানে প্রযোজ্য নহে। এই চরণ (অর্থাৎ চলন) গতির সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। যথা—

চরণ ও পংক্তি

(১) আজি কি তোমার—মধুর মুরতি—হেরিনু শারদ—প্রভাতে!

১। গদ্যত্ব ও পদ্যত্ব ১১ সূত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩। বিষমতার অর্থ ২য় অধ্যায়ের ৯ম সূত্রে দ্রষ্টব্য।

(২) এখানে নামল সন্ধ্যা—সূর্যদেব, কোন দেশে, কোন সমুদ্র-পারে
তোমার প্রভাত হলো !

কবিতায় চরণকে সাধারণতঃ এক পংক্তিতে লেখা হয় বলিয়া কেহ কেহ পংক্তিকেই চরণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চরণ ও পংক্তি একার্থক নহে। চরণ শ্রুতিগ্রাহ্য, পংক্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য; চরণ ধ্বনি-প্রবাহ, পংক্তি বর্ণ-শ্রেণী; চরণের একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকে, কিন্তু পংক্তির কোন নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকিতে পারে না—পংক্তির দৈর্ঘ্য কাগজের প্রস্থের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কাগজ চওড়ায় ছোট হইলে একটি চরণকে একাধিক পংক্তিতে লিখিতে হয়। তাছাড়া—

(ক) কবিতার চরণ এক পংক্তিতে লেখা সম্ভব হইলেও দৃষ্টি-সৌকর্যের জন্য সময়ে সময়ে একাধিক পংক্তিতেও লেখা হয়। উল্লিখিত চরণ-দৃষ্টান্তের প্রথমটি এক পংক্তিতে লিখিত বটে, কিন্তু ইহাকে একাধিক পংক্তিতেও লেখা যায়। যথা—

(i) আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !...............দুই পংক্তি

(ii) আজি কি তোমার
মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !.....................তিন পংক্তি

(iii) আজি কি তোমার
মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ
প্রভাতে !..........................চার পংক্তি

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের ধ্বনিস্রোত দুই তিন বা চার পংক্তিতে প্রকাশিত হইলেও সর্বত্র একটি চরণই বর্তমান।

(খ) কখনও বা একাধিক চরণকে একসঙ্গে একই পংক্তিতে

প্রকাশ করা হয়। চক্ষুতে চরণের একাধিকত্ব দেখা যায় না, কিন্তু কানে ধরা যায়। যথা—

(i) আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে, দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে॥

(ii) ঘন তমসার সজল মায়া, বিছালো ছায়া, নেত্রে তব।
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে, হাস্য ঝরে, কি অভিনব॥

(iii) মধু গন্ধে ভরা, মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া, নীপ কুঞ্জ তলে।
শ্যাম কান্তিময়ী, কোন স্বপ্ন মায়া, ফিরে বৃষ্টি ছলে॥

(iv) গাহিছে কাশীনাথ, নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি।
কণ্ঠে খেলিতেছে, সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখি॥

চক্ষুকে বিশ্বাস না করিয়া কেবল কানের সাহায্য গ্রহণ করিলে বুঝা যাইবে—উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির প্রথমটি ও চতুর্থটির প্রতি পংক্তিতে দুইটি করিয়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির প্রতি পংক্তিতে তিনটি করিয়া চরণ লুকানো আছে। ইহাদের প্রকৃত চরণ-বিন্যাস নিম্নরূপ :—

(i) আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে॥

(ii) ঘন তমসার | সজল মায়া
বিছালো ছায়া
নেত্রে তব।
স্নিগ্ধ তোমার | ওষ্ঠাধরে
হাস্য ঝরে
কি অভিনব॥

(iii) (মধু) গন্ধে ভ | রা
(মৃদু) স্নিগ্ধ ছা | য়া

(নীপ) কুঞ্জ ত | লে।
(শ্যাম) কান্তি ম | য়ী
(কোন) স্বপ্ন মা | য়া
(ফিরে) বৃষ্টি ছ | লে॥

(iv) গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি।
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা | পাখি॥

[পরবর্তী ১২শ সূত্রের আলোচনায় পংক্তিগত চরণ নির্ণয় দ্রষ্টব্য।]

কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর উপর বেশী নির্ভর করা সাধারণ মানুষের অভ্যাস। সেই অভ্যাসে ধ্বনির ক্ষেত্রেও কেহ কেহ চক্ষুর সাহায্য গ্রহণ করিতে যায় ও ফলে প্রবঞ্চিত হয়। কেবল চক্ষু-নির্ভরতার ফলে মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্তিত 'অমিত্র' ছন্দকে কেহ কেহ 'পংক্তি-লঙ্ঘক ছন্দ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ছন্দশাস্ত্রে 'পংক্তি-লঙ্ঘক' শব্দ নিরর্থক; শ্রুতিজগতের ছন্দের পক্ষে দৃষ্টিজগতের পংক্তিকে লঙ্ঘন করার কোন অর্থ হয় না। উপরি-উদ্ধৃত (ক)-দৃষ্টান্ত (আজি কি তোমার মধুর মূরতি···) হইতে বুঝা যায়—কেবল অমিত্র ছন্দ নহে, সর্ববিধ ছন্দের চরণই লিপিবদ্ধ হইবার কালে তথাকথিত পংক্তি-লঙ্ঘন করিতে পারে, অর্থাৎ একাধিক পংক্তিতে বিন্যস্ত হইতে পারে। তাছাড়া 'চরণ-লঙ্ঘক' অর্থেও পংক্তি-লঙ্ঘক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। চরণই ছন্দের আশ্রয়, এই আশ্রয়কে লঙ্ঘন করিয়া ছন্দের শূন্যে অবস্থান সম্ভব নহে। অমিত্র ছন্দও চরণ লঙ্ঘন করে না; উহাতে কবিতার অর্থ একটি বিশেষ চরণে সমাপ্ত না হইয়া একাধিক চরণে ব্যাপ্ত হয় মাত্র। কবিতার অর্থের সহিত ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই।

[প্রথম অধ্যায় ৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।]

§ ৩. পূর্ণ ধ্বনি-প্রবাহের বা উহার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের সীমা-জ্ঞাপক বিরতির নাম যতি। ধ্বনি-প্রবাহের সমাপ্তি সূচক যতি হইতেছে অন্ত্যযতি ও প্রবাহমধ্যে খণ্ডতা-বিধায়ক যতি হইতেছে মধ্যযতি এবং যতিখণ্ডিত প্রবাহাংশ হইতেছে পর্ব।

যতি ও পর্ব

যতি প্রকৃতপক্ষে উচ্চারণের অভাব নহে, ইহা উচ্চারণ-সংযম। যতি শক্তিহীন বা নিক্রিয় নহে। যতিই নির্দিষ্ট স্থানে ধ্বনিপ্রবাহের চলিষ্ণু বেগ রোধ করে ও পর্ব-শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ইহা মিলন-সাধকও বটে; মধ্যযতি দুইটি পর্বের গ্রন্থি-বন্ধনের কাজ করে।

মধ্যযতির সমাবেশে চরণের 'অঙ্গ-বহুত্ব' রূপ সৌন্দর্য-লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধ্বনিস্রোত অনর্গল ভাবে উচ্চারিত হইলে তাহা বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট কিনা বুঝা যায় না; তখন সমস্ত ধ্বনি একাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন হইয়া যায়। যথা—

বরণসিণরবইলুলিঅ

ইহার উচ্চারণে একটি ধ্বনিস্রোত সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এই ধ্বনিস্রোত যে বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট তাহা বুঝা যায় না; কিন্তু মধ্যযতির সমাবেশে অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ বিরতিতে সমগ্র ধ্বনিস্রোত খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং যতি-বিভক্ত অঙ্গগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যথা—

বরণসি ণরবই লুলিঅ
(বারাণসী নরপতি লুলিত)

দুইটি মধ্যযতির জন্য উক্ত চরণ (ধ্বনিপ্রবাহ) তিনটি অংশে বিভক্ত হইয়া ত্রিপর্বিক (ত্রি-অঙ্গ-বিশিষ্ট) হইয়া উঠিয়াছে। 'বরণসি', 'ণরবই' এবং 'লুলিঅ'—এই তিনটির প্রতিটিই উক্ত চরণের পর্ব।

মধ্যযতি-স্থাপনের ফলে প্রবাহবেগ যতিস্থলে বাধা পায় ও

চলিষ্ণু প্রবৃত্তির জন্য খণ্ডপ্রবাহগুলি তরঙ্গাকার প্রাপ্ত হয়। চরণে পর পর পর্বগুলি উচ্চারণ করিতে প্রতিটির আদিতে নূতন করিয়া কণ্ঠশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়; প্রতিটি পর্বের আদিতে কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া শেষে নামিয়া আসে এবং চরণে একাধিক পর্ব থাকিলে উচ্চারণে কণ্ঠস্বর তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এই ভাবেই ধ্বনি-সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। যথা—

(১) এই অনন্ত বিশ্বে আমি কে—আমি কতটুকু—আমি কী!

(২) স্তব্ধ অতল—দীঘি কালো জল—নিশীথ শীতল—স্নেহ।

দৃষ্টান্তের প্রথমটি গদ্য ও দ্বিতীয়টি পদ্য (১১ সূত্র দ্রষ্টব্য)। দুইটিই চরণ। প্রথমটি ত্রিপর্বিক, দ্বিতীয়টি চতুষ্পর্বিক। দুইটিতেই ধ্বনি-প্রবাহের সৌন্দর্য বা ছন্দ সুস্পষ্ট।

§ ৪. চরণান্তর্গত স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বমণ্ডলীর নাম পর্ববন্ধ এবং কবিতার অন্তর্গত স্বয়ংসম্পূর্ণ চরণমণ্ডলীর নাম স্তবক।

[গদ্যে চরণমণ্ডলীর নাম অনুচ্ছেদ।]

পর্বগঠিত প্রবাহ মাত্রই চরণ নহে। একাধিক পর্ব কখন কখন একত্র হইয়া চরণাংশ রচনা করে। ইহাই হইতেছে পর্ববন্ধ।

পর্ববন্ধ ও স্তবক

সকল চরণেই যে পর্ববন্ধ থাকে তাহা নহে, এক-মাত্র সুদীর্ঘ চরণেই পর্ববন্ধ থাকিতে পারে। যথা—

(১) সুখ গিয়াছে | সুখচিহ্ন গিয়াছে | বঁধু গিয়াছে | বৃন্দাবন গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে?

(২) পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট | চম্পক বনে
স্নানে চলেছেন | সব সখী সনে
কাশীর মহিষী | করুণা।

এই দুইটির প্রতিটিই হইতেছে চরণের দৃষ্টান্ত। প্রথম চরণে পাঁচটি ও দ্বিতীয় চরণে আটটি পর্ব আছে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তের

প্রথম চারি পর্বের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পংক্তির পর্বদ্বয়ের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতা আছে। ইহারা পর্ব নহে, পর্বমণ্ডলী ; চরণ নহে, চরণাংশ ; ইহারা পর্ববন্ধের উদাহরণ।

পর্বসমতাকে ভিত্তি করিয়া একাধিক পদ্য-চরণ কখন কখন কবিতার মধ্যে সম্মিতিবদ্ধ স্বতন্ত্র ও বিশেষ আকৃতির চরণমণ্ডলী রচনা করে। ইহারাই হইতেছে স্তবক। সাধারণতঃ দুই চরণের স্তবক হইতে আরম্ভ করিয়া দশ চরণের স্তবক পর্যন্ত দেখা যায়। ইহাদিগকে যথাক্রমে দ্বয়ী, ত্রয়ী, চতুষ্ক, পঞ্চক, ষট্‌ক, সপ্তক, অষ্টক, নবক ও দশক বলা যাইতে পারে। নানা প্রকার স্তবকের মধ্যে দ্বয়ীর ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা অধিক। দ্বয়ী হইতে পঞ্চক পর্যন্ত স্তবকের দৃষ্টান্ত :—

(১) দ্বয়ী :— চলিতে চলিতে | চরণে উছলে | চলিবার ব্যাকু | লতা।
নূপুরে নূপুরে | বাজে বনতলে | মনের অধীর | কথা॥

(২) ত্রয়ী :— এলে কি গো তুমি | এলে কি আমার | চিতে।
পূজা যে করেনি | বৈকালী তার | নিতে।
এলে কি গো এ নি | ভৃতে॥

(৩) চতুষ্ক :— শ্যামল তৃণ | শয়ন তলে | ছড়ায়ে মধু | মাধুরী
ঘুমাতে তুমি | গভীর আল | সে।
ভাঙাতে ঘুম | লাজুক বধু | করিত কত | চাতুরী
নূপুর দুটি | বাজাত লাল | সে॥

(৪) পঞ্চক :— (মম) হৃদয় রক্ত | রঞ্জনে তব | চরণ দিয়াছি | রাঙিয়া,
(অয়ি) সন্ধ্যা স্বপন | বিহারী,
(তব) অধর এঁকেছি | সুধা বিষে মিশে | মম সুখ দুখ | ভাঙিয়া,
(তুমি) আমারি যে তুমি | আমারি,
(মম) বিজন জীবন | বিহারী॥

[স্তবক-গঠন ২৪, ২৫, ও ২৬ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে।]

§ ৫. আকৃতি বা পরিমাণ অনুসারে যতি চতুর্বিধ—হ্রস্বতম, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও দীর্ঘতম। পর্বের যতি হ্রস্বতম, পর্ববন্ধের যতি হ্রস্ব, চরণের যতি দীর্ঘ ও স্তবকের যতি দীর্ঘতম।

ছন্দের যতিদৈর্ঘ্যকে ঘড়ি অনুসারে নহে, জিহ্বার পরিশ্রমের অনুপাতেই নির্ণয় করিতে হয়। জিহ্বা যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, উহার সেই পরিমাণ বিশ্রামের প্রয়োজন। অল্প পরিশ্রম করিলে বিশ্রামও হয় অল্প। ধ্বনি-দৈর্ঘ্যে পর্বই ছন্দোগঠনে হ্রস্বতম বলিয়া পর্ব উচ্চারণে স্বল্পতম নিঃশ্বাস ব্যয় ও প্রশ্বাস পূরণ হয়; সেইজন্য পর্বান্তিক যতি হ্রস্বতম। এইভাবে ধ্বনি-দৈর্ঘ্য অনুসারেই যতি-দৈর্ঘ্য নিয়মিত হয়; অর্থাৎ পর্ববন্ধের অন্তে যতি হয় হ্রস্ব, চরণান্তিক যতি দীর্ঘ ও স্তবকান্তিক যতি হয় দীর্ঘতম।

কাল-যতি

যতির হ্রস্বদীর্ঘতা কোন নির্দিষ্ট মাপ অনুসারে নহে, ইহা আপেক্ষিক। চরণে পর্ববন্ধ না থাকিলে পর্ব ও পর্বযতি হয় হ্রস্ব, পর্ববন্ধ থাকিলে উহারাই আবার হ্রস্বতম। হ্রস্বতা-দীর্ঘতাকে এইরূপ আপেক্ষিক ভাবে দেখিতে হইবে।

যেখানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের যতি-যুক্ত খণ্ড খণ্ড বহু ধ্বনি-প্রবাহ থাকে, সেখানে দীর্ঘ যতিই হ্রস্ব যতিকে নিজের এলাকাভুক্ত করে। এক্ষেত্রে হ্রস্বযতিতে নহে, দীর্ঘযতিতেই প্রবাহখণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। যতির দিক দিয়া দেখিলে অগ্র-পশ্চাতে দুই দীর্ঘযতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন প্রবাহই চরণ এবং দুই-হ্রস্বযতি-বিচ্ছিন্ন অংশই পর্ব।

প্রকৃতি-অনুসারে যতি ত্রিজাতীয়—শ্বাসযতি, অর্থযতি ও ভাবযতি।

§ ৬. নিঃশ্বাস বায়ু ব্যয়িত হইলে প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনে যে উচ্চারণ-বিরতির আবশ্যক হয়, তাহার নাম শ্বাস-যতি। শ্বাসযতি-বিচ্ছিন্ন প্রবাহাংশ হইতেছে শ্বাসপর্ব।

একক স্বাধীন শ্বাসযতি অসাধারণ ব্যাপার। সাধারণতঃ ইহা অন্যান্য যতির সহচর। গ্রন্থপাঠকালে বা কথোপকথনে প্রশ্বাসের প্রয়োজন হইলে অর্থযতি বা ভাবযতিতেই শ্বাস-গ্রহণ হইয়া থাকে। শ্বাসযতি কেবল দৈহিক ব্যাপার মাত্র। ঝাড়ফুঁকের অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণে অথবা ছেলে-ভুলানো অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণে কেবল প্রশ্বাসের প্রয়োজনে ধ্বনি-প্রবাহের বিরতি হয়। ইহাই খাঁটি শ্বাসযতি।

শ্বাস-যতি

§ ৭. অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে যে উচ্চারণ-বিরতির আবশ্যক হয়, তাহার নাম অর্থ-যতি বা 'ছেদ'। অর্থযতি-বিভক্ত বাক্যাংশের নাম অর্থপর্ব।

সমগ্র বাক্যের সমাপ্তিতে অন্ত্যযতি বুঝাইতে লিপিতে দাঁড়ি বা 'পূর্ণচ্ছেদ' ব্যবহৃত হয়। অর্থ-পর্ব বুঝাইতে 'কমা', 'সেমিকোলন' প্রভৃতিকে মধ্যযতির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শব্দান্তিক যতি বুঝাইতে কোন ছেদ চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া কেবল ফাঁক (space) রাখা হয়। লিপিতে এই ফাঁক ও ছেদচিহ্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শব্দদ্বয়-মধ্যবর্তী ফাঁকের অভাবে 'বিনাশপথে'র অর্থ 'বিনা শপথে' না 'বিনাশ-পথে', তাহা বুঝা কঠিন। 'সত্য কথা বলিও না বলিলে দণ্ড পাইবে'—এই বাক্যে অর্থপর্ব-নির্দেশক ছেদ চিহ্ন নাই বলিয়া ইহারও অর্থ বুঝা কঠিন। ছেদ চিহ্নের স্থানভেদে ইহার অর্থপর্বের পরিবর্তন হয় এবং অর্থও সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠে ; যথা :—'সত্য কথা বলিও, না বলিলে দণ্ড পাইবে' এবং 'সত্য কথা বলিও না, বলিলে দণ্ড পাইবে।'

অর্থযতি বা ছেদ

উচ্চারিত ধ্বনিপর্বমাত্রেরই সাধারণতঃ কিছু না কিছু অর্থ থাকে, তাই বলিয়া ইহাদের সকলগুলিকেই অর্থপর্ব বলা চলে না। অর্থ-প্রকাশ ছাড়াও অতিরিক্ত অন্য কিছু প্রকাশের উদ্দেশ্যে

রচিত পর্ব অর্থপর্ব নহে। প্রয়োজনাত্মক কথোপকথনেই খাঁটি অর্থপর্ব দেখা যায়।

§ ৮. অনুভূতি বা ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে যে উচ্চারণ-বিরতির আবশ্যক হয়, তাহার নাম ভাব-যতি। ভাবযতি-জাত পর্বের নাম ভাবপর্ব।

ভাব-যতি

মানসিক ভাবাবেগের সহিত শারীরিক উত্তেজনা সম্পর্কযুক্ত। হাস্য, ক্রোধ, দুঃখ, প্রেম, ঘৃণা, লজ্জা, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের উত্তেজনা আমাদের রক্ত-সঞ্চালনে ও শ্বাসক্রিয়ায় দ্রুততা বা মন্থরতা সৃষ্টি করে। হাস্য ক্রোধ উদ্দীপনা প্রভৃতি ভাবে চোখমুখ আরক্ত হয়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে; কারণ দ্রুতভাবে রক্ত সঞ্চালন হয়। আবার বিষাদ ঔদাস্য শোক প্রভৃতি ভাবে রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু ও স্তিমিত ভাবে হয়। সেইজন্য রক্তে অতিরিক্ত কার্বন সঞ্চয় ঘটে, সেই সঞ্চিত কার্বন একসঙ্গে দূর করিবার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেন লাভের জন্য গভীর প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন হয়। ঘন ঘন শ্বাসপতন হইলে তদবস্থায় উচ্চারিত ধ্বনিপর্বের হ্রস্বতাই স্বাভাবিক এবং দেরি করিয়া শ্বাসপতন হইলে ধ্বনিপর্বের দীর্ঘত্ব আশা করা যায়। দ্রুত হউক, মন্থর হউক, ভাবাবেগ-জাত শ্বাসপতনের ফলে উচ্চারণ-বিরতিই ভাব-যতি। উৎকৃষ্ট কবিতা মাত্রই ভাব-জাত; উহার যতিও তাই ভাব-যতি। অর্থযতির বিশেষ নাম যেমন 'ছেদ', ভাব-যতির বিশেষ সংক্ষিপ্ত নাম তেমনি 'যতি'।

§ ৯. উত্তেজনার দিক হইতে অনুভূতি ত্রিবিধ—অশান্ত, শান্ত ও প্রশান্ত। ভাবপর্ব অশান্ত অনুভূতিতে হ্রস্ব, শান্ত অনুভূতিতে মধ্য ও প্রশান্ত অনুভূতিতে দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক।

অনুভূতির উত্তেজনার দিক হইতে ভাবপর্বের হ্রস্বতা দীর্ঘতা সকল জাতির পক্ষে একরূপ নহে। বাঙ্গালীর কাছে হ্রস্বপর্ব চার বা সাড়ে চার মাত্রা, মধ্যপর্ব পাঁচ হইতে সাতমাত্রা এবং দীর্ঘপর্ব আট বা দশ মাত্রা।

ভাবপর্বের দৈর্ঘ্য

[মাত্রার ব্যাপার চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।]

দেহধর্মের বিপরীত পথে গেলে ধ্বনিধর্ম উদ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে না, বরং বিরোধিতাই করে। তথাপি কেহ কেহ নূতনত্ব সৃষ্টির মোহে ভাবপর্বের দৈর্ঘ্য বিপর্যয় ঘটাইয়া কবিতা রচনা করেন; অর্থাৎ প্রশান্ত অনুভূতি প্রকাশে হ্রস্বপর্বের প্রয়োগ ও অশান্ত অনুভূতি প্রকাশে দীর্ঘপর্বের ব্যবহার করেন। ইহাতে সাধারণতঃ অবাঞ্ছিত ভাবদৌর্বল্যই প্রকাশ পায়।

§ ১০. ছন্দের পর্ব প্রধানতঃ ভাবপর্ব; ইহা বিশুদ্ধ অর্থপর্ব নহে, শ্বাসপর্বও নহে।

সাধারণতঃ কবিতা-রচনাতেই ছন্দের ব্যবহার হয়। কবিতা কেবল ধ্বনি-সর্বস্ব নহে, অর্থ-সর্বস্বও নহে, ভাব-ব্যঞ্জক। সেইজন্য ছন্দপর্বকে কেবল শ্বাসপর্ব বা অর্থপর্ব বলা চলে না; ছন্দ কবিতার ভাব-প্রকাশেরই সহায়ক; ছন্দ-পর্বের জন্মমূলে রহিয়াছে ভাবাবেগ।

ভাবপর্বই ছন্দ-পর্ব

ছন্দে ভাব-যতিই প্রধান, অন্যান্য যতি উহার অধীন। এই প্রাধান্য সাধারণতঃ সুস্পষ্ট নহে, কারণ অধিকাংশ কবিতাতে ভাব-যতিতেই অর্থ-যতি ও শ্বাসযতি বসে (অর্থাৎ শ্বাসপতন হয়)। তবে যেখানে এইরূপ সমাবেশ ঘটে না, সেইখানে ভাব-যতির প্রাধান্য বুঝা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে ভাবপর্ব সমাপ্ত হইবার পূর্বেই বক্তব্য অর্থ শেষ হইয়া যায়। এখানে অর্থপর্ব কবিতার সমাপ্তি ঘটাইতে পারে না, ভাবপর্বের দাবি মিটাইতে হয়; ভাব-পর্বের দৈর্ঘ্য পূরণ করিতে নূতন বাক্যের শব্দযোজনা করিতে হয়।

ফলে অর্থ-যতি ও ভাব-যতি পৃথক স্থানে বসে। এই সকল ক্ষেত্রে একই ছন্দ-পর্বে দুইটি যতি বসে অর্থাৎ দুইবার উচ্চারণ-বিরতি হয় এবং একই ছন্দপর্বে দুইটি শ্বাসপর্ব সৃষ্টি হয়। যথা—
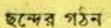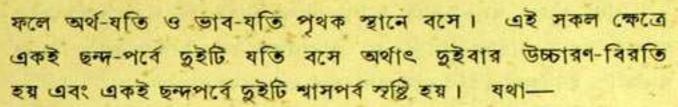
(১) "ইহাদের সঁপি | পূজা উপচার | হব কি পাপের | ভাগী ?
আমি ক্ষীণ,* পথে | যারা যেতে পারি,* | বুদ্ধের অনু | রাগী
যাও তুমি।*" আর | কহিতে নারিনু | উঠিনু তরীতে | গিয়া
আত্মসার এ | আত্মারে মম | শত ধিক্কার | দিয়া॥

(২) সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে
অকালে,* কহ হে দেবি | অমৃত ভাষিণি—

(৩) ভবানী বলেন,* "তোর | নায়ে ভরা জল,
আলতা ধুইবে,* পদ | কোথা থুব বল ?"

দৃষ্টান্তগুলিতে তারকা (*) অর্থ-যতির চিহ্ন এবং দণ্ড (|) ভাব-যতির চিহ্ন। নিম্নরেখ পর্বে উভয়ের পৃথক স্থানে অবস্থিতি দ্রষ্টব্য। দৃষ্টান্তগুলির উচ্চারণে ভাব-যতি ও ভাব-পর্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। সেই কারণে ভাব-যতিই আসলে ছন্দোযতি এবং ভাবপর্বই প্রকৃত ছন্দ-পর্ব।

[অতঃপর এই গ্রন্থে ছন্দোযতিকে সংক্ষেপে যতি ও অর্থযতিকে ছেদ বলা হইবে।]

পর্ব-বিন্যাস

§ ১১. চরণে পর্ব-বিন্যাসের দিক দিয়া ধ্বনিপ্রবাহ দ্বিবিধ— পর্বসম্মিতি-যুক্ত ও পর্বসম্মিতি-হীন। পর্বসম্মিতি-হীন প্রবাহের নাম গদ্য এবং পর্বসম্মিতি-যুক্ত প্রবাহের নাম পদ্য বা বৃত্ত।

গদ্য ও পদ্য

পর্ব-বিন্যাস বলিতে চরণে ক্রমিক পর্ব-সমাবেশ এবং সম্মিতি বলিতে দৈর্ঘ্যসম্মিতি অর্থাৎ পর্বগুলির সমদীর্ঘতা বুঝিতে হইবে।

'গদ' অর্থে বলা এবং 'গদ্য' অর্থে বক্তব্য। পর্বসম্মিতি-হীন রচনায় ধ্বনি-প্রাধান্য থাকে না, প্রধানতঃ বক্তব্য অর্থেরই প্রাধান্য থাকে। সেইজন্য ইহার নাম গদ্য অর্থাৎ বক্তব্য।

পর্বসম্মিতি-যুক্ত রচনাই পদ্য। সংস্কৃতে ছন্দপর্বের প্রাচীন নাম 'পদ', সেইজন্য পর্বযুক্ত-অর্থে সংস্কৃতে ও বাংলায় 'পদ্য' (পদযুক্ত) শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। সম্মিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই পদ্যে নির্দিষ্ট ধ্বনিপর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং পুনরাবৃত্তির জন্য পাঠকের চিত্ত ধ্বনির সমতালে আকৃষ্ট হয়; ফলে পাঠক ধ্বনিকে অস্বীকার করিয়া কেবল অর্থ লইয়া থাকিতে পারে না; তাহার কানও মনের সহিত কাজ করে, অর্থ বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিকেও শুনিয়া থাকে। পদ্য-চরণে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পর্বের একাধিকবার আবর্তন ঘটে বলিয়া পদ্যের অপর নাম 'বৃত্ত' অর্থাৎ আবর্তিত।

সকল ভাষায় সকল দেশে পর্বের আবর্তনজাত সম্মিতি হইতেই পদ্যের উৎপত্তি। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে foot বা measure বলে অথবা সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে পদ বা পাদ বলে, তাহা আসলে ছন্দের অঙ্গ বা পর্বই বটে। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ আসলে সম্মিতিবদ্ধ ত্রিপর্বিক বা চতুষ্পর্বিক ছন্দ-চরণ মাত্র। যথা—

(১) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং | সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ | দিবীব চক্ষুরাততম্।

(২) মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্ব | মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ | যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক | মবধীঃ কামমোহিতম্।

দৃষ্টান্ত দুইটির প্রতিটিতেই অষ্টাক্ষর পর্ব বর্তমান; প্রথম দৃষ্টান্তে তিনটি পর্বে ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে চারিটি পর্বে সম্মিতি স্থাপন করা হইয়াছে।

গদ্য ছন্দোযুক্ত হইলে উহাতে পর্বগত সম্মিতি থাকে না, থাকে পর্বগত সঙ্গতি।

§ ১২. একই পদ্য-চরণে একমাত্র চরণান্তিক পর্বই ভগ্ন ও অ-সম হইতে পারে, অন্যান্য পর্বের সমদীর্ঘতা অপরিহার্য। চরণ-নির্বিশেষে পূর্ণপর্বের সহিত পূর্ণপর্বের ও অন্ত্য ভগ্ন পর্বের সহিত অন্ত্য ভগ্ন পর্বের সম্মিতি হয়।

দ্বিবিধ পর্বে পদ্য-চরণ গঠিত—পূর্ণ মুখপর্ব ও ভগ্ন অন্ত্যপর্ব। মুখপর্বে ধ্বনি-প্রবাহের সূচনা, অন্ত্যপর্বে ইহার পরিসমাপ্তি।

পদ্যে পর্ব-বিন্যাস

সাধারণতঃ মুখপর্ব পূর্ণ তরঙ্গ এবং অন্ত্যপর্ব ভগ্ন তরঙ্গ। সেইজন্য মুখপর্বের তুলনায় অন্ত্যপর্ব সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্রতর। পদ্যচরণে সমদীর্ঘ পর্ব সমূহের মধ্যে অসমপর্ব থাকিলে তাহারই অন্তে চরণান্ত বুঝিতে হইবে। যথা—

(১) মেঘে মেঘে ঘষা | কাঁচেরি ফাহুসে | চাঁদেরি আলো
তাতে কাঁচা সোনা | মুখানি নয়নে | লাগে যে ভালো ॥

ইহার সাধারণ পর্ব ষড়ক্ষর; কিন্তু নিম্নরেখ পর্ব পঞ্চাক্ষর। সেইজন্য উহাই চরণের অন্ত্যপর্ব।

(২) প্রাণেতে আমাতে | খেলিব দুজনে | মরণ-খেলা | নিশীথ-বেলা

ইহার প্রথম দুই পর্ব ষড়ক্ষর ও শেষ দুই পর্ব পঞ্চাক্ষর, সেই-জন্য বুঝিতে হইবে—লিপিতে প্রকৃতপক্ষে এক চরণ নাই, দুই চরণ আছে; কারণ ষড়ক্ষর-পর্বিক ছন্দে প্রথম পঞ্চাক্ষর পর্ব 'মরণ খেলা'ই চরণান্ত-সূচক অন্ত্যপর্ব। দৃষ্টান্তটির প্রকৃত বিন্যাস :—

প্রাণেতে আমাতে | খেলিব দুজনে | মরণ খেলা।
নিশীথ বেলা ॥

পদ্য ছন্দের প্রাণ স্বরূপ পর্ব-সম্মিতির কথা কেহ কেহ ভুলিয়া যান এবং পদ্যচরণে অসমদীর্ঘ পর্ব-সন্নিবেশকে পদ্যচরণের নূতন অলংকরণ বলিয়া ভুল করেন। সময়ে সময়ে কবিরাই এই ভ্রান্তি-সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাঁহারা কখন কখন একাধিক পদ্যচরণকে এক পংক্তিতে সাজাইয়া লেখেন; ফলে চক্ষু-নির্ভর পাঠক একাধিক

চরণকে একটি চরণ বলিয়া ভুল করেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলির একই পংক্তিতে অ-সমদীর্ঘ পর্ব সমাবেশ দ্রষ্টব্য :—

৬ ৫ ৫ ৫

(১) রিম ঝিম ঝিম | বরষা ঝরে | বরষা ঝরে | তরুর দেহে।
লতা দুলে দুলে | পরশে তারে | পরশে তারে | সজল স্নেহে॥

ইহার প্রতি পংক্তির প্রথম পর্ব ছয় মাত্রা, অন্যান্য পর্ব পাঁচ মাত্রা।

[মাত্রানির্ণয়-পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

৬ ৬ ৫

(২) হাসির নেশায় | ঝিম্ মেরে আছে | আজ সকল।

৫ ৫

লাল পানির | রং মহল॥

ইহার প্রথম পংক্তিতে ৬+৬+৫ ও দ্বিতীয়টিতে ৫+৫ মাত্রা।

৩ ৩ ৪ ৩

(৩) ঝর্ণা | ঝর্ণা | সুন্দরী | ঝর্ণা।

৪ ৪ ৪ ৩

তরলিত | চন্দ্রিকা | চন্দন | বর্ণা॥

ইহার প্রথম পংক্তিতে ৩+৩+৪+৩ ও দ্বিতীয়টিতে ৪+৪+৪+৩ মাত্রা।

৪ ১

৪) সে কহিল | ভাই।

২ ৪ ৪ ১

নাই নাই | নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই॥

ইহার প্রথম পংক্তিতে ৪+১ অক্ষর ও দ্বিতীয় পংক্তিতে ২+৪+৪+১ অক্ষর।

চরণ ছোট-বড় হইলে পদ্যছন্দের হানি হয় না, কিন্তু পদ্য-ছন্দে পর্ব-সম্মিতি অপরিহার্য—পূর্ণ পর্বের সহিত পূর্ণ পর্বের এবং অন্ত্য ভগ্ন পর্বের সহিত অন্ত্য ভগ্ন পর্বের দৈর্ঘ্য-সমতা থাকিতেই হইবে। অসম-পর্বিকতার জন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি ছন্দ-পতনেরই

নিদর্শন হওয়া উচিত, তথাপি কানে ছন্দ-পতন অনুভূত হয় না। কারণ উল্লিখিত চারিটি দৃষ্টান্তের কোনটিই সত্যকার অসমপর্বিক বা সম্মিতিহীন নহে, লিপিদোষেই চরণ অসমপর্বিক বলিয়া মনে হইতেছে। অসম পর্বকে চরণান্তসূচক অন্ত্যপর্ব রূপে গ্রহণ করিয়া পংক্তিগুলির মধ্যে যথার্থ চরণ-বিন্যাস করিলে দেখা যাইবে—দৃষ্টান্তগুলিতে যেমন পূর্ণপর্বের সহিত পূর্ণপর্বের, তেমনি ভগ্ন পর্বের সহিত ভগ্ন পর্বের দৈর্ঘ্য-সমতা বজায় আছে। যথা—

(১) (পূর্ণ) (ভগ্ন)

রিম ঝিম ঝিম | বরষা ঝরে
বরষা ঝরে
তরুর দেহে।
লতা দুলে দুলে | পরশে তারে
পরশে তারে
সজল স্নেহে ॥

(২) (পূর্ণ) (পূর্ণ) (ভগ্ন)

হাসির নেশায় | ঝিম মেরে আছে | আজ সকল।
লাল পাণির
রং মহল ॥

(৩) (পূর্ণ) (পূর্ণ) (পূর্ণ) (ভগ্ন)

ঝর্ণা,
ঝর্ণা,
সুন্দরী | ঝর্ণা।
তরলিত | চন্দ্রিকা | চন্দন | বর্ণা ॥

(৪) (পূর্ণ) (পূর্ণ) (ভগ্ন)

সে কহিল | ভাই
নাই
নাই
নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই ॥

সুতরাং দৃষ্টান্তগুলি ছন্দপতনের দৃষ্টান্ত নহে, বহু-চরণ-যুক্ত নির্দোষ ছন্দেরই দৃষ্টান্ত।

অবশ্য অসমপর্বিক পদ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে ছেলে-ভুলানো ছড়াকে দেখানো হয়। যথা—

(১) এক্ ছিল | শেয়াল্ ……………… ৩ + ২ অক্ষর
(তার) বাপ্ দিচ্ছিল | দেয়াল ……………… ৪ + ২ অক্ষর

(২) যমুনাবতী | সরস্বতী | কাল্ যমুনার্ | বিয়ে……… ৫ + ৪ + ৪ + ২ অক্ষর

(৩) ঘুম্ পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম্ দিয়ে | যেয়ো…… ৪ + ৪ + ৩ + ২ অক্ষর

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছড়াগুলি অসমপর্বিক পদ্য-ছন্দের সার্থক দৃষ্টান্ত নহে। কারণ ছড়াগুলি 'পাঠ্য' নহে 'গেয়'; শিশু মনোরঞ্জনে সুরসংযোগে গানের মতো করিয়া উচ্চারণ করা হয় এবং সুরের তাল রক্ষা করিয়া রচনার অসমতাকে সমান করিয়া তোলা হয়। ফলে সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা ছড়াগুলি শেষপর্যন্ত সমপর্বিক হইয়া উঠে। 'গেয়' কবিতার আদর্শে 'পাঠ্য' কবিতার আলোচনা চলে না।

তবে বঙ্গসাহিত্যে সত্যকার অসমপর্বিক পদ্যরচনারও কয়েকটি নিদর্শন আছে। সংস্কৃত ছন্দের অক্ষম ও অন্ধ অনুসরণেই এইগুলির উৎপত্তি। সংস্কৃত ছন্দ যে সম্মিতিহীন তাহা নহে; সংস্কৃত সকল ছন্দেরই অঙ্গে অঙ্গে সম্মিতি আছে। তবে হরিণী, শিখরিণী, স্রগ্ধরা প্রভৃতি এমন কয়েকটি দীর্ঘ ছন্দ আছে, যাহাদের কেবল অঙ্গ নহে, অঙ্গের অন্তর্গত প্রত্যঙ্গও

আছে। এই ছন্দগুলিতে সম্মিতি কেবল অঙ্গগত, প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে সম্মিতি নাই। সংস্কৃতের এই বিশেষ ছন্দগুলির অনুকরণ করিতে গিয়া কয়েকজন পণ্ডিত বাংলায় ছন্দের প্রত্যঙ্গে নহে, অঙ্গেই অসম্মিতি প্রয়োগ করিয়াছেন; ফলে এইগুলি না হইয়াছে বাংলা ছন্দ, না হইয়াছে সংস্কৃত ছন্দ। রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি ক্রীড়াচ্ছলে রচনা এই প্রকার। যথা—

৭ ৪ ৯ ৫

(১) লজ্জা বলিল-'হবে | কিলো তবে | কতদিন পরাণ রবে |
এমন করি।
হইয়ে জলহীন | যথা মীন | থাকিবি ওলো কতদিন | পরাণে মরি॥
—প্রতি চরণে ৭ + ৪ + ৯ + ৫ অক্ষরের পর্ব

৬ ৪ ৭ ৫

(২) পড়ে যেই লোক | এই শ্লোক | পায় সে গুম্ফ লোক | ইহার পরে।
যথা গুম্ফ ধারী | ভারি ভারি | গোঁপের সেবা করি | সুখে বিহরে॥
—প্রতি চরণে ৬ + ৪ + ৭ + ৫ অক্ষরের পর্ব

লালমোহন বিদ্যানিধির সুবিখ্যাত 'কাব্য নির্ণয়' গ্রন্থে এই প্রকার পর্ব-সম্মিতিহীন পদ্যছন্দ রচনার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে; যথা—

(১) বিকৃত নয়ন কদাকার | জন্মের ঠিকানা জানা ভার।
উলঙ্গের কিবা ধন | হরে নাহি বরযোগ্য কিছু গুণ॥
—আর্যা

(২) নাগর কৃষ্ণে | না কর নিন্দা | তিনি নিখিল ভুবন | পতি গতি
চরমে।
ভক্ত সমাজে | পালন জন্যে | জনম লভিল নর | বপু ধরি জগতে॥
—ক্রৌঞ্চ পদা

বলা বাহুল্য, পর্ব-সম্মিতির অভাবে এই সকল রচনায় ছন্দোবোধ জাগ্রত হয় না।

§ ১৩. চরণে পর্ব-বিন্যাস সম্মিতিহীন অথচ সঙ্গতিযুক্ত হইলে গদ্যছন্দ প্রকাশ পায়।

গদ্য রচনায় পর্ব-বিন্যাস ত্রিবিধ—(ক) অসঙ্গত (খ) সাধারণ ও (গ) সুসঙ্গত। সুসঙ্গত বিন্যাসের গদ্যই ছন্দোযুক্ত।

গদ্যে পর্ব-বিন্যাস

(ক) অতিদীর্ঘ পর্বের পার্শ্বেই অতি হ্রস্ব পর্ব-বিন্যাসই হইতেছে অসঙ্গত বিন্যাস। দীর্ঘ সমাসযুক্ত সাড়ম্বর রচনায় অর্থের গুরুত্ব না থাকিলে বি-ষম পর্ব বিন্যাসের অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। অর্থ দুর্বল বলিয়া অসঙ্গতিকে চাপা দিতে পারে না। এই প্রকার রচনাই ছন্দোহীন। যথা—

(১) যখন গগনবিহারী ধূম-জ্যোতি-সলিল-বাহী মেঘ ডাকে—ময়ূরপক্ষী তখন বিস্তার করে তাহার চন্দ্রকবিভূষিত পুচ্ছ—এবং নাচে।

(২) কোকিল-কুল-কলালাপ-বাচাল যে মলয়ানিল—সে—উচ্ছল-চ্ছীকরণাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

ইহাদের প্রথমটিতে 'এবং নাচে' এবং দ্বিতীয়টিতে 'সে' অন্যান্য পর্বের সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া অসঙ্গত এবং সেইজন্য ছন্দ-পতন কারক।

(খ) ধ্বনিগুরুত্বহীন অর্থসর্বস্ব গদ্য রচনাই সাধারণ বিন্যাসের রচনা। এই প্রকার রচনায় অর্থ-প্রাবল্যের জন্য ধ্বনি উপেক্ষিত হয়; জ্ঞাতব্য অর্থ পাঠকের মনকে সম, আ-সম, বি-ষম সকল প্রকার ধ্বনিপর্বকে অগ্রাহ্য করিয়া সজোরে টানিয়া লইয়া যায়। ইহা চিন্তাপ্রধান ভাষা। ইহাই সাধারণ গদ্য। ইহাতে ছন্দ বা ছন্দোহীনতা দুই-ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

(গ) যে গদ্য রচনায় ধ্বনি ও অর্থ উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকৃত হয়, পর্বের পারস্পরিক আ-সমতা প্রকাশ পায় ও বি-ষমতা পরিহার করা হয়, তাহাই সুসঙ্গত গদ্য; ইহাই পরিস্ফুট গদ্যছন্দের আশ্রয়। যথা—

"আমরা অকর্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া

পড়িয়া আছি—প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি —এবং যে কোন কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে।—আর, আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে —তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই।"

[পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদ্যছন্দের বিস্তারিত পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

§ ১৪. পদ্যছন্দের ছন্দ-পর্ব পাঠকের অভ্যস্ত হইয়া গেলে যতি হয় অন্তর্গূঢ় এবং ছেদ হয় সুস্পষ্ট।

সাধারণতঃ পদ্যে যতি ও ছেদ একত্র বসে, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উভয়ের পৃথক্ অবস্থানও হইতে পারে; যথা—

পদ্যছন্দে যতির গোপনতা

ঘুমেরি মহলে | বেশরে মোতিটি | নিশাসে নড়ে;
প্রেমী জেগে আছে | মুখে চেয়ে; চোখে | পাতা না পড়ে।

দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যস্থলে 'মুখে চেয়ে'র পরেই অর্থ সমাপ্ত হইয়াছে ও সেইজন্য ছেদ বসিয়াছে। কিন্তু পর্ব দৈর্ঘ্যের পূরণ হয় নাই বলিয়া নূতন বাক্যের 'চোখে' শব্দ পর্যন্ত পর্ব অগ্রসর হইয়াছে এবং এই 'চোখে'র পরেই যতি বসিয়াছে।

এইরূপ স্বাতন্ত্র্যস্থলে যতি বা ছেদ কাহারও বিলোপ সম্ভব নহে, কারণ যতি-লোপে সম্মিতি নষ্ট হয়, ছেদ-লোপে অর্থহানি ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ত্র বিরতি হয়। কিন্তু অর্থলোভী পাঠক ছেদকে যতটা স্পষ্টভাবে অনুভব করে, যতিকে ততটা করে না। ইহার কারণ আছে।

অভ্যস্ত ব্যাপার মাত্রই অবচেতন মনের অন্তর্ভুক্ত, চেতন মনের নহে। মানুষ যখন চলিতে চলিতে চিন্তা করে তখন চলিবার অনুভূতি হয় অবচেতন মনে, চিন্তা হয় চেতন মনে; চেতন মন প্রকাশিত, অবচেতন মন গুপ্ত। হস্ত পদাদি যুগ্ম অঙ্গের সম্মিতিযুক্ত

ক্রিয়ায় আমরা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া সম্মিতিবোধও আমাদের অবচেতন মনের অঙ্গীভূত ও সুগুপ্ত হইয়া থাকে। পদ্যছন্দের ব্যাপারও তাই। সম্মিতিযুক্ত পর্বদৈর্ঘ্য বার বার পুনরাবৃত্তিতে অবচেতন মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। আমরা যতি লক্ষ্য করিয়া না পড়িলেও অভ্যাসবশে যথাস্থানেই যতি দিয়া পড়িয়া যাই; অথচ চেতন মনে এই যতি অনুভূত হয় না, কারণ চেতন মন তখন কবিতার অর্থ-নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকে। কবিতায় যতি তাই প্রধানতঃ অন্তর্গূঢ়। যথা—

ঘ́রেতে দু | র́স্ত ছেলে | ক́রে দাপা | দ́াপি।
বাইরেতে মেঘ্ | ডেকে ওঠে | সৃষ্টি ওঠে | কাঁপি॥

এই দৃষ্টান্তের 'দুরন্ত' শব্দটি চতুরক্ষর-পর্ব-সম্মিতি রক্ষার জন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া কবিতাকে ছন্দ-পতন হইতে রক্ষা করে। পড়িবার সময়ে কিন্তু অনেকেরই মনে হয় যে 'দুরন্ত' শব্দটি অখণ্ডই আছে, ঠিক যেন—

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে | করে দাপাদাপি

এক্ষেত্রে বাস্তব সত্যে ও ধারণার (idea) মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের কারণ—চেতন মনের অর্থপ্রিয়তা ('রন্ত ছেলে'র কোন অর্থ নাই) এবং অবচেতন মনের সম্মিতি-প্রীতি।

§ ১৫. পদ্য-পর্ব হইতেছে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধ্বনি-পর্ব, ইহার উপাদান অক্ষর; অপর পক্ষে গদ্য-পর্ব হইতেছে অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের শব্দ-পর্ব, ইহার উপাদান অখণ্ড শব্দ।

পদ্যে নির্দিষ্ট ধ্বনিদৈর্ঘ্য বজায় রাখাই প্রথম কর্তব্য, শব্দ-সমাবেশ চিন্তা তাহার পরে; কিন্তু গদ্যে শব্দ-নির্বাচনই অগ্রগণ্য, ধ্বনি-দৈর্ঘ্যের বিচার তাহার পরে। পদ্য সম্মিতি-মূলক বলিয়া ইহাতে পর্বদৈর্ঘ্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। সেইজন্যই ইহা শব্দনিরপেক্ষ ও অপরিবর্তনীয়—শব্দের খণ্ডন ও বিকৃতি সাধন করিয়াও ইহাতে ধ্বনিপর্বের দৈর্ঘ্য

পদ্য পর্বে ও গদ্য পর্বে ভেদ

অক্ষুন্ন রাখা হয়। অপর পক্ষে গদ্যছন্দ সঙ্গতিমূলক বলিয়া ইহাতে পর্বদৈর্ঘ্যের ঈষৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং পদ্যের ন্যায় ইহাতে শব্দের সংকোচন প্রসারণ ও সংযোজনের* প্রয়োজন হয় না।

§ ১৬. বাংলা পদ্য ছন্দে পর্বদৈর্ঘ্যের সীমা নির্দিষ্ট ;—চার অক্ষর হইতে আট অক্ষরের পর্বে এবং দশ অক্ষরের পর্বে ছন্দ-চরণ সীমাবদ্ধ।

যুগভেদে ও জাতিভেদে মানবমনের ধারণাশক্তি পৃথক পৃথক। নির্দিষ্ট-ধ্বনিদৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট একাধিক ধ্বনি-প্রবাহকে একত্র স্মরণ, মনন, তুলনা ও সমঞ্জসীকরণ না করিতে পারিলে সম্মিতি-সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ধারণা-শক্তি ও অভ্যাস—এই দুইটি ছন্দোবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। 'পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্রে' দেখা যায় সংস্কৃত-ভাষাযুগের পাঠকেরা ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত ও অপবাহক নামক ছন্দে চারিটি করিয়া সুদীর্ঘ ২৬ অক্ষরের পর্বকেও একসঙ্গে স্মরণ ও ধারণা করিয়া সম্মিতির আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন। বাঙ্গালীর ধারণাশক্তি অতি দুর্বল বলিয়া বাংলাভাষায় যে-কোন দৈর্ঘ্যের পর্বকে পুনরাবৃত্ত করিলে ছন্দোবোধ হয় না। যাঁহারা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উল্লিখিত পর্ব-দৈর্ঘ্যের সীমা না মানিয়া জবরদস্তি করিয়া যে-কোন দৈর্ঘ্যের পর্ব রচনা করেন, তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থে ভুবন মোহন রায়চৌধুরী এইভাবে রচনা করিয়াছিলেন :—

বাংলা পদ্যে পর্ব-সীমা

(১) মানে যথা আমি করেছি দগ্ধ | তাদৃক্ তুমি ত্যাগ কর স্বমানে।
ভাবে তবে তুল্য হবে সখীতা | প্রেমরণে যোগ্য সদা সমানে॥

---

*প্রথম অধ্যায়, ৫ম সূত্র

(২) ভজে যে রমা বল্লভে যোগ-যজ্ঞে | ঘটে তার ভাগ্যে সুদারিদ্র্য ভিক্ষা।
বৃহৎ শোকতাপে বিবেকী মনেতে | গৃহে কাননে তুল্য জন্মে তিতিক্ষা ॥

'দশানন বধ' কাব্যে হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীও এইভাবে লিখিয়াছিলেন—

(৩) তব উদগ্র বিপৎ শুনি সত্বরে | উদিত দুঃখ মম স্থির অন্তরে।
নিরখি বীর্য অধৃষ্য নরেশ্বরে | কুহক শত্রু বিসর্পিল সঙ্গরে ॥

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি পড়িলে বাঙ্গালী পাঠকের মনে হইবে—দৃষ্টান্তগুলিতে কোন ছন্দই নাই, এগুলি ছন্দ-পতনেরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু আসলে তাহা নহে। দৃষ্টান্তগুলি হইতেছে সংস্কৃত ছন্দ ; প্রথমটির নাম 'ইন্দ্রবজ্রা', দ্বিতীয়টির নাম 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' এবং তৃতীয়টি হইতেছে 'দ্রুত বিলম্বিত'। এইগুলি সংস্কৃতরীতিতে পাঠ্য।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে—ধ্বনিগত যে-কোন দৈর্ঘ্যের আদর্শ বা 'প্যাটার্ণে'র পুনরাবৃত্তি করিলেই বাংলা পদ্য রচনা সম্ভব নহে। অন্যভাষায় যে প্যাটার্ণ সুন্দর, বাংলায় তাহা চলিবেই—একথা বলা চলে না।

লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্য-নির্ণয়ে' বাংলা পদ্যছন্দের পর্বসীমা উপেক্ষা করিয়া রচিত 'কুমারী' 'কুসুমমালিকা' 'পিকাবলী' প্রভৃতি নূতন বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

(১) কুমারী— কি রাখি | ঘি রাখি।
হা করে | না সরে ॥
(তিন অক্ষরের পর্ব)

(২) কুসুম মালিকা— ওহে নিষাদ কি ক্ষণে তুমি বকের মিথুনে
বাণ হেনেছিলে যুজি নিজ ধনুকের গুণে ॥
(ষোল অক্ষরের পর্ব)

(৩) পিকাবলী— তমো বিভা নিশা দিবা মোহমুক্তি কারণ।
ফলাফল ক্রিয়া ক্রিয়া পাপপুণ্য বারণ ॥
(পনের অক্ষরের পর্ব)

বলা বাহুল্য, এইগুলিও বাংলা সাহিত্যে অচল হইয়া আছে।

অবশ্য সঙ্গীতের কথারচনায় সুরের সাহায্যে বাক্-সংকোচ বা বাগ্‌বিস্তার হয় বলিয়া পাঠ্য কবিতার পর্ব-দৈর্ঘ্যের সীমা গীত-রচনায় প্রযোজ্য নহে। গীত-পর্বের সীমা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তবে তালসাম্য ইহাতে অপরিহার্য। যথা—

(যদি) জানতে চাও | আমি ঠিক | কি রকম স্ত্রী | চাই—
ফর্সা কি | কালো কি | মাঝারি | রং
লম্বা কি | বেঁটে কি | ক্ষীণা পী | না
দেখতে ঠিক | পরী কি | দেখতে ঠিক | সং।

ছড়ার ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা আছে, কারণ ছড়াতেও সুর-সংযোগ ঘটে। তবে পাঠ্য পদ্যকবিতায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট পর্ব-দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয়।

চরণ-বৈচিত্র্য

§ ১৭. পদ্যছন্দের চরণ দ্বিবিধ—অসমাপ্ত-গতি ও সমাপ্ত-গতি।

চরণ-মাত্রই পূর্ণপ্রবাহিত এবং সেই হিসাবে সমাপ্ত। তথাপি শেষপর্যন্ত গতিবেগ কোনটিতে থাকে, কোনোটিতে থাকে না। চলিষ্ণু ধর্ম ও চলৎ-শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন কোন প্রবাহ গতি শেষ করিতে বাধ্য হয়; এই গুলিই অসমাপ্ত-গতি চরণ। চরণান্তিক পর্ব মুখপর্ব বা পূর্ণপর্বের সহিত সমদীর্ঘ হইলে তখনই অসমাপ্ত-গতি চরণের সৃষ্টি হয়। চরণে সমদীর্ঘ পর্বের আধিক্যে অভ্যস্ত ভঙ্গির পুনরাবর্তন ঘটিতে থাকে এবং ধ্বনি-প্রবাহ অবাধ-গতিতে সমভাবে চলে; প্রবাহান্তে উহার স্তিমিত হওয়া অপরিহার্য হয় না, বক্তব্যের অভাবেই সমাপ্ত

অসমাপ্ত-গতি ও সমাপ্ত-গতি চরণ

হইতে হয়। কিন্তু কোন কোন চরণের গঠনগুণে চলদ্‌বেগ বা চলিষ্ণু প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিক ভাবেই সমাপ্ত হইয়া যায়। এইগুলিকে বলা চলে সমাপ্তগতি চরণ। চরণান্তিক পর্ব অন্যান্য পর্বের সহিত অসমদীর্ঘ হইলেই চরণকে সমাপ্তগতি হইতে হয়। কারণ সমদীর্ঘ পর্ব-সমূহের ধ্বনিপ্রবাহ অভ্যস্ত পথে আসিতে আসিতে চরণান্তিক পথের অনভ্যস্ত অ-সমতায় বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার গতিবেগের স্তিমিত ও পরিসমাপ্ত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। যথা—

সমাপ্ত-গতি—

কোন লাজে বা | বলবো আমি | তোমায় শুধু | চাহি!

অসমাপ্ত-গতি—

হওরে সোজা | ভূতের বোঝা | আর কতদিন | মাথায় ব'বে ?

§ ১৮. পদ্যচরণের দীর্ঘীকরণ অসমাপ্ত-গতি চরণেই সম্ভব, সমাপ্ত-গতি চরণে নহে।

চরণের দীর্ঘীকরণ

দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি সুস্পষ্ট হইবে।

তোমারে ডা | কিনু যবে

—ইহা দুইটি সমদীর্ঘ পর্বে রচিত, কাজেই অসমাপ্ত-গতি চরণ। ইহার গতিবেগ যে অসমাপ্ত তাহার প্রমাণ—সমদীর্ঘ নূতন পর্ব যোগ করিয়া এই চরণকে দীর্ঘীকৃত করা চলে, এমনকি ইহাতে দুইটি চরণকেও একত্র করিয়া একটি চরণে পরিণত করা যায়। যথা—

তোমারে ডা | কিনু যবে | কুসুম ব | নের মাঝে

ইহাও কিন্তু আবার নূতন একটি অসমাপ্তগতি চরণে পরিণত হয়; কারণ ইহারও শেষ পর্ব সমদীর্ঘ হওয়ায় চলিষ্ণুতার শেষ হয় নাই। কিন্তু চরণান্তে অসমদীর্ঘ পর্ব থাকিলে এরূপ হইত না। যথা—

তোমারে ডা | কিনু যবে | কুসুম ব | নে।

ইহার চরণান্তিক পর্ব অসমদীর্ঘ, তাই চরণ বাধাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ

সমাপ্তগতি। ইহার সহিত নূতন পর্ব যোগ করিলেও চলিবার বাধা দূর হইবে না। দুইটি চরণকে জোর করিয়া জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। যথা—

তোমারে ডা | কিছু যবে | কুসুম ব | নে, | তখনো ফু | লের
মাঝে | সুবাস ছি | ল।

ইহাতে কিন্তু দুই চরণের স্বাতন্ত্র্য লোপ হয় না, উভয়ে মিলিয়া একটি দীর্ঘীকৃত চরণ হইয়া উঠে না; অসংযুক্ত দুই চরণই শেষ পর্যন্ত থাকিয়া যায়। চোখকে ফাঁকি দিলেও কানকে ঠকান যায় না।

§ ১৯. সমাপ্তগতি চরণে চরণান্তিক অসম পর্ব সাধারণতঃ মুখপর্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে।

ইহার কেবলমাত্র ব্যতিক্রম অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'দীর্ঘ ত্রিপদী' এবং 'মহা পয়ার'; সেখানে অন্ত্য অসম পর্ব মুখপর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর*।

চরণে অন্ত্যপর্বের দৈর্ঘ্য

অন্ত্যপর্ব সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর হয় বলিয়া ইহার অপর নাম—ভগ্নপর্ব বা খণ্ডপর্ব। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের খণ্ডপর্বের দৃষ্টান্ত নিম্নে দ্রষ্টব্য;—

(১) মথুরা বাসিনি | মধুর হাসিনি | শ্যাম বিলাসিনি | রে

(২) গোরাচনা গোরী | নবীনা কিশোরী | নাহিতে দেখিলুঁ | ঘাটে।

(৩) কোথা তোরা অয়ি | তরুণী পথিক | ললনা।

(৪) বন বেতসের | বাঁশীতে পড়ুক | তব নয়নের | পরসাদ।

(৫) আনন্দময়ী | মুরতি তোমার | কোন দেব তুমি | আনিলে দিবা?

অসম অন্ত্যপর্ব চরণের সমাপ্তিসূচক; ইহা চরণের পর্ব সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে ও চরণের পূর্ণতা প্রকাশ করিয়া ধ্বনিসৌন্দর্য বোধে সহায়তা করে। মুখপর্ব বা পূর্ণপর্ব হইতেছে ছন্দচরণের 'অঙ্গবত্ত্বে'র উপকরণ এবং অসম অন্ত্যপর্বই 'অঙ্গসংহতি'-বিধায়ক।

---

* ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

§ ২০. বহুপর্বিকতাই চরণের বৈশিষ্ট্য। একটিমাত্র পূর্ণপর্বে চরণ গঠিত হয় না।

চরণের বহুপর্বিকতা

একপর্বিক চরণে সৌন্দর্য-সূচক অঙ্গবহুত্ব থাকে না, কাজেই ছন্দোবোধ হয় না। এমন কয়েকটি কবিতা দেখা যায়, যে-গুলিকে মনে হইতে পারে একপর্বে গঠিত। যথা, সত্যেন্দ্রনাথের—

পাল্কী চলে।
পাল্কী চলে॥
গগন তলে।
আগুন জলে॥

কিন্তু কেবল চোখ দিয়া না দেখিয়া কান দিয়া শুনিলে বুঝা যাইবে যে এই পংক্তিগুলি চরণ নহে, পর্ব মাত্র; পর্বান্তিক মিলের জন্যই পর্বে চরণ-ভ্রম হইতেছে। এই কবিতার চরণ দ্বিপর্বিক, একপর্বিক নহে; একটি চরণকে দুইটি পংক্তিতে সাজানো হইয়াছে। ইহার প্রকৃত বিন্যাস নিম্ন প্রকার—

পাল্কী চলে | পাল্কী চলে।
গগন তলে | আগুন জলে॥

আমাদিগের ধারণা যে সত্য, তাহা এই কবিতার পরবর্তী কয়েকটি পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। যথা—

মেঠো জাহাজ | সামনে বাড়ে।
ছয় বেহারার | চরণ দাঁড়ে॥

§ ২১. একাধিক চরণ স্তবকবদ্ধ হইলে তখন একমাত্র অন্ত্যপর্বই চরণের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রতীক চরণ একপর্বিক।

প্রতীক চরণ

প্রতীক চরণের বহুপর্বিক হইবার আবশ্যকতা নাই। ইহার অনুপস্থিত পূর্ণ পর্বগুলিকে অনুমান করা যাইতে পারে। যথা—

(১) তোমার তরে | সবাই মোরে | করছে দোষী
হে প্রেয়সী।

(২) দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহাসাগরে | তুফান তোল।
বধূরে আমার | পেয়েছি আবার | ভরেছে কোল।

প্রথম দৃষ্টান্তে দুইটি চরণের মধ্যে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে চারিটি চরণের মধ্যে প্রথম দুইটি চরণ প্রতীক চরণ মাত্র।

§ ২২. পদ্য-চরণে গতিবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চরণাগ্রবর্তী অতিরিক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে বলা হয় অতিপর্বিক ধ্বনি। ইহা চরণকে অলংকৃত করে।

চরণের অলংকার

সাধারণতঃ পুনরাবর্তনই পর্বে গতিবেগ সঞ্চারের উপায়, এবং দ্বিতীয় পর্ব হইতেই ধ্বনি তরঙ্গের পুনরাবর্তন ঘটে, প্রথম পর্বে নহে। তাই চরণারম্ভের পূর্বে অতিপর্বিক ধ্বনি-সমাবেশে গতির সূচনা করিয়া প্রথম পর্বেই বেগদান করা যাইতে পারে।

অসম অন্ত্যপর্ব বহুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বা 'খণ্ডপর্ব' রূপে ব্যবহৃত হয়। এই খণ্ডপর্ব খণ্ড হইলেও পর্ব এবং চরণান্তর্গত; কিন্তু অতিপর্বিক ধ্বনি পর্ব নহে, চরণান্তর্গতও নহে; ইহা চরণাতিরিক্ত ধ্বনি, ইহার উচ্চারণ অনেকটা স্বগত। যথা—

(তুমি) এমনি কি ধীরে | দিবে দোল
(মোর) অবশ বক্ষ | শোণিতে?
(কানে) বাজাবে ঘুমের | কলরোল
(তব) কিঙ্কিণী কণ | কণিতে?

এখানে চারিটি চরণের প্রতিটির সূচনায় বন্ধনীস্থিত 'তুমি' 'মোর' 'কানে' ও 'তব' অতিপর্বিক ধ্বনি।

§ ২৩. অতিপর্বিক ধ্বনির বৈশিষ্ট্য—ইহা পূর্ণ পর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘপর্বিক চরণে অব্যবহার্য।

অতিপর্বিক ধ্বনি

অতিপর্বিক ধ্বনি দ্রুতভাবে স্বগতোক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার আকার পূর্ণপর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে চলে না। চার অক্ষরের পর্বই ক্ষুদ্রতম পর্ব বলিয়া সাধারণতঃ একাক্ষর হইতে তিন অক্ষরের ধ্বনিকেই অতিপর্বিক অংশে দেখা যায়। যথা—

(সে) সামনে চলে | যায়
(আর) পিছন ফিরে | চায়
(ডাকে লো) চোখের ঈশা | রায়॥

দীর্ঘপর্বিক চরণ স্বভাবতঃই মন্থর, গতিবেগ-শূন্য—ইহার চপলতা অশোভন। সেইজন্য দীর্ঘপর্বিক চরণে চঞ্চলতার প্রতীক অতি-পর্বিক ধ্বনির সংযোগ শ্রুতিকটুতাই সৃষ্টি করে। যথা—

(তাই) রত্নাকর হতে পাই | কবিতা রতন।
(যাহা) রত্নাকরে নাহি মিলে | করিলে সেচন॥

স্তবক-বন্ধন

§ ২৪. পদ্যছন্দে স্তবক-বন্ধন অপরিহার্য নহে; বহুপর্বিক হইলে একটি চরণেই ছন্দোবোধ হয়।

স্তবকের প্রয়োজনীয়তা

পর্ববদ্ধতাই পদ্যত্ব এবং চরণবদ্ধতাই স্তবকত্ব। পর্বে ও চরণে সকল দিক দিয়া পূর্ণভাবে সম্মিতি উপভোগের আকাঙ্ক্ষা হইতেই স্তবকের উৎপত্তি। এই আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য অন্তত পক্ষে দুইটি চরণের প্রয়োজন হয়, সেই কারণে বাংলায় দ্বয়ী বা দুই চরণের স্তবকই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে; নচেৎ ছন্দোবোধের পক্ষে একটি মাত্র বহুপর্বিক চরণই যথেষ্ট। যথা—

(১) টাক্ ডুমা ডুম্ | টাক্ ডুমা ডুম্ | টাক্ ডুমা ডুম্ | ডুম্।

(২) (উর্‌র্) জাগো জাগো | জাগর্ খিনা | জার্ খিনিনা।

(৩) (যমুনে) এই কি তুমি | সেই যমুনা | প্রবাহিনী ?

[দুই, তিন, চার ও পাঁচ চরণের স্তবকের দৃষ্টান্ত চতুর্থ সূত্রে দ্রষ্টব্য।]

§ ২৫. সমদীর্ঘ পর্বের চরণে-চরণেই স্তবক-বন্ধন হইতে পারে ; পর্ব-সম্মিতিই ইহার ঐক্যসূত্র।

স্তবক-বন্ধনের ঐক্যসূত্র

বিভিন্ন চরণে পর্বসংখ্যার সমতা বা চরণে চরণে মিল স্তবক গঠনে অত্যাবশ্যক নহে ; চরণসম্মিতির ও অন্ত্য মিলের অভাব ইহার গীতিধর্মের কতকটা হানি করে মাত্র, কিন্তু সর্বনাশ ঘটাইতে পারে না। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে অন্ত্য মিল নাই, চরণে চরণে পর্ব সংখ্যাও অসম, তথাপি পর্ব সম্মিতির জন্য স্তবক বন্ধনের ক্ষতি হয় নাই :—

হায়রে উপমা | বিফল উপমা | যত,
সকল উপমা | হারাইয়া যায় | ক্ষণিকের খেলা | ঘরে।
হায় ক্ষণিকার | কবি !
আঁধার নেমেছে | কৃষ্ণ কলির | করুণ নয়ন | ছেয়ে,
নেমেছে আঁধার | ময়না পাড়ার | মাঠে।

দৈর্ঘ্য-সমতা থাকিলে কেবল একমাত্র অন্ত্যপর্বই প্রতীক চরণ রূপে পূর্ণাঙ্গ চরণের সহিত মিলিত হইয়া স্তবক রচনা করিতে পারে। যথা—

(একি) সত্য ?
আমার মধুর | অধর বধূর | নব লাজ সম | রক্ত।
হে আমার চির | ভক্ত
(একি) সত্য।

কিন্তু বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্বে গঠিত চরণের দ্বারা স্তবক গঠন হয় না। যথা—

শুন রাণি | মনে জানি | তব বাণী | সত্য
তোমার মধুর | অধর বধূর | নব লাজ সম | রক্ত।

এখানে প্রথম চরণের পর্ব দ্বিতীয় চরণের পর্বের সহিত সমদীর্ঘ নহে বলিয়াই ছন্দপতন ঘটিয়াছে।

§ ২৬. পূর্ণ পর্বের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণান্তিক ভগ্নপর্ব স্তবকের বৈচিত্র্য বিধান করিতে পারে ; তবে এই প্রকার ভগ্নপর্বের অন্ত্যপর্বিক সম্মিতি রক্ষা অপরিহার্য।

স্তবকে অন্ত্য পর্বের বৈচিত্র্য

স্তবকের মধ্যে অন্ত্য ভগ্নপর্বগুলি পর পর চরণে অসমদীর্ঘ হইতে পারে কিন্তু এক বা একাধিক চরণ লঙ্ঘন করিয়াও উহাদিগকে অন্য চরণের অন্ত্যপর্বের সহিত সমদীর্ঘতা রক্ষা করিতে হইবে। যথা—

(ক) এক চরণ লঙ্ঘনকারী পর্যায়সম অন্ত্যপর্ব ঃ—

(১) (অত) চুপি চুপি কেন | কথা কও
(ওগো) মরণ হে মোর | মরণ
(অতি) ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও
(ওগো) একি প্রণয়েরি | ধরণ !

(২) তটের বুকে লাগে | জলের ঢেউ
তবে সে কলতান | উঠে
বাতাসে বনসভা | শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর | ফুটে।

(খ) দুই-চরণ-লঙ্ঘক প্রথম-চতুর্থসম অন্ত্যপর্ব ঃ—

তুমি যে এসেছো | ভস্ম মলিন | তাপস মুরতি | ধরিয়া।
স্তিমিত নয়ন | তারা
ঝলিছে অনল | পারা
সিক্ত তোমার | জটা জুট হতে | সলিল পড়িছে | ঝরিয়া।

অপরপক্ষে নিম্ন দৃষ্টান্তের প্রথম ও তৃতীয় চরণের অন্ত্যপর্ব কাহারও সহিত সম্মিতি রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া স্তবক-বন্ধনের হানি করিয়াছে ঃ—

যখন আটমাস | কাট্‌লো সে পাহাড়ে | কান্তা বিরহিত | কামুকের

সোনার কঙ্কণ | স্খলিত হয়ে তার | শূন্য হল মণি | বন্ধ

দেখলো মেঘোদয় | ধূমল গিরিতটে | একদা আষাঢ়ের | প্রথম দিনে

বপ্র কেলি করে | শোভন গজরাজ | আনত পর্বত | গাত্রে।

ইহার প্রথম চরণের চতুর্মাত্রিক 'কামুকের' সহিত তৃতীয় চরণের পঞ্চমাত্রিক 'প্রথম দিনে' সম্মিতিহীন। 'প্রথম দিনে'র স্থলে 'পয়লায়' হইলে সম্মিতি রক্ষা পাইত।

§ ২৭. স্তবকবন্ধন ও চরণের সমদীর্ঘতা অস্বীকার করিলে পদ্যছন্দকে বলা হয় 'মুক্তবন্ধ' বা 'মুক্তক'।

মুক্তবন্ধ বা মুক্তক

মুক্তক পাশ্চাত্য 'মুক্ত ছন্দ' বা free verse নহে। পাশ্চাত্য মুক্তছন্দ হইতেছে সর্ববন্ধন-মুক্ত অ-ছন্দ রচনা অথবা গদ্য ও পদ্যের যথেচ্ছ মিশ্রণ। কিন্তু মুক্তক যতিবদ্ধ বিশুদ্ধ পদ্যছন্দ। মুক্তকের মুক্তি চরণ-সম্মিতি হইতে মাত্র, পর্ব-সম্মিতি হইতে নহে; কারণ পর্ব-সমতাই পদ্যছন্দের প্রাণ। মুক্তকে কেবল চরণে চরণে পর্ব-সংখ্যার যথেচ্ছ হ্রাসবৃদ্ধি হয়। যথা:—

(১) হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল | চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য | তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের
প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা
উঠে জেগে, আলোকের
তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া | উঠে বর্ণ স্রোতে।
ধাবমান অন্ধকার হতে॥

(২) (বল) বীর—
(বল) উন্নত মম | শির
(শির) নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিমা | দ্রির।

(বল) মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য | গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক | গোলক ছাড়িয়া
খোদার আসন | 'আরশ' ভেদিয়া
উঠিয়াছি চির | বিস্ময় আমি | বিশ্ব বিধা | ত্রীর।
(মম) ললাটে রুদ্র | ভগবান জ্বলে | রাজ রাজ টীকা | দীপ্ত জয় | শ্রীর ॥

যতই অসমদীর্ঘ হউক, পর পর চরণগুলি যদি কোন বিশেষ প্যাটার্ণের আদর্শে পুনরাবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠে এবং স্তবকবদ্ধতা লাভ করে। তখন উহাদিগকে আর মুক্তক বলা যায় না। 'বলাকা' কাব্যের 'ছবি' 'সাজাহান' 'চঞ্চলা' মুক্তকে রচিত বটে, কিন্তু 'সবুজের অভিযান' বা 'শঙ্খ' স্তবকেই রচিত ; উহাদিগকে মুক্তক বলা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য

§ ১. উচ্চারিত ধ্বনির বৈশিষ্ট্য চতুর্বিধ—মাত্রা, শক্তি, স্বর ও জাতি। ইহাদের মধ্যে মাত্রা হইতেছে ধ্বনির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য তিনটি হইতেছে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

ধ্বনি গতিশীল। শ্রুতিগ্রাহ্য বলিয়া ইহার গতি বা বিস্তার স্থানে (space) নহে, কালে (time)। অর্থাৎ কালই ধ্বনির আশ্রয়; কালে প্রসারিত না হইলে ধ্বনির আকৃতি বুঝা যায় না। ধ্বনির এই আকৃতিসূচক দৈর্ঘ্যের পারিভাষিক নাম মাত্রা। মাত্রা ধ্বনির প্রকৃতিগত নহে বলিয়া ধ্বনি-বিজ্ঞানে আলোচিত হয় না, কিন্তু ছন্দোবিজ্ঞানে মাত্রার আলোচনাই মুখ্য। ধ্বনির আকৃতিগত বলিয়াই এখানে মাত্রার গুরুত্ব। ধ্বনিপ্রবাহের অঙ্গগত দৈর্ঘ্য-সামঞ্জস্যের উপর ছন্দ অর্থাৎ ধ্বনিসৌন্দর্য নির্ভর করে; তাই ছন্দ-শাস্ত্রে ধ্বনি-প্রবাহের মাত্রা-নির্ণয় অত্যাবশ্যক।

চতুর্বিধ ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য

শক্তি, স্বর ও জাতি ধ্বনির প্রকৃতিগত উপাদান। ইহাদের মধ্যে জাতিই হইতেছে ধ্বনির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অন্যগুলি ইহার আনুষঙ্গিক।

শক্তি বলিতে বুঝায় উচ্চারণে প্রযুক্ত দৈহিক শক্তি অর্থাৎ কণ্ঠশক্তি। শক্তি-প্রয়োগের আধিক্যে কণ্ঠধ্বনি উচ্চস্বরে অর্থাৎ চীৎকারে পরিণত হয় এবং দূর হইতে শোনা যায়।

কণ্ঠতন্ত্রীর দ্রুত কম্পনের আনুষঙ্গিক ফল হইতেছে স্বর। গানেই যে কেবল স্বরের প্রকাশ হয় তাহা নহে; স্বরের জন্য গীতহীন স্বাভাবিক অবস্থাতেও কণ্ঠস্বর মিহি বা মোটা, তীব্র বা গম্ভীর হইয়া

থাকে। সাধারণতঃ নারীকণ্ঠ মিহি ও পুরুষকণ্ঠ গম্ভীর। এই পার্থক্য স্বরের পার্থক্য।

ধ্বনির জাতি অর্থে উচ্চারণ-স্থানগত বৈশিষ্ট্য। যথা—অ, ক, খ, গ, ঘ কণ্ঠ্যজাতীয়, ই, চ, ছ, জ, ঝ তালব্যজাতীয়, উ, প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্যজাতীয়, ইত্যাদি।

মাত্রাভেদে ধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতার পার্থক্য, শক্তিভেদে সবল-দুর্বল উচ্চারণের পার্থক্য, স্বরভেদে খাদে ও চড়া পর্দার পার্থক্য ও জাতিভেদে উচ্চারণ-স্থানগত পার্থক্য বুঝায়।

ছন্দ ধ্বনিপ্রবাহের আকৃতি-সৌন্দর্য, প্রকৃতি-সৌন্দর্য নহে ; কাজেই শক্তি, স্বর ও জাতি ছন্দের অলংকরণ-প্রসঙ্গেই আলোচ্য ; সাধারণতঃ এইগুলি মাত্রার ন্যায় ছন্দের গঠনে অংশ গ্রহণ করে না। তবে শক্তির সহিত মাত্রার অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ক্ষেত্রবিশেষে শক্তিপ্রয়োগের তারতম্যে মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিতে শক্তিরও পরিবর্তন হয়।

মাত্রা

§ ২. অক্ষরের দৈর্ঘ্যের নাম মাত্রা। যতি-দৈর্ঘ্য বা ছেদ-দৈর্ঘ্য মাত্রা নহে।

অক্ষর ধ্বনিখণ্ড [একস্বর ধ্বনিই একাক্ষর,[১]] বলিয়া ইহার দৈর্ঘ্য স্থানগত নহে, উচ্চারণ-কালগত ; তবে এই কাল ঘড়ির কাঁটার কাল নহে, অক্ষর উচ্চারণে যে কণ্ঠশক্তির ব্যয় হয়, তদনুসারে মানবমনে কালব্যাপ্তির বোধ জাগে ; এই অনুভূত ব্যাপ্তি বা দৈর্ঘ্যই মাত্রা। ব্যক্তিনিরপেক্ষ কাল মাত্রা নহে। সেকেণ্ড বা মিনিট অনুসারে মাত্রার হিসাব হয় না। মাত্রাবিচারে মনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তাহার

মাত্রা ও ইহার স্বরূপ

১। প্রথম অধ্যায় ১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য।

কাছে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়। যন্ত্রের হিসাবে সকল অক্ষরের উচ্চারণকাল সমান নহে। যন্ত্রের হিসাবে স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা হলন্ত অক্ষর দীর্ঘতর—'দি' ও 'দিক্' অসমান। কিন্তু মনের কাছে ইহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য উপেক্ষণীয়, সকল অক্ষরই সমদীর্ঘ—'দি' এবং 'দিক্' সমান।

যতি বা ছেদ উচ্চারণ নহে, উচ্চারণের অভাব মাত্র। যতি বা ছেদ দীর্ঘ হইলেও এইগুলিতে কণ্ঠশক্তির ব্যয় হয় না বলিয়া পাঠকমনে কালবোধ জাগ্রত হয় না। সেইজন্যই যতির বা ছেদের দৈর্ঘ্য মাত্রা নহে।

স্বরহীন ব্যঞ্জনধ্বনিও (যথা—ক্, ৎ, ং, ঃ প্রভৃতি) অক্ষরমধ্যে গণ্য নহে বলিয়া মাত্রাহীন।

[বিঃ দ্রঃ—কেহ কেহ অক্ষরদৈর্ঘ্য বুঝাইতে 'মাত্রা' না বলিয়া 'কলা' বলিতে চান এবং ধ্বনি-মানদণ্ড (ইউনিট) অর্থে 'অক্ষরের' পরিবর্তে 'মাত্রা' চালাইতে চান। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগে অর্থ-বিভ্রাটেরই সৃষ্টি হয়। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা ভাষার ছন্দে এবং গানে অক্ষরের দৈর্ঘ্য অর্থেই মাত্রা শব্দ চলিয়া আসিতেছে। তাছাড়া কেবল বাংলায় নহে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে 'মাত্রাবৃত্ত' নামক একজাতীয় ছন্দও প্রচলিত আছে। এই প্রচলিত নাম পরিবর্তন করিয়া ইহাকে 'কলামাত্রিক ছন্দ' বলিবার কোন যুক্তি নাই। ভাষা সামাজিক বস্তু ইহার উপর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার চলে না। 'কলা' শব্দ প্রয়োগের জন্য ইঁহারা রবীন্দ্র নাথের দোহাই দেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'মাত্রা' অর্থে নহে, পর্ব-অর্থেই 'কলা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—

(১) (২) (৩) (৪)

"সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়

—এই ছন্দের প্রতিপদে সতেরো মাত্রা। এর চার কলা"[২]।

২। পৃঃ ২১৭ রবীন্দ্র রচনাবলী—১৪শ খণ্ড [বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার সমস্ত উদ্ধৃতি "জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ" (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) হইতে গৃহীত।]

§ ৩. পর্বদৈর্ঘ্য মাত্রাগত সূক্ষ্ম কাল-গত নহে। পর্বস্থ অক্ষরসমূহের মাত্রার হিসাবেই পর্বের দীর্ঘতা স্থির করা হয়। পর্বের সমগ্র কালদৈর্ঘ্য অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণকাল ও বিশ্রামকালের যোগফল পর্বদৈর্ঘ্য নহে।

পুণ্যে—পাপে—সুখে—দুঃখে | পতনে—উত্থানে

—এই দৃষ্টান্ত দুইটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে চারিটি ও দ্বিতীয় পর্বে দুইটি শব্দ আছে, এবং প্রতি শব্দের শেষে শব্দান্তিক ছেদ (বিশ্রাম) আছে। যতি ও ছেদের মাত্রা নাই ; সেইজন্য পর্বদৈর্ঘ্য নির্ণয়ে এই বিশ্রাম-গুলির পরিমাণ গণনীয় নহে, একমাত্র শব্দগুলির মাত্রাসংখ্যাই গণনীয়।

পর্বে মাত্রার প্রয়োজনীয়তা

পর্ব-দৈর্ঘ্য মাত্রাগত বলিয়া ধ্বনিপর্বের দ্রুত ও বিলম্বিত উচ্চারণে যান্ত্রিক কালভেদ ঘটিলেও মূল পর্ব-দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্তন হয় না।

§ ৪. অক্ষরের সাহায্যেই মাত্রা নির্ণেয়। অক্ষরই উচ্চার্য ধ্বনির পরিমাপক।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর 'মাপ' সূক্ষ্ম, কিন্তু 'মাপক' স্থূল। যথা, 'ভার' সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোগ্রাহ্য কিন্তু 'বাটখারা' স্থূল বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সেই প্রকার ধ্বনির মাপ হিসাবে মাত্রা সূক্ষ্ম, কিন্তু মাপক অক্ষর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও স্থূল। উচ্চার্য ধ্বনির মধ্যে অক্ষরই হ্রস্বতম, সেইজন্য ইহাই পর্ব-দৈর্ঘ্য মাপিবার মানদণ্ড।

মাত্রা গণনার উপায়

[কোন কোন ছান্দসিকের ধারণা, বাংলা-ছন্দে পর্বে দৈর্ঘ্য-পরিমাপক মানদণ্ড ত্রিবিধ—ব্যষ্টি (ইউনিট), মাত্রা (কলা) এবং স্বর (দল)। কিন্তু এই চিন্তা স্বাভাবিক নহে। তরল ঔষধ মাপিতে গেলে 'মেজার গ্লাসে'রই প্রয়োজন হয়, 'স্কেল' (scale) বা 'থার্মোমিটার' নহে ; সেইরূপ উচ্চার্য ধ্বনি মাপিবার জন্য অক্ষর ছাড়া অন্য কিছু পরিমাপক হয় না।]

ধ্বনিপর্বে যতগুলি অক্ষর আছে, ততগুলি মাত্রা—ইহাই সোজা

হিসাব। 'কলিকাতা'—ইহার উচ্চারণে ক-লি-কা-তা এই চারিটি অক্ষর আছে, সেই জন্য ইহার দৈর্ঘ্য চারিমাত্রা।

"পুণ্যে-পাপে-সুখে-দুঃখে" এবং "রেখেছো-বাঙ্গালী-করে" এই দুইটি ধ্বনি-পর্বের প্রতিটিতে আটটি করিয়া অক্ষর আছে বলিয়া উভয়েরই দৈর্ঘ্য আট মাত্রা। প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বিশ্রাম কাল (শব্দান্তিক ছেদ) বেশী আছে বলিয়া পর্ব দুইটি যে অসমদীর্ঘ তাহা নহে।

[পূর্বসূত্র দ্রষ্টব্য।]

§ ৫. একাক্ষরাত্মক স্বর-বর্ণকে 'হ্রস্ব' বা একমাত্রিক এবং দ্ব্যক্ষরাত্মক স্বর-বর্ণকে 'দীর্ঘ' বা দ্বিমাত্রিক বলা হয়। বর্ণই এক বা দুই অক্ষরের প্রতীক হইতে পারে। ব্যঞ্জনের হ্রস্বদীর্ঘত্ব নাই।

সাধারণ ও স্বাভাবিক উচ্চারণের দিক দিয়া বাংলা বর্ণমালায় সকল বর্ণই হ্রস্ব বা একাক্ষরসূচক। কেবল অ, ই, উ নহে, আ, ঈ, ঊ, এ, ও—এইগুলি নামে দীর্ঘ বর্ণ হইলেও বাঙ্গালী-উচ্চারণে হ্রস্ব। সংস্কৃতে আ—aa, ঈ—ii, ঊ—uu, এ—ee এবং ও—oo রূপে উচ্চারিত হয় ; সেইজন্য সংস্কৃতেই ইহারা দীর্ঘ বর্ণ, বাংলায় নহে। 'সীতা' সংস্কৃতে 'সি-ই তা-আ' বাংলায় 'শিতা', 'ভূপতি' সংস্কৃতে 'ভু-উপতি' বাংলায় 'ভুপতি'।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণ

যে সকল 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে, সে গুলির বানান উচ্চারণে পরিবর্তিত হইলেও লিপিতে অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়। সেই জন্য বাংলা বর্ণমালায় দীর্ঘবর্ণ চলিয়া আসিয়াছে।

§ ৬. ছন্দের পর্বপূরণের প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত হ্রস্ব-দীর্ঘ সকল বর্ণই যথার্থ দীর্ঘ বর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় ; এ স্থলে তৎসম শব্দেরও 'অ' aa-রূপে, 'ই' ii-রূপে, 'উ' uu-রূপে উচ্চারিত হয়।

(পরবর্তী ১২ সূত্র দ্রষ্টব্য।)

গানের সময়ে শব্দকে সম্প্রসারিত করিয়া উচ্চারণ করার প্রথা আছে। এই প্রসারণের অর্থ একই স্বরধ্বনির একাধিক একত্র উচ্চারণ—'সা'কে 'সা-আ', 'রে'কে 'রে-এ', 'নি' কে 'নি-ই' উচ্চারণ। গাহিবার সময়ে গায়ককে শব্দ-প্রসারণের সুযোগ দেওয়ার জন্য কবিগণ গানের কবিতায় কয়েকটি পর্ব হ্রস্বতর করিয়া রচনা করেন। গানের অনুকরণে কোন কোন পাঠ্য কবিতাতেও এবং ছেলে ভুলানো ছড়াতেও এইরূপ হ্রস্বীকৃত ছন্দপর্ব রচিত হইয়া থাকে। পড়িবার সময়ে পাঠক ইহার অন্তর্গত কোন কোন স্বরধ্বনিকে সম্প্রসারিত করিয়া প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য পূরণ করিয়া লন। ছন্দশাস্ত্রে ইহারই নাম 'শব্দ-প্রসারণ'। এই শব্দ-প্রসারণে সাধারণ হ্রস্ববর্ণ সামযিক দীর্ঘত্ব লাভ করে। নিম্ন দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ বর্ণের বন্ধনীবদ্ধ উচ্চারণ দ্রষ্টব্য :—

হ্রস্ব বর্ণের সাময়িক দীর্ঘত্ব

(১) পরাজিত তুই | সকল ফুলের | কাছে,
তবু কেন তোর | অপরাজিতা নাম? (অঅপরাজিতা)

২) ঘুম্ পাড়ানি | মাসীপিসি | ঘুম্ দিয়ে | যেয়ো (ঘুউম্)
বাটা ভরে | পান্ দেবো | গাল্ ভরে | খেয়ো (পাআন্, গাআল্)

(৩) "অ বটে | এই বুঝি | দেখলুম | দেখলুম" (অঅ বটে)
"ছি ওকি | রাগ করে | তুই ভাই যাচ্ছিস ?" (ছিই ওকি)
"তা তুমি বলবে না | থাকবার | দরকার ?" (তাআ তুমি)
ধাঁ করে | ভেংচিয়ে | কম্‌লীর | প্রস্থান (ধাঁআ করে)
হাঁ করে | চেয়ে রয় | ফট্‌কের | দুই চোখ। (হাঁআ করে)

(৪) চীন গ | গন হতে
পূর্ব গ | গন স্রোতে
শ্যামল | রসধর | পুঞ্জ। (চিইন, পুউর্ব, শ্যাআমল)

§ ৭. অক্ষর স্থির-মাত্রিক। শব্দ-প্রসারণে অক্ষরের মাত্রাবৃদ্ধি নহে,

শব্দেরই অক্ষরবৃদ্ধি ও ফলে মাত্রাবৃদ্ধি হয়। অক্ষরের প্রসারণ সম্ভব নহে।

নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় ও স্থিরধর্মী না হইলে কোন বস্তু মানদণ্ড হইবার যোগ্যতা লাভ করে না। স্থির-মাত্রিক বলিয়াই অক্ষর উচ্চার্য ধ্বনি মাপিবার মানদণ্ড। ছান্দসিকের হিসাব মিলাইবার প্রয়োজনে অক্ষর যদি কখনও একমাত্রার, কখনও দেড়মাত্রার ও কখনও দুই মাত্রার হইত, তাহা হইলে এই প্রকার নমনীয় অক্ষরের দ্বারা যথার্থ ধ্বনিদৈর্ঘ্য নির্ণয় সম্ভব হইত না। গণিত শাস্ত্রের দৈর্ঘ্য-মাপক দণ্ড বা স্কেল কখনই স্প্রিং বা রবারের ন্যায় নমনীয় বস্তুতে নির্মিত হয় না, কঠিন অনমনীয় পদার্থেই নির্মিত হয়, কারণ স্কেলের সঙ্কোচন-প্রসারণ সম্ভব হইলে তাহার দ্বারা যে-কোন দৈর্ঘ্যকেই যে-কোন ফুট বা ইঞ্চি বলিয়া চালানো যাইতে পারে। অস্থির-ধর্মী মানদণ্ডে মাপা হিসাব গোঁজামিল ছাড়া কিছু নহে। এই মূল সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কোনো কোনো ছান্দসিক প্রচার করিয়াছেন—

অক্ষরের স্থির মাত্রিকতা

"বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ হইতে পারে।"

"কোনরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব-নির্দিষ্ট থাকে না।"

"বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙ্গালী মেয়েদের চুলের মতো, কখনও আঁট করিয়া খোঁপা বাঁধা থাকে, আবার কখন এলায়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।"

এই প্রকার প্রচারে তিনটি দোষ দ্রষ্টব্য :—

(১) অক্ষরই হ্রস্বতম উচ্চার্য ধ্বনি—এই হ্রস্বতমেরও আবার হ্রস্বতা-দীর্ঘতা স্বীকার করিতে হয়, ফলে স্ব-বিরোধিতা ঘটে।

(২) বর্ণই যে হ্রস্বদীর্ঘ অর্থাৎ একাক্ষর বা দুই অক্ষরের প্রতীক, একথার অর্থ থাকে না।

(৩) অক্ষরের মানদণ্ডত্ব নষ্ট হয় এবং অক্ষর-নির্ণীত পর্বদৈর্ঘ্যের হিসাব গোঁজামিলে পরিণত হয়।

অক্ষরে অস্থিরমাত্রিকতা-ভ্রান্তির মূল কারণ শব্দ প্রসারণ সম্বন্ধে উল্লিখিত ছান্দসিকগণের ভ্রান্ত ধারণা ; তাঁহারা অক্ষরবৃদ্ধির কথা বাদ দিয়াই শব্দের মাত্রাবৃদ্ধির চিন্তা করেন। অথচ অক্ষরবৃদ্ধি ব্যতীত মাত্রাবৃদ্ধি সম্ভব নহে ; শব্দ-প্রসারণের বৈশিষ্ট্য শব্দান্তর্গত অক্ষর বিশেষের পুনরাবৃত্তি। ইহার প্রমাণ তোতলা উচ্চারণ। যথা—

কো-কো-কো-কোথা গো | বি-বি-বি-বিশাখে
দে-দে-দে-দে-দেখা | সে ব-ব-বঁধুকে ॥ —(কৃষ্ণকমল গোস্বামী)

দৃষ্টান্তে সম্প্রসারিত শব্দের আদ্যক্ষর বৃদ্ধি দ্রষ্টব্য।

পদ্যছন্দে শব্দ-সম্প্রসারণে সঙ্গীতের প্রভাবে শব্দান্তর্গত স্বরধ্বনি-বিশেষের পুনরুক্তি বা দ্ব্যক্ষরতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—

(১) জ-অয়্ রাণা | রা-আম্ সিঙের্ | জয়্
(২) আ-আসিল যত | বি-ইর বৃন্দ | আ-আসন তব | ঘে-এ রি-ই
(৩) আস্তে ভাই | খু-উ কু-উ | ঐ যে ঘু-উম্ | যায়

দৃষ্টান্তগুলির নিম্নরেখ অংশগুলিতে মূল স্বরধ্বনি অবলম্বন করিয়া এক একটি নূতন স্বরধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে একটি অক্ষরের স্থলে তুইটি অক্ষর হইয়াছে। যথা—(১) জয়্—জ-অয়্, রাম্—রা-আম, (২) আ—আ-আ, বী—বি-ই, ঘে—ঘে-এ, রি—রি-ই, (৩) খু—খু-উ, কু—কু-উ, ঘুম্—ঘু-উম্। দৃষ্টান্তগুলিতে অক্ষর বাড়িয়াছে বলিয়াই মাত্রা বাড়িয়াছে, অক্ষরবৃদ্ধি ব্যতীত মাত্রাবৃদ্ধি হয় না। অথচ এইখানেই লোকে ভুল করিয়া বসে ; মনে করে—মূল অক্ষর অপরিবর্তিত আছে, কেবল উহার মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শব্দপ্রসারণে অক্ষরবৃদ্ধি লক্ষ্য না করার ফলেই অক্ষরের অস্থির-মাত্রিকতা রূপ ভ্রান্ত ধারণা ছান্দসিক মহলে প্রচলিত হইয়াছে। ছন্দোবিচারে ধ্বনি ও কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া চক্ষুর উপর বেশী বিশ্বাস করিলে নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। অক্ষরের অস্থির-মাত্রিকতার ধারণা এই সকল বিভ্রাটের অন্যতম দৃষ্টান্ত। "মাত্রার দিক দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতি একেবারে

বাঁধা ধরা নয়” বা “বাংলা শব্দের উচ্চারণের কোন স্থির নিয়ম নেই” এইরূপ অবৈজ্ঞানিক উক্তিও কোন কোন মহলে প্রচলিত আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগতের কোন বস্তুই নিয়ম ও শৃঙ্খলার বহির্ভূত নহে। কী অবস্থায় বাঙ্গালীর সাধারণ উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটে এবং শব্দ সম্প্রসারিত হয় তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

শক্তি

§ ৮. অক্ষরের উচ্চারণে প্রযুক্ত দৈহিক বল হইতেছে ছন্দশাস্ত্রের ‘শক্তি’। কণ্ঠশক্তি না থাকিলে ধ্বনির উচ্চারণই সম্ভব নয়।

শক্তির অর্থ

বলবান ব্যক্তির শক্তি দুর্বল ব্যক্তির শক্তি অপেক্ষা বেশী বটে কিন্তু তাই বলিয়া সবল ব্যক্তির উচ্চারণ সকল কথায় সবল হইবে এবং দুর্বল ব্যক্তির উচ্চারণ সকল কথায় দুর্বল হইবে তাহা নহে। সবল দুর্বল সকল ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে তাহার শরীরের যে কোন অংশে কমবেশী শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। কথোপকথন কালে কোন শব্দে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে সেই শব্দটিতে বিশেষ শক্তি প্রযুক্ত হয় ও উহা সজোরে উচ্চারিত হয়। যথা—

(১) তুমি কী চাও?

(২) এ বই বাজারে কাটে না, কাটে পোকায়।

বাক্যে বা শব্দে নহে, অক্ষরে প্রযুক্ত শক্তিই ছন্দ-শাস্ত্রের আলোচ্য।

§ ৯. স্বাভাবিক উচ্চারণে সাধারণ শক্তিতে উচ্চারিত হয় বলিয়া স্বরান্ত অক্ষর হইতেছে ‘লঘু’ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিতে উচ্চারিত বলিয়া হলন্ত বা যৌগিক অক্ষর হইতেছে ‘গুরু’। হল্ বা ভগ্নস্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই ইহার গুরু উচ্চারণ।

স্বরান্ত অক্ষরে নিঃশ্বাসের গতিপথ উন্মুক্ত থাকে বলিয়া উচ্চারণে

বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরে নিঃশ্বাস-পথ হল্‌ বা ভগ্নস্বরে (১।১১ সূত্র) রুদ্ধ হয় বলিয়া বাধা-সংঘাতে স্বরযন্ত্রের শক্তির বিকাশ হয়। এই কারণে লঘু অক্ষরের শেষে হল্‌ বা ভগ্নস্বর যোগ করিয়া একত্র সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিলে লঘু অক্ষর গুরু অক্ষরে পরিণত হয়। যথা—হাতী, দিগন্ত, ভিজা, জননী, মধু, বসন, ইহাদের প্রথমাক্ষর 'হা', 'দি', 'ভি', 'জি', 'ম', 'ব' হইতেছে লঘু অক্ষর কিন্তু হাল্কা, দিগ্বধূ, ভিক্ষা, ওজঃ, মৌমাছি, বৈঠক, ইহাদের 'হাল্‌' 'দিগ্‌', 'ভিক্‌', 'জঃ', 'মৌ', 'বৈ' গুরু অক্ষর।

অক্ষরের গুরু-লঘুত্ব

অস্বাভাবিক ভাবে যে-কোন স্বরান্ত লঘু অক্ষরে গুরু উচ্চারণ করা যায় কিন্তু তাহা ব্যভিচার-স্থল মাত্র। হলন্ত অক্ষরে তেমনি সাধারণতঃ লঘু উচ্চারণ করা যায় না।

§ ১০. লঘু ও হ্রস্ব একার্থক নহে, সেইরূপ গুরু ও দীর্ঘ একার্থক নহে, ভিন্নার্থক। হ্রস্বদীর্ঘত্ব ধ্বনির দৈর্ঘ্যগত এবং লঘু-গুরুত্ব উহার উচ্চারণে প্রযোজ্য শক্তিগত।

গুরু অক্ষর হ্রস্ব হইতে পারে, লঘু অক্ষর দীর্ঘ হইতে পারে। দীর্ঘ বর্ণের ধ্বনিতে দুইটি দুর্বল অক্ষর ও গুরু অক্ষরে একটি সবল অক্ষর বুঝানো হয়। যথা—

লঘু-হ্রস্বে এবং গুরু-দীর্ঘে ভেদ

জনগণ | মন অধি | নায়ক | জয় হে।

ইহার 'না' এবং 'হে' গুরু নহে, 'দীর্ঘ'; কারণ ইহারা নিম্নপ্রকার দুইটি করিয়া লঘু অক্ষরের প্রতীক :—

জনগণ | মন অধি | নাআয়ক | জয় হে-এ।

কিন্তু—

দিগন্তে সঙ্গীতধ্বনি | সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর | তরঙ্গের তালে।

ইহাতে গন্(দিগন্তে), সং(সঙ্গীত), গম্(সুগম্ভীর), সিন্(সিন্ধুর), রং(তরঙ্গ) প্রতিটি 'গুরু', অথচ দীর্ঘ নহে হ্রস্ব।

[বর্ণ ও অক্ষরকে অভিন্নরূপে দেখার ফলেই লঘুহ্রস্বে সমার্থতা ও গুরুদীর্ঘে অভেদের ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে।]

গুরু ও দীর্ঘ যে ভিন্ন তাহার অপর প্রমাণ—দীর্ঘত্বসাধনে গুরুত্বের হ্রাস হয়।

(পরবর্তী ১১ সূত্র দ্রষ্টব্য)

§ ১১. ছন্দের পর্বপূরণার্থে শব্দপ্রসারণে হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট বা দ্বিগুণিত হইলে উহার দ্বিতীয় অক্ষরটিই হলন্তরূপে থাকে কিন্তু ইহাতে সংশ্লিষ্ট হলন্তের সাধারণ গুরুত্ব হ্রাস পায়। দীর্ঘীকৃত অবস্থায় এই বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর হইতেছে 'ঈষদ্ গুরু'।

হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ নূতন স্বর সন্নিবেশে স্বরান্তিক ব্যঞ্জনকে অপেক্ষাকৃত দূরে ঠেলিয়া দেওয়া; যথা, জল্—জঅল্, দিক্—দিইক্, গুণ্—গুউণ্; এইগুলিতে নিঃশ্বাস পথের বাধাদানকারী ব্যঞ্জন অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। সাধারণ হলন্ত অক্ষর উচ্চারণে নিঃশ্বাস-বেগের প্রারম্ভেই বাধা পড়ে বলিয়া যতটা শক্তি প্রযুক্ত হয়, স্বরবৃদ্ধির দ্বারা বাধা দূরে অপসারিত হইলে ততটা শক্তি লাগে না; কারণ এখানের বাধা নিঃশ্বাসের মন্দীভূত বেগের মুখে, প্রারম্ভে নহে। যথা—

শব্দপ্রসারণে বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব-হ্রাস

এ আঁখি আমার | শরীরে তো নাই | ফুটেছে মর্ম তলে।

এখানে দুই অক্ষরের 'মর্ম' শব্দ সম্প্রসারিত, সেইজন্য ইহা তিন অক্ষরের 'মঅর্ম' (maarma) রূপে উচ্চারিত। মূল মর্ম (marma) শব্দের 'মর্' গুরু অক্ষর; ইহার গুরুত্ব বা শক্তি 'মঅর্ম' (maarma) শব্দের 'অর্' (ar)এ থাকে না, কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই 'অর্' হইতেছে ঈষদ্ গুরু।

[মূল তৎসম 'মর্ম' (marma) শব্দের দ্বিবিধ বিকৃতরূপ বাংলা কবিতায় দেখা যায়—'মঅর্ম' (maarma) এবং 'মরম' (marama)। ইহাদের মধ্যে মর্মের 'মর' (mar) গুরু, 'মঅর্মে'র 'অর' (ar) ঈষদ্ গুরু এবং 'মরমে'র 'র' (ra) লঘু।]

লঘু-গুরু অক্ষরের মাত্রা

§ ১২. সাধারণ অবস্থায় লঘু-গুরু নির্বিশেষে অক্ষরমাত্রই হ্রস্ব বা একমাত্রার। যখন শব্দ-প্রসারণে মূল একাক্ষর স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট ও দ্বিগুণিত হইয়া দুই অক্ষরে পরিণত হয়, তখনই কেবল ইহা হয় দীর্ঘ বা দুইমাত্রার।

যেমন—

(১) মাথা তুলে তুমি যবে | চলো নিজ পথে

(২) পুন্-নে পাপে সুখে দুক্-খে | পতনে উৎথানে

[মূল শব্দ—পুণ্যে, দুঃখে, উত্থানে]

এখানে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতিটি অক্ষর যেমন লঘু ও একমাত্রার, তেমনি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'পুন্', 'দুক্', 'উৎ' অক্ষর গুরু হইয়াও একমাত্রার। তবে শব্দ-প্রসারণে লঘুগুরু যে-কোন অক্ষরের স্বরধ্বনি দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিমাত্রিক হইতে পারে। যথা—

দে-এ শ্-অ দে-এ শ্-অ | ন-অন্ দিত করি | ম-অন্ দ্রিত তব | ভে-এ রি-ই

ইহাতে 'দেশ দেশ' বা 'ভেরী' শব্দে যেমন লঘু অক্ষর 'দে', 'ভে', 'রী' তেমনি 'নন্দিত' ও 'মন্দ্রিত' শব্দে গুরু অক্ষর 'নন্' ও 'মন্' স্বরসন্নিবেশে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইয়াছে।

ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষর বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

§ ১৩. ছন্দপর্বে লঘু-গুরু অক্ষরবিন্যাসের উদ্দেশ্য পর্বধ্বনির অলংকরণ মাত্র। পর্বস্থ অক্ষরবিন্যাসের লঘুত্ব বা গুরুত্ব কোন ছন্দেরই অপরিহার্য অঙ্গ নহে; চরণের পর্বে পর্বে লঘু-গুরু অক্ষরের বৈচিত্র্য থাকিলে প্রবাহান্তর্গত প্রতিটি ধ্বনিতরঙ্গের নিজস্ব হিল্লোল দেখা দেয় ও তাহাতে ধ্বনিসৌন্দর্যের

আতিশয্য ঘটে। শক্তিভেদের বৈচিত্র্য না থাকিলে যে ছন্দপতন ঘটে, তাহা নহে ; ইহাতে সৌন্দর্যের আতিশয্য না থাকিতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য না থাকিবার কোন কারণ নাই।

সংস্কৃতে ও ইংরেজিভাষায় ছন্দপর্বে নির্দিষ্ট অক্ষরে গুরুত্বসাধনে বিশেষ প্যাটার্ণ ও বিশেষ নামের ছন্দোবন্ধ গড়িয়া উঠে। বাংলাছন্দে গুরু অক্ষরের এই গুরুত্ব নাই।

§ ১৪. সাধারণ গুরু অক্ষর উচ্চারণে প্রযুক্ত শক্তি অপেক্ষা গুরুতর শক্তির নাম 'বল' বা 'শ্বাসাঘাত'। শ্বাসাঘাত দ্বিবিধ—সাধারণ ও প্রবল।

শ্বাসাঘাতের অর্থ ও প্রকারভেদ

অক্ষরবিশেষে গুরুতর শক্তি প্রদানকালে নিঃশ্বাসবায়ু স্বরযন্ত্রে সজোরে আঘাত করে। তাই এই শক্তিকে বলা হয় শ্বাসাঘাত। শ্বাসাহত অক্ষর ধ্বনিপর্বের অন্যান্য অক্ষর অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে ও শ্রোতার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। স্বরান্ত বা হলন্ত যে-কোন অক্ষর শ্বাসাহত হইতে পারে।

গুরুত্ববিচারে বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর ঈষদ্‌গুরু, সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর গুরু, সাধারণ শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর গুরুতর এবং প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর হইতেছে গুরুতম।

আমাদের শ্বাসশক্তি সীমাবদ্ধ ; শ্বাসাঘাতে ধ্বনিপর্বের একটি অক্ষরেই অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া গেলে স্বল্পাবশিষ্ট শক্তিতেই পর্বের অন্যান্য অক্ষরগুলির উচ্চারণ শেষ করিতে হয়। কাজেই উচ্চারণের দ্রুততা আসে ; তাছাড়া শব্দান্তিক বিশ্রাম অতি সংক্ষিপ্ত হয় ও পর্বস্থ অক্ষরগুলি প্রায় একাঙ্গ ও একীভূত হইয়া যায়। 'শব্দ-সংযোজনে'র* মূল কারণ প্রবল শ্বাসাঘাত ; যথা—

তাল্ পাতার ঐ | পুথির ভিতর | ধর্ম আছে | বল্‌লে কে ?

---

* প্রথম অধ্যায়ের ৫ম সূত্র দ্রষ্টব্য

ইহার উচ্চারণ :—

তান্নাতারৈ | পুথিভিতর্ | ধর্ম আছে | বল্লে কে ?

§ ১৫. সাধারণ শ্বাসাঘাত ভাষার অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে ও ভাষা-রীতি অনুসারে অক্ষরবিশেষে প্রযুক্ত হয়।

সাধারণ শ্বাসাঘাত

অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে আদ্য, মধ্য, অন্ত্য যে-কোন অক্ষরে সাধারণ শ্বাসাঘাত পড়ে। যথা—'**স**লিল ও স-**লী**ল শব্দ একার্থক নহে।' এখানে 'সলিল' শব্দের প্রথমাক্ষর ও স-লীল শব্দের দ্বিতীয়াক্ষরে সাধারণ শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে।

বাংলাভাষার রীতি অনুসারে গদ্য বা পদ্য ধ্বনিপর্বের প্রথমাক্ষরে সাধারণ শ্বাসাঘাত পড়ে এবং এই শ্বাসাঘাতকেই বাংলা ধ্বনিপর্বের গঠনকর্তা বলা চলে। যথা—

গদ্যে—

আমাদের সঙ্গে | **আ**রো অনেক যাত্রী | **ম**ন্দিরের মধ্যে | **প্র**বেশ করিল।

পদ্যে—

(১) **ক**ত অজানারে | **জা**নাইলে তুমি | **ক**ত ঘরে দিলে | **ঠাঁ**ই।
(২) **ম**হাভারতের **ক**থা | **অ**মৃত সমান।

§ ১৬. প্রবল শ্বাসাঘাত সাধারণতঃ চতুরক্ষরপর্বিক পদ্যছন্দের পর্বাদ্যে প্রযুক্ত হয় এবং চতুরক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘতর পর্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রবল শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত :—

প্রবল শ্বাসাঘাত ও ইহার পর্ব-সীমা

এই যে এলো | **সেই** আমারি | **স্বপ্নে** দেখা | **রূপ**।
কই দেউলে | **দেউ**টি দিলি | **কই** জ্বালালি | **ধূপ** ?

এই দৃষ্টান্তের প্রতিপর্বের আদ্যক্ষর 'এই', 'সেই', 'স্বপ্‌', 'রূপ্‌' এবং 'কই', 'দেউ', 'কই' ও 'ধূপ্‌' উচ্চারণে বাঙ্গালীর কণ্ঠে যে শক্তি ব্যয় হয়, উহাই গুরুতম শক্তি বা প্রবল শ্বাসাঘাত।

ধ্বনিপর্ব চতুরধিক অক্ষরে গঠিত হইলে প্রবল শ্বাসাঘাত প্রবলতা হারাইয়া সাধারণ শ্বাসাঘাতে পরিণত হয়। যথা—

এনেছি শুধু | বীণা

দেখো তো চেয়ে | আমারে তুমি | চিনিতে পারো | কিনা।

§ ১৭. পদ্যপর্বে অন্ততপক্ষে একটি অক্ষর হলন্ত বা যৌগিক হইলে তবেই পর্বের আদ্যক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে।

হলন্ত বা যৌগিক অক্ষর গুরু*, এবং সেইজন্য শক্তির আশ্রয়। স্বরান্ত অক্ষর স্বাভাবিক ভাবে লঘু, সেইজন্য কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত ধ্বনিপর্ব প্রবল শ্বাসাঘাতের আশ্রয় হইতে পারে না। ধ্বনিপর্বের যে-কোন স্থানে নিশ্বাস-নির্গমনপথ হল্ বা ভগ্নস্বরের দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া অন্ততঃ একটি লঘু অক্ষরকে গুরু অক্ষরে পরিণত করিলে তবেই পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে; যথা—'কিছু না', কখনো না', 'সকলে' প্রভৃতি পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত প্রকাশিত নহে, কিন্তু 'কিচ্ছু না' 'কক্‌খনো না' 'সক্কলে' প্রভৃতি পর্বের আদ্যক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু—

প্রবল শ্বাসাঘাতের আশ্রয় লক্ষণ

গগনে গ | রজে মেঘা | ঘন বর | ষা।
কুলে একা | বসে আছি | নাহি ভর | সা॥

ইহার পর্ব চতুরক্ষর হইলেও পর্বে একটিও গুরু অক্ষর নাই; কাজেই পর্বগুলি প্রবল শ্বাসাঘাতের আশ্রয় নহে, এখানে প্রবল শ্বাসাঘাত প্রদান অস্বাভাবিক। কিন্তু পর্বে পর্বে গুরু অক্ষর থাকিলে স্বাভাবিক ভাবে পর্বে পর্বে আদ্যক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়িবে। যথা—

গ́গনে মেঘ্‌ | গ́র্জে উঠে | ঘ́নায়্ বর | ষ́া।

*এই অধ্যায়ের ৯ম সূত্র

একূলা কূলে । রইনু বসে । নাই্ রে ভর । সা ॥

দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ অক্ষরগুলির গুরুত্ব দ্রষ্টব্য।

[কোনো ছান্দসিক মনে করিয়াছেন—চতুরক্ষর ধ্বনিপর্বের সকল গুরু অক্ষরই বুঝি প্রবল শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হয়। তাঁহার গ্রন্থে নিম্নপ্রদর্শিতরূপে প্রবল শ্বাসাঘাত চিহ্ন সন্নিবেশ দেখা যায় :—

কোন্ হাটে তুই্ । বিকোতে চাস্ । ওরে আমার্ । গান্

সকল্ তর্ক । হেলায়্ তুচ্ছ । করে

সব্ পেয়েছির্ । দেশে কারো । নাই রে কোঠা । বাড়ী

কিন্তু ধ্বনিপর্বের সকল গুরু অক্ষরকেই প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়া উচ্চারণ বাংলা ভাষাতত্ত্ব-বিরোধী। বাংলাভাষার ধ্বনিপর্বের আদ্যক্ষর লঘু হউক, গুরু হউক তাহাতেই শ্বাসাঘাত পড়ে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"প্রত্যেক বাক্যখণ্ডে বা পর্বে মাত্র একটি করিয়া স্বরাঘাত (শ্বাসাঘাত) পাওয়া যায়। এই স্বরাঘাত বাক্যখণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আদ্য অক্ষরের উপরই পড়িয়া থাকে।"*

চতুরক্ষর ছন্দ-পর্বে গুরু অক্ষর থাকিলে সেখানে একবারই প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। যেহেতু প্রবল শ্বাসাঘাতে ধ্বনিপর্বের শব্দান্তিক ছেদবিলুপ্তি ঘটিয়া শব্দগুলি প্রায় একাঙ্গ হইয়া যায়, সেইহেতু ধ্বনিপর্বের যে-কোন স্থানে গুরু অক্ষর থাকাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, গুরু অক্ষরের অবস্থিতি কোনখানে এবং সংখ্যায় একটি না দুইটি তাহা উপেক্ষণীয় হয়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রবল শ্বাসাঘাত কেবল প্রতিপর্বের আদ্যক্ষরেই পড়িবে, অন্যত্র পড়িবে না। যথা—

কোন হাটে তুই । বিকোতে চাস্ । ওরে আমার । গান

---

* পৃঃ ৮৪ ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ (২য় সং)

সকল তর্ক | হেলায় তুচ্ছ | করে

সব পেয়েছির | দেশে কারো | নাইরে কোঠা | বাড়ী

শ্বাসাঘাতই পর্বারম্ভ সূচিত করে। একই পর্বে যদি একাধিক শ্বাসাঘাত পড়িত, তাহা হইলে পর্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া একাধিক খণ্ডে বা উপখণ্ডে পরিণত হইত। এই সত্য বিস্মৃত হইলে বহুবিধ প্রমাদ অনিবার্য।]

§ ১৮. প্রবল শ্বাসাঘাতে ব্যয়িত শক্তির অনুভূত দৈর্ঘ্য অর্ধমাত্রা। সেইজন্য অক্ষর প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে তাহার দৈর্ঘ্য হয় দেড় মাত্রা।

অক্ষর উচ্চারণে কালের সহিত 'মাত্রা' সম্পর্কিত নহে, কণ্ঠশক্তির ব্যয়ের ফলে উৎপন্ন কালবোধেরই সহিত মাত্রা সম্পর্কিত (৪।২ সূত্র)। সেইজন্য শ্বাসাঘাতের সহিত মাত্রার সম্বন্ধ আছে। সূক্ষ্মবিচারে প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর দীর্ঘতায় দেড় মাত্রা এবং প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত চতুরক্ষর পর্ব দীর্ঘতায় সাড়ে চারি মাত্রা।

প্রবল শ্বাসাঘাতে অক্ষরের দৈর্ঘ্য দেড় মাত্রা

প্রবল শ্বাসাহত অক্ষরে যে অর্ধমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে তাহা স্বরধ্বনি বৃদ্ধির আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি স্বরান্ত অক্ষরে কৃত্রিমভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়া পরীক্ষা করিলে কথাটি সুস্পষ্ট হইবে। নিম্ন দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য :—

ধিন্‌তা ধিনা | পাকা নোনা।
ডাল্ ভাতে ভাত | চড়িয়ে দেনা ॥

চতুরক্ষর পর্বে গুরু অক্ষর থাকিলে তবেই উহার পর্বাদ্যে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে এবং সেই হিসাবে দৃষ্টান্তের 'ধিন্‌তা ধিনা' পর্বের প্রথমাক্ষর 'ধিন্' এখানে প্রবলভাবে শ্বাসাহত। কিন্তু 'পাকা নোনা' কেবল লঘু অক্ষরে রচিত পর্ব, সেইজন্য ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত স্বতঃস্ফূর্ত

নহে। কিন্তু যেহেতু ইহা শ্বাসাঘাতযুক্ত প্রথম পর্বের সহিত সম্মিতি-যুক্ত হইয়া একই চরণে স্থান পাইয়াছে, সেইহেতু সম্মিতি বজায় রাখিতে ইহাও আন্তক্ষরে কৃত্রিম শ্বাসাঘাতযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়—

ধিনতা ধিনা | পাকা নোনা।

বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে—শ্বাসাহত অবস্থায় ইহার দ্বিতীয় পর্বের প্রথমাক্ষর 'পা' এবং পরবর্তী অক্ষর 'কা', এই উভয়ের মধ্যে একটি ফাঁক সৃষ্টি হয় ঃ—

ধিন্‌তা ধিনা | পা-কা নোনা।

এই ফাঁকের অর্থই শ্বাসাহত অক্ষর 'পা'এর 'আ'ধ্বনির পুনরাবৃত্তির প্রচেষ্টা ; কিন্তু অত্যধিক দ্রুততার জন্য পুরা অক্ষর পুনরাবৃত্ত হয় না, ভগ্নস্বর বা অর্ধাক্ষরই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। শ্বাসাহত 'পাকা নোনা' ঠিক 'পাআকা নোনা' নহে, 'পা-া-কা নোনা' হইয়াই উচ্চারিত হয় ; অর্থাৎ ইহাতে অর্ধমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। এই প্রকার বৃদ্ধিকে পুরা দ্বিমাত্রিক বলা চলে না বলিয়া কেহ কেহ শ্বাসাহত অক্ষরকে বলিয়াছেন 'সঙ্কোচ-হ্রস্ব'। শ্বাসাহত পর্বের আদি অক্ষর লঘু না হইয়া গুরু হইলেও, অর্থাৎ 'পাক্কা নোনা' হইলেও একই প্রকার ভগ্নস্বরের বৃদ্ধি ঘটে, শ্বাসাহত হলন্ত অক্ষর দেড় অক্ষরেই পরিণত হয়। তবে তাহাতে স্বরান্ত অক্ষরের বৃদ্ধির ন্যায় অর্ধমাত্রিক সম্প্রসারণ এতটা সুস্পষ্ট হয় না, কারণ তখন আর ফাঁক থাকে না ; নবাগত ব্যঞ্জনের দ্বারা ভরাট হইয়া যায়। 'সব্‌বাই', 'সক্‌কলে', 'কিচ্ছু না', 'কক্ষনো না' প্রভৃতি কথ্য শব্দেও এই ব্যাপার লক্ষণীয়।

সুর

§ ১৯. কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনের অল্পতা বা আধিক্য-জাত ধ্বনিবৈশিষ্ট্য হইতেছে সুর। উচ্চারিত স্বরধ্বনি মাত্রেই সুর বর্তমান। কণ্ঠতন্ত্রীর

কম্পনের হারের উপর, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যার কম-বেশীর উপর সুরভেদ নির্ভর করে। দৈহিক শক্তিতে নহে, স্বরযন্ত্রের

সুরের অর্থ

কর্ম নৈপুণ্যেই কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনের হার বাড়ানো-কমানো যায়। কম্পনের হার যতই বাড়ানো যায়, ততই সুর ক্রমশঃ সরু হইয়া চড়া পর্দায় উঠে। কম্পনের হার কমাইলে সুর ক্রমশঃ মোটা হইয়া নিম্নখাদে নামিয়া আসে। সাধারণতঃ বাল্যকালেই কণ্ঠনৈপুণ্য বেশী থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাস পায়। সাধারণ পুরুষকণ্ঠ অপেক্ষা নারীকণ্ঠেই চড়া পর্দার সুর বেশী শোনা যায়। তবে উচ্চসুর তথাকথিত উচ্চস্বর বা চীৎকার নহে, নিম্নসুরও চুপি চুপি কথার স্বর নহে। উচ্চসুর অর্থে সরুগলার উচ্চারণ ও নিম্নসুর অর্থে মোটাগলার উচ্চারণ।

§ ২০. সঙ্গীতে প্রচলিত সুর-সপ্তকেই সুর-সংখ্যা নিবদ্ধ নহে।

সুরের বৈচিত্র্য

কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনের হার বহুপ্রকার, সুতরাং সুরও বহুসংখ্যক। কথোপকথনকালে অতি দ্রুত সুর-পরিবর্তন স্বাভাবিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য।

নির্দিষ্ট কম্পনধর্ম বিশিষ্ট সাতটি বিশিষ্ট সুর ষড়্‌জ (সা), ঋষভ (ঋ বা রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), নিষাদ (নি)—ইহারাই সঙ্গীত শাস্ত্রের সুর। এক একটি বিশিষ্ট সুরকে কণ্ঠে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে অর্থাৎ কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট হারে কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনসংখ্যা অব্যাহত রাখিলে সাধারণ লোকে ইহাকে গানের সুর বলিয়া বুঝিতে পারে। সঙ্গীতের সুর কণ্ঠসাধনা-সাপেক্ষ।

ছন্দ-শাস্ত্রে সঙ্গীতের সুরের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই

§ ২১. উচ্চারণের বেগের নাম 'লয়'। লয় ত্রিবিধ—দ্রুত, বিলম্বিত ও ধীর। দ্রুত লয়ের উচ্চারণে সুর উচ্চ এবং বিলম্বিত ও ধীর লয়ের উচ্চারণে সুর ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া থাকে।

ধ্বনির আবির্ভাব কখনই একক ও নিঃসঙ্গ নহে, জন্মমাত্রই ইহা

চারিপাশে বিভিন্ন সুরের আনুষঙ্গিক বহু প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে এবং এইগুলিকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের শ্রবণ-শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া এই আনুষঙ্গিক ধ্বনিগুলি নির্দিষ্ট-সংখ্যক। ইহাদের পারিভাষিক নাম 'শ্রুতিধ্বনি'। শ্রুতিধ্বনি নির্দিষ্ট-সংখ্যক বলিয়া একটি ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য অনুরণন শেষ হইবার পূর্বেই অপর একটি ধ্বনির সূচনা অবাঞ্ছনীয়; সেইরূপ পূর্বধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য অনুরণন শেষ হইবার পরে পরবর্তী ধ্বনির বিলম্ব হওয়াও সমানভাবে অবাঞ্ছনীয়। প্রথমটিতে কথায় কথা জড়াইয়া অস্পষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়টিতে বাধাযুক্ত তোতলা উচ্চারণের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য উচ্চারণকালের হ্রস্ব-দীর্ঘতা অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রুতিধ্বনিরও সংখ্যাগত হ্রাসবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। উচ্চপর্দার ধ্বনিতে নিম্নপর্দার অনেকগুলি শ্রুতিধ্বনি কর্ণে বিলুপ্ত হয়। সেইজন্য মূলধ্বনির সুর-পরিবর্তনে অনুরণনের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হয়। দ্রুত উচ্চারণে সময় সংক্ষেপ করিতে হয়, উহাতে কথা জড়াইয়া যাইতে পারে, সেই কারণে দ্রুত উচ্চারণকালে কণ্ঠস্বর চড়া পর্দায় উঠিয়া নিম্নতর বহু শ্রুতিধ্বনিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। এইভাবে অনুরণন হ্রাস পায় বলিয়া দ্রুতলয়ের উচ্চারণে আমাদের কথা হয় স্পষ্ট, তীব্র ও কর্ণভেদী। অপরপক্ষে বিলম্বিত ও ধীরলয়ের উচ্চারণে প্রসারিত বিরতিগুলি ভরাট করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; সেক্ষেত্রে মূলধ্বনিকে ক্রমশঃ নিম্নপর্দায় নামাইতে হয়; তাহা হইলে শ্রুতিধ্বনিগুলির লয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না ও উহারা অনায়াসে শূন্যস্থান পূরণ করিতে পারে। অনুরণন বৃদ্ধির ফলেই বিলম্বিত ও ধীর উচ্চারণ হয় ক্রমশঃ গম্ভীর মন্দ্রিত ও তান প্রধান।

উচ্চারণ দ্রুততায় সুরভেদ

[তোতলা ব্যক্তির দ্রুত উচ্চারণে সেইজন্য তোতলামি-বৃদ্ধি এবং বিলম্বিত ও ধীর উচ্চারণে তোতলামি হ্রাস হইয়া থাকে। দ্রুত সুর-পরিবর্তনের ক্ষমতার অভাবই তোতলামির অন্যতম কারণ।]

§ ২২. দীর্ঘপর্বের ছন্দে গম্ভীর সুরের, হ্রস্বপর্বের ছন্দে তীব্র সুরের ও মধ্যপর্বের ছন্দে মাঝারি সুরের আগম হয়।

পর্ব দৈর্ঘ্যভেদে সুরভেদ

করণীয় কর্মে দীর্ঘতাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ ক্লান্তির আশঙ্কা ও সেইজন্য পূর্ব হইতে ক্রিয়ায় মন্থরভঙ্গি গ্রহণ মানুষ্যের স্বভাব-ধর্ম। দীর্ঘপর্বের ছন্দে তাই উচ্চারণের ধীর লয়ই গৃহীত হয়। ধীর লয়ের সহিত সুরের নিম্নতা বা গাম্ভীর্য বিজড়িত। তাই দীর্ঘপর্বের ছন্দে স্বাভাবিকভাবে গম্ভীর সুরেরই আগম হয়। যথা—

(ক) হায় অব্যক্ত বেদনা দেবী ঊর্মিলা | তুমি প্রত্যূষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরু-শিখরে একবার মাত্র উদিত হইয়াছিলে | তারপর অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না।

(খ) হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত।

এখানে সুর-গাম্ভীর্য লক্ষণীয়।

অপরপক্ষে করণীয় কার্যে হ্রস্বতাবোধের সহিত শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছাও মনস্তত্ত্ব-সঙ্গত। তাই হ্রস্বপর্বে চপল দ্রুতলয়ের ভঙ্গিই অবলম্বিত হয়। দ্রুতলয়ের সহিত সুর-তীব্রতা জড়িত বলিয়া হ্রস্বপর্বে ছন্দে তীব্র সুরের প্রকাশ ঘটে ; যথা—

(ক) তোমরা দৈর্ঘ্য—আমরা প্রস্থ | আমরা নিশ্চল—তোমরা চঞ্চল | আমরা ওজনে ভারি—তোমরা দামে চড়া।

(খ) মা তুই হতিস্ | নীল্ বরণী | আমি সবুজ্ | কাঁচা
তোর্ হতো মা | আলোর্ হাসি | আমার্ পাতার্ | নাচা।

এখানে সুর-তীব্রতা লক্ষণীয়।

আবার মধ্যতাবোধে আতিশয্য-ত্যাগই মনোধর্ম ; তাই মধ্য দৈর্ঘ্যের পর্বে বিলম্বিত লয়ে অনতিতীব্র অনতিগম্ভীর সুর ফুটিয়া উঠে ; যথা—

(ক) একটা নদী পার হয়েছি—এ আর একটা নদী—ভীষণ : কল্লোলিত : তরঙ্গসঙ্কুল !

(খ) আমরা দুজনে | করিয়াছি খেলা | কোটি প্রেমিকের | মাঝে
বিরহ বিধুর | নয়ন সলিলে | মিলন মধুর লাজে ॥

নিপাতন-স্থল

বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক লয়ের পরিবর্তন ও সুর-বিপর্যয় ঘটে।

ধ্বনির অপেক্ষা অর্থের শক্তি সাধারণতঃ অধিক। অর্থ তাই ধ্বনির ভাবকে কখন কখন দাবাইয়া রাখে। অর্থে চটুলতা থাকিলে দীর্ঘপর্বের ছন্দেও দ্রুতলয় আসে ও স্বাভাবিক গম্ভীর সুরের হানি ঘটে। যথা—

(১) চকমকি ঠোকাঠুকি | আগুনের প্রায়
চোখোচোখি ঘটিতেই | হাসি ঠিকরায়।

(২) পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে | কাৎলা মাছটিরে।

আবার অর্থ-গাম্ভীর্য থাকিলে হ্রস্বপর্বের ছন্দেও বিলম্বিত ও ধীর লয় আসিয়া যায় ও পর্বজাত স্বাভাবিক সুর-তীব্রতার হ্রাস হয়। ' যথা—

(১) (কেবল) আসার আশা | ভবে আসা | আসা মাত্র | হলো
(যেমন) চিত্রের প | দ্মেতে পড়ে | ভ্রমর ভুলে | র'লো।

(২) দিনের আলো | যার ফুরালো | সাঁঝের আলো | জ্বলো না
সেই বসেছে | ঘাটের কিনা | রায়।

অর্থের খাতিরে এই সকল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

§ ২৩. সুর ছন্দের পর্বোৎপন্ন ফল মাত্র, ছন্দ ইহার অধীন নহে এবং সুর ছন্দের কারণও নহে।

ছন্দই সুরের কারণ
সুর ছন্দের কারণ
নহে।

ছন্দের পক্ষে সুর আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ছন্দের পর্ব সুর-সাপেক্ষ নহে, সুরই পর্ব-সাপেক্ষ। চেষ্টাকৃত সুর-পরিবর্তনে ছন্দ পরিবর্তিত হইতে পারে না। আবৃত্তিকালে কবিতার ভাবের উদ্দীপনায় সুর পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মূল ছন্দের কোনই পরিবর্তন ঘটে না।

কোনো ছান্দসিক সুরকেই ছন্দের জাতিনির্ণায়ক মনে করিয়া লিখিয়াছেন—

"যত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না চেতন মানে

এবং—

বসি তরু পরে | কলরব করে | মরি মরি,আহা | মরি

এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক। কিন্তু প্রথমটি যে মাত্রা-বৃত্ত ঢঙে রচিত এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের ঢঙে রচিত, তাহা ঐ সুরের টান আছে কি না-আছে তাহা হইতে বুঝা যায়।"

কিন্তু উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটিরই পর্ব দৈর্ঘ্য ছয় মাত্রার। ছয় মাত্রার পর্বে মাঝারি সুরেরই আগম স্বাভাবিক, দীর্ঘ আট মাত্রার পর্বের গম্ভীর তান-প্রধান সুর স্বাভাবিকভাবে আসিতে পারে না। অবশ্য জবরদস্তি করিয়া সুর-বিপর্যয় ঘটানো যাইতে পারে; কিন্তু অস্বাভাবিক চেষ্টায় স্বাভাবিক ধর্ম অপ্রমাণিত হয় না। অস্বাভাবিক চেষ্টা ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য বস্তুগত, ব্যক্তিগত নহে। ছন্দের পাঠভঙ্গি স্বেচ্ছাচারের ব্যাপার হইলে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তর্গত হইত না। ছন্দের পাঠভঙ্গি ছন্দের পর্ব দৈর্ঘ্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমদীর্ঘ পর্বে সমান সুরেরই প্রকাশ ঘটে। উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টান্তেরই ছন্দ মাত্রাবৃত্ত এবং দুইটিরই সুর মধ্যম, অনতিতীব্র ও অনতিগম্ভীর।

পাঠ্য কবিতাকে চেষ্টাকৃত সুরে উচ্চারণ করা অনুচিত; তাহাতে সুরের অন্তরালে ছন্দ ছাপা পড়ে। পাঠ্য কবিতা ও গেয় কবিতা এক নহে; প্রথমটির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ছন্দ, দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য সুর। ছন্দ কাব্যভাষার অন্তর্নিহিত, গেয় সুর বাহির হইতে কাব্যভাষায় সংযোজিত। ছন্দের কৃতিত্ব কবির, সুরের কৃতিত্ব গায়কের।

জাতি

§ ২৪. ধ্বনির প্রকৃতিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধ্বনির জাতি বা গোত্র।

ধ্বনির জাতিভেদ বলিলে বিভিন্ন ধ্বনির মূলগত পার্থক্য বুঝায়। বাঁশী ও সেতারের ধ্বনিপার্থক্য, কাক ও কোকিলের ডাকের পার্থক্য, পত্রমর্মর ও জলকল্লোলের পার্থক্য—ইহারা ধ্বনির জাতিগত পার্থক্যের দৃষ্টান্ত। বহুজাতীয় ধ্বনি লইয়া মনুষ্যভাষা গঠিত। ভাষায় বহুজাতীয় ধ্বনি না থাকিলে বহুবিধ অর্থপ্রকাশ সম্ভব হইত না। বিভিন্ন জাতীয় ধ্বনিকে নানাভাবে গুচ্ছবদ্ধ করিয়া মানুষ সেই ধ্বনিগুচ্ছগুলিকে বিভিন্ন মনোভাবের প্রতীকরূপে ব্যবহার করে।

জাতির অর্থ

[কেহ কেহ ধ্বনির 'জাতি'কে বলিতে চান—"স্বরের রঙ"। কিন্তু "লাল গানে নীল সুরে"র মতো এই শব্দটি নিরর্থক। দৃষ্টিগ্রাহ্য রঙ্‌কে শ্রুতিজগতে প্রয়োগ করায় 'স্বরের রঙ' শব্দে দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও অসামঞ্জস্যই সৃষ্টি হয়।]

§ ২৫. স্বরযন্ত্রের ও মুখবিবরের বিভিন্নভঙ্গি হইতেই নানাজাতীয় কণ্ঠধ্বনির উৎপত্তি।

কণ্ঠধ্বনির উৎপত্তি মানুষের ইচ্ছাকৃত; সেইজন্য স্বরযন্ত্রের ও মুখবিবরের ভঙ্গিভেদও ইচ্ছাকৃত। বাঙ্গালীর কণ্ঠে সাধারণতঃ অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ভেদে ও অঘোষ-ঘোষ ভেদে কণ্ঠ্য, জিহ্বামূলীয়, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্তমূলীয়, ওষ্ঠ্য, ও নাসিক্য জাতীয় স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়।

ধ্বনিগত জাতিভেদের কারণ

[বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ ও প্রথম ও তৃতীয় বর্ণকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হইতেছে ঘোষ।]

ছন্দশাস্ত্রে বর্গের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের মাত্র সজাতীয়তা স্বীকৃত হয়, কিন্তু অঘোষ ও ঘোষ বর্ণের সজাতীয়তা স্বীকৃত হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে অল্পপ্রাণ ক-এর সহিত মহাপ্রাণ খ-এর মিলন হইতে পারে। যথা—

ধুলার বেগে | কাশিয়া মরে | লোক।
ধুলায় কেহ | মেলিতে নারে | চোখ॥
[অন্ত্য 'লোক' ও 'চোখ'এর মিলন সচল।]

কিন্তু অঘোষ 'ক'এর সহিত ঘোষ 'গ'এর মিলন হয় না ; যথা—

ধুলার বেগে | কাশিয়া মরে | লোক।
একের ভুলে | আরের ফল | ভোগ॥
['লোক' ও 'ভোগে'র মিল অচল।]

§ ২৬. মাধুর্য বা কার্কশ্য ধ্বনির জাতির উপর নির্ভর করে। এই মাধুর্য বা কার্কশ্যের সহিত ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই।

মুখের ভঙ্গিভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন ধ্বনিতে বিভিন্ন সংখ্যক আনুষঙ্গিক ধ্বনি অনুরণিত হয়। এই অনুরণিত ধ্বনিগুলির সামঞ্জস্যের উপরেই ধ্বনির মধুরতা নির্ভর করে। ইহাদের অসামঞ্জস্য ঘটিলেই ধ্বনিকে কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। ত, ল, ম, ন প্রভৃতি ধ্বনি সাধারণতঃ মিস্ট এবং গ, ড, ব, দ প্রভৃতি ধ্বনি সাধারণতঃ সেই তুলনায় কর্কশ।

মধুর ও কর্কশ ধ্বনি

মাধুর্য বা কার্কশ্য ধ্বনিগত ; অপর পক্ষে ছন্দ ধ্বনির প্রবাহগত, ধ্বনিগত নহে। ধ্বনির মাধুর্য 'রম্যতার'ই অন্তর্গত, সৌন্দর্যের অন্তর্গত নহে। অপর পক্ষে ছন্দ সৌন্দর্যেরই অন্তর্গত, রম্যতাগত নহে।

§ ২৭. একই জাতীয় ধ্বনির দ্বারা ছন্দের অলংকরণের কাজ হয়। সজাতীয় ধ্বনি পর্বস্থ অক্ষরের গুরুত্ব বিধানে, পর্বের স্বাতন্ত্র্য সাধনে ও চরণের ঐক্যবন্ধনে সহায়তা করে।

সজাতীয় ধ্বনির প্রয়োজনীয়তা

একই জাতীয় ধ্বনির পারিভাষিক নাম অনুপ্রাস।

শব্দের আদ্য, মধ্য বা অন্ত্য অনুপ্রাস ধ্বনির গুরুত্ব বিধান করে ; যথা—

(১) অপমানে এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। (আদ্য অনুপ্রাস)

(২) বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারী বাবু কলম ধরিয়াছেন। (মধ্য অনুপ্রাস)

(৩) পাঁকে হাতী পড়িলে ভেকেও লাথি পারে। (অন্ত্য অনুপ্রাস)

দ্বিতীয়তঃ পর্বান্তিক অনুপ্রাস পর্বস্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট করে, যথা—

(১) বিশীর্ণা হস্রাকারা তটিনীকে—দেশমার্জিনী—অনন্ত দেহধারিণী—অনন্ত তরঙ্গিনী—জলরাক্ষসী করিব।

(২) শলাকাবিদ্ধ | হতেছে সিদ্ধ | মন্ত্রনিষিদ্ধ | পক্ষী

এই পর্বান্তিক অনুপ্রাস না থাকিলে পদ্যছন্দের চরণে পর্বসীমা নির্ণয় করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহুক্ষেত্রে কষ্টকর হইয়া উঠে ; যথা—

মাথা তুলে তুমি যবে চলো নিজ রথে।
তাকাও না কোথা আমি ফিরি পথে পথে ॥

এই দৃষ্টান্তের চরণে কোথায় মধ্য যতিপ্রয়োগ লেখকের অভিপ্রেত, তাহা স্থির করা কঠিন ; কারণ চরণমধ্যে কোথাও পর্বসীমা নির্দেশক চিহ্ন, ফাঁক বা অনুপ্রাস নাই। বাংলা ছন্দশাস্ত্র অনুসারে দৃষ্টান্তটিকে তিন ভাবে পর্ব-বিভক্ত করা চলে :—

(১) মাথা তুলে | তুমি যবে | চলো নিজ | রথে।
তাকাও না | কোথা আমি | ফিরি পথে | পথে ॥

(২) মাথা তুলে তুমি | যবে চলো নিজ | রথে।
তাকাও না কোথা | আমি ফিরি পথে | পথে ॥

(৩) মাথা তুলে তুমি যবে | চলো নিজ রথে।
তাকাও না কোথা আমি | ফিরি পথে পথে ॥

তৃতীয়তঃ চরণান্তিক হইলে অনুপ্রাস পদ্যস্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণের ঐক্য ও সম্মিতি বিধান করে। পদ্যছন্দের সম্মিতি যে কেবল পর্বে পর্বে নহে, চরণে চরণেও বর্তমান, তাহা অনুপ্রাসবদ্ধ চরণসমূহ দেখিয়া বুঝা যায়; যথা—

নিষ্প্রভ আঁখি | নিখিলে নিরখে | কালি,
মনরে আমার | সাজা তুই বৈ | কালী।
সন্ধ্যামণির | ডালি ॥

এখানে 'আলি' অনুপ্রাস উল্লিখিত তিনটি চরণের ঐক্য ও সম্মিতি বিধান করিয়াছে। পদ্য চরণগুলিকে মিলিত করে বলিয়াই অন্ত্যানুপ্রাসের অন্য নাম 'মিল'।

§ ২৮. গদ্যের অনুপ্রাস ও পদ্যের অনুপ্রাসে ভেদ আছে। গদ্যের অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা এবং পদ্যের অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির সমতা প্রাধান্য লাভ করে।

গদ্যে ও পদ্যে অনুপ্রাস ভেদ

স্বরসাম্যহীন কেবল ব্যঞ্জনধ্বনির সাম্য পদ্যের অনুপ্রাসরূপে গণ্য হয় না, ইহা কেবল গদ্যেই অনুপ্রাসরূপে স্বীকৃত হয়, যথা—কা-কি-কু-কে, ইহারা পদ্য চরণের মিল নহে। আবার ব্যঞ্জন-সাম্যহীন স্বর-সাম্য গদ্যে অনুপ্রাসরূপে গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু ইহা পদ্যের অন্ত্যানুপ্রাস হইতে পারে। যথা—

(১) (সখি) হের দেখসিয়া | বা
নিন্দ যায় ধনী | ও চাঁদবদনী | শ্যাম-অঙ্গে দিয়া | পা

—এখানে 'বা' ও 'পা' অন্ত্যানুপ্রাস।

(২) বারে বারে হায় | এসে ফিরে যায় | কে?
(তারে) আমার মাথার | একটি কুসুম | দে।

—এখানে 'কে' ও 'দে' অন্ত্যানুপ্রাস।

পদ্যে স্বর-প্রাধান্য এতই বেশী যে সমব্যঞ্জন অন্ত্যস্বরের মিলও

এখানে উৎকৃষ্ট মিল বলিয়া গণ্য হয় না। তেলে-জলে, দেখা-রাখা, তটিনী-তরুণী, 'পা'দুটি-পদ্মটি, ইহারা পদ্যের উৎকৃষ্ট অন্ত্যানুপ্রাস নহে; অন্তে সমব্যঞ্জনযুক্ত শব্দের অন্ত্য স্বরে ও উপান্ত স্বরে উভয়ত্র সমতা থাকিলে তবেই উহা উৎকৃষ্ট অন্ত্যানুপ্রাস বলিয়া গণ্য হয়; যথা—প্রাতে-হাতে, কান্ত-শান্ত, ক্রন্দন-বন্ধন, পরিচারিকা-অভি-সারিকা ইত্যাদি। যেমন—

(১) সঘ**ন** বরষা | গগ**ন** আঁধার
হের **বারি ধারে** | কাঁদে **চারি ধার**।

(২) বোলে চালে গেল **দিবা** | **বিভা**বরী ঘুমে।

§ ২৯. পদ্যের অনুপ্রাস শব্দ-বিকৃতি ঘটাইলে উহাকে বলা হয় 'দুষ্ট অনুপ্রাস'।

দুষ্ট অনুপ্রাস

(১) স্বরধ্বনির অনুপ্রাসে শব্দের বিকৃতি সাধনের দৃষ্টান্ত :—

তোমার কে মা | বুঝবে **লীলে**
কি নিলে কি | ফিরিয়ে দিলে ?

—'লীলা' শব্দ 'লীলে' পরিণত।

(২) ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাসে শব্দের বিকৃতি সাধনের দৃষ্টান্ত :—

নব নব **ক্ষুধা** | নূতন **তৃষ্টা** নিত্য নূতন | কর্মনিষ্ঠা
জীবনগ্রন্থে | নূতন পৃষ্ঠা | উলটিয়া যাব | ত্বরিতে।

—'তৃষ্ণা' শব্দ 'তৃষ্টা'য় পরিণত।

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙ্গালীর উচ্চারণ ও বাংলা ছন্দের জাতিভেদ

১

ধ্বনি, উচ্চারণ ও উচ্চারণভঙ্গি

§ ১. কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনি অবিমিশ্র একক নহে; মাত্রা, শক্তি ও সুর অবলম্বনেই ইহা প্রকাশিত হয়। ছন্দোগ্রন্থে তাই ধ্বনি বলিতে বুঝায় উচ্চার্য শুদ্ধ মূলধ্বনি। উচ্চারণ বলিতে বুঝায় বিশেষ মাত্রায় শক্তিতে ও সুরে মূলধ্বনির প্রকাশ এবং উচ্চারণভঙ্গি বলিতে বুঝায় মূলধ্বনির আনুষঙ্গিক মাত্রা, শক্তি ও সুর।

মূলধ্বনি মোটামুটি সকল ভাষায় সমপ্রকার কিন্তু ভাষাভেদে জাতীয় উচ্চারণভঙ্গি ও উচ্চারণ পৃথক পৃথক।

উচ্চারণভঙ্গি

বৈদিক ভাষার বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি সুর। ইংরেজি ভাষার উচ্চারণভঙ্গি বিশেষ বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত। প্রদেশভেদে মানুষ বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গিতে অভ্যস্ত; সেইজন্য এক ভাষার উচ্চারণভঙ্গিতে অন্য ভাষার উচ্চারণ অস্বাভাবিক ও হাস্যকর বলিয়া বোধ হয়।

জাতীয় উচ্চারণভঙ্গির সহিত পরিচিত না হইলে ছন্দের উপলব্ধি ঠিকমতো হয় না। কানে না শুনিয়া উচ্চারণভঙ্গি জানা সহজ নহে। শব্দের লিখিত রূপ হইতে মূলধ্বনিমাত্র জানা যায়, উচ্চারণ জানা যায় না। ছন্দশাস্ত্রে শক্তি বা গুরুত্ব বুঝাইতে মোটা হরফ ব্যবহার করা হয়, শ্বাসাঘাত বুঝাইতে বর্ণের উপর দীর্ঘ রেফ (⁄) ব্যবহৃত হয় এবং দীর্ঘত্ব বুঝাইতে বর্ণের উপর শায়িত দণ্ড (—) প্রযুক্ত হয়। সুর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া সুরজ্ঞাপক

চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। বৈদিক ভাষায় উদাত্তাদি স্বর বুঝাইতে বিশেষ বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার আছে।

§ ২. উচ্চারণের দিক দিয়া শব্দ দ্বিবিধ, মূল শব্দ ও উচ্চারিত শব্দ।

মূল শব্দ ও উচ্চারিত শব্দ

আদর্শ শব্দই মূল শব্দ। উচ্চারিত শব্দ হইতেছে জাতীয় উচ্চারণভঙ্গিযুক্ত বাস্তব শব্দ। মূল শব্দ অসম্পূর্ণ, উচ্চারিত শব্দই সম্পূর্ণ। কিন্তু মূল শব্দ অবিকৃত, উচ্চারিত শব্দ অল্পবিস্তর বিকৃত। উচ্চারিত শব্দে প্রকৃতিগত ও আকৃতিগত উভয়বিধ পরিবর্তন ঘটে। মূল শব্দ 'কবি', 'যজ্ঞ', 'বৃক্ষ' ও 'পদ্ম' বাঙ্গালীর কণ্ঠে 'কোবি', 'জগ্‌গঁ', 'ব্রিখ্য' ও 'পদ্দ'' রূপে পরিবর্তিত হয়; ইহা প্রকৃতিগত পরিবর্তন। প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসলে ভাষাতত্ত্বের বিষয়, ছন্দ-শাস্ত্রের নহে। আকৃতিগত পরিবর্তনই ছন্দ-শাস্ত্রের আলোচ্য। জাতির উচ্চারণ-ভঙ্গির উপর শব্দের আকৃতি-পরিবর্তন নির্ভর করে। বাঙ্গালীর উচ্চারণে কখন কখন মূল শব্দের 'দৈর্ঘ্য' পরিবর্তন হয়। বহু ক্ষেত্রে শব্দ লিপির মধ্যে তাহার উচ্চারিত রূপকে সঙ্কুচিত করিয়া লুকাইয়া থাকে এবং উচ্চারণে অঙ্গবিস্তার করিয়া স্বরূপে দেখা দেয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়েকটি মূল শব্দ লিপিতে দীর্ঘাকারে থাকে কিন্তু উচ্চারণে পরস্পর সংযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্গসংকোচন করে। উচ্চারিত শব্দের এই প্রকার আকৃতি পরিবর্তনই ছন্দ-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। উচ্চারণে মূল শব্দেই যথার্থ পরিবর্তন ঘটে। সেইজন্য মূল শব্দই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শক্তি, স্বর প্রভৃতি উচ্চারণভঙ্গি মূল শব্দেই প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া উচ্চারিত শব্দ লিখিত হয় না, লিখিত শব্দমাত্রই মূল শব্দ।

§ ৩. বাংলায় মূল শব্দের আদ্যক্ষর সবলভাবে ও অন্যান্য অক্ষর অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে উচ্চারিত হয়।

আদ্যক্ষরে সবলতা বহু শব্দের রূপপরিবর্তনের জন্য দায়ী।

শব্দের আদ্যক্ষরে সবলতা

আদ্যক্ষরের সবলতার জন্য বহু শব্দের মধ্য বা অন্ত্য অক্ষর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া শেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যথা—ভ্রাতৃজায়া>ভাজ, গাত্র>গা, শাবক>ছা, চল্>চ ইত্যাদি।

প্রবল শক্তি বা শ্বাসাঘাত যে উচ্চারণকালে মূল শব্দের দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কিত তাহার আভাস উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে পাওয়া যায়।

§ ৪. সাধারণতঃ বাংলায় অ-কারান্ত মূল শব্দের অন্ত্যস্বর (অর্থাৎ অ-কার) উচ্চারণে লুপ্ত হয়; ফলে শব্দ হসন্ত হইয়া যায়।

বাঙ্গালী কেবল শব্দের আদ্যক্ষরে বলপ্রয়োগ করে, তাহার অন্ত্যাক্ষর দুর্বল, সেইজন্য অ-কারান্ত শব্দের অ-ধ্বনি লুপ্ত হয়।

অ-কারান্ত শব্দে হসন্ত উচ্চারণ

'রাম', 'হাত', 'সলিল', 'অরুণ'—মূল শব্দ হিসাবে অ-কারান্তই বটে, কিন্তু উচ্চারণে 'রাম্', 'হাৎ', 'সলিল্', 'অরুণ্' মূর্তি ধারণ করে। বর্ণান্তে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করিয়া এই হসন্ত উচ্চারণ বুঝানো হয় না, শব্দান্তর্গত অবস্থান দেখিয়াই বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ বুঝিতে হয়; যথা—'জগন্নাথ' শব্দের উচ্চারণ 'জগন্নাথ্', কখনোই 'জগন্নাথ্-অ' নহে।

অ-ব্যতীত অন্য স্বর শব্দান্তে থাকিলে উচ্চারণে স্বর বিলোপ হয় না, অর্থাৎ মূল শব্দ হসন্ত হইয়া যায় না; 'হাতি' 'হাৎ' হয় না, 'তনু' 'তন্' হয় না।

নিপাতন স্থল*

নিম্নলিখিত বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে অ-কারান্ত মূল শব্দ উচ্চারণে হসন্ত হয় না, অ-কারান্তই থাকে।

---

* নিপাতনের দৃষ্টান্তগুলি ডঃ সুনীতিকুমারের 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' হইতে গৃহীত।

(ক) দেশীয় শব্দে—

১। সর্বনামজাত ও অপর কয়েকটি বিশেষণে—এত, যত, তত, কত, হেন, ভাল, বড়, ছোট, কাল, মত ইত্যাদি।

২। সংখ্যাবাচক 'এগার' হইতে 'আঠার' পর্যন্ত শব্দে।

৩। কয়েকটি দ্বিরুক্ত ও অনুকার শব্দে—মরমর, কাঁদ-কাঁদ কলকল ইত্যাদি।

৪। 'আন' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াজাত বিশেষ্যে—বেড়ান, করান, কাঁদান ইত্যাদি।

৫। কালবাচক 'ইল' 'ইব'' ইত' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ায়—করিল, খাইব, যাইত প্রভৃতি।

(খ) সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে—

১। শব্দান্তে যুগ্মব্যঞ্জন থাকিলে—চন্দ্র, সূর্য, অন্ধ প্রভৃতি।

২। বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' থাকিলে—স্নেহ, বিবাহ, অনুগ্রহ ইত্যাদি।

৩। বিশেষণের অন্তে 'ঢ' 'য়' থাকিলে—দৃঢ়, মূঢ়, সুপেয়, বিধেয় ইত্যাদি।

৪। 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণে—বিগত, রক্ষিত, নিশ্চিত ইত্যাদি।

৫। 'তর' 'তম' যুক্ত বিশেষণে—গুরুতর, লঘুতম ইত্যাদি।

৬। সমাসের পূর্বপদে—ধন-কুবের, জল-কণা প্রভৃতি।

৭। কথোপকথনে অব্যবহৃত কয়েকটি শব্দে—মম, তব, তৃণ, বৃষ, মৃগ ইত্যাদি।

§ ৫. বঙ্গীয় উচ্চারণে মূল হসন্ত শব্দের অন্ত্যস্বর এবং হসন্তভাবে উচ্চারিত শব্দের অন্ত্যস্বর উভয়ই দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইয়া যায়।

হসন্ত শব্দে অন্ত্যস্বর বৃদ্ধি

বণিক্, মহৎ, সরিৎ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শব্দ মূল হসন্ত শব্দের দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত ভাষায় ইহারা যথাক্রমে ba-nik, ma-hat, sa-rit, bidyut রূপেই উচ্চারিত হয়; কিন্তু বঙ্গীয় উচ্চারণে ইহাদের অন্ত্যস্বরের দীর্ঘতা ঘটে, ইহারা যথাক্রমে baniik, mahaat, sariit ও

bidyuut হইয়া যায়, অর্থাৎ ইহাদের অন্ত্য একাক্ষর উচ্চারণে দুই অক্ষরে পর্যবসিত হয়।

সেইরূপ পবন, সলিল, অরুণ, ফল—ইহারা মূলে হসন্ত নহে, অ-কারান্ত শব্দই বটে ; কিন্তু বঙ্গীয় উচ্চারণে হসন্ত হইয়া যায় এবং হসন্তভাবে উচ্চারিত শব্দ বলিয়া ইহাদেরও অন্ত্যস্বর উচ্চারণে দীর্ঘ হইয়া যায়। বঙ্গীয় উচ্চারণে পবন paban নহে—pabaan, সলিল salil নহে—saliil, অরুণ arun নহে—aruun, ফল phal নহে—phaal।

শব্দ-প্রসারণে হলন্ত অক্ষরের বলহানি হয় (৪।১১ সূত্র) ; এখানে বলহানির জন্য অন্ত্যাক্ষরে এই দীর্ঘতা সাধন হইয়া থাকে।

নিপাতন স্থল—

অন্তে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলে শব্দ হলন্ত হয় বটে কিন্তু এই হলন্ত শব্দ বঙ্গীয় রীতিতে নহে, সংস্কৃত রীতিতেই উচ্চারিত হয়। সেইজন্য অনুস্বারান্ত বা বিসর্গান্ত শব্দের উচ্চারণে অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি ঘটে না ; যথা—তেজঃ (tejah), হবিঃ (habih), স্বয়ং (swayam)।

বিঃ দ্রঃ—হলন্ত শব্দ একাক্ষর হইলে, উহাকে অন্ত্যাক্ষর রূপে গণ্য করা হয়, সেইজন্য উহারও উচ্চারণে স্বরবৃদ্ধি ঘটে ; যথা—দিক্, (diik), জল্ (jaal) ইত্যাদি।

§ ৬. বঙ্গীয় উচ্চারণে মূল শব্দের আদ্য বা মধ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে, হলন্ত হইলেও আদ্য বা মধ্য অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ঘটে না।

আদ্য ও মধ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্যের অ-পরিবর্তন

মূল শব্দের আদ্যক্ষরে শক্তি প্রদান করা বঙ্গীয় রীতি বলিয়া আদিতে অক্ষরের লঘূকরণ বা স্বরবৃদ্ধির কথা উঠে না। শব্দ-মধ্যে হলন্ত অক্ষর থাকিলে উচ্চারণ-কালে উহার সামান্য একটু শক্তিহ্রাস হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে অক্ষর দুর্বল হয় না বা উহার স্বরবৃদ্ধি হয় না ;

একমাত্র শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরেরই লঘূকরণ বা স্বরবৃদ্ধি ঘটে। যথা—

এমন দিনে মন্দিরের সৌন্দর্য দেখিতে হয়।

ইহার উচ্চারণ :—æmaan dine mandireer saundarja dekhite haay।

—দৃষ্টান্তে 'এমন' ও 'মন্দির' উভয় শব্দেই 'মন্' আছে বটে, কিন্তু অবস্থান পৃথক বলিয়া দুই 'মন্'এর উচ্চারণ পৃথক। 'এমন' শব্দের 'মন্' শব্দান্তিক, সেইজন্য উহাতে স্বরবৃদ্ধি ; কিন্তু 'মন্দিরে'র 'মন্' শব্দাদ্য, সেইজন্য উহা অপরিবর্তিত। সেইরূপ 'সৌন্দর্য' শব্দের 'সৌন্' ও 'দর্' যথাক্রমে আদ্য ও মধ্য অক্ষর বলিয়া ইহাদের উচ্চারণে স্বরবৃদ্ধি নাই। অপরপক্ষে 'এমন' 'মন্দিরের' ও 'হয়' শব্দের 'মন্' 'রের্' ও 'হয়' শব্দান্তিক বলিয়া ইহাদের স্বরবৃদ্ধি হইয়াছে।

§ ৭. সাধারণতঃ বাংলা বাক্-পর্বের উচ্চারণে পর্বাদ্যে মৃদু শ্বাসাঘাত পড়ে, শব্দোচ্চারণের অন্যান্য বিধির পরিবর্তন ঘটে না।

পর্বের প্রতি শব্দাদ্যে নহে, পর্বাদ্যেই শ্বাসাঘাত

'শব্দোচ্চারণের অন্যান্য বিধি' অর্থে—অ-কারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ ও শব্দান্তিক হসন্ত অক্ষরের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ। পর্বান্তর্গত শব্দগুলির আদিতে যে একেবারে গুরুত্ব থাকে না, তাহা নহে ; তবে পর্বাদ্যের শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী। পর্বাদ্যের শক্তি গুরুতর বলিয়া উহার দ্বারা পর্বান্তর্গত শব্দগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। যথা—

আমাদের সঙ্গে | আরো অনেক যাত্রী | মন্দিরের মধ্যে | প্রবেশ করিল।

—এই দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পর্বে তিনটি ও অন্যান্য পর্বে দুইটি করিয়া শব্দ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রতি পর্বের প্রথম শব্দের প্রথমাক্ষরই শ্বাসাহত, অন্যান্য শব্দের আদ্যক্ষরে ঈষৎ গুরুত্ব থাকিলেও শ্বাসাঘাত নাই।

২

বাংলা ছন্দে জাতিভেদ

§ ৮. ছন্দের জাতি বলিতে বুঝায়—ছন্দো রচনায় প্রচলিত নিয়মানুগ জাতীয় উচ্চারণভঙ্গি। ব্যক্তিগত, স্বাধীন ও বিশেষ প্রকার ভঙ্গিকে বলা হয় ঢঙ্।

ছন্দে জাতি, ঢঙ ও শ্রেণী

বাংলা ছন্দে যে একাধিক প্রকার উচ্চারণভঙ্গি প্রচলিত আছে তাহা ব্যক্তিগত খেয়াল হইতে উদ্ভূত নহে বা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; এইজন্য বাংলা ছন্দে ঢঙের ভেদ নহে, জাতিভেদই বর্তমান।

জাতিভেদকে শ্রেণীভেদ বলা চলে না। শ্রেণীভেদ শাখাগত, জাতিভেদ মূলগত। যে ভাষায় একটি বিশেষ প্রকার উচ্চারণভঙ্গিতে সর্ববিধ ছন্দপর্ব উচ্চারিত হয়, সেখানে ছন্দের জাতিভেদ থাকে না কিন্তু শাখাভেদ থাকিতে পারে। পর্বের প্যাটার্ণ বা অলংকরণভেদে যে রূপভেদ হয়, তাহাই ছন্দের শাখাভেদ বা শ্রেণীভেদ; যথা, ইংরেজি iambus, trochee, anapaest ইত্যাদি। ছন্দচরণে পর্ব-সংখ্যার ভেদেও একপ্রকার শ্রেণীভেদ হইতে পারে; যথা—ইংরেজি tetrameter, pentameter প্রভৃতি। কিন্তু জাতিভেদ হইতেছে একেবারে গোড়াকার ভেদ। বাংলা ছন্দে বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের পদ্যপর্বে বিশেষ বিশেষ উচ্চারণভঙ্গির আগম হয় বলিয়া বাংলা ছন্দে জাতিভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—একাধিক স্বতন্ত্র রীতি একই ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? ইহার উত্তরে বলা চলে—একই সময়ে একই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষর ছন্দ ও মাত্রা ছন্দ নামক দুই পৃথক উচ্চারণ পদ্ধতির ভিন্নজাতীয় ছন্দ প্রচলিত ছিল, ইহা

ঐতিহাসিক সত্য। আবার বর্তমানে একই বাংলা ভাষায় একাধিক উচ্চারণ-রীতি অবলম্বনে বিভিন্ন পর্বের ছন্দ গঠিত হয়—ইহাও বাস্তব সত্য। কাজেই বাংলা পদ্যছন্দে জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য নহে।

§ ৯. বাংলা ছন্দের জাতি, অর্থাৎ উচ্চারণভঙ্গি ত্রিবিধ—'সাধারণ', 'দুর্বল' ও 'প্রবল'। সাধারণভঙ্গি গদ্য পদ্য উভয়ত্র এবং অন্য দুইটি ভঙ্গি কেবল পদ্যে প্রযুক্ত হয়।

ত্রিবিধ জাতি-বৈশিষ্ট্য

ত্রিবিধ ছন্দে তিনপ্রকারে পর্বস্থ শব্দের বিভিন্ন হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব বিপর্যয় হয়।

(ক) 'সাধারণ' উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ইহাতে শব্দের কেবল অন্ত্য হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব হ্রাস হয় এবং আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব অব্যাহত থাকে (গুরুত্ব হ্রাসের চিহ্ন স্বরবৃদ্ধি)। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'অস্তোন্মুখ' শব্দটিকে লইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে 'অস্-তোন্-মুখ্' এই তিনটি হলন্ত অক্ষর বর্তমান। 'সাধারণ' উচ্চারণভঙ্গিতে শব্দটির কেবল অন্ত্য হলন্ত অক্ষর 'মুখ'এর স্বরবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ উচ্চারণ হয়—astonmuukh (চারটি স্বরে চার অক্ষর লক্ষণীয়)। এই উচ্চারণ নিম্নলিখিত প্রথম গদ্যচরণে এবং দ্বিতীয় পদ্য চরণে দ্রষ্টব্য :—

(১) (গদ্য) বৎস, সাগরতীরে 'অস্তোন্মুখ' সূর্য দর্শন কর।

(২) (পদ্য) হের রবি 'অস্তোন্মুখ' | সাগরের তীরে।

(খ) 'দুর্বল' উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট হইতেছে—ইহাতে শব্দের আদ্য, মধ্য, অন্ত্য সকল হলন্ত অক্ষরেরই গুরুত্ব হ্রাস করা হয় (স্বর বৃদ্ধির দ্বারা গুরুত্ব হ্রাস)। এই ভঙ্গিতে উল্লিখিত 'অস্তোন্মুখ' শব্দের উচ্চারণ হয়—aastoonmuukh (ছয়টি স্বরে ছয় অক্ষর লক্ষণীয়)। এই উচ্চারণ নিম্নের পদ্যচরণে দ্রষ্টব্য :—

(পদ্য) কর দরশন | সাগরের তীরে | 'অস্তোন্মুখ' | রবি

(গ) 'প্রবল' উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাতে পর্বাদ্যে গুরুত্ব বৃদ্ধি হয় এবং শব্দের আদ্য, মধ্য, অন্ত্য সকল হলন্ত অক্ষরেরই গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ভঙ্গিতে উক্ত 'অস্তোন্মুখ' শব্দের উচ্চারণ হয়—astonmukh (তিনটি স্বরে তিন অক্ষর লক্ষণীয়)। এই উচ্চারণ নিম্নের পদ্যচরণে দ্রষ্টব্য :—

(পদ্য) ঐ যে দেখো | সাগর্‌তীরে | 'অস্তোন্মুখ' | রবি

§ ১০. বাংলা গদ্যছন্দে জাতিভেদ নাই, ইহা সাধারণ ছন্দ—'সাধারণ' উচ্চারণভঙ্গিতেই রচিত ও উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অক্ষরছন্দ।

গদ্যে অক্ষর ছন্দ

'সাধারণ' ভঙ্গিবৈশিষ্ট্য ৯ম সূত্রে দ্রষ্টব্য।

গদ্যছন্দের উচ্চারণভঙ্গি বিশেষত্ব বর্জিত, সুতরাং নামও তদনুযায়ী বিশেষত্বহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু অক্ষরই সর্ববিধ ছন্দের সাধারণ উপাদান, সেই হেতু 'অক্ষরছন্দ' নামই ইহার উপযোগী। এই ছন্দের দৃষ্টান্ত :—

আমি যখন মন্দ্রগম্ভীর গর্জন করি—বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া মৃদুগম্ভীর গর্জন করি—তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দসুন্দরীশীর্ষে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্বত-গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। (নিম্নরেখ অক্ষরে স্বরবৃদ্ধি দ্রষ্টব্য)

§ ১১. **পর্ব-দৈর্ঘ্যের উপরেই বাংলা পদ্যছন্দের জাতি নির্ভর করে।** পর্ব দৈর্ঘ্যভেদই পদ্যছন্দে জাতিভেদ বা উচ্চারণভঙ্গি ভেদের কারণ।

পদ্যপর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাতমাত্রার হইলে ছন্দ হয় দুর্বল, ইহা দুর্বল ভঙ্গিতে রচিত ও উচ্চারিত হয়।

পদ্যছন্দে পর্ব দৈর্ঘ্য-ভেদে জাতিভেদ

পদ্যপর্বের দৈর্ঘ্য সাড়ে চারমাত্রার হইলে ছন্দ হয় প্রবল, ইহা প্রবলভঙ্গিতে রচিত ও উচ্চারিত হয়।

[সাড়ে চারিমাত্রার অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮ সূত্রে ব্যাখ্যাত]

পদ্যপর্বের দৈর্ঘ্য আট বা দশমাত্রার হইলে ছন্দ হয় সাধারণ, ইহা সাধারণভঙ্গিতে রচিত ও উচ্চারিত হয়।

দুর্বল, প্রবল ও সাধারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এই অধ্যায়ের ৯ম সূত্রে দ্রষ্টব্য।

দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ—

(ক) (সখি) বিছাসনে | শিলাতলে | পদ্ম পা | তা
দিসনে গো | লাব-ছিটে | খাস্ লো মা | থা

—৪ মাত্রার পর্ব

(খ) খসিয়া পড়া | আঁচলখানি | বক্ষে তুলি | নিল
আপন পানে | নেহারি চেয়ে | সরমে শিহ | রিল।

—৫ মাত্রার পর্ব

(গ) কালো দীঘি জলে | গাহন করিতে | নেমেছে গাছের | ছায়া
নিদ্রিত মাঠে | নির্জন ঘাটে | জাগিছে এ-কার | মায়া ?

—৬ মাত্রার পর্ব

(ঘ) জীবনে যত পূজা | হল না সারা
জানিহে জানি তা-ও | হয়নি হারা।

—৭ মাত্রার পর্ব

প্রবল প্রকৃতির ছন্দ—

মা তুই্ হতিস্ | নীল্ বরণী | আমি সবুজ্ | কাঁচা
তোর্ হতো মা | আলোর্ হাসি | আমার্ পাতার্ | নাচা

—৪৷৷০ মাত্রার পর্ব

সাধারণ প্রকৃতির ছন্দ—

(ক) কাঁপিবে না ক্লান্ত কর | ভাঙ্গিবে না কণ্ঠস্বর | টুটিবে না বীণা
নবীন প্রভাত লাগি | দীর্ঘ রাত্রি রবো জাগি | দীপ নিভিবে না

—৮ মাত্রার পর্ব

(খ) ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক | অধরেতে সুপ্ত অভিমান
বাহুলতা চন্দনের শাখা | বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।

—১০ মাত্রার পর্ব

[বাংলা পদ্যছন্দের উচ্চারণভঙ্গি যে পর্ব দৈর্ঘ্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করে, ইহা লক্ষ্য না করায় কোন ছন্দ-শাস্ত্রী ছন্দপাঠভঙ্গিকে ভিত্তিহীন ও পাঠকের ইচ্ছা-নির্ভর ঢঙ্‌ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ফলে ছন্দের জাতিভেদকে অস্বীকার না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার ধারণা হইয়াছে—"মাত্রাসংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গিতে বা ঢঙে একই কবিতা পড়া যায়" এবং "একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঢঙ্‌ থাকিতে পারে।" কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যক্তিগত হয় না, বস্তুগতই হইয়া থাকে। ছন্দ-পাঠভঙ্গিকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া প্রচার করিলে ছন্দ-শাস্ত্র রচনাই ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ জাতীয় উচ্চারণের ভিত্তিতে কোন ছন্দ কিভাবে পাঠ্য তাহা বুঝাইবার জন্যই ছন্দ-শাস্ত্রের উৎপত্তি। দুর্বল, প্রবল ও সাধারণ উচ্চারণভঙ্গি ব্যক্তিগত হইলে নিয়মের মধ্যে আসিত না এবং সকলক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইত না। অবশ্য জবরদস্তি করিয়া কোন কবিতা বা উহার অংশবিশেষ বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গিতে পড়া যায়, কিন্তু তাহাতে অস্বাভাবিক অবাঙ্গালী উচ্চারণই প্রকাশ পায় এবং অস্বাভাবিকতা মাত্রই হাস্যকর। পদ্যের স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গি ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নহে, নির্দিষ্ট পর্বদৈর্ঘ্যের উপরেই নির্ভর করে।

পদ্য-ছন্দের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর জাতিভেদপন্থীরাও বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গিকে উপেক্ষা করেন। ইঁহাদের ধারণা—কোন বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি কোন বিশেষ জাতীয় ছন্দের কারণও নহে, কার্যও নহে, একটা অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ফল অর্থাৎ ঢঙ্‌ মাত্র। এই মতে—'সরল কলা' (=মাত্রা), 'ব্যষ্টি' বা 'জটিল কলা' (?) এবং 'দল' (=অক্ষর), এই ত্রিজাতীয় মানদণ্ডে বিভিন্নপ্রকার পদ্যছন্দের চরণ মাপা যায় বলিয়াই বাংলা পদ্যছন্দ ত্রিজাতীয়। কিন্তু ইঁহাদের কল্পিত বিভিন্ন জাতীয় মানদণ্ডে বস্তুবিশেষকে মাপিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। রেখাদৈর্ঘ্যের পরিমাপে 'স্কেল'ই প্রয়োজন—বাটখারা, 'মেজার গ্লাস' বা 'থার্মোমিটার' নহে। ছন্দ-শাস্ত্রে তেমনি ধ্বনি-প্রবাহের পরিমাপে একমাত্র মানদণ্ড হইতেছে অক্ষর বা 'সিলেব্‌ল'। এই অক্ষরের দৈর্ঘ্যের নামই 'মাত্রা' (৪।২ সূত্র)। সেই জন্য ধ্বনি-পরিমাপক মানদণ্ড হিসাবে 'সরল কলা', 'ব্যষ্টি' বা 'জটিল
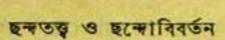
কলা'র কোন অর্থ নাই এবং এইভাবে জাতিভেদ স্বীকারেরও কোন যুক্তি নাই।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা পদ্যছন্দের ত্রিধাবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি ইহার তিন জাতির পরিবর্তে বলিয়াছেন 'তিনটি শাখা'। "বাংলা ছন্দে তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম শাখাকে অবলম্বন করে। সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্‌গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।"* এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট প্রথম শাখাটি হইতেছে সাধারণভঙ্গির ছন্দ, দ্বিতীয় শাখাটি হইতেছে প্রবলভঙ্গির ছন্দ এবং তৃতীয় শাখাটি হইতেছে দুর্বলভঙ্গির ছন্দ। তবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তানুযায়ী ইহাদিগকে একান্তভাবে সাধু বাংলা, কথ্য বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব ছন্দ বলা চলে না; রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা হইতেই তাহার প্রমাণ দেওয়া যায় (৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বাংলা ছন্দের বিভাগ ভাষাভিত্তিক নহে।

কবি মোহিতলালের ধারণা—বাংলা ছন্দ দ্বিজাতীয়; ধ্বনির দুইপ্রকার-গতিভঙ্গিই ছন্দে জাতিভেদের কারণ। বাংলা ছন্দ দ্বিবিধ গতির ধ্বনিতরঙ্গে গঠিত হয়; একটির নাম 'পর্ব', অপরটির নাম 'পদ'। পর্বের গতিভঙ্গি অশান্ত, পদের গতিভঙ্গি প্রশান্ত; পর্বে পর্বে থাকে পুনরাবর্তনে প্রবৃত্তি, পদে পদে থাকে পুনরাবর্তনে নিবৃত্তি। এই কারণে বাংলা ছন্দ দুই জাতীয়—পর্বভূমক ও পদভূমক। মোহিতলাল দুর্বল ও প্রবল প্রকৃতির ছন্দকে পর্বভূমক ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং পদভূমক ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন সাধারণ প্রকৃতির ছন্দকে। এই মতবাদে মোহিতলালের প্রধান ত্রুটি তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপর্বকেই 'পদ' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং দীর্ঘপর্বান্তিক দীর্ঘযতিকে ভাবিয়াছেন পূর্ণ বিরতি ও দীর্ঘপর্বের গতিমন্থরতাকে ভাবিয়াছেন গতিনিবৃত্তি। এই ত্রুটিকে উপেক্ষা করিলেও

---

* পৃঃ ২৩৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪শ খণ্ড)

কিন্তু মোহিতলালের থিয়োরিকে সমর্থন করা যায় না; কারণ তাঁহার মতে ধ্বনির গতিভঙ্গি রসিকজনের উপভোগ্য রসের ব্যাপার মাত্র। রসের ভিত্তিতে ছন্দের বৈজ্ঞানিক জাতিবিভাগ হইতে পারে না।]

§ ১২. বাংলায় দুর্বল প্রকৃতির পদ্যছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত, প্রবল প্রকৃতির পদ্যছন্দের নাম বলবৃত্ত এবং সাধারণ প্রকৃতির পদ্যছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত।

দৃষ্টান্ত পূর্বসূত্রে দ্রষ্টব্য।

মাত্রাবৃত্ত, বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত নামের সার্থকতা

পদ্যচরণে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যযুক্ত থর্বের বারবার আবর্তন ঘটে বলিয়া পদ্যের অপর নাম বৃত্ত অর্থাৎ আবর্তিত। 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'অক্ষরবৃত্ত' নাম নূতন নহে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই দুইটি নাম সুপ্রচলিত। 'বলবৃত্ত' নাম নূতন, কিন্তু ইহা ছন্দ-প্রকৃতির পরিচায়ক।

কেহ কেহ কয়েকটি নূতন নাম প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্বল প্রকৃতির ছন্দের বহু প্রচলিত 'মাত্রাবৃত্ত' নামের পরিবর্তে 'ধ্বনি-প্রধান', 'বিস্তার-প্রধান', 'মান-প্রধান', 'স্থিরমাত্র' ও 'সরল কলামাত্রিক' নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। প্রবল প্রকৃতির ছন্দ বুঝাইতে 'বলবৃত্ত' নামের পরিবর্তে 'শ্বাসাঘাত-প্রধান,' 'তাল প্রধান', 'ছড়ার ছন্দ', 'অস্থিরমাত্র-প্রসারক', 'স্বরবৃত্ত' ও 'দলমাত্রিক' নাম প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সাধারণ প্রকৃতির ছন্দের সুপ্রচলিত 'অক্ষর বৃত্ত' নামের পরিবর্তে 'তাল-প্রধান' 'মিশ্র প্রাকৃতিক', 'অস্থিরমাত্র-সঙ্কোচক', 'যৌগিক' এবং 'বিশিষ্ট কলা মাত্রিক' নাম প্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে।

বিচার করিলে দেখা যায়, প্রস্তাবিত নামগুলির মধ্যে 'প্রধানাত্মিক' (ধ্বনি-প্রধান, তান-প্রধান ইত্যাদি) নামগুলি ছন্দের আনুষঙ্গিক উপধর্মই প্রকাশ করে, ছন্দের প্রকৃতির পরিচয় দেয় না। যথা 'তান' (সুর) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন অতিরিক্ত একটা ফল

মাত্র; এই কারণে প্রধানান্তিক শব্দগুলি নাম হিসাবে অযোগ্য। অপরপক্ষে মাত্রা-শব্দাশ্রিত (স্থিরমাত্র, অস্থিরমাত্র প্রভৃতি), 'মাত্রিক'-যুক্ত (কলা মাত্রিক, দল মাত্রিক প্রভৃতি) এবং 'স্বরবৃত্ত' নাম ছন্দের কাল্পনিক মান-দণ্ডকে ভিত্তি করিয়া গঠিত। এই গুলিও ছন্দ-প্রকৃতি প্রকাশ করে না, বরং মানদণ্ড সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচার করে। অস্থির ধর্মী হইলে কোন বস্তুই মানদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, সেইজন্য 'অস্থিরমাত্র' শব্দও ছন্দের নামে অ-ব্যবহার্য। উচ্চার্য ধ্বনির একমাত্র মানদণ্ড হইতেছে অক্ষর এবং অক্ষরের দৈর্ঘ্য হইতেছে মাত্রা—এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া 'কলা'কে মানদণ্ড কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক। মানদণ্ড হিসাবে 'সরলকলা'ও 'বিশিষ্ট কলা'র কোন অর্থ নাই, সেইজন্য 'সরল কলা-মাত্রিক' ও 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক' শব্দ নিরর্থক, অক্ষরবৃত্তছন্দ গদ্যে ব্যবহৃত সাধারণ উচ্চারণভঙ্গিরই ছন্দ, ইহা যে দুই বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন তাহার কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহাকে 'জটিল', 'মিশ্র' বা 'যৌগিক' বলার কোন সার্থকতা নাই। তাছাড়া 'ছড়ার ছন্দ' নাম ছন্দের পরিচয় না দিয়া অবলম্ব্য বিষয়েরই পরিচয় দেয়; ইহা যে কেবল ছড়াকেই অবলম্বন করে, তাহাও ঠিক নয়। সুতরাং প্রস্তাবিত নামগুলি যথার্থ নাম হইবার অনুপযোগী।

অবশ্য এ-কথা সত্য যে বর্তমান গ্রন্থে গৃহীত 'অক্ষরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' নামও যথার্থভাবে ছন্দ-প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে না; তথাপি ভুলিলে চলিবে না যে মোটামুটি ছন্দোলক্ষণ অনুসারে এই দুইটি নাম সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দ-শাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং বহুকালের ব্যবহারে 'রূঢ়ি' শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে। অর্থের খাতিরে প্রচলিত রূঢ়ি-শব্দের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে; হাত নাই, শুঁড় আছে, এই জন্য হাতীকে হাতী না বলিয়া শুঁড়ী বলা চলে না। বাংলা প্রবল ভঙ্গির ছন্দের পূর্বপ্রচলিত কোন নাম নাই, দ্বিতীয়তঃ

'বলবৃত্ত' নাম ঐ ছন্দের প্রকৃতিসূচক ; সেইজন্য নূতন হইলেও উহা গ্রহনীয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তাঁহার "ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে" শ্বাসাঘাত বুঝাইতে 'বল' শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন।

২

জাতি নির্ণয়

§ ১৩. অধিক-সংখ্যক অক্ষরে রচিত 'দীর্ঘ' আকৃতির পর্ব হইতেই পদ্যছন্দের আদর্শ পর্ব-দৈর্ঘ্য ও জাতি নির্ণয় হইতে পারে। পর্বের এই দীর্ঘতা আকারগত মাত্র, উচ্চারণগত নহে।

জাতি-নির্ণয়ের উপায়

পর্ব-সম্মিতি পদ্যের প্রাণ। অন্ত্যপর্ব বাদে ইহার অন্যান্য পর্ব 'উচ্চারণে' সমদীর্ঘই হইয়া থাকে। পর্বগুলির কোন কোনটি কিন্তু 'আকারে' হ্রস্ব হইয়া রচিত হয় এবং বিশেষ ভঙ্গির উচ্চারণে দীর্ঘ হইয়া উঠে ; ইহারা হইতেছে জটিল পর্ব। অপর কতকগুলি পর্ব আকারে ও উচ্চারণে সমান দীর্ঘ থাকে ; এইগুলি হইতেছে সরল অর্থাৎ আদর্শ পর্ব। অসংকুচিত সরল পর্বই ছন্দের কষ্টিপাথর। আকারগত দীর্ঘতা দেখিয়া এই সরলপর্ব চেনা যায়। ধরিতে হইবে—যে পর্বে অপেক্ষাকৃত অধিক অক্ষর বর্তমান, তাহাই সরল ও অসংকুচিত দীর্ঘ পর্ব, তাহার অক্ষর সংখ্যা হইতেই ছন্দের প্রকৃত পর্বমাত্রা অনুমান করিতে হইবে ; যথা—

(১) তনুভরি | যৌবন্ | তাপসী অ | পর্ণা। = ৪ + ২ + ৪ + ২ অক্ষর
ঝর্ণা ॥ = ০ + ০ + ০ + ২ ,,

(২) মন্ত্রী কহে, | আমারো মনে | ছিল। = ৪ + ৫ + ২ ,,
কেমনে বেটা | পেরেছে সেটা | জান্‌তে ॥ = ৬ + ৫ + ২ ,,

(৩) ফাঁসীর্ মঞ্চে | গেয়ে গেল যারা |
জীবনের্ জয়্ | গান্। =৪ + ৬ + ৪ + ১ অক্ষর
আসি অলক্ষ্যে | দাঁড়ায়েছে তারা |
দিবে কোন্ বলি | দান্॥ =৫ + ৬ + ৫ + ১ „

(৪) আই্ আই | ঐ বুড়া কি |
এই্ গৌরীর্ | বর্ লো। =২ + ৪ + ৩ + ২ „
বিয়ার্ বেলা | এয়োর্ মাঝে |
হৈল দিগ | ম্বর লো॥ =৪ + ৪ + ৪ + ২ „

এই চারিটি দৃষ্টান্তের প্রতিটিতেই অসমসংখ্যক অক্ষরের পর্ব দিয়া চরণ গঠিত। তন্মধ্যে নিম্নরেখ পর্বগুলিই 'দীর্ঘ', অন্যান্য পর্ব 'হ্রস্ব'। জাতি-অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে উচ্চারণ করিলে পর্বগুলির এই হ্রস্ব-দীর্ঘতা থাকিবে না, সমদীর্ঘতা আসিবে এবং তখনই প্রতি দৃষ্টান্তে পর্ব-সম্মিতি বুঝা যাইবে। দীর্ঘ আকারের পর্ব হইতে ছন্দের জাতি ও জাতি হইতে উচ্চারণের নিয়ম জানা যায়। এই দীর্ঘ বা হ্রস্ব আকারের পর্ব যথার্থ উচ্চারিত পর্ব নহে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে 'মূল পর্ব' মাত্র।

[জাতি অনুযায়ী উচ্চারণ সত্ত্বেও পর্বে পর্বে সমদীর্ঘতা না ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে ছন্দোরচনায় ত্রুটি আছে।]

§ ১৪. যে-সকল পদ্যছন্দের 'দীর্ঘ' মূল পর্বগুলি—

(i) কেবল স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত,

(ii) চার, পাঁচ, ছয় অথবা সাত অক্ষর বিশিষ্ট,

বুঝিতে হইবে যে—

(i) ইহারা 'দুর্বল ভঙ্গি'তে উচ্চার্য 'মাত্রাবৃত্ত' জাতীয় ছন্দ,

(ii) ইহাদের হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র হ্রস্ব পর্বগুলি 'বিশেষ পর্ব' বা জটিল পর্ব,

(iii) উচ্চারিত অবস্থায় ইহাদের পর্বদৈর্ঘ্য যথাক্রমে চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রা।

[পর্ব বলিতে পূর্ণপর্বই বুঝিতে হইবে ; দুর্বল ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নবম সূত্রে দ্রষ্টব্য।]

মাত্রাবৃত্ত চিনিবার উপায় — পর্ব-দৈর্ঘ্যানুযায়ী মাত্রাবৃত্ত ছন্দ চতুর্বিধ—চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে—

(১) সঙ্কেত | শঙ্কিতা | বন-বীথি | কায়   ২ + ৩ + ৪ + ১ অক্ষর
কুলবধূ | ছিঁড়ে শাড়ি | কুলের কাঁ | টায়   ৪ + ৪ + ৩ + ১ ,,

—এই দৃষ্টান্তে নিম্নরেখ পর্বগুলিই 'দীর্ঘ' পর্ব, ইহারা স্বরান্ত অক্ষরে রচিত এবং চতুরক্ষর পর্ব। কাজেই ইহা দুর্বল ভঙ্গির 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ। হলন্ত-অক্ষরমিশ্র তিন বা দুই অক্ষরের হ্রস্ব পর্বগুলি ইহার 'বিশেষ পর্ব' মাত্র। মাত্রাবৃত্তের দুর্বল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে সাধারণ ও বিশেষ সকল পর্বই চতুর্মাত্রিক হইবে। যথা—

saankeet | saankitā | bana bithi | kāāy

অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

(২) নিরাবরণ | বক্ষে তব | নিরাভরণ | দেহে।   ৪ + ৪ + ৪ + ২ অক্ষর
চিকন সোনা | লিখন উষা | আঁকিয়া দিল | স্নেহে ॥
৪ + ৪ + ৫ + ২ ,,

—এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্বটি দীর্ঘ পর্ব, ইহা স্বরান্ত অক্ষরেই রচিত এবং পঞ্চাক্ষর পর্ব। অতএব ইহা 'দুর্বল ভঙ্গি'র 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ। হলন্ত-অক্ষর-যুক্ত চার অক্ষরের অন্যান্য পর্ব হইতেছে বিশেষ পর্ব। এইগুলি আপাত দৃষ্টিতে হ্রস্ব বা চতুরক্ষর হইলেও মাত্রাবৃত্তের দুর্বল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে পঞ্চমাত্রিক হইয়া যাইবে। যথা—

nirā baraan | baakkhe taba | nirā bharaan | dehe

অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

(৩) তপতী কুমারী | মরু আজ চাহে | প্রথম পায়ের | ধূলি।
অজানা নদীর | উৎস ডাকিছে | আধেক ঘোমটা | খুলি॥

—এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্ব ছয় অক্ষরের পর্ব অর্থাৎ দীর্ঘ পর্ব এবং ইহা স্বরান্ত অক্ষরে রচিত। কাজেই ইহা ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র অন্যান্য পর্ব হ্রস্ব; কোনটি পঞ্চাক্ষর (যথা—ম-রু-আজ্-চা-হে বা উৎ-স-ডা-কি-ছে) কোনটি বা চতুরক্ষর (যথা—প্র-থম্-পা-য়ের্ বা আ-ধেক্-ঘোম্-টা); ইহারা বিশেষ পর্বমাত্র। মাত্রাবৃত্তের দুর্বল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিলে ইহারা সকলেই ষণ্মাত্রিক হইয়া উঠিবে। যথা—

ta pati kumāri | maru āāj chāhe | prathaam pāyeer | dhuli

অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তটি ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

(৪) ও মুখে হাসি তা-ও | হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কি গো | ফিরাতে মধুমাস?

—এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্ব দুইটি সাত অক্ষরের পর্ব এবং দীর্ঘ পর্ব, তাছাড়া ইহারা স্বরান্ত অক্ষরে রচিত। অতএব ইহা সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। অন্য দুইটি পর্ব হ্রস্ব অর্থাৎ ছয় অক্ষরের (হ-বে-যে-উ-প-হাস্ এবং ফি-রা-তে-ম-ধু-মাস্), সুতরাং বিশেষ পর্ব। মাত্রাবৃত্তোচিত দুর্বল উচ্চারণে ইহারা হইবে সপ্তমাত্রিক। যথা—

o mukhe hāsi tāo | habeje upahāās

অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিস্তারিত আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

§ ১৫. যে সকল পদ্যছন্দে 'দীর্ঘ' মূল পর্ব—

(i) স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরে রচিত,

(ii) চতুরক্ষর পর্ব,

বুঝিতে হইবে যে—

(i) ইহারা 'প্রবলভঙ্গি'তে শ্বাসাঘাতের সাহায্যে উচ্চার্য 'বলবৃত্ত'-জাতীয় ছন্দ,

(ii) কেবল স্বরান্ত অক্ষরে অথবা কেবল হলন্ত অক্ষরে রচিত পর্ব ইহাদের 'বিশেষ পর্ব' বা জটিল পর্ব,

(iii) উচ্চারিত অবস্থায় ইহাদের পর্ব-দৈর্ঘ্য সাড়ে চার মাত্রা।

[প্রবলভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নবম সূত্রে দ্রষ্টব্য]

বলবৃত্ত চিনিবার উপায় যথা—

বাপ্ বল্‌লেন্ | কঠিন্ হেসে | তোমরা মায়ে | ঝিয়ে
এক লগ্নেই | বিয়ে কোরো | আমার্ মরার্ | পরে

—এই দৃষ্টান্তে নিম্নরেখ পর্বগুলি 'দীর্ঘ' ও 'চতুরক্ষর' পর্ব (ক-ঠিন্-হে-সে অথবা তোম্-রা-মা-য়ে ইত্যাদি)। তাছাড়া এ-গুলি স্বরান্ত ও হলন্ত উভয় প্রকার অক্ষরেই গঠিত। সুতরাং ইহা বলবৃত্ত-জাতীয় ছন্দ। অন্যান্য পর্ব তিনটি 'বিশেষ পর্ব' মাত্র, কারণ 'বাপ্-বল্-লেন' এবং 'এক্-লগ্-নেই' এই দুইটি তিন অক্ষরের হ্রস্ব পর্ব এবং তৃতীয়টি 'বিয়ে কোরো' চতুরক্ষর হইলেও কেবল স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত। বলবৃত্ত-জাতীয় 'প্রবলভঙ্গি'র শ্বাসাঘাতযুক্ত উচ্চারণে ইহাদের সকলেরই দৈর্ঘ্য হইবে সাড়ে চার মাত্রা। যথা—

bap-bal-len | ka-ṭhin-he-se | tom-ra-mā-ye | jhi-ye

শ্বাসাঘাতের মূল্য অর্ধমাত্রা বলিয়া শ্বাসাহত চতুরক্ষর পর্বের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার মাত্রা। ত্র্যক্ষর পর্বের তিনটি অক্ষরই শ্বাসাহত; প্রতিটির দৈর্ঘ্য দেড় মাত্রা (৪।১৮ সূত্র)। কিন্তু—

নূতন জাগা | কুঞ্জ বনে | কুহরি উঠে | পিক,
বসন্তের | চুম্বনেতে | বিবশ দশ | দিক।

—ইহার প্রথম চরণের প্রথম দুই মূল পর্বে চারটি করিয়া অক্ষর

আছে এবং ইহারাও কেবল স্বরান্ত বা হলন্ত অক্ষরে রচিত নহে, উভয়বিধ অক্ষরে রচিত; তথাপি এই ছন্দ বলবৃত্ত-জাতীয় নহে, কারণ এইগুলি দীর্ঘপর্ব নহে; চরণের তৃতীয় পর্বই (কুহরি উঠে) 'দীর্ঘ'—পাঁচ অক্ষরের পর্ব। সুতরাং ইহা পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। ইহাতে শ্বাসাঘাত আসিতে পারে না। ইহার উচ্চারণ—

nutaan jāgā | kuunja bane | kuhari uṭhe | piik

কিংবা—

ফিরে ফিরে | আঁখি নীরে | পিছু পানে | চায়।
পায়ে পায়ে | বাধা পড়ে | চলা হলো | দায়॥

—ইহার পর্বগুলি চতুরক্ষর; সেই হিসাবে ইহাকে শ্বাসাঘাতে উচ্চার্য বলবৃত্ত ছন্দ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা বলবৃত্ত ছন্দ নহে। ইহার কোন পর্বই হলন্ত-অক্ষরমিশ্রিত চতুরক্ষর নহে, প্রতিপর্বই কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত। সেইজন্য ইহাতে শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা আসলে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত, ইহার উচ্চারণ—

phire phire | ānkhi nire | pichhu pāne | chāāy

অষ্টম অধ্যায়ে বলবৃত্ত ছন্দের বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

§ ১৬. যে সকল পদ্যছন্দে 'দীর্ঘ' মূল পর্ব—

(i) স্বরান্ত অক্ষরে রচিত

(ii) অষ্টাক্ষর বা দশাক্ষর পর্ব

বুঝিতে হইবে যে—

(i) ইহারা 'সাধারণ ভঙ্গি'তে উচ্চার্য 'অক্ষরবৃত্ত' জাতীয় ছন্দ,

(ii) ইহাদের হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র হ্রস্ব পর্বগুলি 'বিশেষ পর্ব' বা 'জটিল পর্ব' এবং—

(iii) উচ্চারিত পর্বের দৈর্ঘ্য ইহাতে আটমাত্রা বা দশমাত্রা।

[সাধারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নবম স্থত্রে দ্রষ্টব্য]

অক্ষরবৃত্ত চিনিবার উপায়

যথা—

(১) ওপারের কালো কূলে | কালি ঘনাইয়া তুলে |
নিশার কালিমা।
গাঢ় সে তিমির তলে | চক্ষু কোথা ডুবে চলে |
নাহি পায় সীমা ॥

—এই দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্বই 'দীর্ঘপর্ব' এবং স্বরান্ত অক্ষরে রচিত অষ্টাক্ষর পর্ব (কা-লি-ঘ-না-ই-য়া-তু-লে)। স্নুতরাং ইহা সাধারণ উচ্চারণভঙ্গিতে উচ্চার্য অক্ষরবৃত্ত। অন্যান্য পর্ব হয় হ্রস্ব (ও-পা-রের কা-লো-কূ-লে = ৭ অক্ষর), নাহয় হলন্ত-অক্ষরমিশ্র (চক্-খু-কো-থা-ডু-বে-চ-লে), অতএব 'বিশেষ পর্ব'। অক্ষরবৃত্তের সাধারণ উচ্চারণ-ভঙ্গিতে পর্বগুলির দৈর্ঘ্য হইবে অষ্টমাত্রিক। যথা—

o pāreer kālo kule | kāli ghanāiyā tule | nisāār kālimā

(২) শুনেছে সে মা এসেছে ঘরে
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।
মার মায়া পায় নি কখন
মা কেমন দেখিতে এসেছে ॥

—এই দৃষ্টান্তের প্রথম পর্বটিই স্বরান্ত অক্ষরে রচিত দীর্ঘতম দশাক্ষর পর্ব। স্নুতরাং ইহাও সাধারণ ভঙ্গিতে উচ্চার্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। দ্বিতীয় চরণের পর্বটিও দশাক্ষর বটে কিন্তু তন্মধ্যে হলন্ত অক্ষর ('বিশ্বে'র বিশ্ ও 'আনন্দে'র নন্) মিশ্রিত রহিয়াছে সেইজন্য বিশেষ পর্ব। তাছাড়া 'মার্-মা-য়া-পায়্-নি-ক-খন্' সাত অক্ষরের এবং 'মা-কে-মন্-দে-খি-তে-এ-সে-ছে' নয় অক্ষরের হ্রস্ব পর্ব, তাই বিশেষ পর্বই বটে। অক্ষরবৃত্তের সাধারণ ভঙ্গির উচ্চারণে ইহাদের সকলেরই দশমাত্রিক দৈর্ঘ্য হইবে—

sunechhe se mā esechhe ghare
tāi biswa ānande bhesechhe

māār māyā pāāy ni ka khaan
mā kemaan dekhite esechhe

নবম অধ্যায়ে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

§ ১৭. পদ্য-চরণে জটিল পর্বের বাহুল্য থাকিলে একাধিক চরণে আদর্শ পর্বের সন্ধান আবশ্যক হয়।

জাতি-নির্দেশক আদর্শ পর্বের সন্ধান

সকল স্বাভাবিক কবিতায় যতই জটিল পর্ব থাকুক না কেন, সরল পর্ব থাকিবেই ; কারণ কেবল জটিল পর্বে সমস্ত চরণ রচনা সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা নহে। সরল পর্বের চরণকে অলংকৃত করিবার প্রয়োজনে জটিল পর্বের প্রবর্তন হইয়াছে, জটিল পর্বের চরণকে অলংকৃত করিতে সরল পর্ব প্রবর্তিত হয় নাই। জটিল পর্ব বিশেষ পর্ব মাত্র, সাধারণ পর্ব নহে ; সেইজন্য অল্প কিছু দূর সন্ধান করিলেই সরল অর্থাৎ আদর্শ 'দীর্ঘ' পর্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

(১) স্বচ্ছ হাসি | শরৎ আসে | পূর্ণিমা মা | লিকা
সকল বন | আকুল করে | শুভ্র শেফা | লিকা
আসিল শীত | সঙ্গে লয়ে | দীর্ঘ দুখ | নিশা
শিশির কণা | কুন্দ ফুলে | হাসিয়া কাঁদে | দিশা

—ইহার চতুর্থ চরণের তৃতীয় পর্ব (হাসিয়া কাঁদে) হইতেছে জাতি-নির্দেশক আদর্শ দীর্ঘ পর্ব। ইহা হইতে বুঝা যায়—দৃষ্টান্তটির ছন্দ পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত।

(২) পউষ প্রখর | শীতে জর্জর | ঝিল্লী মুখর | রাতি
নিদ্রিত পুরী | নির্জন ঘর | নির্বাণ দীপ | বাতি
অকাতর দেহে | আছিনু মগন | সুখ নিদ্রার | ঘোরে
তপ্ত শয্যা | প্রিয়ার মতন | সোহাগে ঘিরেছে | মোরে।

—ইহার চতুর্থ চরণের তৃতীয় পর্ব (সোহাগে ঘিরেছে) হইতেছে

আদর্শ দীর্ঘ পর্ব। ইহা হইতে বুঝা যায়—দৃষ্টান্তটির ছন্দ ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুইটিতে বলবৃত্ত ভ্রান্তির আশঙ্কা আছে।

§ ১৮. বাংলায় ছন্দচরণকে পর্ব-বিভক্ত করিতে (ক) মাত্রাবৃত্তের চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রা, (খ) বলবৃত্তের সাড়ে চারমাত্রা এবং (গ) অক্ষরবৃত্তের আট বা দশমাত্রা—একমাত্র এই সকল দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডগুলি প্রযোজ্য। [সরল দীর্ঘ পর্বেই মানদণ্ড প্রাপ্তব্য।]

আদর্শ পর্বে ছন্দোবিভাজন

মানদণ্ড নির্বাচনে ভুল হইলে তদ্দ্বারা কবিতার সকল চরণের পর্ব-বিভাগ সম্ভব হয় না, কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আসিয়া যায়; যথা—

ঐ আসে ঐ অতিভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥

মনে হইতে পারে, মাত্রাবৃত্তের চার মাত্রাই এই দৃষ্টান্তের পরিমাপক মানদণ্ড। এই মানদণ্ড প্রয়োগে দৃষ্টান্তটির ছন্দোবিভাজন হইবে নিম্নপ্রকার ঃ—

ঐ আসে | ঐ অতি | ভৈরব | হরষে
জল সিন্ | চিত ক্ষিতি | সৌরভ | রভসে
ঘন গৌ | রবে নব | যৌবনা | বরষা
শ্যাম গম্ | ভীর সর | সা

গুরু গর্‌ | জনে নীল | অরণ্য | শিহরে
উতলা ক | লাপী কেকা | কলরবে | বিহরে
নিখিল চি |......

এইখানেই থামিতে হয়, আর বিভাজন সম্ভব নহে, 'নিখিল চিত্তে'র 'চি'তেই আটকাইয়া যায়, কারণ 'চিত্তে'র (চিৎ+ত) প্রথমাক্ষর 'চিৎ'কে পর্বভুক্ত করিয়া 'নিখিল চিৎ' করিলে মাত্রাবৃত্তের নিয়মে উহা আর চতুর্মাত্রিক পর্ব থাকে না, দীর্ঘতর পর্বে পরিণত হয়। সেইজন্য চতুর্মাত্রিক পর্ব এখানে মানদণ্ড হইতে পারে না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ষণ্মাত্রিক পর্বই ['উতলা কলাপী' এবং 'কেকা কলরবে'] ইহার আদর্শ পর্ব ও মানদণ্ড। এই মানদণ্ডে ভাগ করিলে দৃষ্টান্তটি হইবে নিম্নরূপ—

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরবে | হরষে
জল সিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে
ঘন গৌরবে | নব যৌবনা | বরষা
শ্যাম গম্ভীর | সরসা।
গুরু গর্জনে | নীল অরণ্য | শিহরে
উতলা কলাপী | কেকা কলরবে | বিহরে
নিখিল চিত্ত | হরষা
ঘন গৌরবে | আসিছে মত্ত | বরষা ॥

এইভাবেই সমগ্র কবিতাটি ভাগ করা যায়। অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্ত জাতীয় ষণ্মাত্রিক পর্বের ছন্দ।

§ ১৯. ষণ্মাত্রিক এবং পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত কেবল জটিল বিশেষ-প্রকার পর্বে রচিত হইলে ছদ্মবেশী বৃত্তে পরিণত হইতে পারে, তখন উহারা মাত্রাবৃত্ত ও বলবৃত্ত উভয়ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়। সেইজন্য এই দ্বিবিধ ছদ্মবেশী বৃত্তকে 'উভচর' ছন্দও বলা চলে।

ছদ্মবেশী বৃত্ত রচনা কলানৈপুণ্য প্রকাশের বাসনাজাত বিশেষ

ছদ্মবেশী বৃত্ত বা উভচর ছন্দ

ও অসাধারণ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছদ্মবেশী বৃত্ত রচনায় বিস্ময়কর চাতুর্য দেখাইয়াছেন। বাংলায় দ্বিবিধ ছদ্মবেশী বৃত্তের প্রয়োগ আছে :—

(ক) ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে প্রতি পর্বে দুইটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগে উদ্ভূত ছদ্মবেশী বৃত্ত :—

হঠাৎ তখন্ | সূর্য ডোবার্ | কালে
দীপ্তি জাগায়্ | দিক্ ললনার্ | ভালে
মেঘ্ ছেঁড়ে তার্ | পর্দা আঁধার্ | কালো
কখন্ সে পায় | স্বর্গলোকের্ | আলো
পরম্ আশার্ | চরম্ প্রদীপ্ | জ্বালে ॥

—সুসময়, রবীন্দ্রনাথ

(খ) পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে প্রতি পর্বে একটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগে উদ্ভূত ছদ্মবেশী বৃত্ত :—

সিন্ধু তুমি | বন্দনীয় | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী
দীপ্ত তুমি | মুক্ত তুমি | তোমায়্ মোরা | প্রণাম্ করি
অপার্ তুমি | নিবিড়্ তুমি | অগাধ্ তুমি | পরাণ্ প্রিয়
গহন্ তুমি | গভীর্ তুমি | সিন্ধু তুমি | বন্দনীয়।

—সমুদ্রাষ্টক, সত্যেন্দ্রনাথ

এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই একদিকে বলবৃত্ত লক্ষণ অপরদিকে মাত্রাবৃত্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, ফলে দুইটিকেই যেমন শ্বাসাঘাত দিয়া প্রবল ভঙ্গিতে, তেমনি শ্বাসাঘাত না-দিয়া দুর্বলভঙ্গিতে পাঠ করা চলে। বলবৃত্তরূপে ইহাদের পর্ব সরল ও সাধারণ কিন্তু মাত্রাবৃত্তে রূপে ইহাদের পর্ব জটিল বা বিশেষ পর্ব।

সংস্কৃতযুগীয় কারুকার্যে মণ্ডিত হওয়ায় ছদ্মবেশী বৃত্ত বঙ্গসাহিত্যে অনন্যসাধারণ। প্রতি পর্বের নির্দিষ্ট স্থানে গুরু অক্ষর প্রয়োগ প্রধানতঃ সংস্কৃত যুগেরই রচনারীতি ; এই রীতি ক্লাসিক কবিতার উপযোগী, কিন্তু রোমান্টিক কবিতায় কতকটা কৃত্রিম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গদ্যছন্দ

§ ১. 'সঙ্গতিযুক্ত' গদ্য বাক্‌পর্বের ধ্বনি-সৌন্দর্যই গদ্যছন্দ। অলংকার বা ধ্বনি-লালিত্য ছন্দ নহে।

গদ্যছন্দের অর্থ ; অলংকার বা ধ্বনি-লালিত্য গদ্যছন্দ নহে

গদ্যছন্দ হইতেছে 'গদ্যের ছন্দ', সাম্প্রতিক 'গদ্য কবিতা'র রচনা রীতি নহে। 'গদ্য কবিতা'র রচনারীতির রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত[১] সঙ্গত নাম 'গদ্যিকা'। উহার পরিচয় বিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ বুঝাইতে 'ছন্দস্পন্দ' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু ছন্দের অর্থই—ভাষাধ্বনির তরঙ্গায়িত স্পন্দন। নিঃস্পন্দ বস্তুতে সৌষ্ঠব থাকিতে পারে, ছন্দ থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে 'ছন্দস্পন্দ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—'স্পন্দনের স্পন্দন', সুতরাং ছন্দস্পন্দ শব্দ অব্যবহার্য।

গদ্যছন্দ গদ্যের অলংকার নহে। অলংকার হইতেছে ভাষার অর্থ-সৌন্দর্য। ছন্দ মাত্রই অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনিসৌন্দর্য। অর্থ-সৌন্দর্যের ভোক্তা মন, কিন্তু ধ্বনিসৌন্দর্যের ভোক্তা কান। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে অলংকার বা অর্থ-সৌন্দর্য থাকিলেও ছন্দ নাই :—

(১) জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে লইয়া গেল।

(২) কৃত্তিবাসের সাধনা রামায়ণী কথাকে সংস্কৃতের জটাপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছে।

গদ্যে ব্যবহৃত শব্দালংকারও গদ্যছন্দ নহে। যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ অথবা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দে মণ্ডিত করিলেই গদ্যছন্দ দেখা

১। পৃঃ ২৬৫ রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪)

দেয় না। অলংকার মাত্রই সৌন্দর্য-বর্ধক, সৌন্দর্য-কারক নহে। অলংকার শ্রীমণ্ডিত করে খণ্ডকে, সমগ্রকে নহে। নিম্ন দৃষ্টান্তে শব্দালংকার থাকিলেও ছন্দ নাই ;—

(১) তোমার **তালিকাটি মালিকা** হইয়া উঠিয়াছে।

(২) পাখীরা **স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির** মধ্যে আত্ম-**সমর্পণ** করিল।

[মোটা হরফের ধ্বনিতে শব্দালংকার দ্রষ্টব্য।]

গদ্যের ধ্বনি-লালিত্যও গদ্যছন্দ নহে। ধ্বনির কোমলতা বা মিষ্টতা 'রম্যতা'রই অন্তর্গত এবং রম্যতা সৌন্দর্য নহে (২৮ পৃষ্ঠা)। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে ধ্বনি-লালিত্য থাকিলেও ছন্দ নাই ঃ—

(১) ফাগুনেও আগুন-হওয়া দখিন হাওয়া শিলহানা বৃষ্টির পিচকারি মেরে হোলি খেলে গেল।

(২) তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনের বাদলা হাওয়ায় স্বপনের মতো ভেসে বেড়াতে লাগল।

গদ্যছন্দ সম্মিতি-হীন, পদ্যের ন্যায় ইহার পর্ব বা চরণ বারবার আবর্তিত হয় না ; সেইজন্য ইহার নামে 'অক্ষর বৃত্ত' প্রভৃতির ন্যায় 'বৃত্ত' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

§ ২. চরণের পর্ব-বহুত্বই গদ্যছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

"সৌন্দর্য অঙ্গগত বহুত্ব-সাপেক্ষ" (৩৫ পৃষ্ঠা)—সৌন্দর্যতত্ত্বের এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। পদ্যে বা গদ্যে চরণে বহু পর্ব না থাকিলে ছন্দোবোধ সুকঠিন। পূর্বোক্ত—

গদ্যছন্দে পর্ববহুত্ব

জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে লইয়া গেল।

অথবা—

তোমার তালিকাটি মালিকা হইয়া উঠিয়াছে।

এই দৃষ্টান্ত দুইটি যে ছন্দোহীন, তাহার কারণ ইহাদের পর্ব-বহুত্বের অভাব। কিন্তু—

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় অশ্লীল আছে—অশ্লীল আছে, রঙ্গ আছে—ব্যঙ্গ

আছে, হাসি আছে—খুশী আছে, উপদেশ আছে—নিদেশ আছে, কুন্দন আছে—ক্রন্দন আছে ; কিন্তু হিংসা, ঈর্ষা নাই—নাকসিটানি নাই।

পর্ব-বহুত্বের জন্য এই দৃষ্টান্তে ছন্দ সুপরিস্ফুট।

§ ৩. পর্ব-বহুত্বের অনুভূতি প্রথমতঃ গদ্যভাষার আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে। সাধারণ অনাড়ম্বর ভাষার বাক্যে পর্বত্ব সুস্পষ্ট হয় না।

পর্ব-বোধের কারণ—
(১) শব্দাড়ম্বর

দীর্ঘসমাসশূন্য শব্দ-বাহুল্যহীন অর্থপ্রধান ভাষাই অনাড়ম্বর ভাষা। এই অনাড়ম্বর ভাষায় সরল (simple) বা জটিল (complex) বাক্যে একাধিক পর্ব থাকিলেও পর্ব-বহুত্ব সুস্পষ্ট হয় না। যথা—

অনাড়ম্বর সরল বাক্য (simple sentence)—

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছি।

অনাড়ম্বর জটিল বাক্য (complex sentence)—

হিউয়েন সাং বলিয়াছিলেন যে, নানা গুরুর কাছে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার যে সকল সন্দেহ মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে তাহা মিটিয়া গিয়াছিল।

প্রথম দৃষ্টান্তে শ্বাসযতি-বিচ্ছিন্ন এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে শ্বাসগত ও অর্থগত উভয় প্রকার যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পর্ব আছে, কিন্তু উভয়ত্র ভাষা আড়ম্বর-শূন্য বলিয়া পাঠকমন ধ্বনিকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল অর্থগ্রহণেই ব্যস্ত হইয়া উঠে, ফলে পাঠকের কাছে পর্ব-বহুত্ব সুস্পষ্ট হয় না এবং বাক্যে ছন্দোবোধও হয় না।

অপরপক্ষে সাড়ম্বর ভাষায় অতিরিক্ত সমাস ও বিশেষণ প্রয়োগে অর্থকে ভারযুক্ত ও মন্থর করিয়া তোলা হয় বলিয়া অর্থ দমিত হয়। এখানে পাঠকমন তাই অর্থলোলুপতা ত্যাগ করিয়া উপভোগধর্ম

অবলম্বন করে এবং বাক্যস্থ ধ্বনিপর্বগুলি পাঠক-কর্ণে সুস্পষ্ট হয়। যথা—

(১) সরল সাড়ম্বর বাক্য :—

আর্য, এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশ সতত-সঞ্চরমান জলধরপটল সংযোগে নিয়ত নিবিড় নীলিমায় সমাচ্ছন্ন।

—সীতার বনবাস, ঈশ্বরচন্দ্র

(২) জটিল সাড়ম্বর বাক্য :—

কিন্তু আর একটি ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্র ললাটে সিঞ্চিত হইল না।

—কাব্যের উপেক্ষিতা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে পাঠক-কর্ণে পর্ব-বহুত্ব উপেক্ষিত হয় না, ছন্দও পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

§ ৪. ভাষা অনাড়ম্বর হইলেও যদি উহাতে যৌগিক (compound) বাক্য বা সমবিভক্তিযুক্ত বহু শব্দ থাকে, তাহা হইলে উহাদের পর্বত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

(২) যৌগিকতা

ভাষায় বাক্যগত বা শব্দগত যৌগিকতা থাকিলে কেবল ধ্বনি নহে, অর্থও পর্বের স্বাতন্ত্র্য-বিধানে সাহায্য করে।

(ক) বাক্যগত যৌগিকতা

যৌগিক বাক্যের (compound sentence) অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর বাক্যগুলি জটিল বাক্যের (complex sentence) অন্তর্গত বাক্যের ন্যায় প্রধান সমাপিকা ক্রিয়ার (finite verb) অধীন নহে, ইহাদের অর্থ-স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। সেইজন্য যৌগিক বাক্যে বাক্যমূলক পর্ব সুস্পষ্ট হয়। কানের সহিত মনও এই পর্বস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে।

যথা—

(১) অনাড়ম্বর যৌগিক বাক্য—

সে চাষা এখন নাই, আর সে গৃহস্থ এখন নাই, ঘরে চাল নাই, গোরু দুধ দেয় না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, চাষা পেটের দায়ে হালের গোরু বেচিয়া কোনোক্রমে খাইয়া বাঁচে।

—চিত্তরঞ্জন

(২) সাড়ম্বর যৌগিক বাক্য—

তাহার বামপার্শ্বে অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্র লম্বিত থাকাতে তাহাকে বিষধরজড়িত চন্দনলতার মতো ভীষণ-রমণীয় দেখিতে হইয়াছে—সে শরৎলক্ষ্মীর ন্যায় কলহংস-শুভ্রবসনা এবং বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় বেত্রলতাবতী, সে যেন মূর্তিমতী রাজাজ্ঞা, যেন বিগ্রহিণী রাজ্যাধিদেবতা।

—রবীন্দ্রনাথ

(খ) শব্দগত যৌগিকতা

বাক্য মধ্যে যদি একই বিভক্তিযুক্ত একাধিক বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়ার সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে ইহারা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া পর্বরূপে সুস্পষ্ট হয়। শ্বাসাঘাত বা অনুপ্রাসের দ্বারা অলংকৃত হইলে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতর হইয়া উঠে। যথা—

(১) প্রথমা বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য পদে—

পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল—সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল।

—বৌঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্রনাথ

(২) সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য পদে—

ঊর্ধ্বে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে কিছুই ব্যবধান নাই—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, ভূলোক, দ্যুলোক সকলই অনন্ত আকাশে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

—কেশবচন্দ্র সেন

(৩) বিশেষণ পদে—

এইরূপ জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত অন্ধকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া দেয়।

—কেকাধ্বনি, রবীন্দ্রনাথ

(৪) সমাপিকা ক্রিয়ায়—

জলে ভাসিতেছে, হাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে।

—আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্ত

(৫) অসমাপিকা ক্রিয়ায়—

আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে ভূতলে নামি।

—বৃষ্টি, গদ্য পদ্য, বঙ্কিম

§ ৫. পর্ব-সংহতি গদ্যছন্দের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ পর্বসমূহের অর্থগত এককেন্দ্রিকতা গদ্যছন্দে পর্ব-সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

গদ্যছন্দে পর্ব-সংহতি

সৌন্দর্য কেবল অঙ্গবহুত্ব-সাপেক্ষ নহে, অঙ্গগত শৃঙ্খলা-বা সংহতি-সাপেক্ষ। পর্বের কতকটা অর্থস্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যদি পর্বগুলি সমগ্র বাক্যের অর্থ-সাপেক্ষ হয়, তবেই পর্ব-সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন শব্দ অথবা বৃহত্তর কোন বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য পর্ব-রূপে দেখা দেয়, তখন সমগ্র বাক্যের একটি মাত্রই অর্থই উহাদের সংহতি বুঝাইয়া দেয়। যথা—

(ক) শব্দ-পর্বিক সংহতি—

এসো মা—নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পেদর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি।

—আমার দুর্গোৎসব

(খ) বাক্য-পর্বিক সংহতি—

যাহার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই,—তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ, বাম নাই,—তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে—'আমি চলিই বা কেন, আমি থামিই বা কেন?'

—রাজপথের কথা, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু যেখানে অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বাক্যসমূহ সমগ্র অনুচ্ছেদের পর্বত্ব দাবী করে সেখানে সমগ্রের অর্থগত ঐক্য সহজে বুঝা যায় না, পর্ব-সংহতি শিথিল হইয়া পড়ে এবং ফলে ছন্দোবোধ হয় না। যথা—

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের কনিষ্ঠা। তাঁহার নাম কমলমণি। শ্রীশচন্দ্র তাঁহার স্বামী।

§ ৬. পাঁচটি উপায়ে পর্ব-সংহতি সুস্পষ্ট হয়—যৌগিক পর্বগুলির (১) সংযোজক অব্যয়লোপে, (২) প্রতি পর্বে নির্দিষ্ট স্থানে একই শব্দ প্রয়োগে, তাছাড়া পর পর পর্বগত (৩) প্রশ্নে, (৪), বিস্ময়ে এবং (৫) শ্বাসাঘাতে।

পঞ্চবিধ পর্ব-সংহতি

পর্ববহুল বাক্য মাত্রেই পর্ব-সংহতি বর্তমান কিন্তু যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যই পর্ব, সেইসকল দীর্ঘায়ত বাক্যে প্রায়ই সংহতি সুস্পষ্ট হয় না। দীর্ঘায়ত বাক্য গঠনে পঞ্চবিধ কারণে পর্ববহুত্ব এবং পর্ব-সংহতি দুইই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

(১) যৌগিক পর্বগুলির মধ্যবর্তী সংযোজক অব্যয়ের লোপ। যথা—

অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ—অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার—সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণ-পুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার।

—শ্রীকান্ত, শরৎচন্দ্র

এখানে প্রতি পর্বের অর্থগত ভাব সংযোজক অব্যয় লোপে ঐক্যবদ্ধ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে।

(২) পর্বগুলির আদিতে মধ্যে বা অন্তে একই বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ। যথা—

(i) হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর;

ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।

—বিবেকানন্দ

এই দৃষ্টান্তে 'ভুলিও না' শব্দ পর্বগুলির আদিতে বসিয়া সকল পর্বকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে।

(ii) পৃথিবীর এক দৃশ্য সুতিকাগৃহ—আর এক দৃশ্য শ্মশান।

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

এই দৃষ্টান্তে 'দৃশ্য' শব্দ প্রতি পর্বের মধ্যে বসিয়া পর্ব দুইটিকে মিলিত করিয়াছে।

(iii) আমি যখন মন্দ্রগম্ভীর গর্জন করি—বৃক্ষপত্রসকল কম্পিত করিয়া শিখিকুলকে নাচাইয়া মৃদু গম্ভীর গর্জন করি—তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দস্থহ্ শীর্ষে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্বত গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে।

—মেঘ, বঙ্কিম

এই দৃষ্টান্তে প্রথম দুইটি পর্বের অন্তস্থ 'গর্জন করি' এবং পরবর্তী তিনটি পর্বের অন্তস্থ 'উঠে' শব্দ পর্বগুলির সংহতিদান করিয়াছে।

(৩) কোন বিশেষ ভাবপ্রকাশের জন্য জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে পর পর পর্ব ব্যবহার। যথা—

আমি কে?—আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব?—এই ঘূর্ণ্যমান, পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন মজ্জমানা সুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব?

—ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রশ্নসূচক 'কে', 'কেমন', 'কোন' শব্দ একটি নৈরাশ্য-ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই নৈরাশ্যভাবই পর্বগুলিকে সংহত করিয়াছে।

(৪) বিশেষ ইচ্ছা বা আবেগ প্রকাশের জন্য বিস্ময়ের ভঙ্গিতে পর পর পর্ব ব্যবহার। যথা—

কী সে মূর্তি!— যেন তুষারের উপর ঊষার উদয়!—যেন শুষ্ক

নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার!—যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত!

—নূরজাহান, দ্বিজেন্দ্রলাল

মুগ্ধতাপ্রকাশক বিস্ময় এখানে পর্বগুলির সংহতিবিধান করিয়াছে।

(৫) পর্বস্বরূপ বাক্যগুলিকে উদ্দেশ্য বিধেয়ের ক্রমবিপর্যয় ঘটাইয়া শ্বাসাঘাত ও গুরুত্ব প্রদান।

সাধারণতঃ উদ্দেশ্য অপেক্ষা বিধেয়ই অধিকতর গুরুত্ব সম্পন্ন। তাই বিধেয়কে উদ্দেশ্যের পূর্বে বসাইলে বাক্যগুলি জোরালো হয়। এই গুরুত্বই পর্বগুলিকে সুসংহত করে। যথা—

কখন রস এল শুকিয়ে, একপা একপা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে।

—বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ

§৭. গদ্যছন্দের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—পর্ব-সঙ্গতি। গদ্যছন্দের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নাই।

পর্ব-সংগতি

কেবল পর্ব-বহুত্ব ও পর্ব-সংহতি থাকিলেই ছন্দ হয় না। সৌন্দর্য সর্বত্রই অঙ্গ-সঙ্গতি সাপেক্ষ। পর্বে পর্বে সঙ্গতি থাকিলে তবে ছন্দোবোধ হয়। পর্ব-দৈর্ঘ্যের সমতা বা আ-সমতাই সঙ্গতি, বি-ষমতা সঙ্গতি নহে। পর্ব-বিষমতা চরণে ছন্দপতনের কারণ (২।১০ ও ২।১১ সূত্র)।

[অল্প পার্থক্যে আ-সম, অধিক পার্থক্যে বিষম]

পদ্যছন্দে পর্ব-দৈর্ঘ্যের সমতা রক্ষণীয় বলিয়া ইহাতেই পর্বে পর্বে অক্ষর-গণনা অপরিহার্য। সাধারণতঃ গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্য আ-সম পর্ব বলিয়া ইহাতে পর্বে পর্বে অক্ষর-গণনা অবশ্য-কর্তব্য নহে। পর্ব-দৈর্ঘ্যের আসমতা দৃষ্টিমাত্রই সহজবোধ্য।

§৮. স্বতন্ত্রভাবে পর্ব দ্বিবিধ—সরল ও জটিল। কিন্তু পর্বগুলির

পরস্পরের সম্পর্কের দিক দিয়া পর্ব-সঙ্গতি ত্রিবিধ—'তুলা' সঙ্গতি 'তরঙ্গ' সঙ্গতি ও 'সোপান' সঙ্গতি। এই ত্রিবিধ সঙ্গতির প্রতিটিই সরল ও জটিল হইতে পারে।

সরল ও জটিল সঙ্গতি

কেবল পর্বই যখন সমগ্র চরণের অঙ্গস্বরূপ হয় তখনই পর্বকে সরল ও সঙ্গতিকে 'সরল' সঙ্গতি বলা চলে। কিন্তু যদি এক একটি পর্বের পরিবর্তে পর্ববন্ধই (পর্বগুচ্ছ) অঙ্গস্বরূপ হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিটি পর্ব চরণের প্রত্যঙ্গ হইয়া উঠে; তখন পর্ব-জটিলতার জন্য সঙ্গতি হয় 'জটিল'। যথা—

আর্যের ইতিহাস কই—জীবন চরিত কই—কীর্তি কই—কীর্তিস্তম্ভ কই—সমরক্ষেত্র কই?

ইহা সরল সঙ্গতির উদাহরণ। কিন্তু—

(সুখ গিয়াছে : সুখ চিহ্ন গিয়াছে : বঁধু গিয়াছে : বৃন্দাবন গিয়াছে)—চাহিব কোন দিকে?

ইহার ( ) বন্ধনীবন্ধ প্রথম অঙ্গ নিজেই প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, কাজেই সঙ্গতি এখানে জটিল।

§ ৯. দ্বিপর্বিক চরণের ধ্বনি প্রবাহে পর্বধ্বনি তুলাদণ্ডের ন্যায় তুলিত হয় বলিয়া দ্বিপর্বিক চরণের সঙ্গতির নাম 'তুলা'-সঙ্গতি।

তুলা-সঙ্গতি

জটিল চরণের বিশেষক্ষেত্রে পর্বের স্থানে পর্ব-বন্ধ বুঝিতে হইবে। তুলাসঙ্গতি সমদীর্ঘ (এই সমতা আনুমানিক মাত্র), ক্রমদীর্ঘ ও ক্রমহ্রস্ব হইতে পারে।

সরল সঙ্গতি—

সমদীর্ঘ—

মা উঠিলেন না—উঠিবেন না কি?

—আমার দুর্গোৎসব, বঙ্কিম

ক্রমদীর্ঘ—

পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে—সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমা ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়।

—কেকাধ্বনি, রবীন্দ্রনাথ

ক্রমহ্রস্ব—

পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে—এই 'জিজ্ঞাসা' সেই পিপাসারই মূর্তিভেদ।

—জিজ্ঞাসা, রামেন্দ্রসুন্দর

জটিল সঙ্গতি—

(পর্বের স্থলে পর্ববন্ধ ব্যবহৃত)

আদিতে—

এখানে নৌকা ঘাটে বাঁধা : মাঝি ঘুমিয়ে—সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

—সন্ধ্যা ও প্রভাত, রবীন্দ্রনাথ

অন্তে—

এ সংসারের ঐ নিয়ম—সবই ভাল : সবই মন্দ।

—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, চন্দ্রশেখর

উভয়ত্র—

আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম : এত সূক্ষ্ম যে আছে কিনা বোঝা কঠিন—তোমাদের বুদ্ধি স্থূল : এত স্থূল যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন।

—আমরা ও তোমরা, বীরবল

§ ১০. ত্রিপর্বিক চরণের ধ্বনি-প্রবাহে প্রথম হইতে দ্বিতীয় পর্বে কণ্ঠধ্বনির উত্থান ও দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পর্বে কণ্ঠধ্বনির পতন অনুভূত হয় বলিয়া ত্রিপর্বিক চরণের সঙ্গতি হইতেছে—

'তরঙ্গ'-সঙ্গতি।

তরঙ্গ-সঙ্গতি

সরল ও জটিল, উভয়বিধ তরঙ্গ-সঙ্গতি হইতে পারে। যথা—

সরল সঙ্গতি—

সমদীর্ঘ—

"বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল—ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল—নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল।"

—দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম

ক্রমদীর্ঘ—

কোথা মা—কই আমার মা—কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি?

—আমার দুর্গোৎসব, বঙ্কিম

ক্রমহ্রস্ব—

এই অনন্ত বিশ্বে আমি কে—আমি কতটুকু—আমি কী?

—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, চন্দ্রশেখর

জটিল সঙ্গতি—

(পর্বের স্থলে পর্ববন্ধ ব্যবহৃত)

আদিতে—

হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া : পেণ্টলুন সেই ধড়া : হুইপ্ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ—আমি তোমাকে প্রণাম করি।

—ইংরাজ স্তোত্র, বঙ্কিম

মধ্যে—

তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্তশ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়—তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান : বিনাশের ঝঞ্ঝা : তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধুলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়—তাঁহার বিষাণ-বাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।

—সাধক রামপ্রসাদ, দীনেশচন্দ্র

অন্তে—

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশীতে বেজে উঠ্‌ল—তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম—তার গলায় সোনার

হার : তার পায়ে দুগাছি মল : সে যেন কান্নার সরোবরের আনন্দের পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে। —বাঁশী, রবীন্দ্রনাথ

সর্বত্র—

যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম : কবে মরিয়া গিয়াছে : তাহার জন্য আজিও কাঁদি—যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম : কবে শুকাইয়াছে : তাহার জন্য আজিও কাঁদি—যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে ভাসমান : সূর্যরশ্মি-সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম : তাহার জন্য আজিও কাঁদি।

—কমলাকান্তের বিদায়, বঙ্কিম

§ ১১. বহুপর্বিক চরণে কণ্ঠস্বরের আরোহণ বা অবরোহণ অনুভূত হয় বলিয়া ইহার সঙ্গতিকে বলিতে হইবে—'সোপান'-সঙ্গতি।

[তিনের অধিক সংখ্যা হইলেই তাহা 'বহু' পদবাচ্য।]

সোপান-সঙ্গতি

পর পর পর্বগুলি অসমদীর্ঘ, সমদীর্ঘ বা ক্রমদীর্ঘ হইলে ধ্বনির আরোহণ এবং ক্রমহ্রস্ব হইলে ধ্বনির অবরোহণ অনুভূত হয়। যথা—

সরল সঙ্গতি—

অসমদীর্ঘ—

তারা সভ্যতার পিলসুজ—মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সকলেই আলো পায়—তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

—রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ

সমদীর্ঘ—

পৃথিবী এখনও তাই আছে—সংসার এখনও তাই আছে—মনুষ্য এখনও তাই আছে—কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই।

—একা, কমলাকান্ত

ক্রমদীর্ঘ—

মেঘাবৃত আকাশ—ছায়াবৃত অরণ্য—নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর—বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দ রাশি।

—কেকাধ্বনি, রবীন্দ্র

ক্রমহ্রস্ব—

আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে—এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই—সহানুভূতি নাই—করুণা নাই।

—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, চন্দ্রশেখর

জটিল সঙ্গতি—

(পর্বের স্থলে পর্ববন্ধ ব্যবহৃত)

প্রথমে ও দ্বিতীয়ে—

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী : তরুণের আশাপ্রদীপ : যুবক-যুবতীর যামিনী যাপনের সম্ভোগ পদার্থ : স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ—তুমি অনাথার প্রহরী : স্থির দীপধারা : পথিকের পথ প্রদর্শক : গৃহীর নৈশ সূর্য—তুমি পাপের সাক্ষী : পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা—তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি : জগতের শোভা : আর এই শ্মশান বিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল।

—চন্দ্রালোকে, কমলাকান্ত

চতুর্থে—

আর আজি গদার মাকে দেখ—বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিন বসনা : বিকট দশনা : তীব্র রসনা—দীর্ঘাঙ্গী : কৃষ্ণাঙ্গী : লোলচর্ম : পলিতকেশ : শুষ্ক বাহু : কর্কশ কণ্ঠ—এই সেই তরঙ্গিণী !

—বুড়া বয়সের কথা, বঙ্কিম

§ ১২. যেখানে চরণ জটিল অর্থাৎ পর্বগঠিত নহে—পর্ববন্ধে গঠিত, সেখানে যদি পর্ববন্ধের সঙ্গতি একপ্রকার এবং পর্ববন্ধের অন্তর্গত পর্বের সঙ্গতি ভিন্ন প্রকার হয়, তাহা হইলে চরণের সঙ্গতি হয়—'মিশ্র'-সঙ্গতি।

মিশ্র সঙ্গতি

সাধারণ জটিল সঙ্গতিতে অঙ্গগত ও প্রত্যঙ্গগত শৃঙ্খলা একপ্রকার হয় বলিয়া তুলা, তরঙ্গ বা সোপান—একটি নামে চিহ্নিত করা চলে কিন্তু অঙ্গগত ও প্রত্যঙ্গগত শৃঙ্খলা ভিন্ন প্রকার হইলে মিশ্র-সঙ্গতি বলিতে হইবে। দৃষ্টান্ত :—

(১) এই জীবনব্যাপী বিরহে যেখানে আরম্ভ : সেখানে যিনি—যেখানে

অবসান : সেখানে যিনি—এবং তারি মাঝে গভীর ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে : যিনি করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছেন—সেই হরি বিনে : কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া !

—শ্রাবণ সন্ধ্যা, রবীন্দ্র

ইহার অঙ্গগত সোপান-সঙ্গতি, এবং প্রতি প্রত্যঙ্গগত তুলা-সঙ্গতি।

(২) পর্বতের মাথায় চড়িয়া : তাহার গলা ধরিয়া : বুকে পা দিয়া : পৃথিবীতে নামিব—নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব—নদীকূলের শূন্য হৃদয় ভরাইয়া : তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া : মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া : তরঙ্গের পর তরঙ্গ মারিয়া : মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব ! —বৃষ্টি, বঙ্কিম

এই দৃষ্টান্তে অঙ্গগত তরঙ্গ-সঙ্গতি এবং প্রথম ও তৃতীয় পর্ববন্ধে প্রত্যঙ্গগত সোপান-সঙ্গতি।

(৩) ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী স্ফুরিত হইতে লাগিল—শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল—দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল : অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল—অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল : জীবকুল নীরব হইল : মহাকালের তাণ্ডব নর্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।

—মহাকাব্যের লক্ষণ, রামেন্দ্রসুন্দর

এখানে অঙ্গগত সোপান সঙ্গতি, প্রত্যঙ্গের সঙ্গতি বিচিত্র, তৃতীয় পর্ববন্ধে তুলা-সঙ্গতি, চতুর্থ পর্ববন্ধে তরঙ্গ-সঙ্গতি।

(৪) আর সে আমার প্রথম যৌবন মেহের : প্রথম যৌবন—যখন আকাশ বড়ই নীল : পৃথিবী বড়ই শ্যামল—যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার স্ফুলিঙ্গ : গোলাপ ফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত—যখন কোকিলের গান একটা স্মৃতি : মলয় সমীরণ একটা স্বপ্ন—যখন প্রণয়ীর দর্শন উষার উদয় : চুম্বন সজল বিদ্যুৎ : আলিঙ্গন আত্মার প্রলয় ! —নূরজাহান, দ্বিজেন্দ্রলাল

এই দৃষ্টান্তে অঙ্গগত সোপান সঙ্গতি এবং প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রথম চারিটি পর্ববন্ধে তুলা-সঙ্গতি ও পঞ্চম পর্ববন্ধে তরঙ্গ-সঙ্গতি দ্রষ্টব্য।

§ ১৩. দীর্ঘায়ত গদ্যপ্রবাহে যেখানে সঙ্গতি কেবল পর্ববন্ধে বা পর্বে নহে—ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম উপবিভাগেও পরিব্যাপ্ত হয়, সেখানের সঙ্গতির নাম 'মহা'সঙ্গতি।

মহাসঙ্গতি মিশ্রসঙ্গতিরই ব্যাপকতর রূপ। ইহাও জটিল সঙ্গতির অন্তর্গত। যথা:—

মহাসঙ্গতি [দৃষ্টান্তে ধ্বনি প্রবাহের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম অন্তর্বিভাগকে যথাক্রমে ড্যাস (—), দণ্ড (।) ও বিন্দু-দণ্ড (:) চিহ্নে বুঝিতে হইবে; স্বতন্ত্র শব্দগুচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধনী { } এবং শব্দে প্রথম বন্ধনী ( ) ব্যবহৃত হইল।]

১। তোমার {দয়া নাই : মমতা নাই : স্নেহ নাই} | বীরের প্রাণ-নাশে সঙ্কোচ নাই—তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর | (সর্বমঙ্গলময়ী : সর্বার্থ সাধিকা : সর্ব কামনা পূর্ণকারিণী : সর্বাঙ্গসুন্দরী)—তোমাকে নমস্কার।

—চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম

২। কে যেন আমার {খাটের নিচে : মেঝের নিচে} | এই বৃহৎ পাষাণ ভিত্তির তলবর্তী | একটা (আর্দ্র : অন্ধকার) গোরের ভিতর হইতে | কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—{কঠিন মায়া : গভীর নিদ্রা : নিস্ফল স্বপ্নের} সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া | তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া : তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া | বনের ভিতর দিয়া : পাহাড়ের উপর দিয়া : নদীপার হইয়া | তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও—আমাকে উদ্ধার করো!

—ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথ

§ ১৪. গদ্যছন্দের রচনায় অতিদীর্ঘ পর্বের সহিত অতিহ্রস্ব পর্বের সমাবেশে বিষমতাজনিত ছন্দপতন হয়। ইহার নাম—পতৎ-প্রকর্ষ বা উৎক্রামতা দোষ।

অনাড়ম্বর রচনা অর্থসর্বস্ব বলিয়া ইহাতে শ্রোতা ধ্বনি সম্বন্ধে সচেতন হয় না, রচনায় পতৎপ্রকর্ষ বা উৎক্রামতা থাকিলেও উহা বোধগম্য হয় না, সাড়ম্বর রচনাতেই উহা সুস্পষ্ট হয়।

গদ্যছন্দে ছন্দ পতন

যেখানে দীর্ঘায়ত পর্বসমূহের মধ্যে হঠাৎ দুই একটি অতিহ্রস্ব পর্ব বসিয়া ছন্দপতন ঘটায়, সেখানের অসঙ্গতি হইতেছে পতৎপ্রকর্ষ এবং যেখানে হ্রস্বপর্ব সমূহের মধ্যে আকস্মিকভাবে দুই একটি অতিদীর্ঘ পর্ব বসিয়া ছন্দপতন ঘটায় সেখানে অসঙ্গতি হইতেছে উৎক্রামতা। যথা—

১। কোকিলকুল কলালাপ-বাচাল যে মলয়ানিল—সে—উচ্ছলচ্ছীকরণাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া—আসিতেছে।

—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

২। যাঁহাদিগের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক—আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সাধুভাষা কহেন—আর শুনেন—তাঁহাদের অল্পশ্রমেই ইহার অধিকার জন্মিবেক।

—রামমোহন রায়

প্রথম দৃষ্টান্তে "সে" ও "আসিতেছে" এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে "আর শুনেন" পারিপার্শ্বিক পর্ব-দৈর্ঘ্যের সহিত অসঙ্গতভাবে হ্রস্ব বলিয়া রচনায় ছন্দপতন হইয়াছে। উভয়ত্র দোষ হইতেছে পতৎপ্রকর্ষ।

উৎক্রমতা দোষের দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায় না।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিম্ন দৃষ্টান্তে ইচ্ছাকৃত ছন্দপতন সৃষ্টি করিয়াছেন—

আমি ঊর্মি সন্তাড়িত হয়ে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার সমুদ্রে আন্দোলিত হচ্ছি—না, ঘুঁসি খেলছি?—আমি শার্দুল-সিংহ-বরাহ-ব্যাল-সঙ্কুল অরণ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে কাঁদছি—না গান গাচ্ছি?

—পুনর্জন্ম

§ ১৫. গদ্যরচনায় যদি এরূপ অতিরিক্ত-সংখ্যক পর্ব প্রযুক্ত হয় যাহাতে পাঠকের শ্বাসকষ্ট হয় এবং ঐক্যবোধের অভাব ঘটে, তাহা হইলেও ছন্দোদোষ ঘটে। ইহার নাম পর্বাতিশয্য-দোষ।

অপরিণত গদ্য রচনাতেই পর্বাতিশয্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—

রে রে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার : স্ববংশ-পাংশুল : রণকাতর : যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ : নির্লজ্জ : খট্টারূঢ় : ব্যলীক : নিঃসাহস : সহিস : কুড়িয়া বেটা—তোর নিমিত্তে আমাদের ভীম : মা : ভাই : স্ত্রী : পুত্র : খুড়া : খুড়ী : জ্যেঠা : জ্যেঠী : ঝি : জামাই : মামী : পিসা : পিসী : মাসুয়া : মাসী : শ্বশুর : শ্বাশুড়ী : বেহায়ী : বেহানী : শ্যালা : শ্যালী : ভাউজ : ভাইবউ : ভাএরাভাই : তাউই প্রভৃতি—স্বজনেতে (নির্মম : নিঃস্নেহ) হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালন ধর্ম-প্রতিপালনার্থে (নিঃসহায় : একক) তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। —প্রবোধ চন্দ্রিকা

পর্বাতিশয্য দোষ

§ ১৬. গদ্যছন্দে অলংকার দোষ হইতেছে অনুপ্রাসের আতিশয্য।

অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি গদ্য পদ্য সকল ক্ষেত্রেই হাস্যকর। ইহারও দৃষ্টান্ত অপরিণত গদ্য রচনায় দেখা যায়—

অনুপ্রাস দোষ

(১) বহু দিবসাবধি — প্রত্যবধি — নিরবধি — প্রয়াস— নিবাস—তাহাতে কর্মফাঁস—প্রতিনিয়ত উত্যাক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি।

—স্ত্রীর প্রতি লিখিত পত্র, শিশুবোধক

(২) রে পাষণ্ড ষণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়া ও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিতাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ।

—পৃঃ ৫৩৩, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

§ ১৭. পদ্যছন্দের তুলনায় গদ্যছন্দ ধ্বনি-শিল্পে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপক ও শক্তিসমৃদ্ধ।

পাঠকেরা সাধারণতঃ ছন্দ বলিতে পদ্যছন্দই বুঝিয়া থাকেন, গদ্যের ধ্বনির দিকে বিশেষ লক্ষ্য করেন না। কিন্তু শক্তিমান লেখকের গদ্যধ্বনি শ্রুতি-বিনোদনে পদ্যধ্বনিকে ছাড়াইয়া যায়। উপযুক্ত লেখকের হাতে গদ্যধ্বনি স্নিগ্ধ-গম্ভীর মৃদঙ্গ-নির্ঘোষে পরিণত হয়। পদ্যছন্দ সম্মিতির জন্য কৃত্রিম, একঘেয়ে ও স্বল্পায়ু। কিন্তু গদ্যছন্দ অকৃত্রিম, বিচিত্র, বিপুল, গম্ভীর ও বিশাল। মেঘমন্দ্র, সাগর-কল্লোল ও ঝটিকা-গর্জনের আভাস গদ্যেই ফুটিতে পারে, পদ্যে নহে। পদ্যছন্দকে যদি কবিতার সংগীত বলা যায়, তাহা হইলে গদ্যছন্দকে বলিতে হইবে মহাসংগীত। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলির ধ্বনিগৌরব লক্ষণীয় :—

গদ্যছন্দের শ্রেষ্ঠতা

(ক) কোথায় ফুল পাইলাম : বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম—সর্বমঙ্গল্যে : শিবে : আমার সর্বার্থসাধিকে : অসংখ্য সন্তান-কুলপালিকে : ধর্ম-অর্থ-সুখদুঃখদায়িকে—আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করো।

এই (ভক্তি : প্রীতি : বৃত্তি : শক্তি) করে লইয়া : তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি—তুমি অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া : এই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ করো।

এসো মা—নবরাগরঙ্গিণি : নববলধারিণি: নবদর্পেদর্পিণি : নবস্বপ্ন-দর্শিনি—এসো মা : গৃহে এসো!

ছয় কোটি সন্তানে (একত্রে : এককালে) : দ্বাদশ কোটি করযোড় করিয়া : তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব—ছয় কোটি মুখে ডাকিব—মা প্রসূতি অম্বিকে | ধাত্রি : ধরিত্রি : ধনধান্যদায়িকে | নগাঙ্কশোভিনি : নগেন্দ্রবালিকে | শরৎসুন্দরি : চারু পূর্ণচন্দ্রভালিকে—ডাকিব—সিন্ধু সেবিতে : সিন্ধু পূজিতে : সিন্ধুমথনকারিণি | শত্রুবধে দশভুজে দশ-প্রহরণধারিণি। অনন্তশ্রী : অনন্তকালস্থায়িনি—শক্তি দাও সন্তানে : অনন্ত শক্তিপ্রদায়িনি!

তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা?

এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি : এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব !

এসো মা : গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান : তাঁহার ভাবনা কি ?

—আমার দুর্গোৎসব, বঙ্কিম

(খ) আমি কে—আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব—আমি এই ঘূর্ণ্যমান : পরিবর্তমান : স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে : কোন মজ্জমান' সুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব ?

তুমি কবে ছিলে : কোথায় ছিলে : হে দিব্যরূপিণি ?—তুমি কোন শীতল উৎসের তীরে : খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় : কোন গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ?

তোমাকে কোন বেদুয়ীন দস্যু : বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো : মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া—বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বের উপর চড়াইয়া—জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া—কোন রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল ?

সেখানে কোন বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকসিত যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া : স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া দিয়া : সমুদ্র পার হইয়া : তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া—প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল ?

সেখানে সারঙ্গীর সংগীত : নূপুরের নিক্কণ : সিরাজের সুবর্ণ মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক : বিষের জ্বালা : কটাক্ষের আঘাত—কী অসীম ঐশ্বর্য—কী অনন্ত কারাগার !

দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলী খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে—শাহেনশা বাদশাহ্ শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে—বাহিরের দ্বারের কাছে : যমদূতের মতো হাবসী : দেবদূতের মতো সাজ করিয়া : খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া !

তারপর সেই রক্ত-কলুষিত : ঈর্ষাফেনিল : ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল... ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য প্রবাহে ভাসমান হইয়া—তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী—

কোন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ : অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে ? —ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথ

(গ) যে রাত্রে আমার গৃহদ্বারে : মুকুলিত রসালের সুরভিত পল্লব শয়নে : (মধুমত্ত : বধূসহায়) পরভৃৎ : তাহার মধুকষায় পঞ্চমস্বর সুপ্তজগতে বারংবার কুহরিত করিল,—যে রাত্রে তোমার নববিরহে অতিবিকল : আমার নিদ্রাহীন নেত্রদ্বয় : নববসন্তের মলয় চুম্বনে সুখালসে নিমীলিত হইল—সেই রাত্রে—হে রঞ্জনা : হে তরুণী তন্বঙ্গী : আমার শিশির-কাতরা ভীরু বিহঙ্গী—তুমি দেশান্তরে : নীলাম্বু চুম্বিত সিন্ধুতীরে—তোমার সেই উত্তরে রোপিত তমাল শ্রেণী : দক্ষিণে বিস্তৃত পুষ্পকুঞ্জের মধ্যস্থলে—অগুরুবাসিত আতপগৃহে—শিশিরভয়ে নিবিড়বিলম্বিত স্থূল যবনিকার পটান্তরে : বাতায়নশ্রেণী অবিচ্ছেদে রুদ্ধ করিয়া—এবং অবিরল বিস্তৃত লোমকোমল আস্তরণে গৃহতলের তুহিনতা হরণ করিয়া—দিবারাত্রি কখন সংগীত চর্চায় : কখন কাব্যালাপে : কখন বা মৃগচর্ম-নির্মিত তপ্ত-শয্যায় অলস-লুণ্ঠিত দেহে : কনকপাত্রে অনলোজ্জ্বল মদিরা পানে : সমস্ত শিশিরকাল বঞ্চনা করিয়া—আমাদের দেবদারুচ্ছায় নিবিড় উত্তর জনপদে : তোমার জলরাশি বেষ্টিত কুঞ্জভবনে—আরবার ফিরিয়া আসিলে !

—দেবীপ্রতিমা, অবনীন্দ্র

কেবল সাধুভাষার গদ্যে নহে, চলিত ভাষার গদ্যেও এমন সংযত, আতিশয্যহীন স্বচ্ছন্দ অথচ জটিল ও বিচিত্র ধ্বনি-বিলাস দেখা দিতে পারে, যাহা পদ্যে সম্ভবপর নহে। যথা—

(ক) বসন্ত বঙ্কিমের "রজনী"র মতো : (ধীরে ধীরে : অতিধীরে) : ফুলের মালা হাতে কোরে : দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে—তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে—শবসাধকের শবের ন্যায়—প্রথমে বর্ণ দেখা দেয় : তারপর ভ্রূ কম্পিত হয় : তারপর চক্ষু উন্মীলিত হয় : তারপর তার নিঃশ্বাস পড়ে : তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে।—এ সকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্যায়ক্রমে নয়—ধীরে ধীরে : অতি ধীরে প্রকটিত হয়।

কিন্তু বর্ষা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ কোরে : একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে—আকাশে তার চুল ওড়ে : চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে : মুখে তার প্রচণ্ড হুঙ্কার—সে যেন একেবারে প্রমত্ত।

ইংরেজেরা বলেন—কে কার সঙ্গ রাখে : তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

বসন্তের সখা মদন—আর বর্ষার সখা?—পবন নন্দন নন : কিন্তু তাঁর বাবা!

ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে—ফুল ছেঁড়েন : ডাল ভাঙেন : গাছ ওপড়ান—আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড কোরে দেন;—যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে : তাকে বগল দাবা করেন—আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত : তাঁর কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। —বর্ষার কথা, প্রমথ চৌধুরী

(খ) বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়?

গোপন অতৃপ্তি : গভীর নৈরাশ্য—অবহেলা : অপমান : অবসাদ—তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য : কুশ্রী নীরসতার কলহ : ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত : অভ্যস্ত জীবন যাত্রার ধূলি লিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশীর দৈববাণীতে এ-সব বার্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে,—চিরদিনকার বরকনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে : কোন রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠন তলে—তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল!

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশীতে বেজে উঠ্‌ল—তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম্—তার গলায় সোনার হার : তার পায়ে দুগাছি মল : সে যেন কান্নার সরোবরের আনন্দের পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে!

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেনা গেল না—সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশী বলে—এই কথাই সত্য! —বাঁশী, লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ

সপ্তম অধ্যায়

মাত্রাবৃত্ত

§ ১. অন্যজাতীয় ছন্দের তুলনায় মাত্রাবৃত্ত দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ। চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের পদ্যছন্দে 'স্বাভাবিক ভাবে' দুর্বল উচ্চারণভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে; সেইজন্য এই সকল পর্বের ছন্দ মাত্রাবৃত্তজাতীয়।*

পর্বে পর্বে মাত্রাসংখ্যার সমতা থাকে বলিয়া যে উল্লিখিত ছন্দ-গুলির নাম মাত্রাবৃত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। পদ্যছন্দ মাত্রেই পর্বসম্মিতি বা পর্বগত মাত্রা-সমতা থাকে। তাই বলিয়া সকল ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা চলে না। এই নামের কারণ অন্য। মূল ধ্বনির উচ্চারণে শক্তি, স্বর ও মাত্রা এই ত্রিবিধ ভঙ্গির সকলগুলিকে সকলছন্দে সমভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায় না। বাংলায় চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বে শক্তি বা স্বরের স্বাভাবিক প্রাধান্য প্রকাশিত হয় না, কেবল মাত্রারই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। মাত্রা-প্রধান বলিয়া এই সকল পর্বের ছন্দগুলির নাম মাত্রাবৃত্ত।

মাত্রাবৃত্ত নামের কারণ

লঘু ও স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্বই মাত্রাবৃত্তের স্বভাবসঙ্গত আদর্শ 'সাধারণ পর্ব'; যথা—

চতুর্মাত্রিক সাধারণ পর্ব—

সে দিনো তো | মধুনিশি প্রাণে গিয়ে | ছিল মিশি
মুকুলিত | দশদিশি | কুসুম দ | লে
দুটি সোহা | গেরি বানী হত যদি | কানাকানি
যদি ওই | মালাখানি | পরাতে গ | লে।

---

* ছন্দের দুর্বল, প্রবল ও সাধারণ প্রকৃতি পঞ্চম অধ্যায়ের ৯ম ও ১১শ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পঞ্চমাত্রিক সাধারণ পর্ব—

নাহিক যদি | সে রূপ-জ্যোতি | কি আছে তাহে | ক্ষতি মা
ও হিয়া মাঝে | স্নেহ তো রাজে | তেমনি।
অতীত তব | যত বিভব | বিগত তব | গরিমা
তবু তো তুমি | জনম-ভূমি | জননী।

ষণ্মাত্রিক সাধারণ পর্ব—

আলোতে কালোতে | মলয়জে যেন | মিলেছে চুয়া।
পহেলি ফাগুনে | কে ধরেছে মরি | শাঙনী ধুয়া॥

সপ্তমাত্রিক সাধারণ পর্ব—

এ-গৃহে প্রতি রেণু | কণিকা তুমি-মাখা
চরণ-রেখা তব | আঙিনা-ভরা আঁকা
রোপিত লতিকারা | লুটাবে স্নেহহারা
ফুকারি সারী সারা | রে।

§ ২. মাত্রাবৃত্তে মূল শব্দের আদ্য, মধ্য, অন্ত্য সকল হলন্ত ও যৌগিক অক্ষরের স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দ্বিস্বরে প্রসারিত হয়।

সাধারণতঃ স্বরান্ত অক্ষর লঘু ও হলন্ত বা যৌগিক অক্ষর গুরু। মাত্রাবৃত্তের পর্বে সর্বত্র স্বর-সম্প্রসারণের দ্বারা সকল গুরু অক্ষরেরই লঘুকরণ হয়। এইখানেই রহিয়াছে মাত্রাবৃত্তের দুর্বলতা। তবে ইহাতে গুরু অক্ষর যে সম্পূর্ণ লঘু হইয়া যায় তাহা নহে, 'ঈষদ্ গুরু' ধ্বনিতে পরিণত হয়।

মাত্রাবৃত্তে গুরু অক্ষরের লঘুকরণ

(চতুর্থ অধ্যায় ১১ সূত্র দ্রষ্টব্য)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ হয় বলিয়া হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র পর্বগুলি উচ্চারণ-সাপেক্ষভাবে অঙ্গ-সঙ্কোচ করিয়া লিপিবদ্ধ হয়; উচ্চারণে দীর্ঘীকৃত হইলে তখনই ইহারা স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য লাভ

করে। এই সঙ্কুচিত হ্রস্বপর্বগুলিই হইতেছে মাত্রাবৃত্তের 'বিশেষ পর্ব', উচ্চারিত অবস্থায় ইহাদেরই অঙ্গ-প্রসারণ হয়। যথা—

(বাংলা হরফে নিম্নরেখ 'বিশেষ' পর্বের মূল রূপ ও ইংরেজি হরফে উহার উচ্চারিত রূপ দেখানো হইল, উচ্চারিতরূপে গুরু অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি দ্রষ্টব্য।)

চার মাত্রার বিশেষ পর্ব—

পান্নার | অঞ্জলি | দিতে দিতে | আয় গো
হরি চর | ণ-চ্যুতা | গঙ্গার | প্রায় গো।

pāānnāār | aanjali | dite dite | āāy go

hari chara | naachchutā | gaangāār | prāāy go

পাঁচ মাত্রার বিশেষ পর্ব—

কুহেলি গেল | আকাশে আলো | দিল যে পর | কাশি
ধূর্জটির | মুখের পানে | পার্বতীর | হাসি।

kuheli gela | ākāse ālo | dila je para | kāsi
dhuurjatiir | mukheer pāne | pāārbatiir | hāsi

ছয় মাত্রার বিশেষ পর্ব—

অভিমান ভরে | মাথা দোলাইয়া | কহিল গাছের | ফুল
"আমারে যে আগে | ভালো বেসেছিলে | করেছিলে সে কি | ভুল ?"
abhimāānbhare | māthā dolāiyā | kahila gāchheer | phuul
āmāre je āge | bhālo besechhile | karechhile se ki | bhuul

সাত মাত্রার বিশেষ পর্ব—

প্রণাম শতকোটি | ঠাকুর যে খোকাটি | পাঠায়ে দেছ তুমি | মাকে
পারে না খেতে তাই | আমার ছোট ভাই | দাঁত তো দাও নাই | তাকে।
pranāām sata koṭi | ṭhākuur je khokāṭi |
pāṭhāye dechha tumi | māke
pāre nā khete tāi | āmāār chhoṭa bhāi |
dāānt to dāo nāi | tāke

§ ৩. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও উহার দুর্বল উচ্চারণভঙ্গি কেবল বঙ্গীয় নহে, সর্বভারতীয়; প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত হইয়াছে।

"আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।"[১] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির লক্ষ্য মাত্রাবৃত্ত।

মাত্রাবৃত্তের মূল

আ, ঈ, ঊ, এ, ও-বর্ণের দীর্ঘ (দ্বিমাত্রিক) উচ্চারণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তে বর্তমান আছে, কিন্তু বাংলা মাত্রাবৃত্তে এই পাঁচটি 'দীর্ঘ' স্বরবর্ণেরও উচ্চারণ হ্রস্ব (একমাত্রিক), এইখানে মাত্র তফাৎ। অন্য কোন ব্যাপারে প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের সহিত বাংলা মাত্রাবৃত্তের কোন ভেদ নাই। নিম্নে বিভিন্ন পর্বের সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত[২] দ্রষ্টব্য:—

চতুর্মাত্রিক পর্ব—

সরস ম | সৃণ মপি | মলয়জ | পঙ্কম্
পশ্যতি | বিষমিব | বপুষি স | শঙ্কম্।

পঞ্চমাত্রিক পর্ব—

অহহ কল | য়া-মি বল | য়া-দি মণি | ভূ-ষণম্
হরি বিরহ | দহন বহ | নে-ন বহ | দূ-ষণম্।

ষণ্মাত্রিক পর্ব—

বহতি মলয় | সমী-রে-
মদন মুপ নি | ধা-য়
স্ফুটতি কুসুম | নিকরে-বির | হি হৃদয় দল | না-য়।

সপ্তমাত্রিক পর্ব—

কিং করিষ্যতি | কিং বদিষ্যতি | সা-চিরং বির | হে-ণ।
কিং ধনে-নজ | নে-ন কিং মম | জী-বিতে-ন গৃ | হে-ণ॥

১। পৃঃ ২৩৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪), ২। 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত।

§ ৪. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বদৈর্ঘ্যভেদে ধ্বনিপ্রবাহের গতিভঙ্গি ত্রিবিধ—সম, অসম ও বিষম।

রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিবিধ গতিভঙ্গির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।*

মাত্রাবৃত্তে সম, অসম ও বিষম গতি

চার মাত্রার ধ্বনি-তরঙ্গকে দুই-দুই মাত্রায় ভাগ করা যায়। দুই সংখ্যা সম, সেইজন্য চতুর্মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত হইতেছে 'সমচলনের ছন্দ'; ইহার গতি মানব-পদক্ষেপের ন্যায় ক্রমগতি। যথা—

ফিরে ফিরে | আঁখি নীরে | পিছু পানে | চায়।
পায়ে পায়ে | বাধা পড়ে | চলা হলো | দায়॥

ছয় মাত্রার ধ্বনি-তরঙ্গ তিন-তিন মাত্রায় বিভাজ্য, তিন মাত্রা অ-সম; সেইজন্য ষণ্মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত হইতেছে 'অ-সম চলনের ছন্দ'; ইহার গতি অবিচ্ছিন্ন আবর্তনের ন্যায় চক্রগতি। যথা—

নয়ন ধারায় | পথ সে হারায় | চায় সে পিছন | পানে।
চলিতে চলিতে | চরণ চলে না | ব্যথার বিষম | টানে॥

পাঁচ ও সাত মাত্রার ধ্বনি-তরঙ্গ অসম তিন মাত্রার সহিত যথাক্রমে সম দুই ও চার মাত্রার সংযোগে উৎপন্ন। ইহাদের তিন মাত্রায় গতি এবং দুই বা চার মাত্রায় বাধা। এইজন্য পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত হইতেছে 'বিষম চলনের ছন্দ'। ইহাদের গতি খঞ্জগতি। যথা—

(১) পঞ্চমাত্রিক পর্ব—

মন্ত্রী কহে | আমারো মনে | ছিল
কেমনে বেটা | পেরেছে সেটা | জান্‌তে।

(২) সপ্তমাত্রিক পর্ব—

জীবন মরণের | বাজায়ে খঞ্জনী | নাচিয়া ফাল্গুন | গাহিছে।
অধীরা হল ধরা | মাটির বন্দিনী | আকাশে উড়ে যেতে | চাহিছে॥

---

*পৃঃ ১৫৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪) দ্রষ্টব্য।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে সম, অ-সম ও বি-ষম চলনের ছন্দে ভাগ করা রসের দিক দিয়া সার্থক হইলেও তত্ত্বের দিক দিয়া অনাবশ্যক।

§ ৫. রবীন্দ্রপূর্ব বঙ্গসাহিত্যে 'শুদ্ধ বাংলায়' চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পদ্যপর্বে কৃত্রিমভাবে অক্ষরবৃত্তের সাধারণ উচ্চারণভঙ্গি প্রচলিত ছিল। এই প্রকার প্রাচীন রচনার 'বিশেষ ক্ষেত্রে' শব্দের আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষর সংশ্লিষ্ট একাক্ষররূপেই উচ্চার্য।

ইহা 'বিশেষ বিধি', প্রাচীন বাংলার বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনধিকার প্রবেশ

ইহাকে মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনধিকার প্রবেশ বলা চলে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 'মিশ্র বাংলা'য় চর্যা পদে ও ব্রজবুলি পদে চতুরক্ষর পর্ব হইতে সপ্তাক্ষর পর্বের ছন্দে অক্ষরবৃত্তের অনধিকার প্রবেশ সম্ভব হয় নাই। সেখানে মাত্রাবৃত্তের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিই (অর্থাৎ দুর্বল উচ্চারণভঙ্গিই) বলবৎ ছিল।

প্রাচীন 'শুদ্ধ বাংলা'য় মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনুপ্রবেশের কারণ পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নির্বিচার অন্ধ অনুকরণ। অবশ্য এই অনুকরণে যে ছন্দোগত সম্মিতির হানি হইত তাহা নহে; হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে পর্বদৈর্ঘ্যের সমতা বা পর্ব-সম্মিতি অক্ষুন্নই থাকিত। যথা—

(১) সদাই চঞ্চল | বসন অঞ্চল | সম্বরণ নাহি | করে।
বসি থাকি থাকি | উঠয়ে চমকি | ভূষণ খসিয়া | পড়ে॥

(২) কৃষ্ণচন্দ্র রায় | রাজা ইন্দ্র প্রায় | অশেষ গুণ সা | গর।
তাঁর অভিমত | রচিলা ভারত | কবি রায় গুণা | কর॥

ইহাদের প্রথম চরণের তাৎকালিক উচ্চারণ ছিল :—

(i) sadāi chanchala | basana anchala |
sambarana nāhi | kare

(2) krishna chandra rāāy | rājā indra prāāy |
asesa guna sā | gaar

এই উচ্চারণে পর্বে পর্বে ছয় অক্ষর আছে বলিয়া পর্ব-সম্মিতি অটুট আছে তথাপি হ্রস্বপর্বিক ছন্দে হলন্ত অক্ষরের এই প্রকার সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ কর্ণ-পীড়াদায়ক, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই স্বাভাবিক; আধুনিক যুগের কবিকে উক্ত চরণ দুইটি রচনা করিতে হইলে লিখিতে হইবে :—

(১) সদা চঞ্চল | বসনাঞ্চল | সম্বরণ না | করে
(sadā chaanchaal | basanāānchaal |
saambaraan nā | kare)

(২) কৃষ্ণচন্দ্র | রায় রাজেন্দ্র | অশেষ গুণ | সাগর
(kriishna chaandra | rāāy rājeendra |
aseesh guna sā | gaar)

অনুমান করিবার কারণ আছে যে রবীন্দ্রপূর্ব অধিকাংশ কবিই কেবল প্রথা রক্ষার জন্যই হ্রস্বপর্বিক ছন্দে হলন্ত অক্ষরকে কৃত্রিমভাবে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিতেন, নচেৎ তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দিকে। প্রথমতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা যথাসাধ্য গুরু অক্ষর এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন, উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটির প্রতিটির দ্বিতীয় চরণ উহার প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে ছন্দেরই প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হইয়া মধ্যে মধ্যে হলন্ত অক্ষরে দুর্বল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রয়োগ করিয়া ফেলিতেন। যথা—

(১) ব্রাহ্মণে | মারিয়া- | পুথি নিল | কাড়িয়া- | ডোর দিয়া |
দুই ভুজ | বান্ধে।
ব্রাহ্মণে | না-মার | ব্রাহ্মণে | না-মার | বলিয়া- |
দ্বিজবর | কান্দে ॥

—মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, (দক্ষযজ্ঞ)

(২) সহচরী | গণ যদি | সন্নিধি | আ-ইল |
নম্র মু | খী-অতি | লাজে।
ভারত | চন্দ্র ক | হে-শুন | সুন্দরি |
লা-জক | রো-কোন | কাজে ॥
—ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দরের বিহার

(৩) (ওকে) চিত্ত ছলনা | দৈত্য দলনা | ললনা নলিনী | বিড়ম্বিনী।
—রামপ্রসাদ, শ্যামাসঙ্গীত (কে রে মনোমোহিনী)

(৪) তোমাতে আমাতে | একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী | আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে জানি | আমি ভুজঙ্গ | তুমিই আমার | রতন মণি।
—গোঁজলা গুঁই, (প্রাচীন কবিওয়ালার গান)

(৫) বিল্ব বিটপে | ব্রহ্ম পিশাচ | হাসিছে বাজায়ে | গালে।
—হেমচন্দ্র (ছায়াময়ী কাব্য)

(৬) পিককুল | কলকল | চঞ্চল | অলিদল
উছলে সু.| রবে জল | চলো লো ব | নে।
—মাইকেল মধুসূদন (ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ পর্বগুলি অঙ্গসংকুচিত বিশেষ পর্ব মাত্র; এইগুলিতেই রহিয়াছে অস্বাভাবিক উচ্চারণের প্রতিক্রিয়াজাত সত্য স্বভাবের আত্মপ্রকাশ। চতুরক্ষর হইতে সপ্তাক্ষর পর্যন্ত চতুর্বিধ পর্বে মাত্রাবৃত্তধর্ম অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রবৃত্তি কেবল আধুনিক নহে, চিরন্তনই* বটে।

[অক্ষরবৃত্তের অধিকার কেবল অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বে (৫।১৬ সূত্র)]।

---

*সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের অনুপ্রবেশকে কোন ছান্দসিক এ-যুগেও সমর্থনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি 'ঘোর অন্ধকারে' (ভীতবদনা, পৃথিবী হেরিছে, ঘোর অন্ধকারে, মিশি), 'অরণ্যে খেলিছে' (সন্ধ্যা গগনে, নিবিড় কালিমা, অরণ্যে খেলিছে, নিশি) প্রভৃতি শ্রুতিদুষ্ট পর্বকেও সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—"আশা করি তাহাদিগকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে কেহ সাহস করিবেন না।" কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এইপ্রকার পর্বকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে দ্বিধা করেন নাই ; তিনি বিহারীলালের ছন্দ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"অপ্সরী কিন্নরী | দাঁড়াইয়া তীরে | ধরিয়ে ললিত | করুণ তান

'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর (সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ) লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে।"[১] 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধের তৃতীয় পর্য্যায়েও তিনি লিখিয়াছেন—

"অমৃত নির্ঝরে | হৃৎ পাত্রটি ভরি
কারে সমর্পণ | করিলে সুন্দরি ?

অগ্রাহ্য, অন্তত আধুনিক কালের কানে।"[২]

অবশ্য দেখাইতে পারা যায় যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—

কঠিন বাঁধনে | চরণে বেড়িয়া
চিরকাল তোরে | রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের | ডোর।

কিন্তু এই 'লৌহ শৃঙ্খলের' পর্বে অক্ষরবৃত্ত-ভঙ্গির অবৈধ অনুপ্রবেশকে

১। পৃঃ ১২৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪)
২। পৃঃ ২০০ ঐ

কবি অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার কৈফিয়ৎ হইতেছে—

"মনে খট্‌কা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি। কিন্তু তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক।"[১]

খাঁটি বাংলা ভাষায় চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের ছন্দে বহুকাল প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিকে (হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ) অস্বীকার এবং মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিকে (হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ) গ্রহণ ও উহার নিয়মিত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথেরই কৃতিত্ব। তবে এই সকল দৈর্ঘ্যের পর্বের প্রবর্তনও যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা হইয়াছে, তাহা নহে। সর্ববিধ পর্বের ছন্দই রবীন্দ্রপূর্ব কবিতায় দেখা যায়, যথা—

চতুর্মাত্রিক পর্ব :—

(১) (নাগর হে) গিয়াছিনু | নাগরীর | হাটে।
(তারা) কথায় ম | নের গাঁটি | কাটে॥

—ভারতচন্দ্র

(২) করভের | কর জিনি | বাহুর ব | লনি গো
হিঙ্গুল ম | ড়িত তার | আগে।
যৌবন ব | নের পাখি | পিয়াসে ম | রয়ে গো
উহারি প | রশ রস | মাগে॥

—শ্রীনিবাস আচার্য

(৩) অনুপম | তনু শ্যাম | নিরুপম | আভা
মুখরুচি | কত শুচি | করিয়াছে | শোভা॥

—কাশীরাম দাস

১। পৃঃ ১৯২ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪)

পঞ্চমাত্রিক পর্ব—

(১) হে নটবর । সর হে সর
ছি ছি কি কর । বসন ধর
আমি অবলা । গোপের বালা
হলো কি জ্বালা । ছুঁয়োনা কালা ।

—ঈশ্বর গুপ্ত

(২) সদাই ধায় । নদীর ঢেউ,
রাখিতে তায় । পারে না কেউ,
সময় যায় । তাহারি প্রায়
কাহারো মুখ । চাহে না হায় ।

—মনমোহন বসু

ষণ্মাত্রিক পর্ব—

(১) লঘু ত্রিপদী—

সুখের লাগিয়া । এ ঘর বান্ধিনু । অনলে পুড়িয়া । গেল
অমিয়া সাগরে । সিনান করিতে । সকলি গরল । ভেল ।

—জ্ঞানদাস

(২) লঘুভঙ্গ ত্রিপদী—

হীরা কহে পুন । জোরে
"কুটিনী বলিলি । মোরে ?
রাজার মালিনী । বলিলি কুটিনী । কালি শিখাইব । তোরে ॥"

—ভারতচন্দ্র

(৩) একাবলী—

আনিব তুলিয়া । গগন ফুল
একেক ফুলের । লক্ষেক মূল
সে ফুল গাঁথিয়া । পরাব হার
সোনার বাছারে । না কান্দ আর ।

—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম

(৪) দীর্ঘ একাবলী—

আজি শচীমাতা | কেন চমকিলে
ঘুমাতে ঘুমাতে | উঠিয়া বসিলে
লুণ্ঠিত অঞ্চলে | 'নিমু নিমু' বলে
দ্বার খুলি মাতা | কেন বাহিরিলে ?

—শিবনাথ শাস্ত্রী

সপ্তমাত্রিক পর্ব—

(১) সুশীলা রূপবতী | হরিদ্রাযুত ধুতি | পরিয়া বসিল আ | সনে।
যতেক দ্বিজমণি | করেন বেদধ্বনি | কন্যার গন্ধাধি বা | সনে॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

(২) কুকুরে নাহি কহে | বিরহ দাহে দহে | নয়ন বারি বহে | ভাসিল।
কামিনী অভিলাষ | হইল পরকাশ | মদন কালী আশ | ভাষিল॥

—মদনমোহন তর্কালঙ্কার

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত বটে, কিন্তু স্বভাবধর্মে ইহারা দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত। সেই কারণেই হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ এইগুলিতে কর্ণপীড়া উৎপন্ন করে। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলন্ত অক্ষরগুলি প্রযুক্ত হইলে এইগুলি যে শ্রুতিসঙ্গত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

§ ৬. বিশ্লেষণ-মুখিতা মাত্রাবৃত্তের ধর্ম হইলেও সাধারণতঃ শুদ্ধ বাংলায় 'পাঠ্য' মাত্রাবৃত্তে স্বরান্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট বা দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না ; স্বরান্ত অক্ষর এখানে একাক্ষররূপেই উচ্চার্য।*

[এই স্বর-হ্রস্বতা 'গেয়' কবিতায় প্রযোজ্য নহে, 'পাঠ্য' কবিতাতেই প্রযোজ্য ; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের ভাষা ও ব্রজবুলি পদের ভাষা 'শুদ্ধ বাংলা' নহে, সেখানেও স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রচলিত। পরবর্তী ৯ম সূত্র দ্রষ্টব্য।]

---

* ইহা মাত্রাবৃত্তে স্বরান্ত অক্ষরের উচ্চারণ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র।

স্বরান্ত অক্ষরের হ্রস্ব উচ্চারণই বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকরণে বাংলা লিপিতে দীর্ঘ আ, ঈ, ঊ, এ, ও আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণে ইহারাও হ্রস্ব। ধ্বনির দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া বাঙ্গালীর কণ্ঠে 'দীনবন্ধু'র সহিত 'দিনবন্ধু'র অথবা 'কূলের কথা'র সহিত 'কুলের কথা'র কোন পার্থক্য নাই।

মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘ স্বরবর্ণেরও হ্রস্ব উচ্চারণ

তথাপি কয়েকজন কবি সংস্কৃত অনুকরণে বাঙ্গালীর উচ্চারণ অস্বীকার করিয়া 'পাঠ্য' মাত্রাবৃত্তেই দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। যেমন কোন কবি 'তোটক' ছন্দে রচনা করিয়াছেন—

অচিরে নগরে উপনীত সবে

পাঠকের কাছে কবির প্রত্যাশা নিম্নপ্রকার উচ্চারণ ঃ—

achiree | nagaree | upanii | ta sabee

কিন্তু এইভাবে 'অচিরে'কে 'অচিরেএ' এবং 'উপনীত'কে 'উপনিইত' উচ্চারণ বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি বিরুদ্ধ। তাই বাঙ্গালীরা উচ্চারণ করেন—

achire nagare | upanita sabe

ফলে কবির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, ছন্দের আর 'তোটক'ত্ব থাকে না। ভারতচন্দ্রের মতো শক্তিশালী শব্দকুশলী কবির ভাগ্যেও এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে; তাঁহার 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' ছন্দ রচনা দ্রষ্টব্য—

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে॥

ইহাতে কবির প্রত্যাশিত উচ্চারণ—

চলেএ ডাআ | কিনিই যোও | গিনিই ঘোও | র বেএশেএ।
চলেএ শাঁআ | খিনিই পেএ | তিনিই মুক্ | ত কেএশেএ॥

সংস্কৃত প্রভাবে দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণে বাংলা শব্দের মূর্তি যে কতখানি কিম্ভূতকিমাকার হইতে পারে, উল্লিখিত দৃষ্টান্তই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।
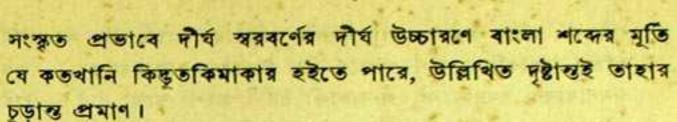
[পাঠ্য মাত্রাবৃত্তে সংস্কৃত-অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রচলিত করার স্বপক্ষে কোন বিশিষ্ট লেখকের ওকালতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, পদ্যে এই দীর্ঘ উচ্চারণ সমর্থনীয়, কারণ—

(১) "ছন্দের কল্লোলে সে বহুদিন হ'ল আশ্রয় পেয়েছে।"

(২) "কাব্য জগতে ব্যতিক্রম বলে কোন বস্তু নেই……প্রতিভার কাজ দেখানো কোন পথে অসম্ভব সম্ভব হয়।"

(৩) "ছন্দে অনভ্যস্ত ভঙ্গি মাত্রই কৃত্রিম নয়।"

(৪) "এক হিসেবে সব ছন্দই কৃত্রিম, বিশেষ করে উচ্চ-বিকশিত ছন্দভঙ্গি।"

এই যুক্তিগুলির উত্তর যথাক্রমে—

(১) অল্প কয়েক জনের অভ্যস্ত হইলেই বস্তু গ্রহণীয় হয় না। নেশা করা নেশাখোরের অভ্যাস, তথাপি ইহা পরিত্যাজ্য।

(২) কাব্য জগতেও সীমা আছে। প্রতিভা সম্ভাব্যকেই সম্ভব করে, অসম্ভবকে নহে; প্রতিভা অন্ধকারকে আলো, মশাকে হাতী করিতে পারে না।

(৩) অভ্যস্ত হওয়াই অকৃত্রিমতার লক্ষণ নহে।

(৪) সৌন্দর্য যেখানে স্বভাবাতিরিক্ত সেখানেও স্বভাববিরোধী নহে। তাই ধ্বনি-সৌন্দর্য হিসাবে যথার্থ ছন্দ কখনই কৃত্রিম নহে।

বঙ্গ সাহিত্যে দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ সত্যকার আশ্রয় পায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর অল্প কয়েকজন গোঁড়া সংস্কৃত পণ্ডিত বঙ্গভাষার স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে না পারিয়া বাঙ্গালীর উচ্চারণকে বিকৃতি বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহারাই সাধারণতঃ দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণে বাংলা কবিতা লিখিয়াছেন। তাছাড়া কেহ কেহ

কৌতুক সৃষ্টির জন্য বাংলা পণ্ডিতী কবিতায়* সংস্কৃত ছন্দ আমদানি করিয়া তথাকথিত দীর্ঘ স্বরবর্ণে দীর্ঘ উচ্চারণ চালাইয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ কখনই এই অ-বাঙ্গালী রীতি গ্রহণ করে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ পত্রে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন, "দীর্ঘ-হ্রস্ব সম্বন্ধে আর একবার বলি। ও এক বিশেষ ধরণের লেখায় বিশেষ ভাষা-রীতিতেই চলতে পারে।······বাংলার উচ্চারণ রীতিকে মেনে চলে যে ছন্দ তার চলা ফেরা কোনো গণ্ডীর মধ্যে নয়। তা পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল পাঠকের পক্ষেই সুগম। তুমি বলতে পার—সকল কবিতাই সকলের পক্ষে সুগম হবে এমনতরো কবুলতিনামায় সই দিতে বাধ্য করতে পারিনে। সে তর্ক খাটে ভাবের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, কিন্তু ভাষার সর্বজনীন উচ্চারণ-রীতির দিক থেকে নয়।"[১]

কবিগুরু অন্যত্র বুঝাইয়াছেন—"ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।"[২]]

§ ৭. 'গেয়' কবিতাতে অতি-সংকুচিত পর্বের মাত্রাবৃত্তে আদর্শ পর্বদৈর্ঘ্য-পূরণার্থে স্বরান্ত অক্ষরের প্রয়োজন মতো দীর্ঘীকরণ হয়।

[অক্ষরের দীর্ঘীকরণের অর্থ উহার স্বর বৃদ্ধি।]

সাধারণতঃ স্বর-সম্প্রসারণে গানের সুরের বিকাশ হয়, সেইজন্য

---

* যথা—(১) 'শিখরিনী' ছন্দে রচিত—(হ্রস্ব চিহ্ন ⏑, দীর্ঘ চিহ্ন —)

⏑ — — — — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — — ⏑ ⏑ ⏑ —
বি লা তে পা লা তে | ছ ট ফ ট ক রে ন ব্য গ উ ড়ে
(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(২) 'স্রগ্ধরা' ছন্দে রচিত—

— — — — ⏑ — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ —
রা ত্রৌ তী ব্রা ন্ধ কা রে | চো খে কি ছু দে খি না |
— ⏑ — — ⏑ — —
ঘা-শু তা খা ই ক পা লে। (উদ্ভট)

১। পৃঃ ২৫১ রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪) ২। পৃঃ ১২২—ঐ

গানে 'সা'কে 'সাআ', 'রে'কে 'রে-এ', 'নি'কে 'নিই' রূপে উচ্চারণ করা হয়। গানে স্বরধ্বনির এই প্রকার দ্বিমাত্রিক দীর্ঘীকরণই যে হয়, তাহা নহে; প্রয়োজন-অনুসারে বহুমাত্রায় দীর্ঘীকরণও হইয়া থাকে। তাই 'গেয়' কবিতা প্রায়ই ছন্দোহীন হইয়া রচিত হয়।

'গেয়' কবিতায় স্বরান্ত অক্ষরের সুদীর্ঘ উচ্চারণ

গানের কথাকে মধ্যে মধ্যে বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়া ও ছন্দোহীন করিয়া রচনা না করিলে গায়ক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তালে তালে স্বরপ্রসারণের দ্বারা ছন্দোহীন রচনায় হ্রস্বতর পর্বকে সমদীর্ঘ ও ছন্দোময় করিয়া তোলা গায়কের কৃতিত্ব। যথা—

জগৎ পিতা তুমি বিশ্ববিধাতা।
আমরা তোমারি কুমার কুমারী
তুমি হরি সব সুখ দাতা॥

এই দৃষ্টান্তের কয়েকটি পর্ব অতি-সংকুচিত বলিয়া পাঠকের কাছে যদিও রচনাটি ছন্দোহীন বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু গানের সময়ে ইহাকেই ছন্দোময় প্রতীত হয়। কারণ গানে ইহার সংকুচিত হ্রস্ব-পর্বকে চতুর্মাত্রায় প্রসারিত করিয়া সকল পর্বকেই সমদীর্ঘ করিয়া তোলা হয়। যথা—

[সাধারণ অবস্থার হসন্ত শব্দ গানে অ-কারান্ত হইয়াই উচ্চারিত হয়,— 'জগৎ' হয় 'জগত', 'কুমার্' হয় 'কুমার্অ', 'সব্' হয় 'সব্অ'।]

jagata pi | tāā tumi | biissa bi | dhāātāā
āmarā to | māārii kumāra ku | māārii
tumi hari | saba sukha | dāāāā | tāāāā

ইহার নিম্নরেখ অক্ষরগুলির স্বরবৃদ্ধি দ্রষ্টব্য। শেষ চরণের 'দাতা' শব্দের 'দা' এবং 'তা' একেবারে চার মাত্রায় দীর্ঘীকৃত হইয়াছে। এইরূপ দুইয়ের অধিক মাত্রায় সম্প্রসারণ 'গানে' স্বাভাবিক হইলেও 'পাঠে'র পক্ষে অস্বাভাবিক।

§ ৮. 'গেয়' এবং 'পাঠ্য' উভয় উদ্দেশ্যে রচিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশেষ কবিতায় সংকুচিত পর্বের আদর্শ দৈর্ঘ্য পূরণে স্বরান্ত অক্ষরেরও দ্বিমাত্রিক দীর্ঘীকরণ হইয়া থাকে।* সেই জন্য এই প্রকার বিশিষ্ট মাত্রাবৃত্তের নাম—'স্বর-প্রসারক মাত্রাবৃত্ত'।

স্বর প্রসারক মাত্রাবৃত্ত

সাধারণ মাত্রাবৃত্তে পর্বদৈর্ঘ্য পূরণের প্রয়োজন থাকে না এবং হলন্ত অক্ষরের মাত্র স্বর-প্রসারণ হয়। স্বর-প্রসারক মাত্রাবৃত্তে হলন্ত অক্ষরের স্বর-প্রসারণ হয়ই, তাছাড়া প্রয়োজন মত স্বরান্ত অক্ষরেরও স্বর-প্রসারণ ঘটে।

কবিতা 'পাঠ্য' হইলে উহা 'গেয়' কবিতার ন্যায় ছন্দোবন্ধন অস্বীকার করিয়া রচিত হইতে পারে না। সেই জন্য স্বর-প্রসারক মাত্রাবৃত্তের স্বর-প্রসারণ যথেচ্ছ হইতে পারে না, দ্বিমাত্রিকতায় সীমাবদ্ধ হয়, কারণ ইহা কেবল 'গেয়' নহে 'পাঠ্য'ও বটে। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দীর্ঘ স্বরবর্ণই (আ, ঈ, ঊ, এ, ও) দ্বিমাত্রিক উচ্চারণের ক্ষেত্র। (সাঙ্গীতিক কবিতায় সাধারণ হসন্ত শব্দ অকারান্ত রূপেই উচ্চারিত হয়।) যথা—

(১) দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী
আসিল যত | বীর বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি

উচ্চারণ—

deesa deesa | naandita kari | maandrita taba | bheerii
āāsila jāta | biira briinda | āāsana taba | gheerii

(২) হিংসায় উন্ | মত্ত পৃথ্বী | নিত্য নিঠুর | দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল | পন্থ তার | লোভ | জটিল | বন্ধ

---

* ইহা স্বরবৃদ্ধির বিশেষ সূত্র।

উচ্চারণ—

hiinsāāy uun | maatta priitthi | niitta niṭhura | daanda
ghoora kuṭila | paantha tāāra | loobha jaṭila | baandha

(৩) (এস) প্রাণ স | খা এস | প্রাণে
(এস) দীর্ঘ বি | রহ অব | সানে

উচ্চারণ—

(esa) prāāna sa | khāā esa | prāānee
(esa) diirgha bi | raha aba | sāānee

(৪) মম চিৎ | তে
নিতি নৃৎ | তে
কে যে না | চে

উচ্চারণ—

mama chiit | tee
niti nriit | tee
ke je nāā | chee

(ইহাতে প্রয়োজন অনুসারে 'তে' 'না' ও 'চে' উচ্চারণে স্বরবৃদ্ধি দ্রষ্টব্য।)
তবে এই জাতীয় কবিতাতেও দীর্ঘ স্বরবর্ণের 'হ্রস্ব' উচ্চারণ বিরল নয়। ইহার কারণ বাঙ্গালীর কণ্ঠে 'দীর্ঘ' বর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণই স্বাভাবিক এবং দীর্ঘ উচ্চারণ বরং কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন—"সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা স্বরবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘতার প্রচলন করতে গেলে এই কৃত্রিমতা বেশীক্ষণ সয় না।"[১] যথা, 'জনগণ-মন-অধিনা-য়ক' গানে—

পঞ্জাব | সিন্ধু | গুজরাট | মারাঠা | দ্রাবিড় | উৎকল | বঙ্গ
বিন্ধ্য হি | মাচল | যমুনা | গঙ্গা | উচ্ছল | জলধি ত | রঙ্গ

১। পৃঃ ২৩০ রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪)

এখানে কবি 'দীর্ঘ' স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ চালাইতে গিয়াও সর্বত্র রীতি রক্ষা করিতে পারেন নাই—'পঞ্জাব' ও 'গুজরাট' শব্দের আ-বর্ণে এবং 'মারাঠা' শব্দের তিনটি 'আ'র দুইটিতে ('মা' ও 'রা') বঙ্গীয় হ্রস্ব উচ্চারণই করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা—

p a a n j ā ba | s i i n d h u u | g u u j r ā ṭ a |
m ā r ā ṭ h ā ā | d r ā ā b i r a | u u t k a l a | b a a n g a
b i i n d h y a h i | m ā ā c h a l a | j a m u n ā ā |
g a a n g ā ā | u u c h c h h a l a | j a l a d h i
t a | r a a n g a

উল্লিখিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'তেও দীর্ঘ ঈ কারান্ত 'থ্বী'ও এইভাবে হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কবিতার অনুকরণে রচিত অনুপ্রাসযুক্ত ও সমাসবদ্ধ পদ-সম্বলিত সংস্কৃত-প্রায় বহু গানে ও কবিতাতেও সেই জন্য 'দীর্ঘ' স্বরবর্ণের উচ্চারণে বাঙ্গালী হ্রস্ব রীতিকেই জয়ী হইতে দেখা যায়। যথা—

মনো মন্দির | সুন্দরী
মণি মঞ্জীর | গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা | চল চঞ্চলা | অয়ি মঞ্জুলা | মঞ্জরী !
রোষারুণ রাগ | রঞ্জিতা
বঙ্কিম ভুরু | ভঙ্গিতা
গোপন হাস্য | কুটিল-আস্য | কপট কলহ | গঞ্জিতা !
—'চিরকুমার সভা'র গান

সূক্ষ্ম বিচারে গান ও পাঠের উভচর বাংলা কবিতায় 'দীর্ঘ স্বর-বর্ণে'র দ্বিমাত্রিক উচ্চারণের মূলে সংস্কৃত-প্রভাব স্বীকার্য নহে ; কারণ এই প্রকার উচ্চারণ আসলে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য পূরণার্থ স্বর-সম্প্রসারণ মাত্র। স্বর প্রসারক মাত্রাবৃত্ত সংস্কৃত প্রভাব জাত হইলে হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষরের কথনই দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হইত না। কিন্তু বাংলায় পর্ব দৈর্ঘ্য পূরণে
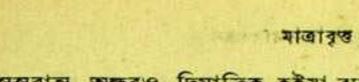
হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক হইয়া ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা' চরণের 'সিন্ধু' শব্দের 'ধু' হ্রস্বস্বরান্ত হইলেও উচ্চারণে দীর্ঘীকৃত। সংস্কৃত প্রভাব নহে, গানের সুর-প্রভাবই এই দীর্ঘীকরণের জন্য দায়ী। সেই জন্য 'বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা'র 'যমুনা'কে **jamunāā** না বলিয়া কেবল 'য' কে দীর্ঘীকৃত করিয়া **jaamunā** বলিয়া উচ্চারণ করিলেও ছন্দ-পতন হয় না। সুর-প্রভাবে পর্বদৈর্ঘ্য-পূরণে অক্ষরের স্বর-সম্প্রসারণ করা চিরন্তন রীতি, কেবল প্রাচীন রীতি নহে। সেই জন্য একাধারে 'গেয়' ও 'পাঠ্য' কবিতার মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে 'প্রত্ন রীতির মাত্রাবৃত্ত' বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। বরং অতিরিক্ত ক্ষেত্রে স্বর প্রসারণের জন্য এই প্রকার ছন্দকে 'স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত' বলাই সঙ্গত। 'সাধারণ মাত্রাবৃত্তে' কেবল হলন্ত অক্ষরের স্বরপ্রসারণ, কিন্তু 'স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্তে' তদতিরিক্ত স্বরান্ত অক্ষরেরও স্বরপ্রসারণ ঘটে। 'সাধারণ মাত্রাবৃত্তে'র সীমা সংকীর্ণ—আধুনিক যুগের 'পাঠ্য' কবিতাতেই সীমাবদ্ধ, অপর পক্ষে 'স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্তে'র প্রচলন-কাল ব্যাপক—প্রাচীন যুগে ও আধুনিক যুগে যুগপৎ 'গেয়' ও 'পাঠ্য' কবিতায় প্রসারিত। আধুনিক যুগের স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্তের অন্যান্য দৃষ্টান্ত পরবর্তী দশম সূত্রে দ্রষ্টব্য।

§ ৯. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত চর্যা ভাষা ও ব্রজবুলি ভাষার ছন্দ হইতেছে স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত; ইহাতে পর্বের দৈর্ঘপূরণার্থে, হ্রস্ব-স্বরান্ত অক্ষরেরও দ্বিমাত্রিক দীর্ঘীকরণ ঘটে।

চর্যাছন্দ ও ব্রজবুলির ছন্দ স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত

চর্যাপদ এবং ব্রজবুলি পদ যুগপৎ 'গেয়' এবং 'পাঠ্য' দুইই। প্রাচীন যুগে অ-কারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না, সেইজন্য চর্যা ও ব্রজবুলির অ-কারান্ত শব্দগুলি হসন্তরূপে নহে, অ-কারান্ত রূপেই উচ্চার্য।

চর্যাপদে কেবল চতুর্মাত্রিক পর্বের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—
[নিম্ন দৃষ্টান্তে বর্ণান্তিক হাইফেন (-) স্বরপ্রসারণের চিহ্ন।]

(১) অ লি এঁ - | ক লি এঁ - | বা ট রু ন্ | ধে -লা -
তা - দে খি | কা হ্নু - | বি - ম ন | বৈ লা -

(২) দি ব স ই | ব হু ড়ী কা | ঋ ই ড রে | ভা - ই -
রা - তি - | ভ ই লে - | কা - ম রু | যা - ই -

(৩) রাউতু ভ | নই কট | ভুসুকু ভ | নই কট | সঅলা- |
অইস স | হা-ব-
জই তো- | মু-ঢ়া- | অচ্ছসি | ভান্তী- | পুচ্ছতু | সদ্‌গুরু | পা-ব-

১ম দৃষ্টান্তের 'হ্নু' (কাহ্নু) 'বি' (বিমন) এবং ২য় দৃষ্টান্তের 'তি' (রাতি) বানানে হ্রস্ব স্বরান্ত, কিন্তু উচ্চারণে দীর্ঘীকৃত।

ব্রজবুলি পদের ছন্দ :—

চতুর্মাত্রিক পর্ব :—

(১) চম্পক | শো-ন কু | সুম কন | কা-চল | জিতল 'গ | উর' তনু |
লা-বণি | রে-
উন্নত | গী-ম 'সি | ইম' নাহি | অনুভব | জগমনো | মো-হন |
ভা-ঙনি | রে-

এখানে 'গৌর' 'গউর'ভাবে এবং 'সীম' 'সিইম'ভাবে উচ্চারিত।

(২) কণ্টক | গা-ড়ি ক | মল সম | পদতল | মঞ্জীর | চী-রহি | ঝাঁ-পি-
গা-গরি | বা-রি- | ঢারি করি | পি-ছল | চলতহি | অঙ্গুলি | চা-পি-

এখানে 'বারি'র 'রি' এবং 'পিছল' শব্দের 'পি' বানানে হ্রস্ব স্বরান্ত কিন্তু উচ্চারণে দীর্ঘীকৃত।

পঞ্চমাত্রিক পর্ব :—

তুঙ্গ মণি | মন্দিরে- | ঘন বিজুরি | সঞ্চরে- | মে-ঘ রুচি |
বসন পরি | ধা-না-
যত যুবতি | মণ্ডলী- | পন্থ ইহ | পে-খলি- | কো-ই নহি |
রা-ইক স | মা-না-

এখানে 'পেখলি'র 'লি' দীর্ঘীকৃত।

ষণ্মাত্রিক পর্ব :—

কটি কা-ছনি | বঙ্কিম ধটি | বেণুবর বাম। কাঁ-খে-
জিতি কুঞ্জর | গতি মন্থর | 'ভায়্যা ভায়্যা' বলি | ডা-কে-

সপ্তমাত্রিক পর্ব :—

কুলিশ শত শত | পা-ত মো-দিত | ময়ুর না-চত | মা-তিয়া-
মত্ত দা-হুরি | ডা-কে ডা-হুকি | ফা-টি যা-ওত | ছা-তিয়া-

চর্যাপদের ও ব্রজবুলি পদের কোন কোন চরণ কিন্তু 'পাঠ্য' ধর্ম অগ্রাহ্য করিয়া কেবল 'গেয়' রূপেই রচিত। এইগুলিতে ছন্দোবিধি অস্বীকার করিয়া পর্বদৈর্ঘ্য রক্ষার প্রয়োজনে কেবল স্বর প্রসারণ নহে, স্বর-সংকোচনও দেখা যায়। যথা—

চর্যায়—

তিঅড়া চা | পী জোইনি | দে অঙ্ক | বা-লী-
কমল কু | লিশ ঘাণ্টে | করহুঁ বি | আ-লী-

ব্রজবুলিতে—

নী-রদ | নয়নে- | নীর ঘন | সিঞ্চনে | পুলক মু | কুল অব | লম্ব।
স্বে-দ ম | করন্দ | বিন্দু বিন্দু | চু-য়ত | বিকশিত | ভা-ব ক | দম্ব ॥

উল্লিখিত নিম্নরেখ পর্ব দুইটিতে 'ঘান্' (ঘাণ্টে) এবং 'বিন্' (বিন্দু) অক্ষরে প্রত্যাশিত স্বরসম্প্রসারণের পরিবর্তে স্বর-সংকোচনই হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এগুলি নিপাতনেরই দৃষ্টান্ত।

§ ১০. বিশেষ দৈর্ঘ্যের পর্ব-উচ্চারণে পাঠক অভ্যস্ত হইয়া গেলে 'পাঠ্য' কবিতার বিশেষ ক্ষেত্রেও উক্ত দৈর্ঘ্যের স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এক্ষেত্রেও পর্ব-পূরণের প্রয়োজনে স্বরান্ত অক্ষর দুই মাত্রায় দীর্ঘীকৃত হয়।*

---

* ইহাও স্বরবৃদ্ধির বিশেষ সূত্র। (§ ৮. দ্রষ্টব্য)

স্বরযুক্ত ছেলে-ভুলানো ছড়া এবং গানের প্রভাবেই অতি-সঙ্কুচিত পর্বের 'পাঠ্য' কবিতা রচিত হয়। পাঠ্য কবিতায় অতি-সঙ্কুচিত পর্ব রচনা করা কবির পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অতি-সঙ্কুচিত পর্বে স্বরান্ত অক্ষরের সম্প্রসারণ গায়কের ন্যায় পাঠকেরই মেরামতি কাজ এবং মেরামতি দ্বারা ছন্দ রক্ষা করা পাঠকেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক। নিম্নপ্রকার উচ্চারণে ছন্দের মেরামতি কাজ দ্রষ্টব্য :—

'পাঠ্য' কবিতায় স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ

(১) সাত ভাই | চম্পাআ | জাআগোও
জাআগোও | জাগো মোর | সাত ভাই।

[মূল পাঠ—'চম্পা', 'জাগো'

(২) পরাজিত তুই | সকল ফুলের | কাছে
তবু কেন তোর | অঅ পরাজিতা | নাম ?

[মূল পাঠ—'অপরাজিতা'

(৩) রূউঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমাসুন্দর | চক্ষে

[মূল পাঠ—'রূঢ়'

(৪) পড়শীর কণ্ঠেএ | জাগলোও | সাআড়াআ

[মূল পাঠ—'কণ্ঠে', 'জাগলো', 'সাড়া'

দাঁআড়াআ | আপনার | পাআয়েএ | দাঁআড়াআ

[মূল পাঠ—'দাঁড়া' এবং 'পায়ে'

(৫) "অঅ বটে | এই বুঝি | দেখলুম | দেখলুম !" [মূল পাঠ—অ
"ছিই ওকি | রাগ করে | তুই ভাই | যাচ্ছিস্ !" „ ছি
"তাআ তুমি | বলবে না | থাকবার | দরকার ?" „ তা
"হুঁউ বলি | আয় কাছে | "—ফুসফুস | ফিসফিস্ „ হুঁ
"এএ কিএ | ছাই কথা | "—ফুসফুস | ফিসফিস্ „ এ
—ধাঁআ করে | ভেংচিয়ে | কম্লীর | প্রস্থান, „ ধাঁ
হাঁআ করে | চেয়ে রয় | ফটুকের | দুই চোখ। „ হাঁ

অবশ্য কবিতায় এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে কবির লিপি-দোষে এবং পাঠকের চক্ষু-নির্ভরতার জন্য চরণের অন্ত্য ও খণ্ড পর্বকে মুখ্য ও পূর্ণ পর্ব বলিয়া ভুল হয়; হ্রস্বরূপের জন্য এইগুলিকেও মনে হয়—প্রসারণ-সাপেক্ষভাবে রচিত অতি-সঙ্কুচিত পর্ব। সেই জন্য চক্ষুপ্রতারিত পাঠক এইগুলিতেও স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ করিয়া ছন্দো রক্ষার চেষ্টা করেন। যথা—

(১) ঝর্ণাআ | ঝর্ণাআ | সুন্দরী | ঝর্ণা
তরলিত | চন্দ্রিকা | চন্দন | বর্ণা

(২) হাঁস ছিল | সজারুউ | ব্যাকরণ | মানিনা
হয়ে গেল | হাঁসজারু | কেমনে তা | জানিনা

(৩) (মধু) গন্ধে ভ | রাআ মৃদু | স্নিগ্ধ ছা | য়াআ নীপ | কুঞ্জত | লে
(শ্যাম) কান্তি ম | য়ীই কোন | স্বপ্ন মা | য়া ফিরে | বৃষ্টি ছ | লে

কিন্তু পাঠকের পক্ষে নিম্নরেখ অংশে উল্লিখিতরূপে স্বর সম্প্রসারণ করিয়া ছন্দ রক্ষা করার সত্যকার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ এইগুলি আসলে চরণের অন্ত্যপর্বের ক্ষেত্র; এইগুলিতে মোটেই অতি-সঙ্কোচন নাই, কাজেই পাঠকের দ্বারা উচ্চারণে দীর্ঘীকরণের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইহারা সাধারণ মাত্রাবৃত্তই বটে, স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্ত নহে। ইহাদের প্রকৃত বিন্যাস নিম্নপ্রকার :—

(১)
ঝর্ণা
ঝর্ণা
সুন্দরী | ঝর্ণা
তরলিত | চন্দ্রিকা | চন্দন | বর্ণা।

(২)
হাঁস ছিল | সজারু
ব্যাকরণ | মানিনা
হয়ে গেল | হাঁসজারু | কেমনে তা | জানিনা।

(৩) (মধু) গন্ধে ভ | রা
(মৃদু) স্নিগ্ধ ছা | য়া
(নীপ) কুঞ্জ ত | লে।
(শ্যাম) কান্তি ম | য়ী
(কোন) স্বপ্ন মা | য়া
(ফিরে) বৃষ্টি ছ | লে॥

§ ১১. সাতের অধিক মাত্রায় মাত্রাবৃত্তের পর্ব রচিত হইতে পারে না, রচনা করিলে উহা ক্ষুদ্রতর পর্বে বিভক্ত হইয়া যায়।

মাত্রাবৃত্তের পর্ব দৈর্ঘ্যের সীমা

মাত্রাবৃত্ত দুর্বল প্রকৃতি-বিশিষ্ট এবং সুদীর্ঘ একটানা উচ্চারণ সবলতারই প্রকাশক, সেই জন্য অল্প দৈর্ঘ্যের পর্ব উচ্চারণের দিকেই মাত্রাবৃত্তের প্রবৃত্তি। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, বাংলায় সর্বত্রই মাত্রাবৃত্তের পর্বের ঊর্দ্ধ-সীমা সাত মাত্রা এবং নিম্ন-সীমা চার মাত্রা। দুর্বল প্রবৃত্তির বশে চালিত পাঠক তাই সর্বপ্রথম চার মাত্রাতেই যতি দিয়া পর্ব-উচ্চারণের চেষ্টা করে। এই জন্য কবি যদিও আট মাত্রায় মাত্রাবৃত্তে পর্ব রচনা করেন, তথাপি কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না কারণ পাঠক একটি আট মাত্রার পর্বকে দুইভাগ করিয়া উহাকে দুইটি চার মাত্রারই পর্বরূপে উচ্চারণ করে। যথা—

চন্দন চর্চিত | নী-ল কলে-বর | পী-ত বসন বন | মা-লী-

ইহার যথার্থ উচ্চারণ হয়—

চন্দন | চর্চিত | নী-ল ক | লে-বর | পী-ত ব | সন বন | মা-লী-

কোন কোন ক্ষেত্রে কবি এমন সুকৌশলে রচনা করেন যে দৃশ্যতঃ কোন চরণকে চার চার মাত্রায় ভাগ করা যায় না, আট মাত্রাতেই ভাগ করিতে হয় যথা—

(১) নীল সিন্ধুজল | ধৌত চরণতল | অনিল বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল

(২) চম্পক শো-ন কু | সুম কনকা-চল | জিতল গৌর তনু | লা-বণি রে-

ইহাদের প্রথম দৃষ্টান্তের বাধা 'সিন্ধু'; চার চার মাত্রায় পর্ব ভাগ করিতে গেলে মনে হয় একদিকে 'নীল সি' ও অপরদিকে 'ন্ধু জল' হইয়া চার্‌মাত্রা হইতেছে না। সেইরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাধা 'গৌর', একদিকে 'জিতল গৌ' অপরদিকে 'রতনু' হইয়া চার চার মাত্রার পরিবর্তে পাঁচ মাত্রা ও তিন মাত্রার পর্ব সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে মাত্রাবৃত্তে দ্বিমাত্রিক অক্ষর দৃশ্যতঃ ভাগ করা সম্ভব না হইলেও শ্রুতিতে ভাগ করা যায়। 'সিন্ধু' 'সিইন্‌ধু' হইয়া এবং 'গৌর' 'গউর' হইয়া উচ্চারিত হয় বলিয়াই উচ্চারণকালে ইহাদের বিভাজন সম্ভব। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটির যথার্থ উচ্চারণ হয় চার মাত্রায় নিম্নপ্রকারে—

(১) n i i l a s i | i n d h u j a l a | d h a u t a cha |
r a n a t a l a
a n i l a b i | k a a m p i t a | s y ā ā m a l a |
a a n c h a l a

(২) c h a a m p a k a | s o o n a k u | suma kana | kāāchala
j i t a l a g a | u r a t a n u | l ā ā b a n i | r e e

ঝুল্লণা ছন্দে দশ মাত্রায় মাত্রাবৃত্তের পর্ব রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'কার—

পঢ়ম দহ দিজ্জিআ- | পুনবি তহ কিজ্জিআ-
পুনবি দহ সত্ত তহ | বিরই জা-আ-

অর্থাৎ প্রথমে দশ মাত্রায়, পুনর্বার দশ মাত্রায়, আবার দশ ও সাত মাত্রায় বিরতি—ইহাই ঝুল্লণা ছন্দ।

কিন্তু পাঠক পর্বগুলিকে পাঁচ পাঁচ মাত্রায় ভাগ করিয়া পাঠ করেন। যথা—

paḍhama daha | diijjiāā | punabi taha | kiijjiāā
punabi daha | saatta taha | birai jāā | āā

তুলনীয়—

তুঙ্গ মণি | মন্দিরে- | ঘন বিজুরী | সঞ্চরে- | মে-ঘ রুচি | বসন পরি | ধানা

এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নয় মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত দেখাইবার চেষ্টায় নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি লইয়া পৃথক পৃথক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন :—

(১) আঁধার রজনী পোহাল | জগৎ পূরিল পুলকে
(২) সেতারের তারে ধানসী | মিড়ে মিড়ে ওঠে বাজিয়া
(৩) মোর বনে ওগো গরবী | এলে যদি পথ ভুলিয়া
(৪) বারে বারে যায় চলিয়া | ভাসায় নয়ন নীরে সে
(৫) আসন দিলে অনাহূতে | ভাষণ দিলে বীণা তানে
(৬) বলেছিনু বসিতে কাছে | দেবে কিছু ছিল না আশা
(৭) বিজুলি কোথা হতে এলে | তোমারে কে রাখিবে বেঁধে
(৮) আলো এলো যে দ্বারে তব | ওগো মাধবী বনছায়া

কিন্তু উচ্চারণকালে এইগুলি নিম্ন-প্রদর্শিতরূপে ক্ষুদ্রতর পর্বে বিভক্ত হইয়া যায়। যথা—

(১) আঁধার রজনী | পোহাল
জগৎ পূরিল | পুলকে
(২) সেতারের তারে | ধানসী
মিড়ে মিড়ে ওঠে | বাজিয়া
(৩) মোর বনে | ওগো গর | বী
এলে যদি | পথ ভুলি | য়া
অথবা
মোর বনে ওগো | গরবী
এলে যদি পথ | ভুলিয়া
(৪) বারে বারে | যায় চলি | য়া
ভাসায়ে ন | য়ন নীরে | সে
অথবা
বারে বারে যায় | চলিয়া
ভাসায়ে নয়ন | নীরে সে

(৫) আসন দিলে অনা | হুতে
ভাষণ দিলে বীণা | তানে

অথবা

(আসন) দিলে অনাহুতে
(ভাষণ) দিলে বীণা তানে

(৬) বলেছিনু | বসিতে কা | ছে
দেবে কিছু | ছিল না আ | শা

(৭) (বিজুলি) কোথা হতে এলে
(তোমারে) কে রাখিবে বেঁধে

অথবা

বিজুলি কোথা হতে | এলে
তোমারে কে রাখিবে | বেঁধে

(৮) (আলো) এল যে দ্বারে তব
(ওগো) মাধবী বন-ছায়া

কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারও চার মাত্রার পর্বের সঙ্গে দশ মাত্রার পর্ব ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন :—

ফেনিল লহরী দলে যায় (বায়ু) চলে যায়
(যেথা) মন যায়।
শীতল অতল পারাবার (পেয়ে) সাড়া তার
(ডাকে) ঝঞ্ঝায়।

ইহার চরণের প্রথম পর্বটিকে দশ মাত্রার পর্ব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আসলে উচ্চারণকালে এই দশ মাত্রা থাকে না। ইহার যথার্থ পর্ব-বিভাগ নিম্নপ্রকার :—

ফেনিল লহরী | দলে যায়, বায়ু | চলে যায়, যেথা | মন যায়।
শীতল অতল | পারাবার, পেয়ে | সাড়া তার, ডাকে | ঝঞ্ঝায়॥

§ ১২. অযুগ্ম মাত্রিক অর্থাৎ পাঁচ বা সাত মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্ত বিশিষ্ট প্রকৃতির ছন্দ; উচ্চারণকালে ইহার পর্বান্তিক যতি হয়

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং ইহার পূর্ণ পর্ব হয় দ্বিখণ্ডিত :—পর্বের প্রথম খণ্ড হয় সাধারণতঃ তিন মাত্রার এবং দ্বিতীয় খণ্ড হয় অবশিষ্ট দুই বা বা চার মাত্রার।

অযুগ্ম মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'বিষম চলনের ছন্দ'। "বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি ও বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।"[১] "দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।"[২] সেইজন্য তিন মাত্রার শব্দ গতিবেগ সৃষ্টি করে এবং দুই মাত্রার অথবা চার মাত্রার (দ্বিগুণিত দুই মাত্রার) শব্দ গতিবেগে বাধা দেয়। গতিকে বাদ দিলে ছন্দই থাকে না, কারণ গতিসৌন্দর্যই ছন্দ। চলনের নিয়ম হইতেছে—আগে গতি পরে বাধা, আগে বাধা পরে গতি নহে। সেইজন্য পঞ্চমাত্রিক পর্বের অন্তর্বিভাগ ৩+২ মাত্রায় এবং সপ্তমাত্রিক পর্বের অন্তর্বিভাগ ৩+৪ মাত্রায় হইয়া থাকে। যথা—

পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের বিশিষ্টতা

পঞ্চমাত্রিক পর্ব (৩+২) :—

আধেক : কায়া | আধেক : ছায়া
জলের : পরে | রচিছে : মায়া
দেহেরে : যেন | দেহের ছায়া | করিছে : পরি | হাস

সপ্তমাত্রিক পর্ব (৩+৪) :—

বিদায় : বেলা এলো | মেঘের : মতো ব্যেপে
গ্রন্থি : বেঁধে দিতে | দুহাত : গেল কেঁপে
সেদিন : থেকে থেকে | চক্ষু : দুটি ছেপে | ভরে যে : এল জল | ধারা

ইহাদের পর্বে পর্বে যুগ্মমাত্রিক শব্দের বাধা গতিবেগকে সংযত

১। পৃঃ ১৬১ র-র (১৪) ২। পৃঃ ১৪৪ ঐ

করিয়াছে। তাই পর্বান্তিক যতি এখানে সাধারণ পর্বযতি অপেক্ষা দীর্ঘতর। অযুগ্ম মাত্রিক পর্বের অন্তর্বিভাগ ৩+২ বা ৩+৪ মাত্রায় হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া ২+৩ বা ৪+৩ মাত্রার শব্দ থাকিলে উচ্চারণকালে অখণ্ড শব্দ খণ্ডিত হইয়া যায়। যথা—

পাঁচ মাত্রার পর্বে—

পূর্ণ : চাঁদ | হাসে আ : কাশ | কোলে

আলোক : ছায়া | শিব শি : বানী | সাগর : জলে | দোলে

সাত মাত্রার পর্বে—

গভীর : স্থির নীরে | ভাসিয়া : যাই ধীরে
পিক কু : হরে তীরে | অমিয় মাখা

পর্বের এই প্রকার ৩+২ ও ৩+৪ মাত্রায় অন্তর্বিভাগে পর্বান্তিক যতি দীর্ঘতর হয় কিন্তু পর্বদ্বয় মধ্যস্থ সংযোগগ্রন্থি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু বিপরীত পন্থায় অর্থাৎ ২+৩ ও ৪+৩ মাত্রায় পর্ব খণ্ডগুলি সন্নিবেশ করিলে পর্ব গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং পর্বগুলি নিজেরাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণে পরিণত হয়। যথা—

পাঁচ মাত্রা—

শিখী : নাচিল
শোভা : জাগিল
বনে।
আজি : ফাগুনে
দোলা : লাগিল
মনে॥

সাত মাত্রা—

কুসুমিত : কাননে
বেণু যবে : বাজিল,
রাধা

অভিসারে : চলিল
কিছু নাহি : মানিল
বাধা।

এখানে অযুগ্ম মাত্রিক 'পর্ব' রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কারণ পর্বান্তিক যতিগুলি স্বাভাবিক পর্বযতির ন্যায় 'হ্রস্ব' নহে, চরণান্তিক যতির ন্যায় দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। সূক্ষ্মবিচারে ইহাদের প্রথমটি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত নহে, দ্বিতীয়টিও সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত নহে; দুইটিই চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। প্রথমটির প্রকৃত বিন্যাস—

শিখী নাচি | ল
শোভা জাগি | ল
বনে

নিম্নোক্ত কবিতাটিকে কেহ কেহ সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের আদর্শে ভাগ করেন—

ছিলাম : নিশিদিন | আশাহীন : প্রবাসী
বিরহ : তপোবনে | আনমনে : উদাসী

কিন্তু ইহাতে চরণস্থ পূর্ণ পর্বদ্বয়ের সম্মিতি-বিপর্যয় ঘটে; প্রথম পর্বে ৩+৪ মাত্রা ও দ্বিতীয় পর্বে ৪+৩ মাত্রা দেখা দেয়। সূক্ষ্ম শ্রুতিতে দৃষ্টান্তটির ছন্দোবিভাজন নিম্নরূপ :—

(ছিলাম) নিশিদিন | আশাহীন | প্রবাসী
(বিরহ) তপোবনে | আনমনে | উদাসী।

অর্থাৎ দৃষ্টান্তটির ছন্দ চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত।

§ ১৩. মাত্রাবৃত্ত গম্ভীর সুরের ও মন্থর ভঙ্গির ছন্দ নহে, তীব্র সুরের ও দ্রুত ভঙ্গির ছন্দও নহে; ইহার সুর অনতিগম্ভীর গতিও মধ্যগতি। ইহা বাংলা সাধুভাষারই অধিকতর উপযোগী।

কবি ও ছান্দসিক মোহিতলাল লিখিয়াছেন—"এই গীতিচ্ছন্দও (মাত্রাবৃত্ত) যে পয়ারের মতই সাধুভাষার ছন্দ তাহার আর একটি

প্রমাণ—অতিরিক্ত হসন্তের প্রাধান্য ইহার যেন ধর্মহানি করে। ····এই মাত্রিক পর্বভূমক গীতিচ্ছন্দ হসন্ত বাহুল্যে এমন এক রূপ ধারণ করে, যে এক হিসাবে তাহা উপভোগ্য হইলেও সে যেন এক ভাষার ছন্দে আর এক ভাষার কবিতা।"[1] মোহিতলাল শ্রুতি-রসিক; তাঁহার কান ঠিকই সাক্ষ্য দিয়াছে। বাংলা কথ্য ভাষার সুর তীব্র, গতিভঙ্গিও দ্রুত; সেইজন্য মাত্রাবৃত্তের অনতিতীব্র সুরে ও নাতিদ্রুত গতির মধ্যে কথ্য ভাষাকে একটু বে-মানান বোধ হয়; কথ্য ভাষা মাত্রাবৃত্তে অতিমাত্রায় সুরেলা হইয়া একটু কৃত্রিম হইয়া উঠে। যথা—

মাত্রাবৃত্তের সুর ও ভঙ্গি

(১) আচ্ছা তাহলে | যাচ্ছি নমস্ | কার
এ-জীবনে জেনো | হবে নাক দেখা | আর

(২) দুই বোন তারা | হেসে যায় কেন | যায় যবে জল | আনতে
তারে যে কখন | কটাক্ষে চায় | কিছু তো পারিনে | জানতে।

(৩) যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর

লক্ষ্য করিতে হইবে যে কথ্য ভাষার সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনি এইখানে বিশ্লিষ্ট হইয়া এবং সুরযুক্ত হইয়া উচ্চারণকে একটু বিকৃতই করিয়া তুলিয়াছে।

১। পৃঃ ২৯ বাংলা কবিতার ছন্দ

অষ্টম অধ্যায়

বলবৃত্ত

§ ১. মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের তুলনায় বলবৃত্ত হইতেছে সবল প্রকৃতির ছন্দ, ইহার পর্ব প্রবল শ্বাসাঘাতেই উচ্চারিত হয়। সাধারণতঃ হলন্ত অক্ষরমিশ্র চতুরক্ষর পর্বেই প্রবল শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয় বলিয়া এই প্রকার চতুরক্ষর পর্বের ছন্দকে বলা হয়—'বলবৃত্ত'। শ্বাসাঘাত-যুক্ত উচ্চারণে এই ছন্দের পর্ব দৈর্ঘ্য সাড়ে চারি মাত্রা।

পর্ব দৈর্ঘ্যের হিসাব পূর্ণ সংখ্যায় না হইয়া ভগ্নাংশে হওয়া একমাত্র বলবৃত্ত ছন্দেরই বিশেষত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে আঠারো সূত্রে দেখানো হইয়াছে—প্রবল শ্বাসাঘাতের মাত্রিক মূল্য অর্ধমাত্রা ও প্রবল শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হইলে অক্ষরের দৈর্ঘ্য হয় দেড় মাত্রা। সেই হিসাবে, যেহেতু বলবৃত্তে চতুরক্ষর পর্বের প্রথমাক্ষর প্রবলভাবে শ্বাসাহত হয়, সেইহেতু উচ্চারণে ইহার পর্বের মোট দৈর্ঘ্য হয় সাড়ে চারি মাত্রা।

বলবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ ও নামের কারণ

উচ্চারণে দ্রুততা ও সবলতা বলবৃত্তের বৈশিষ্ট্য। পর্বাদ্যে প্রবল শ্বাসাঘাতই উচ্চারণ দ্রুততার প্রধান কারণ। আমাদের শ্বাসশক্তি সীমাবদ্ধ। এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য অক্ষরগুলির একটিতেই (প্রথমটিতে) অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হইলে স্বল্পাবশিষ্ট শক্তিতে পর্বের অপর সমস্ত অক্ষরের উচ্চারণ শেষ করিতে হয়, কাজেই পর্বের অনাদ্য অক্ষরগুলির উচ্চারণে দ্রুততা আসিয়া যায়। বলবৃত্ত পর্বের আকারগত হ্রস্বতা দ্রুত পর্ব-উচ্চারণের অপর কারণ। বাঙ্গালীর কণ্ঠে দীর্ঘ পর্বের দ্রুত উচ্চারণ কষ্টকর, হ্রস্বপর্বই দ্রুত উচ্চারণের উপযোগী। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ চতুরক্ষর পর্বই হ্রস্বপর্ব। এই হ্রস্ব চতুরক্ষর

পর্বই বলবৃত্তের সাধারণ পর্ব বলিয়া বলবৃত্তের পর্ব-উচ্চারণ দ্রুতভাবে হইয়া থাকে।

শ্বাসাঘাতের শক্তিই বলবৃত্তের উচ্চারণে সবলতার কারণ। সাধারণ শ্বাসাঘাতে নহে, প্রবল শ্বাসাঘাতেই বলবৃত্তের পর্ব উচ্চার্য; সেইজন্যই এই ছন্দের নাম 'বলবৃত্ত'। অবশ্য, বাংলায় অন্যান্য সকল ছন্দেই পর্বের আদ্য অক্ষর শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হয়; তাই বলিয়া এই সকল ছন্দ বলবৃত্ত নহে; কারণ এই শ্বাসাঘাত সাধারণ শ্বাসাঘাত মাত্র, বলবৃত্তের ন্যায় প্রবল শ্বাসাঘাত নহে।

বলবৃত্তের প্রবল শ্বাসাঘাত ছন্দের বাহির হইতে ছন্দ-পর্বে প্রদত্ত হয় না, অর্থাৎ ইহা পাঠকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না, ইহা ছন্দ-পর্বে স্বতঃস্ফূর্ত। পর্বের গঠনগত সবলতাই ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত আবির্ভাবের কারণ। শ্বাসাঘাত ছন্দের বাহির হইতে প্রদত্ত হইলে বলবৃত্ত পর্বের হলন্ত অক্ষর মিশ্রণে সবল হইবার প্রয়োজন হইত না, কেবল স্বরান্ত বা লঘু অক্ষরে রচিত লঘু পর্ব হইলেই চলিত। যথা—

আজি মধু | সমীরণে
নিশীথে কু | সুম-বনে
তারে কি প | ড়েছে মনে | বকুল-ত | লে ?

ইহারা কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত দুর্বল পর্ব; এইগুলিতে প্রবল শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, জোর করিয়া শ্বাসাঘাত দিয়া পড়িলে হাস্যকর কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। আসলে ইহা বলবৃত্ত ছন্দই নহে, চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যেসকল ছান্দসিক সাড়ে চারিমাত্রার সবল পর্বকে স্বীকার না করিয়া চারিমাত্রার দুর্বল পর্বকেই বলবৃত্তের পর্ব বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তকে বলবৃত্ত বলিয়া ভুল করেন এবং কৃত্রিম শ্বাসাঘাত দিয়া উল্লিখিত দৃষ্টান্ত পাঠ করিতে বাধ্য হন।

চতুরক্ষর পর্বে দুইটি বা কমপক্ষে একটি হলন্ত অক্ষর থাকিলে তবেই উহা সবল হইয়া উঠে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত ধারণ করিতে পারে। যথা—

(১) (প্রতি পর্বে দুইটি করিয়া হলন্ত অক্ষর)

আজ্ কি মধুর্ | মলয়্ হাওয়ায়্
নিশীথ্ বনের্ | কুসুম্ শোভায়্
তোমার্ সথায়্ | বকুল্ তলায়্ | পড়্লো হায়্ ম | নে ?

(২) (প্রতি পর্বে একটি করিয়া হলন্ত অক্ষর)

মলয়্ বায়ে | আজ্ ফাগুনে
নিশীথ্ রাতে | কুসুম্ বনে
তারে কি হায়্ | পড়্লো মনে | বকুল্ তলা , তে ?

এই দৃষ্টান্ত দুইটিরই পর্ব সরল পর্ব, প্রবল শ্বাসাঘাত এখানে স্বতঃস্ফূর্ত— বাঙ্গালী স্বাভাবিক ভাবে পর্বগুলির আদ্যাক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়া পাঠ করিতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ এই দুইটি যথার্থ বলবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। তবে বলবৃত্ত ছন্দের পর্বে পর্বে যে সমসংখ্যক গুরু অক্ষর থাকিতেই হইবে তাহা নহে, পর্বের সবল হওয়াই মাত্র প্রয়োজনীয়; একই চরণে কোন পর্বে দুইটি, কোন পর্বে বা একটি গুরু অক্ষর থাকিতে পারে। যথা—

(১) কুঞ্জে গোপন্ | গন্ধ বাজায়্ | নিরুদ্দেশের্ | বাঁশী
দোঁহার্ নয়ন্ | খুঁজে বেড়ায়্ | দোঁহার্ মুখের্ | হাসি।

(২) মেঘের্ পুরীর্ | পর্দা তুলে | নীল্ পাহাড়ের্ | কোল্ ঘেঁসে
কোন্ তারকার্ | ইঙ্গিতে আজ্ | পৌঁছিব গো | কোন্ দেশে

দৃষ্টান্ত দুইটির কেবল নিম্নরেখ পর্বগুলিতে একটি করিয়া গুরু অক্ষর আছে, অন্যান্য পর্বে আছে দুইটি করিয়া গুরু অক্ষর। এই পার্থক্যের জন্য পর্বের সবলতার ইতর বিশেষ হয় নাই। [পর্বে দুইয়ের অধিক গুরু অক্ষর প্রয়োগ সম্বন্ধে পরবর্তী ৫, ৬ ও ৭ সূত্র দ্রষ্টব্য।]

§২. বলবৃত্ত চরণে কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত চতুরক্ষর পর্ব শুধু 'বিশেষ পর্ব' হিসাবেই স্থান পায়; স্বাধীন ভাবে নহে, হলন্ত-অক্ষর-যুক্ত সাধারণ পর্বের সঙ্গী হিসাবেই এই বিশেষ পর্ব ব্যবহৃত হইতে পারে। উচ্চারণকালে ইহা অর্ধমাত্রায় স্বর সম্প্রসারণ করিয়া দৈর্ঘ্য সম্মিতি রক্ষা করে এবং সাধারণ পর্বের সমান হইয়া উঠে।

কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্ব দুর্বল পর্ব; ইহার স্থান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, বলবৃত্ত ছন্দে নহে; ইহার নিজের কোন প্রবল শ্বাসাঘাত নাই, ফলে বলবৃত্ত-ধর্ম নাই। তথাপি ছন্দের বৈচিত্র্য বিধানে কবিরা ইহাকে বলবৃত্ত চরণে স্থান দেন। তখন সম্মিতি রক্ষার্থ চরণের সাধারণ পর্বগুলির সবলতা এই দুর্বল পর্বেও সঞ্চারিত হয় এবং ইহারও আদ্যাক্ষর প্রবলভাবে শ্বাসাহত হয়। কিন্তু হলন্ত অক্ষর ব্যতীত প্রবল শ্বাসাঘাত তিষ্ঠিতে পারে না। সেইজন্য এই আদ্যাক্ষর অর্ধমাত্রিক 'ভগ্নস্বর' বৃদ্ধি করিয়া দেড় মাত্রায় পরিণত হয় এবং প্রবল শ্বাসাঘাতের বেগ ধারণ করে। শ্বাসাহত অবস্থায় নিম্নলিখিত নিম্নরেখ 'বিশেষ পর্ব'গুলি দ্রষ্টব্য—[ভগ্নস্বরগুলি অতিরিক্ত অ, া, ি, ী, ু, ে প্রভৃতি চিহ্নে বুঝিতে হইবে।]

স্বরান্ত অক্ষরে রচিত 'বিশেষ পর্ব'

(১) তোর্ হতো মা | উপর্ থেকে | নয়ন্ মেলে | চাওয়া
আমার্ হতো | 'আঁ-া'কু বাঁকু | হাত্ তুলে গান্ | গাওয়া

(২) স্বপন্ হ'য়ে | আঁখির ফাঁকে
দেখ্‌তে আমি | আস্‌ব মাকে
যাব তোমার্ | ঘুমের্ মধ্যি | খানে
'জে-েগে' গে তুমি | মিথ্যা আশে
হাত্ বুলিয়ে | দেখ্‌বে পাশে
মিলিয়ে* যাবো | কোথায়্ কে তা | জানে

* 'মিলিয়ে' শব্দের 'য়ে' ভগ্নস্বর মাত্র, পরবর্তী তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৩) রাখাল্ বলে | 'ক-অ্'খনো না
মা যে আমায়্ | বলেন্ সোনা
'সে-এ্' কথাটা | গাল্ সে তো নয়্ | পাড়ার্ সবাই | জানে

দৃষ্টান্ত তিনটিতে নিম্নরেখ পর্বগুলি কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত বটে কিন্তু উচ্চারণকালে প্রবল শ্বাসাঘাত যুক্ত হইলে উহাদের প্রথমাক্ষর ঠিক স্বভাবিক দৈর্ঘ্যের এক একটি স্বরান্ত অক্ষর থাকিতেছে না; 'আঁকু বাঁকু'র 'আঁ' হইতেছে 'আঁ-া', 'জেগে তুমি'র 'জে' হইতেছে 'জে-এ্' এবং 'কখনো না'র 'ক' হইতেছে 'ক-অ্'। এই অতিরিক্ত বর্ধিত স্বরধ্বনিগুলি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের ব্যঞ্জনের মতোই স্বাধীনভাবে উচ্চারিত নহে, পূর্বস্বরের সাহায্যেই উচ্চারিত হইতেছে। সুতরাং ইহাদিগকে ব্যঞ্জনধর্মী 'ভগ্নস্বর' বলাই সঙ্গত। ইহারা যে ব্যঞ্জনধর্মী তাহার অপর প্রমাণ—ইহাদের স্থানে ইহাদের পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবে ব্যঞ্জন বসিতে পারে। যথা—

রাখাল্ বলে | ক-'অ্'খনো না

ইহার পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবেই বলা চলে—

রাখাল্ বলে | ক'ক্'খনো না

লক্ষ্য করিতে হইবে—অ-কারান্ত 'ক' নহে, হসন্ত 'ক্'ই সম্প্রসারিত 'অ্'এর পরিবর্তে বসিয়াছে। এই 'অ্' ভগ্নস্বর, ইহাও একপ্রকার ব্যঞ্জন। বলাবাহুল্য, কেবল ভগ্ন 'অ' নহে, ভগ্নস্বর মাত্রই ব্যঞ্জন। যথা, শ্বাসাহত অবস্থায়—

ধিন্‌তা ধিনা | পা-'া' কা নোনা

'পা-া কা'র এই 'া' ধ্বনিও আসলে ব্যঞ্জন, তাই এই 'া' ধ্বনিরও পরিবর্তে হসন্ত 'ক্' বসিতে পারে। যথা—

ধিনতা ধিনা | পা'ক্'কা নোনা

সুতরাং প্রবলভাবে শ্বাসাহত অবস্থায় অর্ধ-বর্দ্ধিত যে-কোন-স্বরান্ত অক্ষরকে হলন্ত বলা যাইতে পারে।

কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্ব যদি বলবৃত্ত চরণে ‘বিশেষ পর্ব’রূপে না আসিয়া সাধারণ পর্বরূপেই সমগ্র চরণ অধিকার করে, তাহা হইলে চরণ শক্তিহীন হইয়া পড়ে ও কোন পর্বেই প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে না ও কোন অক্ষরেই স্বর-সম্প্রসারণ ঘটে না। ইহাতে চরণের বলবৃত্ত ধর্ম লোপ পায় এবং উহা চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয়। যথা—

মনে ভাবে | এ-ও কেন | সাথে সাথে | আসে

কিন্তু চরণে অন্ততপক্ষে হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র একটি পর্বও থাকিলে উহা চরণের বলবৃত্ত ধর্মের সাক্ষ্য দিতে পারে এবং অন্যান্য সকল লঘু পর্বকেই প্রবল ভাবে শ্বাসাহত করাইতে পারে। যথা—

মনে ভাবে | এ-ও কেন | মোদের্ সাথে | আসে

নিম্নরেখ (মোদের্ সাথে) পর্বই যথার্থ বলবৃত্ত জাতীয় হলন্ত-অক্ষর-মিশ্র পর্ব, ইহাতেই স্বাভাবিক ভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত আবির্ভূত হয়, সেইজন্য ইহাই দেখাইয়া দেয় যে এই চরণের অন্যান্য পর্বও বলবৃত্তের পর্ব এবং প্রবল শ্বাসাঘাতে উচ্চার্য।

§ ৩. বলবৃত্ত ছন্দের দ্রুত উচ্চারণে পর্বস্থ পাশাপাশি দুইটি বিভিন্ন স্বরধ্বনিও পর্বদৈর্ঘ্য রক্ষার প্রয়োজনে সংযুক্ত হইয়া একটি যৌগিক অক্ষরে (diphthong) পরিণত হয়, ইহাদের অন্ত্যস্বর হইয়া যায় ভগ্নস্বর। শ্বাসাহত অবস্থায় সাধারণ হলন্তের ন্যায় যৌগিক অক্ষরেরও দৈর্ঘ্য দেড় মাত্রা।

বাংলা বর্ণমালায় যথার্থ দ্বি-স্বর বা যৌগিক ধ্বনি প্রকাশক বর্ণ মাত্র দুইটি আছে—ঐ এবং ঔ ; ইহারা যথাক্রমে ‘অই’ এবং ‘অউ’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। দ্রুতভাবে উচ্চারিত আই, উই, এই, আউ, ইউ, এউ, ইঅ, ইআ, ইএ, ইউ, ইও, উঅ, উআ, উএ, উও প্রভৃতি দ্বিস্বর যৌগিক ধ্বনি লিখিত অবস্থায় দুই অক্ষর বলিয়া মনে হয় কিন্তু কানের সাক্ষ্যে

বলবৃত্তে দ্বিস্বর ধ্বনির যৌগিকতা

বুঝা যায়—দ্রুত উচ্চারণে ইহারাও ঐ ঔ এর মতো একাক্ষর, ইহাদেরও অন্ত্যস্বর ব্যঞ্জনের মতো পূর্বস্বরের আশ্রয়ে উচ্চারিত এবং ইহারাও যথার্থ ভাবে হলন্ত অক্ষরই বটে। যথা—

(১) মা তুই্ হতিস্ | নীল্ বরণী | আমি সবুজ্ | কাঁচা

[তুই = উই্

(২) পদ্ম গোলাপ্ | নিন্দি পাখা | পরিয়ে ছে তার্ | অঙ্গে কে

[রিয়ে = ইএ্

(৩) পান্ খাইয়া | যাও রে বন্ধু | পান্ খাইয়া | যাও

[ইয়া = ইআ্, যাও = আও্

(৪) মহুয়া দারু | পান করে প্রাণ্ । চাঙ্গা করে | নে

[হুয়া = উআ্

(৫) ফুল্ ফোটানো | আবহাওয়া এই্ | কর্‌লে কে গো | সৃষ্টি

[ওয়া = ওআ্

(৬) সইন্ধা বেলায়্ | জলের্ ঘাটে | একলা যাইয়ো | তুমি

[ইয়ো = ইও্

(৭) প্রেম্ যমুনার্ | ঢেউ লেগেছে | রাই কিশোরীর্ | গায়

[ঢেউ = এউ্, রাই্ = আই্

(৮) কও না কথা | মুখ্ তুলে বউ্ | কও না কথা | চোখ্ তুলে

[কও = অও্

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির নিম্নরেখাঙ্কিত দ্বি-স্বর ধ্বনি লিপিতে দুই বর্ণে প্রকাশিত হইলেও উচ্চারণে একাক্ষর, সেইজন্যই পর্বে পর্বে চতুরক্ষরই বর্তমান আছে। এই দ্বি-স্বর ধ্বনিগুলির অন্ত্যস্বর হইতেছে হসন্ত 'ভগ্নস্বর', সেইজন্য এই দ্বি-স্বর ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষর।

যেখানে বলবৃত্ত পর্বে পাঁচটি স্বরধ্বনি আসিয়া যায় সেখানে আদর্শ পর্ব দৈর্ঘ্য (অর্থাৎ চতুরক্ষরত্ব) বজায় রাখিবার প্রয়োজনে পাশাপাশি অবস্থিত দ্বি-স্বর ধ্বনিকে সংযুক্ত করিয়া একাক্ষর করিয়া উচ্চারণ করা
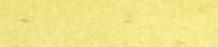
হয়। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই (অর্থাৎ পর্বে চারিটি মাত্র স্বরধ্বনি থাকিলে) সেখানে দ্বি-স্বর ধ্বনির সংযোগ সাধন হয় না, স্বরধ্বনিগুলি পৃথক পৃথক অক্ষর রূপেই থাকে। যথা—

(১) দেউলে তার্ | সোনার্ চূড়া | সব্ পেয়েছির্ | দেশে

(২) গরীব্ গোরে | দীপ্ জেলো না | ফুল্ দিও না | কেউ ভুলে

এখানে 'দেউ' অথবা 'দিও' কোনটিই সংযুক্ত একাক্ষর হইয়া উঠে নাই, পৃথক ভাবে 'দে-য়্' 'দি-য়ো' হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে, এই ভাবে—

কই্ দেউলে | দেউ্টি দিলি | কই্ জ্বালালি | ধূপ ?

এখানে 'দেউলে'র 'দেউ' বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দুই অক্ষর এবং 'দেউ্টি'র 'দেউ' সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ একাক্ষর।

§ ৪. বলবৃত্ত ছন্দে চতুরক্ষর পর্বের আদ্য, মধ্য, অন্ত্য যে কোন অক্ষর হলন্ত হইলে উহাতে সমগ্র পর্বই সবল হইয়া উঠে। তবে যে কোন হলন্ত অক্ষরে নহে, পর্বের আদিতেই প্রবল শ্বাসাঘাত প্রকাশ পায়।

পর্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত

বাধা প্রাপ্ত হইলে বাধা অপসারণের জন্য শক্তির বিকাশ স্বাভাবিক। হল্ বা ব্যঞ্জনের দ্বারা নিঃশ্বাস নির্গমন বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া সাধারণতঃ হলন্ত অক্ষরেই উচ্চারণের সবলতা নির্ভর করে। সেই জন্য চতুরক্ষর পর্বের কোন অক্ষর হলন্ত হইলে তবেই ঐ পর্ব বল প্রকাশক ছন্দের উপযোগী পর্বে পরিণত হয়। যথা—

(১) পর্বের প্রথম অক্ষর হলন্ত :—

চাই্ লে চোখে | সংকোচে সে | চম্‌কে সরে | যায়

(২) পর্বের দ্বিতীয় অক্ষর হলন্ত :—

মাঠের্ পারে | দাঁড়িয়ে ছিল | ঈশান্ কোনে | তে

(৩) পর্বের তৃতীয় অক্ষর হলন্ত :—

যত দেখ্‌বি | টিকি লম্বা | তত বুঝ্‌বি | ভণ্ড

(৪) পর্বের চতুর্থ অক্ষর হলন্ত :—

কে এলো আজ্ | কুটিরে মোর্ | শ্রাবণী সন্ | ধ্যায়্

কিন্তু হলন্ত অক্ষর পর্ব-সবলতার কারণ হইলেও সবলভাবে শ্বাসাঘাত দিয়া বলবৃত্তের হলন্ত অক্ষর উচ্চার্য নহে, পর্বই উচ্চার্য। প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দে দ্রুত উচ্চারণে পর্বস্থ পৃথক পৃথক শব্দ পরস্পর গাঢ়-সংবদ্ধ ও একাঙ্গ হইয়া উঠে। একাঙ্গত্বের জন্যই পর্বের যে অংশে হলন্ত অক্ষরের অবস্থিতি সেই অংশই কেবল সবল না হইয়া সমগ্র পর্ব-শরীরই সবল হইয়া উঠে। ফলে প্রবল শ্বাসাঘাত পর্বের আদ্য অক্ষরেই প্রকাশ পায়, মধ্য বা অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলেও উহাতে স্বাভাবিকভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে না। সেই কারণে—

(১) সব্ পেয়েছির | দেশে কারো | নাই্ রে কোঠা | বাড়ী

(২) মা তুই্ হতিস্ | নীল্ বরণী | আমি সবুজ্ | কাঁচা

(৩) জীবন্ তরী | বয়ে যেত | মন্দাক্রান্তা | তালে

এইভাবে দৃষ্টান্তগুলি উচ্চার্য নহে, নিম্নলিখিতভাবেই উচ্চার্য :—

(১) সব্ পেয়েছির্ | দেশে কারো | নাই্ রে কোঠা | বাড়ী

(২) মা তুই্ হতিস্ | নীল্ বরণী | আমি সবুজ্ | কাঁচা

(৩) জীবন্ তরী | বয়ে যেত | মন্দাক্রান্তা | তালে

§ ৫. দ্বিতীয় সূত্রোক্ত কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্বের ন্যায় কেবল হলন্ত অক্ষরে রচিত পর্বও বলবৃত্তের 'বিশেষ পর্ব'। তবে ইহা উক্ত পর্বের মতো অন্যসাপেক্ষ নহে, স্বাধীন পর্ব এবং চতুরক্ষর নহে, ত্রি-অক্ষর পর্ব। ইহার তিনটি অক্ষরের প্রতিটিই প্রবল শ্বাসাঘাতে উচ্চার্য।

প্রবল শ্বাসাঘাত যুক্ত হইলে অক্ষরের পরিমাণ হয় দেড় মাত্রা (৪র্থ অধ্যায়, ১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।)। বলবৃত্তের ত্রি-অক্ষর বিশেষ পর্বে প্রতিটি অক্ষরই প্রবল ভাবে শ্বাসাহত হয় বলিয়া তিনটি অক্ষরেই বলবৃত্ত পর্বের আদর্শ পর্বদৈর্ঘ্য সাড়ে চারি মাত্রা পূরণ হইয়া যায় যথা :—

কেবল হলন্ত অক্ষরে রচিত 'বিশেষ পর্ব'
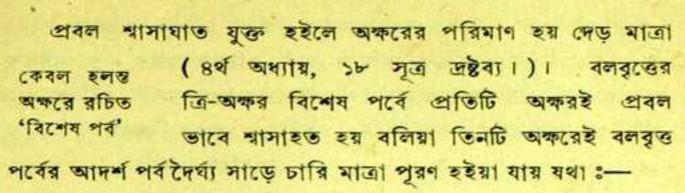
(১) গর্ গর্ গর্ | গর্জে দেয়া | ঝর্ ঝর্ ঝর্ | বৃষ্টি

(২) নির্ভয়ে তুই | রাখ্ রে মাথা | কাল্ রাত্রির্ | কোলে

(৩) আয়্ আয়্ সই্ | জল্ আনিগে | জল্ আনি গে | চল্

(৪) আগা গোড়া | সব্ শুন্ তেই | হবে

এই নিম্নরেখ পর্বগুলিই ত্রি-অক্ষর বিশেষ পর্ব ; ইহারা সাধারণ বলবৃত্ত পর্বের ন্যায় চতুরক্ষর পর্ব নহে। সাধারণ পর্বে কেবল পর্বের প্রথমাক্ষরেই শ্বাসাঘাত, এক্ষেত্রে পর পর তিনটি অক্ষরেই শ্বাসাঘাত। এই বিশেষ পর্ব তাই ত্রিধাবিভক্ত, সাধারণ পর্বের ন্যায় একাঙ্গ নহে। কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত চতুরক্ষর পর্বও বলবৃত্তে বিশেষ পর্ব বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ যথেষ্ট। হলন্ত অক্ষরমিশ্র সাধারণ পর্বের সাথী হইলে তবেই স্বরান্ত অক্ষরে রচিত বিশেষ পর্ব শ্বাসাহত হয় কিন্তু কেবল হলন্ত অক্ষরে রচিত বিশেষ পর্ব আপনা হইতে শ্বাসাহত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে।

কখনও কখনও লিপি-দোষে হলন্ত অক্ষরের দুইটি প্রতীক চরণের অন্ত্য খণ্ড পর্বকে (৩য় অধ্যায় ২১ সূত্র দ্রষ্টব্য) একত্র একটি পূর্ণ পর্ব বলিয়া ভুল হইতে পারে। যথা—

সে কহিল | ভাই

নাই নাই | নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই।

শ্বাসাহত অক্ষর দেড় মাত্রার বলিয়া এখানে দ্ব্যক্ষর প্রথম পর্বের

(নিম্নরেখাঙ্কিত) দৈর্ঘ্য হয় ৩ মাত্রা—ইহা চরণের অন্যান্য পর্বের ৪॥০ মাত্রা দৈর্ঘ্যের সহিত সম্মিতি রক্ষা করিতে পারে না, সেইজন্য ইহাকে পূর্ণ পর্ব বলা চলে না। দৃষ্টান্তের এই 'নাই নাই' আসলে দুইটি একাক্ষর প্রতীক চরণ মাত্র। ইহাদের প্রকৃত বিন্যাস :—

সে কহিল | ভাই,
নাই,
নাই,
নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই।

প্রতীক চরণের পরিবর্তে 'বিশেষ পর্ব' থাকিলে দৃষ্টান্তটির রূপ হইত নিম্ন প্রকার :—

সে কহিল | ভাই
নাই নাই নাই | নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই।

§ ৬. তিন অক্ষরে রচিত কোন পর্বে যদি পর পর দুইটি অক্ষর হলন্ত হয় এবং তৃতীয়টি স্বরান্ত হয়, তাহা হইলে আদর্শ দৈর্ঘ্য পূরণার্থ স্বরান্ত অক্ষরটিও প্রবল শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রসারিত ভগ্নস্বরযুক্ত হলন্ত অক্ষর হইয়া উঠে এবং পর্বটিও বলবৃত্তের 'বিশেষ পর্বে' পরিণত হয়।

দুইটি হলন্ত ও একটি স্বরান্ত অক্ষরের বিশেষ পর্ব

ইহা কেবল হলন্ত অক্ষরে অক্ষরে রচিত 'বিশেষ পর্বে'রই অন্তর্গত 'বিশেষতর পর্ব'। বিশেষ পর্বের ন্যায় ইহাতেও প্রথম দুইটি হলন্ত অক্ষরে স্বাভাবিক ভাবে প্রবল শ্বাসাঘাত আবির্ভূত হয় এবং দেড় মাত্রার হিসাবে তিন মাত্রার দৈর্ঘ্য উৎপন্ন করে। আদর্শ পর্ব-দৈর্ঘ্য সাড়ে চারি মাত্রা পূরণার্থে তৃতীয় স্বরান্ত অক্ষরকেও বাহির হইতে প্রবল শ্বাসাঘাত যুক্ত করা হয়। যথা :—

(১) গেছে দোঁহে | ফরাক্কা বাদ | চলে
সেই খানেতেই | ঘর্ পাত্ বে-ে | বলে

(২) শিব্ ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্ কন্ নে-৫ | দান

(৩) হাত্ ঝুম্ ঝুম্ | পা-া ঝুম্ ঝুম্ | সীতারামের খেলা

(৪) ভিতরে তার্ | ঢুকৃতে গেলে | গা-া ছম্ ছম্ | করে

নিম্নরেখ পর্বগুলিতে 'বে' (ঘর পাত্‌বে) 'নে' (তিন্ কন্‌নে) 'পা' (পা ঝুম্ ঝুম্) ও 'গা' (গা ছম্ ছম্) অক্ষরগুলিতে অর্ধমাত্রিক ভগ্নস্বরের সম্প্রসারণ দ্রষ্টব্য।

§ ৭. বলবৃত্ত ছন্দের সাধারণ পর্বের চতুরক্ষরত্ব বজায় রাখিতে হইলে পর্ব মধ্যে পর পর একাধিক হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ বর্জনীয়।

বলবৃত্ত পর্বে হলন্ত অক্ষরের সংখ্যা

বলবৃত্ত পর্বে পর পর দুইটি বা তিনটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ করিতে হইলে তিন অক্ষরের 'বিশেষ পর্ব'ই করিতে হয়। কারণ বলবৃত্তে স্বাভাবিকভাবে পর পর চারিটি হলন্ত অক্ষরের প্রয়োগ চলে না, চালাইলে শ্রুতিকটু হয়। এই শ্রুতিকটুতার কারণ আছে। বলবৃত্ত পর্বে পর পর দুইটি হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ করিলেই উহারা প্রবলভাবে শ্বাসাহত হয় এবং উহারা উহাদের আনুষঙ্গিক তৃতীয় অক্ষরটিকেও সমভাবে শ্বাসাহত করিয়া লয়; কাজেই এইপ্রকার তিনটি অক্ষরেই আদর্শ পর্ব-দৈর্ঘ্য সাড়ে চারি মাত্রা পূরণ হইয়া যায় ও চতুর্থ অক্ষর হয় অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক। যথা (নিম্নরেখ পর্বগুলি দ্রষ্টব্য)—

(১) কন্যা তখন্ | নিঃসঙ্কোচে | কয়

['অসঙ্কোচে' হইলে শ্রুতিকটুতা হইত না

(২) শেষ বসন্তের্ | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্যশূন্য | মাঠে

['চৈত্র শেষের' হইলে মাধুর্য বজায় থাকে

(৩) বহুদিনের্ | বোঝা তোমার্ | চির-নিদ্রার্ | দেশে

['চির ঘুমের' হইলে কর্ণপীড়া হইত না।

(৪) উল্টে কিছু | বল্‌তে গেলে | বিট্‌কেল্ বিট্‌কেল্ | গাল্ পাড়্‌ছে

['বিট্‌কেল্ সব' হইলে শ্রুতিকটুতা দূর হইত।

§৮. 'গেয়' কবিতার বিশেষ ক্ষেত্রে একপ্রকার অসম পর্বে রচিত অপরিণত বলবৃত্ত দেখা যায়; সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহার 'দীর্ঘ' পর্বের সংকোচন ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহার 'হ্রস্ব' পর্বের প্রসারণ করিয়া অসম পর্বগুলিকে সমদীর্ঘ পর্বে পরিণত করিতে হয়। এই বলবৃত্তের নাম—'স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত'; সাড়ে চারি মাত্রায় পর্বের স্থিতিস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য।

স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত—'গেয়'

গায়ক যাহাতে সুরের সাহায্যে শব্দ সংকোচন ও প্রসারণ করিয়া গীত-রচনাকে ছন্দোময় করিয়া তুলিতে পারেন, গীত রচয়িতা প্রায়ই সে সম্বন্ধে অবহিত হন এবং গানে অসম দীর্ঘ পর্ব রচনা করিয়া উহাদের সমতা-বিধান ও পূর্ণতাদানের ভার গায়ক ও পাঠকের উপর চাপাইয়া দেন। ইহাই স্থিতিস্থাপক বলবৃত্তের উৎপত্তির কারণ। প্রাচীন 'ধামালী' গানে, লোকসঙ্গীতে, বাউল ও রামপ্রসাদী পদাবলীতে সুরেলা ছড়ায় এবং মৈমনসিংহ গীতিকায় এইপ্রকার বলবৃত্তকে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যদিও সাড়ে চারি মাত্রাই পর্বদৈর্ঘ্যের আদর্শ, তথাপি এই সকল স্থানে যেমন একদিকে পাঁচ বা ছয় অক্ষরের পর্ব তেমনি অপরদিকে দুই বা তিন অক্ষরের পর্বও ব্যবহৃত হইয়াছে; পাঠক প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে অসম পর্বকে সমদীর্ঘ সাড়ে চারি মাত্রার পর্বে পরিণত করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই উক্ত প্রকার অসম বিশেষ পর্বগুলি রচিত। বিশেষ করিয়া বলবৃত্ত ছন্দেই লেখকের এই প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ আছে। অন্যান্য ছন্দে অসমদীর্ঘ পর্বকে সমদীর্ঘ করিয়া তোলা সহজ নহে। প্রবল শ্বাসাঘাত বলবৃত্তের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সাড়ে চারি মাত্রার পর্ব প্রবলভাবে আবর্তিত হয় এবং অক্ষর উচ্চারণ অপেক্ষা শ্বাসাঘাতের তালেই শ্রোতার মন অধিক আকৃষ্ট হয়; সেইজন্য ইহার দুই শ্বাসাঘাত-মধ্যবর্তী উচ্চার্য অক্ষরসংখ্যার তারতম্য ঘটিলেও ইহাতে

পাঠকের সমদৈর্ঘ্যবোধের বিপর্যয় ঘটে না। পর্বের অক্ষরসংখ্যা যাহাই হউক না কেন, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ব্যবধানে প্রবল শ্বাসাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মনও তাল দিতে থাকে ; তাহার সম্মিতিবোধ অক্ষর-বিপর্যয় সত্ত্বেও তালভঙ্গ করিতে দেয় না, লেখকের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পাঠককে প্ররোচিত করে। শ্বাসাঘাত-প্রাধান্য বা তাল-প্রাধান্যের অভাবে অক্ষর বৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পাঠক-মন এতখানি সক্রিয় হয় না।

বলাবাহুল্য, স্থিতিস্থাপক বলবৃত্তে চতুরক্ষর অপেক্ষা 'দীর্ঘ' পর্বে সংশ্লিষ্ট দ্রুত উচ্চারণ এবং 'হ্রস্ব' পর্বে বিশ্লিষ্ট বিলম্বিত উচ্চারণ অবলম্বিত হয়। যথা—

(ক) 'দীর্ঘ' বিশেষ পর্ব—(নিম্নরেখ পর্বগুলি দ্রষ্টব্য)

(১) ভবের্ গাছে | জুড়ে দিয়ে মা | পাক্ দিতেছ | অবিরত
কি দোষে ক | রিলে আমায়্ | ছটা কলুর্ | অনুগত

—রামপ্রসাদী সঙ্গীত

(২) গোলা পায়রার্ | বাচ্ছা পুষে | আপন্ বলে তার | খাচ্ছ চুম্
বল্‌বে না সে | রাধাকৃষ্ণ | কেবল বক্‌বে | বক্-ব-কুম্।

—বাউল সঙ্গীত

(৩) সন্ধ্যা বেলায়্ | চান্নি ওঠে | সুরজ্ বৈসে | পাটে
হেন কালেতে | কইন্যা তুমি | যাইয়ো জলের্ | ঘাটে।

—মৈমনসিংহ গীতিকা

(৪) যমুনাবতী | সরস্বতী | কাল যমুনার | বিয়ে
যমুনা যাবেন | শ্বশুর বাড়ী | কাজিতলা | দিয়ে।

—ছেলে ভুলানো ছড়া

(৫) কলকত্তামে | চলা গায়ো রে | সুরেন বাবু | মেরা
সুরেন বাবু | আসল বাবু | সকল বাবুকো | সেরা

—হিন্দি মিশ্রিত ছড়া (রবীন্দ্রনাথ)

(খ) 'হ্রস্ব' বিশেষ পর্ব—(নিম্নরেখ পর্ব)

(১) হলু-দ্ বাঁ | টিতে ধনী | বসিল য | তনে
হলুদ্ বরন্ | গোরা চাঁ-দ্ | পড়ি গেল | মনে

—লোচনদাসের ধামালি

(২) শু-ক্ বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতে-র্ | কালো
শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো

—প্রাচীন গান

(৩) উইড়া যাও রে | বনের কুড়া | কইও মায়ের্ | আগে
তোমা-র্ না | চান্দ্ বিনোদে | খাইছে জংলার | বাঘে

—মৈমনসিংহ গীতিকা

(৪) মু-খ্ পোড়া | ব-র্ আবার্ | টেরি কেটে | ছে
বুড়ো ধাড়ি | কনে আবার্ | কাঁদ্‌তে বসে | ছে।

—ছেলে ভুলানো ছড়া

(৫) সর্বদা মন্ | কেমন্ কর্‌তা | কেঁদে উঠ্‌তা | হির্দয়
ভা-ত্ খাতা | ইস্কুল্ যাতা | সুরেন বাবু | নির্দয়

—হিন্দি মিশ্রিত ছড়া (রবীন্দ্রনাথ)

(গ) একই কবিতায় দীর্ঘ ও হ্রস্ব বিশেষ পর্ব :—

(১) ভিক্ষা দা-ও | ভিক্ষা দাও গো | জননী লক্ষ্মী | রাই
তোমার হাতের্ | ভিক্ষা পাইলে | বৈ-দেশে | যাই।

—গোপীচাঁদের গান

(২) চোখ্ খাও গো | বা-প্ মা- | চোখ্ খাও গো | খুড়ো
এমন্ বর্‌কে | বিয়ে দিয়েছিলে | তামাক্ খেকো | বুড়ো

—ছেলে ভুলানো ছড়া

এই শেষ দৃষ্টান্তে (গ-২) পর্ব রচনার হ্রস্ব-দীর্ঘত্বের চূড়ান্ত সীমা

দেখা যায়। ইহার প্রথম চরণের পর্ব মাত্র দুই অক্ষরে (বাপ্, মা) রচিত এবং দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্ব ছয় অক্ষরে (বিয়ে দিয়েছিলে) রচিত।

§ ৯. 'পাঠ্য' কবিতার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত অসঙ্গত। বিশেষ করিয়া 'দীর্ঘ' পর্ব সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অচল। অবশ্য 'হ্রস্ব' পর্বকে কোন কোন সঙ্গীত-প্রভাবিত পাঠ্য কবিতার 'বিশেষ পর্ব'রূপে দেখা যায়; তবে তাহা নিপাতনরূপেই গণ্য। এই হ্রস্বপর্ব স্বর-প্রসারক বিশ্লিষ্ট উচ্চারণেই পাঠ্য।

স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত—'পাঠ্য'

দীর্ঘপর্বে পর্বস্থ অক্ষরের স্বর-বিলোপ না করিলে পর্ব সংকোচন সম্ভব হয় না, অথচ স্বর-বিলোপে শব্দের অর্থ-হানি ঘটে। [যথা—'ননদ' শব্দের দ্বিতীয়াক্ষর 'ন'এর স্বরলোপে ভিন্নার্থক 'নন্দ' শব্দের উৎপত্তি।] সেই জন্যই পাঠ্য বলবৃত্তে দীর্ঘ-পর্ব অচল। অপর পক্ষে শব্দস্থ অক্ষর বিশেষের স্বর বৃদ্ধি করিয়া পর্ব প্রসারণ করিলে বিকৃত হইয়াও শব্দ তাহার অর্থ রক্ষা করিতে পারে। ৮ম সূত্রে হিন্দিমিশ্রিত ছড়ায় (খ-৫) 'ভাত খাতা' পর্বটিকে 'ভা-া ত্ খাতা'রূপে উচ্চারণ করিলে ততখানি অর্থহানি হয় না যতটা হয় 'সকল্ বাবুকো' (ক-৫) পর্বকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে স্বর বিলোপে 'সকল্ বাব্‌কো'রূপে পাঠ করিলে। সেইজন্য পাঠ্য বলবৃত্তে পর্ব-প্রসারক উচ্চারণ পর্ব-সংকোচক উচ্চারণের মতো অচল নহে। তবে স্থিতিস্থাপক সকল বলবৃত্তই পাঠকনির্ভর ছন্দ হিসাবে পঙ্গু ও অপরিণত ছন্দই বটে। পাঠ্য কবিতায় পাঠকের দ্বারা লেখকের ছন্দ ত্রুটি সংশোধনও লেখকের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। তাছাড়া হ্রস্বপর্ব প্রসারণে শব্দার্থের ক্ষতি না হইলেও স্বাভাবিক সহজ উচ্চারণ ব্যাহত হয়—স্বর বৃদ্ধিতে কৃত্রিম সুরের আগম হয়। যথা—(নিম্নরেখ শব্দগুলি দ্রষ্টব্য)

(১) ফুলের্ বা-া-র্ | নাইকো আ-া-র্ | ফসল্ যা-া-র্ | ফলল্ না
চোখের্ জ-অল্ | ফেল্‌তে হাসি | পায়
দিনের্ আলো | যার্ ফুরালো | সাঁঝের আলো | জ্বল্‌ল না
সেই বসেছে | ঘাটের্ কিনা | রায়।

(২) বাইরে কেবল্ | জলের্ শব্দ | ঝু-উপ্ ঝু-উপ্ | ঝুপ্
দস্যি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ

(৩) চুড়ি চা-া-ই | চুড়ি চাই সে | হাঁকে
চীনের পুতুল্ | ঝুড়িতে তার | থাকে।

(৪) জলের উপর্ | রোদ্ পড়েছে | সোনা মাখা | মায়া
ভেসে বেড়ায় | দুটি হাঁ-া-স্ | দুটি হাঁসের্ | ছায়া।

(৫) মন্দিরেতে | কাঁসর ঘণ্টা | বাজ্‌ল ঠ-অং | ঠং

(৬) জ-অয় রানা | রা-াম্ সিঙের্ | জয়
মৈত্রিপতি | ঊর্দ্ধস্বরে | কয়

(৭) বিষ্ণু দূত্‌টা | ধরল যখন্ | য-অম্ দূতের | মূর্তি

(৮) নব নবীন্ | ফাগুন্ রাতে | নী-ইল্ নদীর্ | তীরে

বিঃ দ্রঃ—কেবল বলবৃত্তে নহে, সর্ববিধ ছন্দেই কাহারও ব্যক্তিগত মনঃকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী উচ্চারণ না হইয়া পর্বের গঠনগত (objective) উচ্চারণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লেখকের মনঃকল্পিত আদর্শ পাঠকের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। ব্যক্তিগত নূতন আদর্শ অনুসারে ছন্দ রচিত হইলে প্রায়ই লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, কারণ পাঠক জাতীয় ও সাধারণ ছন্দোরীতি অনুসারেই উহা পাঠ করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়—শিশু-সাহিত্যিক সুনির্মল বসু 'ছন্দের টুংটাং' পুস্তিকায় বিভিন্ন ধ্বনির প্যাটার্ণে কয়েকটি ছড়া রচনা

করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চলন্ত রেলগাড়ীর ধ্বনির অনুসারে রচিত ছড়াটি হইতেছে—

ঠাকুর্ দাদা,
ঠাকুর্ দাদা,
তোমার নাকে
কিসের্ কাদা ?
তামাক্ খাবে ?
তামাক্ খাবে ?
কোথায়্ পাবে
পানের ছ্যাঁচা ?

পাঠক মাত্রই ইহাকে বলবৃত্তের সাধারণ পর্ব মনে করিয়া পর্বান্তে কেবল একবার প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়া পাঠ করেন। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য হইতেছে রেলগাড়ীর ধ্বনি অনুসারে পর পর তিন অক্ষরের প্রতিটিতে প্রবল শ্বাসাঘাত দিয়া নিম্নপ্রকারে উচ্চারণ :—

	́	́	́		́
রেলগাড়ীর শব্দ :—	ঘ্যাঁচ্	অ্যাং	ঘ্যাঁচ্	|	ঘ্যাঁ
	ঠাক্	উর্	দা	|	দা,
	ঠাক্	উর্	দা	|	দা,
	তোম্	আর্	না	|	কে
	কিস্	এর্	কা	|	দা ?
	তাম্	আক্	খা	|	বে ?
	তাম্	আক্	খা	|	বে ?
	কো	থায়্	পা	|	বে
	পা	নের্	ছ্যাঁ	|	চা ?
	ঘ্যাঁচ্	অ্যাং	ঘ্যাঁ	|	চা।

লেখকের উদ্দিষ্ট হইলেও কিন্তু এইপ্রকার উচ্চারণ কৃত্রিম ও বিকৃত উচ্চারণ মাত্র, বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ নহে। [উদ্দিষ্ট

উচ্চারণটি ফুটাইতে হইলে পর্বস্থ পর পর তিনটি অক্ষরকেই হলন্ত করা উচিত ছিল।]

স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য :—

বলবৃত্ত চরণে অসম পর্বের সমাবেশ দেখামাত্রই উহাকে উচ্চারণে-শোধিতব্য স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। কোনো কোনো সময়ে লেখকের লিপিদোষে বা অতিপর্বিক অংশের ছদ্মরূপের জন্য পাঠকেরা সাধারণ বলবৃত্তকে স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত বলিয়া ভুল করিয়া বসেন। যথা—

এমন করে | হায়, আমার | দিন যে চ'লে | যায়
মাথার পরে | বোঝা আমার | বিষম হ'লো | দায়।

ইহা লিপি দোষের দৃষ্টান্ত। ইহার প্রথম চরণের দ্বিতীয় পর্বের উচ্চারণ কখনই নিম্ন প্রকার নহে :—

এমন্ করে | হা-য়্ আমার্ | দিন যে চলে | যায়

ইহার প্রকৃত বিন্যাস নিম্নরূপ :—

এমন করে | হায়
(আমার) দিন যে চলে | যায়
মাথার পরে | বোঝা আমার | বিষম হ'লো | দায়।

এখানে কোথাও স্বর-প্রসারণের দ্বারা ছন্দ সংশোধনের প্রশ্ন উঠে না। এই ভাবে—

আগুনের্ | পরশ্ মণি | ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন্ | পুণ্য কর | দহন দানে।

ইহারও উচ্চারণ কখনই নিম্ন প্রকার নহে :—

আ-আ গুনের | পরশ মণি | ছোঁয়াও প্রাণে
এ-এ জীবন্ | পুণ্য কর | দহন দানে

ইহার প্রকৃত উচ্চারণ নিম্নরূপ :—

(আগুনের্) পরশ মণি | ছোঁয়াও প্রাণে
(এ জীবন্) পুণ্য কর | দহন দানে

এখানে অতিপর্বিক অংশে পর্বভ্রান্তির ফলেই সাধারণ বলবৃত্তে স্থিতিস্থাপক বলবৃত্ত ভ্রান্তি হইয়াছে।

বিঃ দ্রঃ—সকল ছন্দেই অতিপর্ব প্রকৃত ছন্দ-পর্ব অপেক্ষা হ্রস্ব হইয়া থাকে। এই অতিপর্বকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে প্রসারিত করিয়া মূল পর্বের সমদীর্ঘ করা কখনই কর্তব্য নহে। তাছাড়া অতিপর্বমাত্রই স্বগত-ভাবে পাঠ্য, অন্যান্য পর্বের সহিত সমভাবে উচ্চার্য নহে।

[চক্ষুর উপর বেশী বিশ্বাস না করিয়া কানের উপর বেশী বিশ্বাস রাখিলে লেখকের লিপি জনিত ভ্রান্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।]

§ ১০. প্রবল শ্বাসাঘাতের জন্য বলবৃত্ত কথ্যভাষারই ছন্দ এবং সরলতা, প্রাণবত্তা ও অশান্ত ভাবেরই অধিকতর উপযোগী। ইহা দীর্ঘায়ত সাধুভাষার ও প্রশান্ত-গম্ভীর ভাবের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী।

বলবৃত্তের অবলম্ব্য ভাষা ও ভাব

বলবৃত্তে সুর-তীব্রতা বর্তমান বলিয়া ইহা বালক কিশোর ও রমণী-কণ্ঠের অধিকতর উপযোগী; সেই জন্য ইহাতেই ছেলে ভুলানো ছড়া রচিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলবৃত্ত ছন্দকে বলেন—'ছড়ার ছন্দ' বা 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ'।

সাধুভাষায় সাধারণতঃ দীর্ঘ বাক্-পর্ব ব্যবহৃত হয় ও প্রবল শ্বাসাঘাতের তীব্র সুরের পরিবর্তে গম্ভীর সুরের আগম হয়। সেইজন্য বলবৃত্তছন্দ সাধুভাষার অনেকটা অনুপযোগী। তবে গুরু অক্ষর যুক্ত চতুরক্ষর পর্বে রচিত হইলে সাধুভাষাতেও বলবৃত্ত ছন্দ দেখা যায়। যথা—

(১) চিত্ত দুয়ার | মুক্ত রাখি | সাধু বুদ্ধি | বহির্গতা
অদ্য আমি | কোনোমতে | নাই বলিলাম | সভ্য কথা।

(২) প্রিয় সখীর | নাম গুলি সব
ছন্দ ভরি | করিত রব
রেবার কূলে | কল হংসের | কলধ্বনির | মতো

নিম্নরেখাঙ্কিত পর্বগুলিতে সাধু-ভাষারই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বলবৃত্তে দ্রুতভাবে বারংবার প্রবল শ্বাসাঘাতের জন্য একটা ধ্বনি-চাপল্য বা নৃত্যগতি প্রকাশ পায়। গাম্ভীর্যপ্রিয় কবি মোহিতলাল সেইজন্য বলবৃত্তকে বলিয়াছেন—'ভেক প্রলম্ফী'[১]; ইহা "কোমরে হাত দিয়া নাচিতে থাকে বা কাঠি বাজায়।"[২] এই নৃত্য-চাপল্যের জন্য বলবৃত্ত যথার্থ মহাকাব্যের বাহন হইতে পারে না। বলবৃত্তে প্রবল শ্বাসাঘাতে ধ্বনির উত্থান-পতন অত্যধিক সুস্পষ্ট হয়, কাজেই ছন্দকে ভাষার মধ্যে অন্তর্গূঢ় করিয়া রাখা যায় না। জীবনধর্মী কাব্যে ছন্দের অন্তর্গূঢ়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তাহলে সেই প্রগল্ভ ছন্দকে ধিক্‌কার দেব।[৩] —রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মহাকাব্যের মতো জীবনধর্মী কাব্যের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। অবশ্য দেখানো যায় যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার ক্রীড়াচ্ছলে মেঘনাদ বধ কাব্যের সূচনা অংশকে নিম্ন প্রকারে বলবৃত্ত ছন্দে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন :—

যুদ্ধ যখন | **সা**ঙ্গ হোলো | **বী**র বাহু বীর | **য**বে
বিপুল বীর্য | **দে**খিয়ে হঠাৎ | **গে**লেন মৃত্যু | **পু**রে
যৌবন কাল | **পা**র না হতেই | **ক**ও মা সর | **স্ব**তি
কোন বীরকে | **ব**রণ করে | **পা**ঠিয়ে দিলেন | **র**ণে
রঘু কুলের | **প**রম শক্র | **র**ক্ষ কুলের | **নি**ধি।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাতে যে মূলের মহিমা কিছুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—বলবৃত্তই এই দৌর্বল্যের জন্য দায়ী।

প্রশান্ত গাম্ভীর্যের অভাব থাকিলেও বলবৃত্তে প্রাণ-প্রাচুর্য কিন্তু অতুলনীয়। ইহা বাংলার ধাতুগত ছন্দ। প্রবল শ্বাসাঘাত ও

১। পৃঃ ৫০ বাংলা কবিতার ছন্দ, ২। পৃঃ ৯০ ঐ, ৩। পৃঃ ২৩৮ র-র (১৪)

বাক্‌পর্বের হ্রস্বতায় বলবৃত্ত ছন্দ বাংলা কথ্য ভাষারই সগোত্র। সহজ সরল নিরাভরণ নিরাবরণ ভাব ও হৃদয়াবেগ যেমন বাঙালীর কথ্য-ভাষায় তেমনি বলবৃত্ত ছন্দেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। তাই 'ছন্দসরস্বতী'তে সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দকে বলিয়াছেন—'বাংলার প্রাণ পাখী'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষর বৃত্ত—"বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটা-সোটা গোল-গাল; চর্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে এবং তার চিক্কণতা যতই থাক, তার জোর অতি অল্পই।"[৪] কিন্তু বলবৃত্তের—"চেহারা বলে একটা পদার্থ আছে—সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে রয়েছে।"[৫] —ইহাই বলবৃত্তের প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচয়।

৪। পৃঃ ১৪০ র-র (১৪), ৫। ঐ

নবম অধ্যায়

অক্ষরবৃত্ত

§ ১. অক্ষরবৃত্ত সাধারণ প্রকৃতির ছন্দ, নিত্য-প্রচলিত গদ্যের সাধারণ-ভঙ্গিতে ইহা উচ্চার্য। অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ উচ্চারণভঙ্গিই প্রকাশিত হয় বলিয়া অষ্টাক্ষর বা দশাক্ষর পর্বের পদ্যছন্দ হইতেছে অক্ষরবৃত্তজাতীয়।

ছন্দ-শাস্ত্রে অক্ষরই হইতেছে ধ্বনি-পরিমাপক মানদণ্ড, অক্ষর-সংখ্যা গণনা করিয়া সর্বজাতীয় ছন্দের পর্বদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়।

অক্ষরবৃত্তের লক্ষণ ও নামের কারণ

তাই বলিয়া পদ্যছন্দ মাত্রকেই অক্ষরবৃত্ত বলা চলে না; উচ্চারণভঙ্গির বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ পর্বের ছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত বা বলবৃত্ত হইয়াছে। একমাত্র অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বের উচ্চারণ সাধারণ গদ্যের মতোই বিশষত্বহীন বলিয়া এই প্রকার ছন্দের নামও বিশেষত্ব-বর্জিত; মানদণ্ড অক্ষরের নামেই তাই এই ছন্দের নামকরণ।

স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্বই অক্ষরবৃত্তে আদর্শ পর্ব। নিম্নোদ্ধৃত প্রতিটি দৃষ্টান্তের প্রথম চরণের পর্ব স্বরান্ত অক্ষরে রচিত এবং দ্বিতীয় চরণের পর্ব স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষর মিশ্রণে রচিত—

(ক) দ্বিপর্বিক চরণ :—

(১) তোমারে চিনিনু চির | পরিচিত সম
মুহূর্তে আলোকে যেন | হে অম্বর তম।

ইহার চরণের প্রথম পর্ব ৮ অক্ষরের ও দ্বিতীয় পর্ব ৬ অক্ষরের। এই প্রকার ছন্দোবন্ধের নাম—'পয়ার'। [ইহার ৮ অক্ষরের পর্বই পূর্ণ পর্ব, ৬ অক্ষরের পর্ব খণ্ড ও অন্ত্য পর্ব।] ইহা বাংলার অতি-পুরাতন ছন্দ প্যাটার্ণ।

(২) তোমারে বলিনু যবে | বিদেশিনি, জানি তোরে জানি
সন্ধ্যাকাশে তারা যেন | স্নিগ্ধ হাসে হাসিলে কল্যাণী।

ইহার চরণে ৮ ও ১০ অক্ষরের পর্ব। এই ছন্দোবন্ধের নাম—'মহাপয়ার'। ঊনবিংশ শতকের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রবর্তক।

(৩) আঁধারে চলিনু তবে একা | ধ্রুবতারা চাহি অনিমেষে
উত্তরিব নব সূর্যালোকে | অন্ধতম অমা রাত্রি শেষে।

ইহার চরণের দুইটি পর্বই ১০ অক্ষরের। এই ছন্দোবন্ধের নাম—'দিগক্ষরা'। ইহাও অতি প্রাচীন প্যাটার্ণ।

(খ) ত্রিপর্বিক চরণ :—

(১) রজনী শাওন-ঘন | ঘন দেয়া গরজন' | রিমি ঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান-রঙ্গে | বিগলিত চীর অঙ্গে | নিন্দ যাই মনের হরিষে।

ইহার চরণে ৮, ৮, ১০ অক্ষরের পর্ব। এই ছন্দোবন্ধের নাম—'দীর্ঘ ত্রিপদী'। ইহাও অতি পুরাতন প্যাটার্ণ।

(২) যে মালা গেঁথেছি আমি | তোমারে সঁপিতে সখা | তারি দলে দলে
কুণ্ঠিত সঙ্কোচে নত | সলজ্জ আকাঙ্ক্ষা মম | আঁকা অশ্রুজলে।

ইহার চরণে ৮, ৮, ৬ অক্ষরের পর্ব। এই ছন্দোবন্ধের নাম—'সঙ্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদী'। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার প্রবর্তক।

§ ২. অক্ষরবৃত্তের (এবং গদ্যেরও) উচ্চারণ রীতি হইতেছে—শব্দের আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনিকে একাক্ষরে সংশ্লিষ্ট করিয়া উচ্চারণ এবং শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনিকে 'দুই' অক্ষরে বিশ্লিষ্ট করিয়া উচ্চারণ। শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের একস্বর ধ্বনিকে দুই অক্ষরে উচ্চারণ করিবার কারণ আছে। শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরকে সাধারণ দৃষ্টিতে

একাক্ষর বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু আসলে ইহা একাক্ষর নহে, দ্ব্যক্ষর। সেই কারণে, গদ্যে এবং অক্ষরবৃত্তের উচ্চারণে ইহার সত্যকার মূর্তি দেখা যায়। সাধারণতঃ বাংলার হসন্ত শব্দগুলি মূলে হসন্ত নহে, অ-কারান্ত (যেমন জল্ নহে, জল্-অ; কিরণ্ নহে, কিরণ্-অ)। আদ্য শ্বাসাঘাত এই অন্ত্য 'অ' বিলোপ করিয়া শব্দগুলিকে হসন্ত করে। কিন্তু এই 'অ' লোপে শব্দের মোট স্বর-সংখ্যার হ্রাস হয় না, কারণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বরলুপ্তধ্বনির পূর্ব স্বর বৃদ্ধি পায়, ফলে অক্ষর সংখ্যার ভেদ ঘটে না। দৃষ্টান্তে কথাটি স্পষ্ট হইবে। বাংলায় 'ফল' 'রাম' 'সলিল' 'অরুণ' শব্দ এযুগের উচ্চারণে হসন্ত। ইহাদের প্রথম দুইটিকে একাক্ষর (ফল্, রাম্) এবং শেষ দুইটিকে দ্ব্যক্ষর (স-লিল্, অ-রুণ্) শব্দ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এই হিসাব ঠিক নহে। মূল শব্দগুলি অ-কারান্ত—phala, rāma, salila, aruna যথাক্রমে ২, ২, ৩, ৩ অক্ষরের শব্দ। হসন্ত উচ্চারণে ইহাদের যথার্থ রূপ phaal (phal নহে), rāām (rām নহে), saliil (salil নহে) এবং aruun (arun নহে); এখানেও উচ্চারিত শব্দগুলি যথাক্রমে ২, ২, ৩, ৩ অক্ষরের শব্দ, সুতরাং মূল শব্দের ও উচ্চারিত শব্দের অক্ষর সংখ্যার হিসাবে কোন পার্থক্য নাই। হসন্তভাবে উচ্চারিত অ-কারান্ত শব্দের এই প্রকার অন্ত্য স্বরবৃদ্ধি বাংলায় সত্যকার হসন্ত শব্দকেও প্রভাবিত করে এবং বর্তমান উচ্চারণে হসন্ত তৎসম শব্দেরও অন্ত্যস্বর বৃদ্ধি পায়। 'সৎ', 'দিক', 'জগৎ', 'বণিক্' মূলে অ-কারান্ত নহে, হসন্তই বটে; ইহাদের অন্ত্যস্বর লুপ্ত হয় না, ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও উঠে না। তথাপি বাঙ্গালীর অভ্যাসে উচ্চারণকালে ইহাদের অন্ত্যস্বর বৃদ্ধি ঘটে, যথাক্রমে—saat, diik, jagaat, baniik রূপে উচ্চারিত হয়। এই কারণে সাধারণ গদ্যে এবং অক্ষরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্তে শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণ

ছন্দে শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের স্বরধ্বনি দুই অক্ষরে প্রসারিত হয়; যথা—

(১) সুরাঙ্গনা নন্দনের | নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে
মন্দার মঞ্জরি তোলে | চঞ্চল কঙ্কণে।

এই দৃষ্টান্তে 'নন্দনের, মন্দার' ও 'চঞ্চল'—এই তিনটি শব্দ উচ্চারণে হলন্ত, সেইজন্য এইগুলির অন্ত্যস্বর নিম্নপ্রকারে দুই অক্ষরে প্রসারিত করিয়া উচ্চার্য :—

surāngana nandaneer | nikunja prāngane
mandāār manjari tole | chanchaal kankane

(২) নিঃস্বতা সংকোচে দিন | অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা | লয় তারে কোলে।

এখানে 'দিন' এবং 'লয়' শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষর কাজেই ইহাদের উচ্চারণ diin (din নহে) এবং laay (lay নহে)।

বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ও সাধারণ উচ্চারণ রীতি অগ্রাহ্য করিয়া শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরকে এক অক্ষরেই উচ্চারণ করিলে পয়ার চরণে ৮, ৬ অক্ষরের পর্বের হিসাব পাওয়া যায় না, ভাষাও কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিধারণ করে, যথা—(অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ)

(১) মহাভারতের্কথা | অমৃত সমাং ··· ৭ + ৫ = ১২ অক্ষর
কাশীরান্দাস্কহে | শুনে পুণ্যবাং ··· ৬ + ৫ = ১১ "

[মূলঃ— মহাভারতের কথা | অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান।]

(২) যার্নামে পার্করে | ভব পারাবার্ ··· ৬ + ৫ = ১১ অক্ষর

[মূলঃ— যার নামে পার করে | ভব পারাবার

(৩) বীর্বাহু চলি যবে | গেলা যম্পুরে ··· ৭ + ৫ = ১২ অক্ষর

[মূলঃ— বীর বাহু চলি যবে | গেলা যম পুরে]

প্রকৃত বাঙ্গালী উচ্চারণে উল্লিখিত দৃষ্টান্তের নিম্নরেখ অক্ষরগুলি দুই অক্ষর, একাক্ষর নহে ; সেইজন্য উদ্ধৃত প্রতিটি দৃষ্টান্তের চরণে আসলে ৮+৬=১৪ অক্ষরই বজায় আছে, বিকৃত উচ্চারণের ১১ বা ১২ অক্ষর নাই।

ব্যতিক্রম—(ক) ং, ঃ

এই রীতির ব্যতিক্রম হয় অনুস্বারান্ত ও বিসর্গান্ত শব্দে। এই শব্দগুলি হলন্তই বটে, তথাপি সংস্কৃত-প্রভাবিত (ং, ঃ-যুক্ত) বলিয়া ইহাদের উচ্চারণে স্বাভাবিক বাঙ্গালী রীতি প্রযুক্ত হয় না। তাই শব্দগুলির অন্ত্যাক্ষর হলন্ত হইলেও দুই অক্ষরে নহে, এক অক্ষরেই উচ্চারিত হয়। যথা—

(১) তোমার শ্রীপদ-'রজঃ' | এখনো লভিতে

(২) স্বপ্রকৃতি-অনুসারে | 'স্বয়ং' যবে নারায়ণ

ব্যতিক্রম—(খ) সমাস

সমাসের পূর্ব-পদেও সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হয়। সংস্কৃত প্রভাবে সমাসে একাধিক শব্দের একীকরণ ঘটে ; উহাতে শব্দদ্বয়ের মধ্যবর্তী ছেদের বিলুপ্তি ও অক্ষর সন্ধি হয়। সমাসবদ্ধ অবস্থায় পূর্বপদান্তিক হলন্ত অক্ষর আর 'অন্ত্য' থাকে না, 'মধ্য' অক্ষরেই পরিণত হয় ; কাজেই উহাকে আর দুই অক্ষরে প্রসারিত করিয়া উচ্চারণ করা চলে না, এক অক্ষরেই সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। ওম্ (oom), দিক্ (diik), সৎ (saat) স্বতন্ত্রভাবে বঙ্গীয় উচ্চারণে প্রত্যেকে দুই অক্ষর, কিন্তু সমাসের পূর্বপদে থাকিলে ইহারা প্রত্যেকে একাক্ষরেই উচ্চার্য ; যথা—ওঙ্কার (omkāār), দিক্‌প্রান্ত (dikprānta), সৎকথা (satkathā)। সংস্কৃত প্রভাবেই বাংলাতে এই রীতি চলিয়া গিয়াছে। তথাপি সমাসে বাঙ্গালীর উচ্চারণে বিকল্পতা আসিয়া থাকে ; কারণ 'সন্ধি-বিমুখিতা'ই বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। সেই কারণেই বাংলায় 'কচু-আলু-আদা' 'কচা্‌ল্লাদা' হয়

না। সমাসবদ্ধ পদে তাই কখন সংস্কৃত প্রভাবে সন্ধি-মুখিতা কখনও বা স্বাভাবিক বঙ্গীয় রীতির সন্ধি-বিমুখিতা দেখা যায়। এই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি কোন কোন সমাসবদ্ধ পূর্বপদের অন্ত্য হলন্ত অক্ষর উচ্চারণে বিকল্পতা সৃষ্টি করে—হলন্ত অক্ষর কখনও একাক্ষরে সংশ্লিষ্টভাবে কখনও বা দুই অক্ষরে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। সমাসবদ্ধ পদে 'দিক্' শব্দকে সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ একবার প্রয়োগ করিয়াছেন সংস্কৃত রীতিতে—

(১) মনের আকাশে তার | দিক্-সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপন পাখি | চলিয়াছে ধেয়ে।

['দিক্' এখানে সংশ্লিষ্ট, একাক্ষর (dik)।]

আবার প্রয়োগ করিয়াছেন স্বাভাবিক বঙ্গীয় রীতিতে—

(২) তব চিত্তগগনের | দূর দিক্-সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে | পেয়েছে মহিমা।

['দিক্ এখানে বিশ্লিষ্ট, দুই অক্ষর (diik)।]

এই বিকল্প উচ্চারণ একমাত্র সমাসেই প্রযুক্ত হয়। সমাসের পূর্বপদে না বসিলে কোন শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরেরই একাক্ষর সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ চলিতে পারে না; জোর করিয়া চালাইলে বাংলাভাষার মুণ্ডপাত হয়। যথা—

খেঁজুর গাছেতে তারা | 'উট্রাখিল' বেঁধে

স্বাভাবিক উচ্চারণে 'উট রাখিল' (uuṭ rākhila) পাঁচ অক্ষর; ইহাকে অক্ষরবৃত্তের দৈর্ঘ্য রক্ষায় চার অক্ষরের 'উট্রাখিল'রূপে উচ্চারণ করা হাস্যকর। সেইজন্য এক্ষেত্রে চরণটির বিশুদ্ধ রূপ হইবে :—

খেঁজুর গাছেতে তারা | উট রাখে বেঁধে

[কেবলমাত্র বলবৃত্ত ছন্দেই প্রবল শ্বাসাঘাতে উচ্চারণ দ্রুততায় শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষর সংশ্লিষ্ট একাক্ষররূপে উচ্চারিত হইতে পারে। বলবৃত্ত দ্রষ্টব্য।]

§৩. একমাত্র শব্দান্ত ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ শব্দের আদিতে বা মধ্যে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ অক্ষরবৃত্তের নহে, মাত্রাবৃত্তেরই ধর্ম। অক্ষরবৃত্তের মধ্যে এইপ্রকার মাত্রাবৃত্তধর্মী রচনার অনুপ্রবেশ 'অনিয়মিত' বিশেষ ব্যাপার মাত্র। শব্দের আদিতে ও মধ্যে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ 'নিয়মিত ভাবে' থাকিলে ছন্দ মাত্রাবৃত্তেই পরিণত হয়।

অক্ষরবৃত্তে মাত্রাবৃত্তধর্মী রচনার অনুপ্রবেশ

শব্দের আদিতে ও মধ্যে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ হইতেছে সাঙ্গীতিক এবং সেই হিসাবে কৃত্রিম। গদ্যপাঠে বা কথোপকথনে এইপ্রকার উচ্চারণ করিলে ইহার অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট বুঝা যায়। অক্ষরবৃত্তের মধ্যে মাত্রাবৃত্তধর্মী (সকল হলন্ত অক্ষরই বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চার্য) রচনার অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত :—[নিম্নরেখ অক্ষরগুলি দ্রষ্টব্য]

(১) বড় বড় মস্তকের | পাকা শস্য ক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন | 'শীর্ষ' সমেত

(২) আসে 'অবগুণ্ঠিতা' | প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈল তটমূলে।

(৩) যুগান্তরের ব্যথা | প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে

প্রাচীন বাংলা কবিতা সঙ্গীত-প্রভাবিত ছিল বলিয়া প্রাচীন অক্ষরবৃত্ত রচনার মধ্যেও সময়ে সময়ে মাত্রাবৃত্তধর্মী চরণের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের লিপিতে বিশেষ প্রকার বর্ণ-বিন্যাস প্রশংসনীয়। পাঠক যাহাতে সহজে মাত্রা-বৃত্তোচিত বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ বুঝিতে পারেন সেইজন্য প্রাচীন কবি যুক্ত বর্ণকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দুইটি অযুক্ত বর্ণে লিখিতেন—'উল্কা'কে 'উল্‌কা', যুক্ত'কে 'যুক্‌ত', 'মৌ'কে 'মউ', 'ঐ'কে 'অই'। যথা—

(১) কাটিল দোঁহার অস্ত্র | দোঁহাকার- শরে।
জলন্ত 'উল্‌কা' প্রায় | উঠিল অম্বরে॥ —কৃত্তিবাস

(২) 'সেই' সে করয়ে কর্ম | যে 'যুকৃত' নহে
কুমারী দেখিয়া বলে | মোরে বিবাহিয়ে। —বৃন্দাবন দাস

(৩) ভবানী বলেন তোর | নায়ে ভরা জল।
'আল্‌তা' ধুইবে পদ | কোথা থুব বল। —ভারতচন্দ্র

অক্ষরবৃত্ত সবল প্রকৃতির এবং মাত্রাবৃত্ত দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলন্ত অক্ষরের গুরুত্ব হ্রাস পায় (৪।১১ সূত্র) এবং মাত্রাবৃত্ত-ত্বই প্রকাশ পায়। সেইজন্য অক্ষরবৃত্তে বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের 'নিয়মিত' প্রয়োগ ঘটিলে ছন্দ সম্পূর্ণ মাত্রাবৃত্ত হইয়া উঠে ও অক্ষরবৃত্ত পর্ব দ্বিধা বিভক্ত হয়। যথা—

নিম্নে য | মুনা বহে | স্বচ্ছ শী | তল
ঊর্ধ্বে পা | ষাণ তট | শ্যাম শিলা | তল
মাঝে গ | হ্বর তাহে | পশি জল | ধার
ছল ছল | করতালি | দেয় অনি | বার।
বরষার | নির্ঝরে | অঙ্কিত | কায়
দুই তীরে | গিরিমালা | কত দূর | যায়।......ইত্যাদি

—নিষ্ফল উপহার (রবীন্দ্রনাথ)

শব্দের আদ্য মধ্য হলন্ত অক্ষরের নিয়মিত বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে অক্ষর-বৃত্তের সর্বনাশ রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তাকে পীড়িত করিয়াছিল; তাই তিনি উল্লিখিত কবিতাকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে সংশোধিত করিয়া পুনর্বার রচনা করিয়াছিলেন—

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে | যমুনার জল
দুই তীরে গিরিতট | উচ্চ শিলাতল
সংকীর্ণ গুহার পথে | মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে | গর্জি অনিবার।
এলায়ে জটিল বক্র | নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় | নীল গিরিশ্রেণী।......ইত্যাদি

বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ছন্দ নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি যে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

§ ৪. অক্ষরবৃত্ত তানপ্রধান ছন্দ, শ্বাসাঘাত প্রধান নহে। তানের কারণে ইহাতে শব্দপ্রসারণ চলিতে পারে কিন্তু প্রবল শ্বাসাঘাতের অভাববশতঃ শব্দসংকোচন চলিতে পারে না।

'তান'এর অর্থ স্বরধ্বনি উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা টান, ইহাতে সুরের ঈষৎ আভাস আসে। দীর্ঘ পর্বিকতার জন্য অক্ষরবৃত্তে বাঙ্গালীর কণ্ঠে 'তানে'র আগম হয়। তান স্বরবৃদ্ধি-প্রবণ বলিয়া অক্ষরবৃত্তে শব্দ-প্রসারণ শ্রুতিকটু নহে। হলন্ত অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি পূর্বেই দেখানো হইয়াছে (২য় ও ৩য় সূত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সাঙ্গীতিক কবিতায় শুধু হলন্ত অক্ষরে নহে স্বরান্ত অক্ষরেও স্বরবৃদ্ধিকে অক্ষরবৃত্ত স্বীকার করে ; যথা—

তানপ্রধানত্বের জন্য অক্ষরবৃত্তে শব্দ সংকোচন-বিমুখিতা

মনের মরম কথা | তোমারে কহিয়ে এথা | শুন শুন পরাণের সই
স্বপনে দেখিলুঁ 'যে-এ' | শ্যামল বরণ 'দে-এ' | তাহা বিনু আর কারো নই।

—জ্ঞানদাস

এই 'যে-এ' 'দে-এ' উচ্চারণ কৃত্রিম হওয়া সত্ত্বেও শ্রুতিকটু নহে।

অক্ষরবৃত্তে শব্দ-সংকোচন কিন্তু অচল। শব্দের অন্তর্গত স্বর-বিশেষের বিলোপেই শব্দ-সংকোচন সম্ভব ; শ্বাসাঘাতই এই স্বর-বিলোপের জন্য দায়ী। শব্দের অক্ষর বিশেষে প্রবল শ্বাসাঘাতে উচ্চারণ শক্তির অনেকখানি ব্যয়িত হইয়া গেলে স্বল্পাবশিষ্ট শক্তিতে অন্যান্য অক্ষরের উচ্চারণ শেষ করিতে হয়, তাহার ফলে উচ্চারণের দ্রুততা এবং অবশিষ্ট কোন একটি অক্ষরের স্বর-বিলোপ ঘটে। যথা—'মোহিত' শব্দ অ-কারান্ত বটে, কিন্তু কথ্যভাষায় প্রবল আদ্য শ্বাসাঘাতে ইহার অন্ত্য 'অ' লুপ্ত হয় এবং ইহা হসন্ত 'মোহিৎ' (যথা, মোহিতলাল) হইয়া যায়। শব্দাদ্যের শ্বাসাঘাত কেবল

শব্দের অন্ত্যস্বর নহে, মধ্যস্বর বিলোপের জন্যও দায়ী ; যথা—গণেশ + (অবজ্ঞার্থে) আ = গণেশা, কিন্তু শ্বাসাঘাতে মধ্যস্বর 'এ' লুপ্ত হইয়া শব্দটি হয় 'গণ্‌শা'। এইভাবে সাধুভাষার ক্রিয়া 'চলিল', 'আসিত', 'করিবে' যথাক্রমে চলিত ভাষায় 'চল্‌ল', আস্‌ত', 'কর্‌বে' রূপে পরিণত হয়। বলবৃত্ত ছন্দের পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত বর্তমান বলিয়া এই সকল তিন অক্ষরের মূল শব্দ স্বরলুপ্ত অবস্থায় দুই অক্ষরের 'মো-হিৎ', 'গণ্‌-শা', 'চল্‌-ল', 'আস্‌-ত', 'কর্‌-বে', প্রভৃতি রূপে স্থান পায়। ইহাদের উচ্চারণ হয়—mohit, gansā, challa প্রভৃতি। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে স্বরবিলোপক প্রবল শ্বাসাঘাত বর্তমান থাকে না, তাই শব্দদৈর্ঘ্যের সঙ্কোচনও সম্ভব হয় না, শব্দগুলি মূলের মতোই তিন অক্ষরেই বর্তমান থাকে, যথা—mohiit, gaansā, chaalla ইত্যাদি। ভাষারীতি অনুসারে স্বরধ্বনি নিজে বিলুপ্ত হইবার সময়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্বস্বরের বৃদ্ধি করিয়া তবেই বিলুপ্ত হয়। এই কারণে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে চল্‌ল (chaalla), আস্‌ত (āāsta), কর্‌বে (kaarbe) প্রভৃতি মধ্যস্বর-লুপ্ত ক্রিয়াকে দুই অক্ষরের শব্দরূপে—challa, āsta, karbe রূপে উচ্চারণ করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অ-বঙ্গীয়। যেমন—(নিম্নরেখ শব্দগুলি দ্রষ্টব্য)

(১) বসন্ত সত্যই '<u>আসবে</u>' | কী দরকার এসে ?

(২) চামেলি পোষাক '<u>পরলো</u>' | চলো যাই ঢের রাত্রি হোলো
নীল কণ্ঠ '<u>শুনতে</u>' পাচ্ছো | এবার তোমার সাজ খোলো।

এই নিম্নরেখ শব্দগুলি দুই অক্ষরের নহে, তিন অক্ষরেরই শব্দ ; তাই দৃষ্টান্তগুলি ছন্দপতনেরই দৃষ্টান্ত। অক্ষরবৃত্তে মধ্যস্বর-লুপ্ত ক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ—

সে না হলে বিরাটের | নিখিল মন্দিরে
'<u>উঠত</u>'না শঙ্খধ্বনি, | '<u>মিলত</u>'না যাত্রী কোনোজন

আলোকের সামমন্ত্র | ভাষাহীন হয়ে
'রইত' নীরব। —পরিশেষ, প্রাণ

এখানে নিম্নরেখ শব্দগুলিতে সংকোচন নহে, প্রসারণই দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের অক্ষরবৃত্তে রচিত "ছুটল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর"[1] প্রমুখ চারিটি চরণে ক্রিয়ার সংকোচন স্বাভাবিক রীতির ব্যতিক্রম ও 'আর্ষ-প্রয়োগ' মাত্র।

§ ৫. প্রবল শ্বাসাঘাতহীনতা ও দীর্ঘপর্বিকতার জন্য অক্ষরবৃত্তে পর্ববন্ধন শিথিলতা প্রকাশ পায় ও শব্দ নিজস্ব গুরুত্ব লাভ করে। অক্ষরবৃত্ত পর্বে যুগ্মাক্ষর শব্দের পার্শ্বে যুগ্মাক্ষর শব্দ এবং অযুগ্মাক্ষর শব্দের পার্শ্বে অযুগ্মাক্ষর শব্দই বসিতে পারে; যুগ্মাক্ষর শব্দ ও অযুগ্মাক্ষর শব্দের পাশাপাশি স্থান হয় না।

অক্ষরবৃত্ত পর্বে শব্দ-বিন্যাস

বলবৃত্তে ও মাত্রাবৃত্তে পর্বস্থ শব্দাবলীর নির্দিষ্ট স্থান ও মর্যাদা থাকে না, শব্দগুলি স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একীভূত একটি ধ্বনিপিণ্ডে পরিণত হয়। বলবৃত্তে প্রবল শ্বাসাঘাত পর্বাদ্যে থাকিয়া দ্রুত উচ্চারণে পর্বস্থ শব্দগুলিকে একাঙ্গ করিয়া দেয় এবং পর্বের হ্রস্বতার জন্য মাত্রাবৃত্তের নৃত্যতাল শব্দাবলীর ঊর্ধ্বে পর্বকে তুলিয়া ধরে। সেইজন্য বলবৃত্তে ও মাত্রাবৃত্তে শব্দের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের ব্যাপার অন্য। ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেই শাসনকার্য জবরদস্ত হইয়া থাকে, শাসনের ক্ষেত্র দীর্ঘায়ত হইলে শাসনের শৈথিল্য ও শাসিতের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। অক্ষরবৃত্তের ব্যাপার এই প্রকার। ইহার পর্ব দীর্ঘায়ত; শব্দাবলীকে অভিভূত করিবার মতো নৃত্যতাল বা শ্বাসাঘাতের শাসন ইহাতে নাই, সেইজন্য ইহার পর্বে শব্দের কতকটা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়—শব্দের বিশেষত্ব উপেক্ষিত হইতে

১। পৃঃ ১৯৭ র-র (১৪)

পারে না; ফলে পর্বের মধ্যে বিশেষ শব্দ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হয়। একমাত্র অক্ষরবৃত্তেই শব্দ-বিন্যাসের নিয়ম আছে, অন্য বৃত্তে নাই। অক্ষরবৃত্তের শব্দ-বিন্যাস-বিধি হইতেছে—যুগ্মাক্ষর শব্দের সহিত কেবল যুগ্মাক্ষর শব্দ এবং অযুগ্মাক্ষর শব্দের সহিত কেবল অযুগ্মাক্ষর শব্দই প্রযোজ্য। (এই প্রকার বিন্যাসের দ্বারা সামগ্রিক অক্ষর-যুগ্মতা সাধন হয়। ইহার মূলে সম্ভবতঃ রহিয়াছে বাঙ্গালীর যুগ্ম-মাত্রিক উচ্চারণ-প্রবৃত্তি*।) 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত অক্ষরবৃত্তের পর্বে শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে লেখককে উপদেশ দিয়াছেন—

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।

এই শব্দ-বিন্যাস-বিধি অস্বীকার করিলে অক্ষরবৃত্তে ছন্দ-পতন অনিবার্য। এই রীতি অগ্রাহ্য করায় কয়েকটি বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট কবিতাতেও ছন্দোদোষ দেখা দিয়াছে; যথা—[নিম্নরেখ পর্বগুলি দ্রষ্টব্য।]

(১) নিশার স্বপন সুখে | সুখী যে কী সুখ তার | জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণ-প্রভা প্রভাদানে | <u>বাড়ায় মাত্র আঁধার</u> | পথিকে ধাঁধিতে॥

—মাইকেল

['বাড়ায় আঁধার মাত্র' হইলে ছন্দ পতন হইত না।

---

* বঙ্গীয় উচ্চারণের যুগ্মমাত্রিক প্রবৃত্তির জন্য অযুগ্মাক্ষর শব্দ প্রায়ই যুগ্মাক্ষর শব্দে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত একাক্ষর, ত্র্যক্ষর, পঞ্চাক্ষর শব্দগুলির পরিণতি দ্রষ্টব্য। একাক্ষর 'কি', 'চ' (চল্', 'দিন' হইয়াছে দ্ব্যক্ষর **kii, chaa, diin**। ত্র্যক্ষর 'করিয়া', 'হইতে', 'মাছুয়া' হইয়াছে দ্ব্যক্ষর 'করে', 'হতে', 'মেছো'। পঞ্চাক্ষর 'হাসিয়াছিল' 'অপরাজিতা' হইয়াছে চতুরক্ষর 'হেসেছিল' 'অপ্‌রাজিতা'।

(২) তার মধ্যে বাক্যহীনা | কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধার | সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে? —রবীন্দ্রনাথ

['অতৃপ্ত স্নেহের ক্ষুধা' হইলে ছন্দ পতন হইত না।

(৩) নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি | কেমনে হইব পার | দুস্তর তিমির তরঙ্গিণী
বনপথে পথে শিবা | দের অশিব চীৎকার | তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী
—মোহিতলাল

['অশিব চীৎকার করে' হইলে ছন্দ রক্ষা পাইত।

বিঃ দ্রঃ—অক্ষরবৃত্ত পর্বে অনন্যসাধারণ শব্দ-স্বাতন্ত্র্যের জন্য সহজে শব্দ-খণ্ডন হয় না, পূর্ববর্তী কয়েকটি চরণের পর্ব দৈর্ঘ্য পাঠকমনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে তবেই শব্দ-খণ্ডন চলিতে পারে; যথা—

আজো মনে পড়ে,
অস্ত্র পরীক্ষার দিন | হস্তিনা নগরে
তুমি ধীরে প্রবেশিলে | তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে নক্ষত্র 'খ | চিত' পূর্বাশার
প্রান্ত দেশে নবোদিত | অরুণের মত।

[চতুর্থ চরণে 'খচিত' শব্দ খণ্ডিত।

কিন্তু কবিতার সূচনাতেই শব্দ-খণ্ডন করিলে অক্ষরবৃত্তে ছন্দপতন হয়; যথা—

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ।

এই কবিতা পাঠে কর্ণপীড়া উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ অক্ষরবৃত্তের অষ্টাক্ষর পর্বিক সুর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কবি নিম্নপ্রকার শব্দ-খণ্ডন করিয়াছেন—

চেয়ে দেখি ছাতার ম | তন বড় পাতাটির | নীচে বসে আছে

শব্দ-খণ্ডনের ন্যায় কবিতার সূচনাতে শব্দ-প্রসারণ করিলেও অক্ষরবৃত্তে ছন্দ-পতন হয় ; যথা—

গানের সুরের মত | বিকালের দিকে বাতাসে
হৃদয় ভাসিয়া যায় | সেখানে সে যারে ভালোবাসে।

[কবি 'বাতাসে-এ' উচ্চারণ করিয়া ১০ মাত্রা পূরণ করিয়াছেন।

§৬. অক্ষরবৃত্তের ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্ব 'অন্ত্যপর্ব'রূপেই ব্যবহার্য।

বাংলা অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তির ইতিহাসে* দেখা যায়, 'ধামালী' নামক দেশজ প্রাচীন ছন্দের আদর্শ চরণ ছিল শ্বাসাঘাতযুক্ত তিনটি চতুরক্ষর পর্বে ও একটি দ্ব্যক্ষর অন্ত্যপর্বে গঠিত ; অর্থাৎ ইহার রূপ ছিল নিম্ন প্রকার—

ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্বের অন্ত্যপর্ব-ত্ব

ό o o o | ό o o o | ό o o o | ό o
(১) | (২) | (৩) | (৪)

ইহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্বাসাঘাতের বিলোপে দুই দুই পর্ব পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যায়, সংযোজনের ফলে চরণে অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের পর্বের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া মূল আদর্শ চরণের প্রথম পর্ব বাদ দিয়া অবশিষ্ট পর্বগুলির পরস্পর সংযোগে দশাক্ষর পর্ব উৎপন্ন হয়। নব গঠিত ত্রিবিধ পর্বের মধ্যে ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্ব অন্ত্যপর্বজাত—মূল ধামালী ছন্দের দ্ব্যক্ষর অন্ত্যপর্বের সংযোগে গঠিত। তাই ষড়ক্ষর পর্ব ও দশাক্ষর পর্ব অক্ষরবৃত্তের চরণান্তই সূচিত করে, ইহারা কখনই চরণের 'মুখ-পর্ব' হইতে পারে না। ইহাদের যতি চরণান্তিক দীর্ঘ যতি (॥), মধ্য পর্বান্তিক হ্রস্ব যতি (।) নহে।

ষড়ক্ষর বা দশাক্ষর পর্বকে জোর করিয়া চরণের মুখপর্বরূপে

---

* ১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার করিলে পর্বান্তিক যতি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া নূতন অষ্টাক্ষর পর্ব গঠনের চেষ্টা করে। যথা—

(১) অমৃত সমান | মহাভারতের কথা ··· ৬ + ৮
(২) শুধু এই খেলাবার বাঁশী | কোন মা আমারে দিলি ··· ১০ + ৮

এইরূপ বিন্যাস করিতে গেলে বাঙ্গালীর কণ্ঠে পর্বভঙ্গ অনিবার্য, উচ্চারিত হইবে—

(১) অমৃত সমান মহা | ভারতের কথা
(২) শুধু এই খেলাবার | বাঁশী কোন মা আমারে দিলি।

কিন্তু যেখানে মধ্য যতির এইরূপ স্থান পরিবর্তন ও নূতন পর্বগঠন সম্ভব হয় না, সেখানে চরণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুই চরণে পরিণত হয়, অষ্টাক্ষর পর্ব নূতন চরণের মুখপর্ব হিসাবে এবং ষড়ক্ষর বা দশাক্ষর পর্ব অন্ত্য পর্বরূপে আসন গ্রহণ করে, প্রথমটির যতি হয় হ্রস্ব, দ্বিতীয়টির যতি হয় দীর্ঘ ; যথা—

(১) তোমার সন্তানে | মানুষ হইতে দাও ··· ৬ + ৮
(২) অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত | হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ ··· ১০ + ৮

ইহাদের প্রতিটিরই উচ্চারণ হয় দুই চরণে :—

(১) তোমার সন্তানে ॥
মানুষ হইতে দাও।
(২) অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত ॥
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ।

[উচ্চারণে মুখপর্ব নির্দেশক হ্রস্বযতি (।) ও অন্ত্যপর্ব নির্দেশক দীর্ঘ যতি (॥) লক্ষণীয়।]

দশাক্ষর পর্বে রচিত দ্বিপর্বিক চরণ উচ্চারণকালে এক চরণ থাকে না, দুই চরণে পরিণত হয়। যথা—

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক | অধরেতে সুপ্ত অভিমান।
বাহুলতা চন্দনের শাখা | বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।

ইহার যথার্থ রূপ ঃ—

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক
অধরেতে সুপ্ত অভিমান।
বাহুলতা চন্দনের শাখা
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান॥

বিঃ দ্রঃ—অক্ষরবৃত্তে চরণ গঠনের মূলে দ্ব্যক্ষর অন্ত্যপর্ব বর্তমান বলিয়া দৈবাৎ কখনও কখনও দ্ব্যক্ষর অন্ত্যপর্বও বিশিষ্ট প্রতীক চরণরূপে অন্য চরণের সহিত স্তবক বন্ধন করিতে পারে। যথা—

হায়
সারাজীবনের সাথী | আজ চলে যায়

§ ৭. জাত্যন্তর গ্রহণে প্রবৃত্তি অক্ষরবৃত্তের বিশিষ্টতা; চতুরক্ষর পর্বে উচারিত হইবার সুযোগ পাইলেই ইহা নিজ পর্বকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বলবৃত্তে অথবা মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয়, তাছাড়া ইহার অন্ত্য পর্বের ঈষৎ হ্রাসবৃদ্ধিতেও ইহা চতুর্মাত্রিক পর্বে বিভক্ত হইয়া মাত্রাবৃত্ত মূর্তি ধারণ করে।

অক্ষরবৃত্তের জাতি-পরিবর্তন প্রবৃত্তি

"আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুতঃ লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদ-মর্যাদা।"[১] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি শুধু 'পয়ার' সম্বন্ধে নহে, অক্ষরবৃত্তের সকল ছন্দোবন্ধ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'চাল খাটো করা'র সুযোগ দিলেই অক্ষরবৃত্তের জাতি-চ্যুতি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা হইতেই তাহার প্রমাণ দেওয়া যায়। কবি 'লম্বা নিঃশ্বাসে'ই নিম্নোদ্ধৃত স্তবক দুইটি রচনা করিয়া পয়ার বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন—

(১) একটা কথা শোনো মনে | খটকা নাহি রেখে
টাট্‌কা মাছ জুটল না তো | শুঁটকি দেখো চেখে।[২]

১। পৃঃ ১৪২ র-র (১৪), ২। পৃঃ ১৮৮ ঐ,

(২) চকমকি ঠোকাঠুকি | আগুনের প্রায়
চোখোচোখি ঘটিতেই | হাসি ঠিকরায়।[৩]

কিন্তু রচনার অসাবধানতায় ইহাদের মধ্যে অন্তর্বিভাজনের সুযোগ থাকিয়া গিয়াছে। শ্রমবিমুখ বাঙ্গালীর জিহ্বা একবার হ্রস্বপর্ব পাইলে আর দীর্ঘপর্ব উচ্চারণের ক্লেশ স্বীকার করে না। তাই চতুরক্ষর পর্বে বিভক্ত হইয়া প্রথম দৃষ্টান্তটি বলবৃত্তে ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয় :—

(১) একটা কথা | শোনো মনে | খট্‌কা নাহি | রেখে
টাট্‌কা মাছ | জুটল না তো | শুঁট্‌কি দেখো | চেখে।

(২) চক মকি | ঠোকাঠুকি | আগুনের | প্রায়
চোখো চোখি | ঘটিতেই | হাসি ঠিক | রায়

['মালঝাঁপ পয়ার' ও 'তরল পয়ারে' যেখানে অন্তর্বিভাজন সম্ভব হয় না সেখানে জাতি পরিবর্তনও ঘটে না ; অনুপ্রাসে অলংকৃত অক্ষরবৃত্ত রূপেই থাকিয়া যায় (সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।]

কেবল বাঙ্গালীর উচ্চারণ-বিলাসে নহে, অন্ত্যপর্বের হ্রাস বৃদ্ধিতেও অক্ষরবৃত্ত জাতি-পরিবর্তন করে। অন্যান্য বৃত্তে অন্ত্যপর্বের হ্রাস বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ নহে। যথা, বলবৃত্তে—

মেঘের ডাকে | পেখম তুলে | ময়ুর নাচে | বনে

ইহা সাধারণ বলবৃত্ত-চরণ। ইহার দ্ব্যক্ষর অন্ত্যপর্ব হইতে একাক্ষর কমাইয়া অনায়াসে বলা চলে—

মেঘের ডাকে | পেখম তুলে | ময়ুর নাচে | রে

আবার দ্ব্যক্ষর অন্ত্যপর্বে একাক্ষর বাড়াইয়াও বলা যায়—

মেঘের ডাকে | পেখম তুলে | ময়ুর নাচে | কোন্ বনে

অন্ত্যপর্বের এইপ্রকার হ্রাস বৃদ্ধিতে মুখ্য পর্বের বা জাতির পরিবর্তন

৩। পৃঃ ১৬৪ র-র (১৪)

ঘটে নাই। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এখানে অন্ত্যপর্বের ঈষৎ হ্রাস বৃদ্ধিতে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয়। যথা—
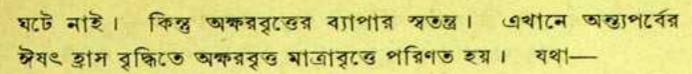
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষণ

ইহা অক্ষরবৃত্তই বটে। ইহার অন্ত্যপর্ব 'ঘন বরষণ' হইতে একাক্ষর বাদ দিয়া 'ঘন বরষা' করিলেই ইহা চতুর্মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্তে পরিণত হয়; যথা—

গগনে গ | রজে মেঘ | ঘন বর | ষা —সোনার তরী

এই কবিতায় অক্ষরবৃত্তের পরিবর্তে মাত্রাবৃত্তের ধর্ম আসিয়াছে বলিয়াই কবি শব্দান্তে হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রয়োগে বাধ্য হইয়াছেন; তিনি—

শূন্য নদীটির তীরে | রহিনু পড়ি

লিখিতে পারেন নাই, লিখিয়াছেন—

শূন্য ন | দীর তীরে | রহিনু প | ড়ি।

কেবল বাদ দেওয়ায় নহে, পয়ারের অন্ত্যপর্বে এক অক্ষর যোগ করিলেও একই ব্যাপার ঘটে। যথা—

হে বীর জীবন দিয়া | মরণেরে জিনি

ইহার অন্ত্যপর্বে একাক্ষর 'লে' যোগ করিলে উহা উচ্চারিত হয়—

হে বীর জী | বন দিয়া | মরণেরে | জিনিলে

এই চরণ যে মাত্রাবৃত্তের, অক্ষরবৃত্তের নহে, তাহার প্রমাণ—ইহার দ্বিতীয় চরণে শব্দান্ত হলন্ত অক্ষরে কবির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ :—

নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে

[পৃঃ ২১১, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪)

অক্ষরবৃত্তের অন্ত্যপর্ব ষড়ক্ষর না হইয়া দশাক্ষর হইলেও স্বভাব-ধর্মের পরিবর্তন হয় না, একাক্ষর যোগ-বিয়োগে এখানেও ছন্দ চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিবর্তিত হয়; যথা—

কোন মা আমারে দিলি | শুধু এই খেলাবার বাঁশী

অন্ত্যপর্বে একাক্ষর 'টি' যোগ করিলেই ইহার উচ্চারণ হয়—

কোন মা আ | মারে দিলি | শুধু এই | খেলাবার | বাঁশীটি

সেইজন্যই—

হাঁগো এ কাদের দেশে   বিদেশী নামিনু এসে
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি
অমনি কথা না বলি   ভরা ঘট ছল ছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।

ইহার ছন্দ অক্ষরবৃত্ত হইতে পারে না, ইহা মাত্রাবৃত্ত এবং চতুর্মাত্রিক পর্বে নিম্নপ্রকারে উচ্চার্য ঃ—

হাঁগো এ কা | দের দেশে | বিদেশী না | মিনু এসে | তাহারে শু | ধানু হেসে | যেমনি

অমনি ক | থা না বলি | ভরা ঘট | ছল ছলি | নতমুখে | গেল চলি | তরুণী।

§ ৮. অক্ষরবৃত্তে পয়ার ও মহাপয়ারের পর্ব-সম্মিতি প্রকাশিত নহে, অন্তর্গূঢ়; সেইজন্য এই দুই ছন্দ চাপল্যবর্জিত, গম্ভীর ও মহাকাব্যের উপযুক্ত বাহন।

পয়ারে ও মহাপয়ারে অন্তর্গূঢ় সম্মিতি

ছন্দ চরণে পর্বে পর্বে সমদৈর্ঘ্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটিলে সম্মিতিবোধ হয় না; কিন্তু পয়ার ও মহাপয়ারের চরণ অ-সমপর্বিক; পয়ারের মুখপর্ব আট মাত্রার এবং অন্ত্যপর্ব ছয় মাত্রার। সেইরূপ মহাপয়ারের মুখপর্ব আট মাত্রার এবং অন্ত্যপর্ব দশ মাত্রার। কাজেই পয়ার ও মহাপয়ারের চরণকে সম্মিতিহীন ও ছন্দোহীন মনে করা স্বাভাবিক অথচ এ-কথাও সত্য যে পয়ার বা মহাপয়ারের একটি মাত্র চরণেই বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ উদ্রিক্ত হয়; যথা ;—

দুঁহু কোরে দুহু কাঁদে | বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

অথবা—

পর্বত চাহিল হতে | বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

এই ছন্দোবোধের প্রকৃত কারণ পয়ার বা মহাপয়ারের প্রতি পর্বে অন্তর্গূঢ়ভাবে একাধিক অন্তঃপর্ব বর্তমান। আসলে ইহাদের পর্ব ভিতরে যুক্তপর্ব কিন্তু বাহিরে বেমালুম যোগচিহ্নহীন একাকার হইয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখানো হইয়াছে—

ó ০ ০ ০ | ó ০ ০ ০ | ó ০ ০ ০ | ó ০
(১) | (২) | (৩) | (৪)

এইরূপ দ্ব্যক্ষর খণ্ড পর্বযুক্ত তিনটি পূর্ণ চতুরক্ষর পর্বের বলবৃত্ত-চরণই পয়ার চরণের মৌলিক রূপ। ইহার দ্বিতীয় চতুর্থ শ্বাসাঘাতের বিলোপে প্রথমের সহিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের সহিত চতুর্থ পর্ব সংযুক্ত হইয়া যায়; সংযোজনের ফলে পয়ারের অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া মূল আদর্শ বলবৃত্ত চরণের প্রথম পর্ব বাদ দিয়া অবশিষ্ট পর্বগুলির পরস্পর সংযোগে দশাক্ষর পর্ব উৎপন্ন হয়। এই দশাক্ষর পর্ব মহাপয়ারের অন্ত্যপর্ব, ইহা দীর্ঘ ত্রিপদীরও অন্ত্যপর্ব বটে। এই জন্যই পয়ার বা মহাপয়ারের পর্ব ভিতরে ভিতরে যুক্তপর্ব এবং পর্ব-সম্মিতি অন্তর্গূঢ়।

আমাদের হাত, পা, চোখ, কান একটি নহে, দুইটি। এইসকল যুগ্ম অঙ্গের স্নায়বিক ক্রিয়ায় সম্মিতিবোধ উৎপন্ন হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। তথাপি অবিরত অভ্যাসে এই সম্মিতি চেতনা আমাদের অন্তর্গূঢ়। আমরা এই স্নায়বিক সম্মিতি চেতন মনে অনুভব করি না, অবচেতন মনেই অনুভব করি। প্রায় হাজার বছরের অভ্যাসে পয়ার ছন্দের সম্মিতিও বাঙ্গালীর অবচেতন মনে স্থানলাভ করিয়াছে; সেইজন্য ইহার ধ্বনি-সৌন্দর্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। ইহার সম্বন্ধে বলা চলে—

> ভুলে থাকা নয় সে যে ভোলা
> বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা।

পয়ার ছন্দের ব্যাপার মহাপয়ার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এখানেও মূল

পর্বের ধ্বনি-তরঙ্গ অন্তর্গূঢ়। সেইজন্য পয়ার ও মহাপয়ার অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ এবং জগৎ ও জীবন বর্ণনার উপযোগী। সংস্কৃত ভাষার অনুষ্টুপ্ ছন্দের ন্যায় পয়ার ছন্দ বাংলা মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম বাহন। প্রাচীন বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব জীবনী এবং আধুনিক বাংলায় মেঘনাদ বধ* বৃত্রসংহার প্রভৃতি ক্লাসিক কাব্য প্রধানতঃ পয়ার ছন্দেই রচিত। পয়ারকেই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ছন্দ বলা যাইতে পারে।

[পয়ার যে কেবল অক্ষর বৃত্তেরই অন্তর্গত, অন্য কোন জাতীয় নহে, তাহা পরবর্তী দশম সূত্রে দেখানো হইয়াছে।]

§ ৯. অক্ষরবৃত্তের স্তবক বা ছন্দোবন্ধ গঠনে অষ্টাক্ষর পর্ব, দশাক্ষর পর্ব এবং কেবল এই দুইটির কোনোটির সহযোগেই ষড়ক্ষর পর্ব ব্যবহৃত হইতে পারে; এই তিন প্রকার পর্ব ভিন্ন অন্য পর্ব ব্যবহৃত হইতে পারে না।

পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীই অক্ষরবৃত্তে সর্ববিধ স্তবকের মূল, অষ্টাক্ষর পর্বই ইহাদের 'মুখপর্ব' এবং ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্ব যথাক্রমে পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীর 'অন্ত্যপর্ব'।

স্তবক গঠনে অষ্টাক্ষর, দশাক্ষর ও ষড়ক্ষর—এই ত্রিবিধ পর্বের যে কোন একটিরই পুনরাবর্তন হইতে হইবে তাহা নহে, ত্রিবিধ পর্বেরই

অক্ষরবৃত্তে স্তবক গঠন

একত্র সমাবেশ হইতে পারে তবে যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে নহে, অন্ত্যপর্বকে চরণান্তেই বসাইতে হয় এবং অসমদীর্ঘ চরণ রচনায় ষড়ক্ষর পর্বকে বহুগুণিত করা চলে না। অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ বিলম্বিত সুরের ছন্দ, ষড়ক্ষর পর্ব

* মাইকেলের অমিত্রছন্দ পয়ার ব্যতীত অন্য কিছু নহে, উহাতে অর্থগত ছেদ-বৈচিত্র থাকিলেও, ধ্বনিগত যতি-বিপর্যয় নাই। (১৮শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

একাকী এই সুর সৃষ্টি করিতে পারে না, সেইজন্য স্তবকে ষড়ক্ষর পর্বের পর পর বহুল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। চরণে কেবল ষড়ক্ষর পর্ব থাকিলে ছন্দ হইয়া উঠে মাত্রাবৃত্ত।
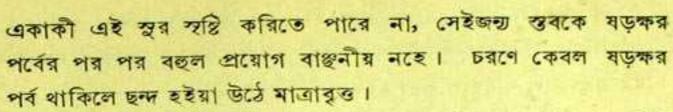
পয়ার (৮+৬), মহাপয়ার (৮+১০), দিগক্ষরা (১০), দীর্ঘ ত্রিপদী (৮+৮+১০) ও সঙ্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদীর (৮+৮+৬) গঠন বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেই দেখানো হইয়াছে, এগুলির প্রতিটিই দুই চরণের স্তবক বা দ্বয়ী। তাছাড়া দীর্ঘ চৌপদী (৮+৮+৮+৬) নামক দ্বয়ীও বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রচলিত ছন্দ। যথা—

পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম তুচ্ছ তারা সূর্য সোম
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন | গণিবারে পারে।
সম্মুখে সাগরাম্বরা ছড়ায়ে রয়েছে ধরা
কটাক্ষে কখন যেন | দেখিছে তাহারে॥

—বিহারীলাল

পয়ার চরণের (৮+৬) সহিত দীর্ঘ চৌপদী চরণের (৮+৮+৮+৬) মেল বন্ধন করিয়া নূতন দ্বয়ী করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র :—

ভাসিছ সলিলে যেন | আকাশেতে তারা।
কিংবা কাদম্বিনী গায় যেন বিহঙ্গিনী প্রায়
কিংবা যেন মাঠে ভ্রমে | নারী পথহারা॥

দুইটি পয়ার চরণের সহিত একটি দীর্ঘ চৌপদী চরণ মিলিত করিয়া ত্রয়ী রচনা করিয়াছেন হেমচন্দ্র :—

ফেলিয়া দিয়াছি আমি | যত অলংকার
রতন মুকুতা হীরা | সব আভরণ।
ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা জুড়াতে মনের জ্বালা
চন্দন চর্চিত দেহে | ভস্মের মতন॥

কতকগুলি চারি চরণের ছন্দ বা চতুষ্ককে দ্বয়ী বলিয়া ভ্রম হয় ; এইগুলিকে বিভিন্ন প্যাটার্ণের দুইটি চরণকে একত্র করিয়া সমগ্রকে এক চরণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা—

(১) নমি তোমা নর দেব | কি গর্বে গৌরবে ৮ + ৬
দাঁড়ায়েছ তুমি ॥ ৬
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি | শিরে চূর্ণ মেঘ
পদে শষ্প ভূমি ॥

—অক্ষয় বড়াল

(২) ওহে দেব ভেঙ্গে দাও | ভীতির শৃঙ্খল ৮ + ৬
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন ॥ ১০
সমুদয় একেবারে | দেই একেবারে
জগতের পায় বিসর্জন ॥

—কামিনী রায়

(৩) এবার আসনি তুমি | বসন্তের আবেশ হিল্লোলে ৮ + ১০
পুষ্পদল চুমি। ৬
এবার আসনি তুমি | মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে
ধন্য ধন্য তুমি ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪) মোরে কর সভাকবি | ধ্যানমগ্ন তোমার সভায় ৮ + ১০
হে শর্বরী হে অবগুণ্ঠিতা। ১০
তোমার আকাশ জুড়ি | যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা ॥

—রবীন্দ্রনাথ

কখন কখন ছন্দোবন্ধের কোন পর্বকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ও খণ্ডিত

অংশগুলিকে বিভিন্ন পর পর পক্তিতে সাজাইয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়; যথা—

[বন্ধনীবদ্ধ অংশগুলি দ্রষ্টব্য]

হে ভুবন আমি যতক্ষণ }	...	০ + ১০
তোমারে না বেসেছিনু ভালো	...	০ + ১০
ততক্ষণ তব আলো	...	৮ + ০
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | তার যত ধন	...	৮ + ৬
ততক্ষণ নিখিল ভুবন }	...	০ + ১০
হাতে নিয়ে দীপ তার | শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে		৮ + ১০

—রবীন্দ্রনাথ

§ ১০. বাংলা সাহিত্যে অক্ষরবৃত্তের কয়েকটি ছন্দোবন্ধের নাম প্রচলিত থাকিলেও নামগুলি অত্যাবশ্যক নহে; তাছাড়া পর্বের অষ্টাক্ষরতা ও দশাক্ষরতা অস্বীকার করিয়া যে সকল অক্ষরবৃত্ত-ছন্দোবন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদেরও কোন সার্থকতা নাই।

ছন্দোবন্ধের নামকরণ ও নূতন পরিকল্পনা

সংস্কৃত ভাষার ন্যায় যে সকল ভাষায় কবিতা খণ্ড খণ্ড শ্লোকে বিচ্ছিন্ন হইয়া রচিত হয়, সেই সকল ভাষায় বিভিন্ন প্যাটার্ণের ছন্দোবন্ধের স্থায়িত্ব প্রয়োজনীয় এবং স্থায়িত্বের জন্যই নামকরণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। বাংলা কবিতা সাধারণতঃ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ভাবেই প্রবাহিত হয়, সংস্কৃত কবিতার মতো বিচ্ছিন্ন শ্লোকাবলীতে গ্রথিত হয় না। সেইজন্য ছন্দের প্যাটার্ণ ও উহার নামের মূল্য বাংলায় সীমাবদ্ধ। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত প্রধান দুইটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দোবন্ধের নাম ছিল পয়ার ও লাচাড়ি (দীর্ঘ ত্রিপদী);

অন্যগুলির নামকরণ হয় নাই। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্যাটার্ণ ভেদে পুরাতন ছন্দোবন্ধগুলিকে একাবলী, মালঝাঁপ, তরল পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, দীর্ঘ চৌপদী, লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি নামে নামাঙ্কিত করা হয়। উনবিংশ শতকে রচিত ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থে, মধুসূদন বাচস্পতির 'ছন্দোমালা'য় এবং লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্য-নির্ণয়ে' পুরাতন ছন্দোবন্ধগুলি ছাড়াও নূতন পরিকল্পিত বিচিত্র প্যাটার্ণের বহু ছন্দোবন্ধ নানা নামে ভূষিত হইয়া প্রচারিত হয়; যথা—ললিত, দিগক্ষরা, বিশাখ পয়ার, ভঙ্গ পয়ার, সতী, কুমারী, রসবতী, পংক্তি, ভৃঙ্গাবলী প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্যাটার্ণ সংস্কৃত হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত, কতকগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা নূতন পরিকল্পিত। লক্ষ্য করিবার বিষয়—মধ্যযতি ও পর্বদৈর্ঘ্য অস্বীকার করিয়া এবং কেবল মাত্র চরণের অক্ষর সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ নূতন ছন্দোবন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে; ফলে এইগুলির মধ্যে ছন্দ নহে, ছন্দ-পতনই প্রকাশ পায়। 'কাব্য-নির্ণয়' হইতে উদ্ধৃত নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য :—

(১) অয়ি সুবদনি কেন রহ গরবে।
এ নব যৌবন কদিন বল রবে॥ —ত্রয়োদশাক্ষরা একাবলী

(২) ওহে নিষাদ কিক্ষণে তুমি বকের মিথুনে।
বাণ হেনেছিলে যুজি নিজ ধনুকের গুণে॥
—কুসুম মালিকা (১৬ অক্ষর)

(৩) বিভু করুণা নিধান, করিব তব গুণ গান।
কিন্তু নাহিক শকতি, এজন বিহীন মতি॥ —বিধুমালা

(৪) বিকৃত নয়ন কদাকার, জন্মের ঠিকানা জানা ভার।
উলঙ্গের কিবা ধন, হরে নাহি বরযোগ্য কিছু গুণ॥ —আর্যা

পর্ব-সম্মিতির অভাবেই উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে ছন্দ অনুভূত হয় না।

[একজন বিশিষ্ট আধুনিক ছান্দসিকও অষ্টাক্ষর পর্বকে উপেক্ষা করিয়া কেবল চরণের ভিত্তিতেই পয়ার ছন্দোবন্ধের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—চরণের চৌদ্দটি 'ইউনিট'ই পয়ারের একমাত্র লক্ষণ; সেইজন্ত পয়ার "তিন রকমের হ'তে পারে। যৌগিক (অক্ষরবৃত্ত) পয়ার, মাত্রিক (মাত্রাবৃত্ত) পয়ার, আর স্বরবৃত্ত (বলবৃত্ত) পয়ার।" ইহাদের ক্রমিক দৃষ্টান্ত :—

(১) নিয়ে আবর্তিয়া ছুটে | যমুনার জল
দুই তীরে গিরিতট | উচ্চ শিলাতল।

(২) নিয়ে য | মুনা বহে | স্বচ্ছ শী | তল
ঊর্ধ্বে পা | ষাণ তট | শ্যাম শিলা | তল ॥

(৩) নিয়ে ছুটে | স্বচ্ছ শীতল | নীল যমুনার | জল।
দুই তীরে তার | উচ্চ পাষাণ | শ্যামল শিলা | তল ॥

কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলির প্রথমটিই কেবল সত্যকার 'পয়ার'; কারণ অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর এই দুই পর্বের বন্ধনই পয়ারের একমাত্র লক্ষণ; এই লক্ষণ প্রথম দৃষ্টান্তেই আছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে নাই। তাছাড়া চরণের ভিত্তিতে বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিচার হয় না। অষ্টাক্ষর পর্বিক বলিয়া পয়ার কেবল অক্ষরবৃত্ত জাতীয়, ইহার ত্রিজাতীয় মূর্তি হইতে পারে না। "আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে।······লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদ-মর্যাদা,"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিই চূড়ান্ত প্রমাণ। এই উক্তির 'মন্দগতি চাল' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ: ইহা বুঝাইয়া দেয়—পয়ার একমাত্র অক্ষরবৃত্তেরই অন্তর্গত।]

§ ১১. অক্ষরবৃত্তের অন্তর্গত বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের মধ্যে পয়ার বা মহাপয়ারের চৌদ্দ চরণে গঠিত ছন্দোবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ইহার নাম 'চতুর্দশপদী' বা 'সনেট'।

ইহা বিশেষ জনপ্রিয় ইউরোপীয় ছন্দোবন্ধ। ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজি সনেটের অনুসরণে বহু কবি বাংলায় 'সনেট্' লিখিয়াছেন।

চতুর্দশপদী বা সনেট্

মাইকেল* পয়ারে এবং রবীন্দ্রনাথ মহাপয়ারে সনেট্ প্রচলিত করেন। সনেটের বৈশিষ্ট্য স্তবকবন্ধনগত ও চরণের অন্ত্যানুপ্রাসগত, ইহার ছন্দোগত নূতনত্ব কিছু নাই ; পয়ার বা মহাপয়ারের বিধি ইহা কখনই লঙ্ঘন করে না। ইতালীয় সনেট অষ্টক ও ষট্ক স্তবকে বিভক্ত, ইহাতে চরণান্তিক অনুপ্রাস যথাক্রমে ক খ খ ক ক খ খ ক এবং চছ চছ চছ বা চছজ চছজ ; ইহাতে শেষ দুই চরণ এক অনুপ্রাসে মিলিত হয় না। ইংরেজি সনেটে পর পর তিনটি চতুষ্ক ও একটি দ্বয়ী থাকে এবং ফরাসী সনেটে দুইটি চতুষ্কের পর একটি দ্বয়ী, তাহার পর আর একটি চতুষ্কে সনেট সমাপ্ত হয়। ইংরেজি ও ফরাসী সনেটের অন্ত্যানুপ্রাস সাধারণতঃ যথাক্রমে—কখকখ, গঘগঘ, চছচছ, জজ এবং কখখক, কখখক, গগ, চছচছ। বাংলায় চৌদ্দ চরণের বন্ধন ছাড়া সনেটের আর কোন বন্ধন নাই। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সনেটের সর্বপ্রকার বন্ধন অস্বীকার করিয়া উহাকে করিয়া তুলিয়াছেন কেবল চতুর্দশপদী। ইংরেজি রীতিতে রচিত বাংলা সনেটের দৃষ্টান্ত ঃ—

(ক) পয়ারে রচিত—	মিল
'ঢুকিবে না কায়া' বলে | মুগ্ধা হাসি মুখ—	ক
'ছিঁড়িবে যে ছোট জামা | দেহ পরিসর'	খ
বাঁকাইয়া কটিতট | ফুলাইয়া বুক	ক
বাড়াইল প্রতিকূল | পথে রম্যকর।	খ
বীর আমি, ভালবাসি | এ মিষ্ট সংগ্রাম	গ

* বাংলা ছন্দে মাইকেল মধুসূদনের দান ১৮শ অধ্যায়ে আলোচিত। রবীন্দ্রনাথের দান ১৭শ ও ১৯শ অধ্যায়ে।

	মিল
স্বম্ববাসে সাজাইনু । দেহ যষ্টি তার	ঘ
কোথাও বাঁধন দিয়া । কোথাও বিরাম	গ
শির স্কন্ধ বক্ষ পরে । করে দিনু পার।	ঘ
উদ্ভিন্ন দেহ বাসে । কলার কৌশলে	চ
উচ্ছল সে দেহলতা । প্রতি অঙ্গ রেখা।	ছ
হাসিছে লক্ষীটি বাহু । সামান্ত সম্বলে।	চ
ঠিক বসিয়াছে বাস । শোভা তাহে লেখা।	ছ
হৃদয়ে অভাব নাই । বাহুল্য শরীরে।	জ
এমন নারীরে চাই । এমন বাণীরে।	জ

—প্রিয়নাথ সেন

(খ) মহাপয়ারে রচিত—

	মিল
বসন্তের উষা আসি । রঞ্জি দিল যুগল কপোলে	ক
তাই ও ফুলের বাস । ফুলহাসি আননে প্রিয়ার।	খ
নিদাঘের রৌদ্র আসি । বিলসিল ললাট নিটোলে	ক
তাই গো প্রিয়ার ভালে । জ্যোতি খেলে মহিমা ছটার।	খ
ঘন ঘোর বর্ষা রাত্রি । বিহরিল অলক নিচোলে	ক
তাই গো প্রিয়ার পিঠ । কেশমেঘে সদা মেঘাকার	খ
নাচিল শরৎ-শশী । রূপহ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে	ক
তাই গো প্রিয়ার দেহ । কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার।	খ
রাহু কেতু দুই ঋতু । শীত ও হেমন্ত শুধু হায়	গ
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি । ছড়াইল কঠিন তুষার	খ
তাই প্রিয়ে তাই বুঝি । সুকঠিন হৃদয় তোমার	খ
উপাসনা আরাধনা । সকলি ঠেলিয়া দাও পায়।	গ
আমি গো বুঝিতে নারি । দেবী তুমি অথবা রাক্ষসী	চ
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি । কিংবা ঘোর কৃষ্ণা চতুর্দশী।	চ

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

§ ১১. অক্ষরবৃত্ত-পর্বের গুরু-অক্ষর বহনের শক্তি সর্বাধিক, তবে এই শক্তিকে শোষণ-শক্তি বলা চলে না।

অক্ষরবৃত্তের শোষণ শক্তি

কেহ কেহ পয়ার ও পয়ারজাতীয় (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দের 'অসাধারণ শোষণ শক্তি'র কথা প্রচার করিয়াছেন ; কিন্তু ছন্দে 'শোষণ' কথার কোন অর্থ নাই। অক্ষর-ধ্বনি ছন্দ-পর্বের খণ্ডাংশ মাত্র ; খণ্ডাংশ যোজনীয়, শোষণীয় নহে। পুষ্পমাল্য পুষ্পকে শোষণ করিতে পারে না, পুষ্পকে (অর্থাৎ পুষ্প মধুকে) শোষণ করিতে পারে ভ্রমর। পৃথক তরল পদার্থকে আত্মসাৎ করাই হইতেছে যথার্থ শোষণ। ধ্বনি যে তরল ও ধ্বনিপর্ব যে কঠিন তাহা নহে, উভয়ে পৃথকও নহে, ধ্বনি ধ্বনিপর্বেরই অঙ্গ মাত্র। কাজেই পয়ারজাতীয় ছন্দের ধ্বনি-শোষণ রূপ কল্পনার বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই।

তথাকথিত শোষণ শক্তির উদ্দিষ্ট অর্থ ভারবহন সামর্থ্য। ছন্দ-শাস্ত্রে স্বরান্ত অক্ষর দুর্বল, হলন্ত অক্ষর সবল। তবে সকল হলন্ত অক্ষর সবল নহে ; সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হলন্ত অক্ষরই সবল, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলন্ত অক্ষরের বলহানি ঘটে। মাত্রাবৃত্ত দুর্বল প্রকৃতির ছন্দ, ইহা সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরকে ধারণ করিতে পারে না। বলবৃত্ত সবল প্রকৃতির ছন্দ বটে, কিন্তু ইহার পর্বে স্থানাভাব—তিনটির অধিক সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরধারণ সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে অক্ষর-বৃত্তের পর্ব দীর্ঘায়ত—ইহাতে শব্দান্ত বাদে সর্বত্র সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইতে পারে। সেইজন্য অক্ষরবৃত্তের পর্বেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সবল অক্ষর ব্যবহৃত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, বাংলা শব্দের সমাবেশে অষ্টাক্ষর পয়ার পর্বে পাঁচটি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট হলন্ত-অক্ষর ব্যবহার করা যায়। যথা—

(১) পাষাণ মিলায়ে যায় | গায়ের বাতাসে ··· ০ সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর
(২) পাষাণ **মু**ছিয়া যায় | গায়ের বাতাসে ··· ১ টি „ „
(৩) **স**ঙ্গীত ত**র**ঙ্গি উঠে | অঙ্গের উচ্ছ্বাসে ··· ২ টি „ „
(৪) **স**ঙ্গীত ত**র**ঙ্গ **র**ঙ্গ | অঙ্গের উচ্ছ্বাস ··· ৩ টি „ „
(৫) **দু**র্দান্ত **পা**ণ্ডিত্য **পূ**র্ণ | দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত ··· ৫ টি „ „

অষ্টাক্ষর পর্বে বাংলা শব্দে সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের পাঁচটি সংখ্যাই সম্ভবতঃ শেষ সীমা। তবে অবঙ্গীয় শব্দ বসাইলে পয়ার পর্ব আরও অধিক ভার বহন করিতে পারে। যথা—

শুনি নিত্য বেদধ্বনি | শ্রবণ কুহরে
'সঙ্গচ্ছধ্বং সঙ্গচ্ছধ্বং' | ধীরোদাত্ত স্বরে।

ইহার দ্বিতীয় চরণের অষ্টাক্ষর পর্বে আটটিই হইতেছে সংশ্লিষ্ট সবল হলন্ত অক্ষর।

উত্তরার্ধ

ছন্দোবিবর্তন

দশম অধ্যায়

ছন্দের উৎপত্তি ও বৈদিক ছন্দ

মানুষের প্রয়োজনজ্ঞাপক কথ্য ভাষা কী কারণে প্রথম ছন্দোবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মনীষীরা চিন্তা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণা পরস্পরের বিপরীত মুখী।

সৌন্দর্য দ্বিবিধ—স্থিতি সৌন্দর্য ও গতি সৌন্দর্য। তন্মধ্যে গতি-সৌন্দর্য বুঝাইতেই ছন্দ (rhythm) শব্দ ব্যবহৃত হয়। গতি-সৌন্দর্য আধুনিক বা সদ্যোজাত ব্যাপার নহে, পৃথিবীতে মানব-আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই গতিশীল জড়জগতে ও প্রাণিজগতে সৌন্দর্য সমভাবেই বর্তমান আছে। জলতরঙ্গের উত্থান পতন, জলের কলকল ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের কম্পন, ময়ূরের নাচ, হরিণের উল্লম্ফন, হাঁসের গতি প্রভৃতিতে সম্মিতি (symmetry) যুক্ত সমমাত্রিক ছন্দ বর্তমান ; তেমনি নদীর প্রবাহ, মাছের সাঁতার, ধূমের সঞ্চরণ, মেঘ-মন্দ্রের অনুরণন, উৎসজলের উচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে সঙ্গতি (harmony) যুক্ত অসমমাত্রিক ছন্দও বর্তমান। সম্মিতি যুক্ত হউক বা সঙ্গতি-যুক্ত হউক, ছন্দ হইতেছে এই সকল সচল বস্তু ও প্রাণীর নিত্যসঙ্গী। কাজেই প্রাকৃতিক জগতে ছন্দের উৎপত্তি কীভাবে হইল, কবে হইল, সে সম্বন্ধে কৌতূহল বা প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু ছন্দ মানব-ভাষার নিত্যসঙ্গী নহে ; মানুষের সাধারণ ভাষা অর্থপ্রধান প্রয়োজনের ভাষা এবং এ-ভাষা ছন্দোহীন। এই ছন্দোহীন ভাষা হঠাৎ প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া ধ্বনি-প্রধান ও ছন্দোবদ্ধ হইয়া উঠিল কেন—এ

সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক ; মানব-সভ্যতার আদিযুগ হইতেই এই জিজ্ঞাসা মানবমনে জাগিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর ইউরোপ দিয়াছে একভাবে, ভারত দিয়াছে উহার বিপরীত ভাবে।

ইউরোপীয় চিন্তার স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে। রাষ্ট্রচেতনা বা গোষ্ঠী-চেতনা ইউরোপের মজ্জাগত। যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনে ও অধ্যাত্ম সাধনায় তেমনি সৌন্দর্য-ভোগের ক্ষেত্রে ভারতের মানুষ একাকী ও স্বতন্ত্র ; ইউরোপীয়গণ কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ। মানুষ একজন হইলেও সে যে 'বহু'রই অঙ্গ, একটি গোষ্ঠীর অংশ তাহা কোন ইউরোপীয়ই ভুলিতে পারে না। ছন্দোব্যাখ্যার মধ্যেও দেখা যায় সেই মনোবৃত্তি।

গ্রীস দেশের বিশিষ্ট প্রাচীন ছান্দসিক আরিষ্টক্সেনাস (Aristoxenus) (খ্রীঃ পূঃ ৩২০)। ইনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত পিথাগোরাস ও আরিষ্টটলের শিষ্য। ইঁহার মতে, দলবদ্ধ ব্যক্তিগণের নৃত্যগীতের সমতাল হইতেই ভাষাগত ছন্দের উৎপত্তি এবং ছন্দের অর্থ হইতেছে তালনিবদ্ধতা— ταξις χρονων বা "ordering of times"[১]। তাছাড়া Westphal-এর Metrik der Griechen গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে—"দলবদ্ধনৃত্যে সামনে পিছনে আটবার করিয়া পদক্ষেপের তালে তালে গান গাহিবার ফলেই ইন্দোইউরোপীয় ছন্দের জন্ম ; সেই জন্যই এই আদিম ছন্দের অষ্টাক্ষরে যতি দেখা যায়।"[২]

ভাষাগত ছন্দের উৎপত্তি-নির্ণয়ে আধুনিক 'মার্কস্'-বাদী ইউরোপীয়গণ পৃথক্ ভাবে নূতন করিয়া চিন্তা করিয়াছেন। এই চিন্তাও কিন্তু গোষ্ঠী-ভিত্তিক। ইঁহাদের ধারণা—নৃত্য নহে, দলবদ্ধ ভাবে শ্রমসাধ্য কর্ম করিবার ফলেই ভাষা ও ভাষাগত ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সকল দেশেই দেখা যায়—শ্রমিকের দল হাতিয়ার

১। P. 7. What is Rhythm (Sonnenshein)

২। Pp. 135-36. Hand book of Poetics (Gummere)

(tools) চালনা কালে দমবন্ধ করিয়া তবেই হাতিয়ারে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে। বারংবার হাতিয়ার চালনায় শক্তি প্রয়োগের ফাঁকে ফাঁকে উহাদের শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে। উহাদের রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময়ে কতকটা বায়ু মুখ দিয়াই বাহির হইয়া যায় এবং উহাতে কণ্ঠতন্ত্রী কম্পিত হওয়ায় সাধারণতঃ অর্থহীন বিচিত্রধ্বনি উৎপন্ন হয়। কাঠুরিয়ার কুঠার-চালনা, মাঝি মাল্লার দাঁড় টানা, বেহারাদের পাল্কী বহা প্রভৃতি শ্রমসাপেক্ষ কর্মে শ্রমিকগণের কণ্ঠে এই প্রকার ধ্বনির উৎপত্তি এ-কালেও হইয়া থাকে। আদিম যুগে শ্রমিকদিগের এই প্রকার মিলিত কণ্ঠধ্বনিই ভাষা ও ছন্দের জননী—"Speech evolved from the reflex action of the vocal organs incidental to the muscular efforts involved in the use of tools.।"[৩] হাতিয়ার চালনার তালে তালে শ্রম-সঙ্গীত নির্গত হয় বলিয়া ইহার ভাষাও হয় ছন্দোবদ্ধ। এই ভাবেই আদি ভাষা ছন্দোবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—"Each stroke on stick or stone was timed by a more or less inarticulate recitative uttered by all in unison.।"[৪] ইহা হইতে মার্কস-পন্থী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—হাতিয়ার চালনা হইতেই মনুষ্যকণ্ঠে ছন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—"humanised rhythm originated from the use of tools."[৫]

ভারত কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ; তাহার ধারণা—ব্যক্তিগত ভাবাবেগই ভাষায় ছন্দ আবির্ভাবের কারণ। রামায়ণে আদি কবি বাল্মীকির কবিত্বলাভ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চ ব্যাধশরে নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী আর্তস্বরে চীৎকার করিতে

৩। P. 16. Marxism and poetry (George Thompson)

৪। P. 7. Ibid, ৫। P. 15, Ibid.

থাকে ; সহৃদয় কবি বাল্মীকি ইহাতে বেদনার্ত হন এবং শোকাবেগে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ বাণী—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্ব-
মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক-
মবধীঃ কামমোহিতম্॥

—ভারতের ধারণা, ইহাই আদি কবির আদি কবিতা এবং এই কবিতার ছন্দ অনুষ্টুভ্ ই জগতের আদি ছন্দ। শোক-জাত বলিয়া এই কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম শ্লোক—"শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ" (রঘু ১৪।৭০)।

অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত 'মা নিষাদ' শ্লোক ভারতের আদি কবিতা নহে এবং উহার অনুষ্টুভ্ ছন্দও আদি ছন্দ নহে। অনুষ্টুভ্ সংস্কৃত ভাষার পূর্ববর্তী বৈদিক ভাষারই অন্যতম ছন্দ; বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বহু পূর্ব হইতেই ইহা ভারতে প্রচলিত আছে। রামায়ণের যুগে ভারতীয়েরা এ কথা জানিতেন না, তাহা নহে। বৈদিক ভাষা ও ছন্দ অ-পৌরুষেয়। উহা দেবতার দান মাত্র, মানবীয় ব্যাপার নহে; ইহা বুঝাইবার জন্যই উক্ত গল্পের অবতারণা করিয়া বাল্মীকিকে আদি মানবীয় কবি এবং 'মা-নিষাদ' শ্লোকের ছন্দকে লৌকিক আদি ছন্দ বলা হইয়াছে। শ্লোকের শোকত্বই কিন্তু বাল্মীকির কবিত্ব-লাভ কাহিনীর আসল তাৎপর্য; ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে—গোষ্ঠীবদ্ধ ক্রিয়ার ফলে নহে, ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়াবেগেই ভাষায় ছন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত আর্যভাষার আদিমতম সাহিত্য ঋগ্ বেদের কবিতা হইতেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। ঋগ্ বেদের কবিতা ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগসঞ্জাত দেবতার পাদমূলে নিবেদিত ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি মাত্র; প্রথম ঋক্ মন্ত্রই ইহার প্রমাণ—

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং | যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
হোতারং রত্নধা-তমম্।

['আমি' সেই অগ্নিকে বন্দনা করি যিনি পুরোহিত, যজ্ঞের দেব-ঋত্বিক্, হোতা এবং শ্রেষ্ঠ রত্নদাতা।]

অপর একটি মন্ত্র—

অসতো মা সদ্গময় | তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

[অসৎ হইতে 'আমাকে' সতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে 'আমাকে' আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে 'আমাকে' অমৃতে লইয়া যাও।]

—ইহাদের প্রথমটিতে একবচনাত্মক 'ঈড়ে' এবং দ্বিতীয়টিতে একবচনাত্মক 'মা' দ্রষ্টব্য। ব্যক্তিগত হৃদয়ের আবেগই ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট : কোন দলবদ্ধ নৃত্য বা হাতিয়ার চালনা হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইতে পারে না।

ছন্দের উৎপত্তি বিচারে চিন্তাপদ্ধতি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিক চিন্তা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে চিরন্তন বস্তুর উৎপত্তি-নির্ণয় হয় না। হাসি, কান্না, আহার, নিদ্রার মতো ছন্দোবোধও আমাদের চিরন্তন বৃত্তি। সহস্র বৎসর পূর্বে ক্ষুধাতৃষ্ণা যে কারণে উদ্ভূত ও অনুভূত হইত, আজও সেই কারণেই উহা উদ্ভূত ও অনুভূত হয়। ছন্দস্থষ্টি এবং ছন্দোবোধের কারণও সেইরূপ যুগ-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ যেখানে বস্তু-বিশ্লেষণে ব্যক্তি মনোবৃত্তিই যথেষ্ট উপাদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে, সেখানে গোষ্ঠী মনোবৃত্তির কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার ফলেই যে মানবমনে ছন্দোবোধ হয় তাহা নহে, আবার গোষ্ঠীমনোবৃত্তি না থাকিলে শিল্পী যে শিল্পকে ছন্দোবদ্ধ করিতে পারে না, তাহাও

নহে। আসলে ছন্দের সহিত গোষ্ঠী-চেতনার কোন সম্বন্ধ নাই। তৃতীয়তঃ বিশেষ কোন শিল্পের ধর্ম ও স্বরূপ বুঝিতে প্রথমে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা না করিয়া উহাকে অন্য শিল্পের সহিত মিশাইয়া চিন্তাকরা অসঙ্গত; উহাতে যথার্থ সত্য নির্ণীত হয় না। ছন্দ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শিল্প; উহা নৃত্য, গীত বা যন্ত্র চালনার অধীন নহে। কাজেই নৃত্য গীত বা হাতিয়ার চালনাকে ছন্দসৃষ্টি বা ছন্দোবোধের কারণ বলিয়া মনে করার কোন হেতু নাই।

ছন্দ-উৎপত্তি ও ছন্দোবোধের উৎপত্তি পৃথক্ ভাবে চিন্তনীয়। ছন্দ বস্তুজগতের, ছন্দোবোধ মনের। ছন্দের বিকাশ ঈশ্বরের বা বিশেষ শিল্পীর সৃষ্টিতে, ছন্দোবোধের বিকাশ জন-সাধারণের মনে। যুগে যুগে প্রত্যেকের ছন্দোবোধের মূলে রহিয়াছে নিজের নিজের শারীরিক ক্রিয়ার সম্মিতি (symmetry) ও হস্তপদাদি যুগ্ম অঙ্গের স্বাভাবিক ভারসাম্য (balance)। ব্যক্তি মাত্রেরই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্তচলাচল সমতালে চলিতেছে। চলিবার সময়ে পদক্ষেপ সমদৈর্ঘ্যই হইয়া থাকে এবং উভয় হস্ত সমভাবেই দুলিতে থাকে। শরীরের এই প্রকার স্বাভাবিক স্নায়বিক ক্রিয়ার সম্মিতি হইতেই মূলে ছন্দোবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য শক্তি প্রয়োগকালে মানুষ সমপরিমাণ শক্তি বারবার প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঘন্টা বাজানো, পেরেক ঠোকা, শাবল বা কোদাল চালনা প্রভৃতিতে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ছন্দোবোধই প্রকাশিত হয়।

ছন্দ সম্বন্ধে মানুষ কিন্তু সাধারণতঃ সচেতন নহে। শারীরিক ক্রিয়ার অনুভূতি সাধারণতঃ আমাদের চেতন-মনে নহে, অবচেতন মনেই স্থান পায়। বিশেষ কারণই এই অনুভূতিকে অবচেতন মন হইতে চেতন-মনে টানিয়া তোলে। আমাদের দেহে 'লিভার' পীড়িত হইলে তবেই উহার অস্তিত্ব আমরা টের পাই। ছন্দোবোধও সেইরূপ অবচেতন মনেরই সামগ্রী। সাধারণতঃ আমরা উহাকে

ভুলিয়াই থাকি। বিশেষ কারণ ঘটিলে তবেই উহা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। ছন্দ-সচেতনতার বিশেষ কারণ হইতেছে প্রাণাবেগ বা হৃদয়াবেগ।

প্রাণাবেগই নৃত্যের কারণ। ছাগল ছানা, ময়ূর বা মানবশিশুর নৃত্য পৃথিবীর আদিমতম নৃত্য। সাধারণ প্রাণপ্রবাহের অতিরিক্ত একটা প্রবলতর আবেগই এই নৃত্যের জন্য দায়ী। এই আবেগই নাচের তাল বা ছন্দ সৃষ্টি করে। আবেগ মাত্রই স্বাভাবিক ও সাধারণ ক্রিয়ার আতিশয্য ঘটায়। আবেগ শারীরিক ক্রিয়ার সম্মিতি-বদ্ধতার বিপর্যয় ঘটায় না, কেবল শারীরিক ক্রিয়ার সাধারণ 'হ্রস্ব'তাকে বিশেষ ক্রিয়ার 'দীর্ঘ'তায় পরিণত করে। চলা ও নাচের পার্থক্য সম্মিতিতে নহে; দুই-ই সমান সম্মিতিযুক্ত, পার্থক্য হইতেছে দীর্ঘতায় বা আতিশয্যে। পশু-শিশু, পক্ষি-শিশু বা মানবশিশুর আদিম নৃত্যে তাই সমতালেই অঙ্গ সঞ্চালিত হয়; তবে সাধারণ চলনের 'হ্রস্ব'ভাবে নহে, আতিশয্যযুক্ত বিশেষ 'দীর্ঘ'ভাবেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সু-'সম্মিত' অঙ্গসঞ্চালনের এই বিশেষ 'দীর্ঘ'ত্ব বা আতিশয্য মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং কেবল তাহার অবচেতন মনে নহে, চেতনমনেও ভারসাম্য, সম্মিতি ও ছন্দোবোধ উৎপন্ন করে। গ্রীক দিগের ছন্দোব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়—আদিম নৃত্য হইতেই প্রাণধর্মী গ্রীকগণ ছন্দোবোধ লাভ করিয়াছিলেন। তবে 'নৃত্যই ছন্দের কারণ'—গ্রীকদিগের এই ধারণা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে আবেগই সর্ববিধ ছন্দের মূল কারণ। এখানে প্রাণাবেগ হইতে নৃত্য এবং নৃত্য হইতে সচেতন ছন্দোবোধ উৎপন্ন।

মার্কস্‌-পন্থীদিগের চিন্তাও আসলে প্রাণ-ভিত্তিক। তবে এখানে প্রাণাবেগ শিশুনৃত্যের মতো স্বাভাবিক 'প্রকৃতি'জাত নহে, কৃত্রিম প্রয়োজন-জাত। এখানে দেখানো হইয়াছে—মানুষের প্রয়োজনের জন্যই হাতিয়ারে অতিরিক্ত প্রাণের প্রয়োগ এবং অতিরিক্ত শক্তি

প্রয়োগের পৌনঃপুনিকতায় বা সমতালে মাঙ্গীয় ছন্দোবোধের উৎপত্তি।

কাব্যছন্দ সৃষ্টির কারণ স্বতন্ত্র। প্রাণাবেগে নৃত্যছন্দ বা হাতিয়ার-ছন্দ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কাব্যছন্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। কাব্যের মূলে রহিয়াছে মনুষ্যহৃদয়; হৃদয়ভাব প্রকাশ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। এখানে প্রাণাবেগ নহে, হৃদয়াবেগই সচেতন ছন্দ উৎপন্ন করে। হৃদয়ে ভাব জাগ্রত হয় মাত্র, কিন্তু আবেগই ভাবকে গতিদান করে। হৃদয়াবেগ সঞ্জাত কাব্যভাষা আবেগে কম্পিত হইবেই। ভাবের উত্তেজনাভেদে অবশ্য কম্পনেরও প্রকৃতিভেদ হয়; ভাবের শান্ততা-অশান্ততাভেদে ভাষাও দীর্ঘহ্রস্ব ধ্বনিপর্বে বিভক্ত হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। কিন্তু পর্বের হ্রস্বদীর্ঘতার কথা স্বতন্ত্র, ধ্বনিপর্বের স্পন্দনই হইতেছে ধ্বনিসৌন্দর্য বা ছন্দ। কাব্যে ছন্দ তাই ভাবের বাহন, কবির হৃদয়ভাব বহন করিয়া শ্রোতৃচিত্তে পৌঁছাইয়া দেয়। ছন্দ-চিন্তায় কেবল প্রাণাবেগ স্বীকার করিয়া ও হৃদয়াবেগ অস্বীকার করিয়া কবিত্বও বুঝা যায় না, কাব্যছন্দও বুঝা যায় না। কর্মব্যস্ত সাধারণ মানুষ তাহার হৃদয়ের দ্রুত-অপস্রিয়মান আবেগ ও ভাব-স্পন্দন লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় না, কিন্তু অন্তর্মুখী কবিমন ইহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ভাষাবদ্ধ করিয়া ফেলে। ছন্দোবদ্ধ কবি-ভাষা তাই সাধারণ ভাষা নহে; বিদ্যুদ্‌বাহী তারের অন্তর্গত বিদ্যুৎ-শক্তির মতো ছন্দোভাষায় ভাবোৎপাদন-শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকে। ছন্দোবদ্ধ ভাষার এই গুপ্ত শক্তির জন্য বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া কেহ কেহ ইহাকে দেব-বন্দনায় নিবেদন করে, কেহ ব্যাধি-নিবারণে বা দুর্দৈব-তাড়নে প্রয়োগ করে, কেহ বা ভূতপ্রেত ডাকিনী বশীকরণে ব্যবহার করে। প্রাচীন যাদুবিদ্যার ভাষা ছন্দোবদ্ধ ভাষা। বলা বাহুল্য, ছন্দোবদ্ধ বৈদিক ভাষা দেব-চরণেই নিবেদিত। ইহাই প্রকৃতপক্ষে ছন্দ-উৎপত্তির ইতিহাস।

বৈদিক ভাষার ইতিহাসে দেখা যায়, কাব্যছন্দ আনুষঙ্গিক গৌণভাবে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কাব্যছন্দের ধ্বনিপর্ব স্পন্দনধর্মে মানুষের দেহজ স্নায়বিক ক্রিয়ার সমধর্মী অর্থাৎ সু-সম্মিত; সেইজন্য ইহা অবচেতন মনের স্বভাব-সঙ্গত, মুদ্রণোপযোগী। ছন্দোবদ্ধ হইলে রচনা তাই সহজে স্মৃতিগত হইতে পারে; ছন্দোহীন সাধারণ রচনা অবচেতন মনে মুদ্রিত হওয়া কঠিন। বৈদিক সাহিত্যে ছন্দই বেদমন্ত্রকে রক্ষা করিয়াছে। লিপি আবিষ্কারের বহুপূর্বে সুপ্রাচীন যুগে বেদমন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। পুরুষানুক্রমে স্মৃতিগত হইয়া মুখে মুখেই বহুকাল চলিয়া আসিয়াছিল। ছন্দোবদ্ধতার কারণেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল; ছন্দই উহাদিগকে কণ্ঠগত করাইয়াছে। তাছাড়া ছন্দ বেদমন্ত্রের বর্মের কাজও করিয়াছে। যুগে যুগে কণ্ঠে কণ্ঠে চলিয়া আসায় মন্ত্রমধ্যে প্রক্ষিপ্ত সংযোজন বা মন্ত্রবিকৃতির আশঙ্কা কম ছিল না। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের ধ্বনিপর্বে গ্রথিত হওয়ায় মন্ত্রগুলির ঐরূপ কোন বিকৃতি ঘটে নাই। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"অপমৃত্যুং বারয়িতু-মাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ" (অপমৃত্যু নিবারণে আচ্ছাদন করে বলিয়াই ইহার নাম ছন্দ)। বেদমন্ত্রের বিকৃতি বা অপমৃত্যু ঘটিলে সত্যকার অপমৃত্যু ঘটিত ভারতীয় দেব-বাদের, সেকথাও তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"দেবা বৈ মৃত্যো বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশং স্তে ছন্দোভি রাত্মান মাচ্ছাদয়ন্, যদেভি রাচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্" (ছা-উ ১-৪-২)। অর্থাৎ দেবতারা মৃত্যুভীত হইয়া ঋক্, সাম, যজুঃ এই ত্রয়ী বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াই তাঁহারা অপমৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এইখানেই রহিয়াছে বৈদিক ছন্দের কৃতিত্ব।

একাদশ অধ্যায়

বৈদিক ছন্দের ক্রম-পরিণতি

বৈদিক ভাষার নাম 'ছান্দস' অর্থাৎ ছন্দোময়ী। 'অপৌরুষেয়' বা অলৌকিক শক্তিজাত বস্তুর শ্রী-হীনতা চিন্তা করা অন্যায়। সেইজন্য সর্ববিধ বৈদিক রচনাকেই ছান্দস বা ছন্দোযুক্ত বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য ভাষার রচনার ন্যায় বৈদিক রচনাতেও ধ্বনিশ্রী বা যথার্থ ছন্দ কোথাও আছে, কোথাও নাই। বহু বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে ছন্দোলক্ষণযুক্ত সন্দেহ নাই; তথাপি ছন্দোলক্ষণহীন ও ছন্দপতনযুক্ত অনিয়মিত মন্ত্রের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অথচ দেবসৃষ্ট মন্ত্রে অঙ্গহানি রহিয়াছে, একথা সাহস করিয়া বলা চলে না। সেইজন্য প্রাচীন ছান্দসিকগণ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা একাক্ষর (যথা, 'ওঁ') হইতে আরম্ভ করিয়া একশত চার অক্ষর পর্যন্ত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বৈদিক রচনাকে অন্যূন ১৩০টি ছন্দের নামে চিহ্নিত করিয়াছেন[১]। ফলে যে-কোন দৈর্ঘ্যের বেদমন্ত্রকে কোনো না কোনো ছন্দে রচিত বলিয়া ঘোষণা করা চলে। আসলে প্রধান বৈদিক ছন্দ মাত্র সাতটি—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি ও বৃহতী।

বৈজ্ঞানিক বিচারে ভাষাগত ছন্দের যথার্থ লক্ষণ[২] হইতেছে—উচ্চার্য পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহে বা 'চরণে'[৩] পর্বের বহুত্ব (diversity),

---

১। গ্রন্থশেষে ক্রোড়পত্র 'ক' দ্রষ্টব্য,

২। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩। এই গ্রন্থে 'চরণ'কে 'পদ' (foot) অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই, ইহার ব্যুৎপত্তিগত 'চলন' অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ধ্বনি-প্রবাহের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত সম্পূর্ণ গতি হইতেছে এই 'চরণ'।

পর্বের সংহতি (unity) এবং পর্বের সম্মিতি (symmetry) অথবা সঙ্গতি (harmony)। সুতরাং কেবল চরণের অক্ষর সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া নহে, যথার্থ ছন্দোলক্ষণ—অর্থাৎ পর্বের বহুত্ব, সংহতি, সম্মিতি বা সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া বৈদিক ছন্দের পরিণতির ইতিহাস অনুসরণ করা কর্তব্য।
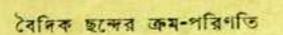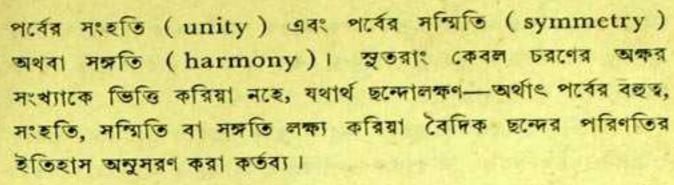
[প্রাচীন ছন্দের আলোচনায় ছন্দ-শাস্ত্রের আধুনিক পরিভাষা ও প্রাচীন পরিভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন না হইলে পদে পদে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা আছে। প্রাচীন ছন্দ-শাস্ত্রে 'পর্ব' শব্দ নাই, পর্ব বুঝাইতে 'পাদ' এবং চরণ (=চলন) বুঝাইতে 'ছন্দ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একাধিক তরঙ্গযুক্ত পূর্ণ প্রবাহিত ধ্বনিস্রোত হইতেছে 'চরণ', চরণান্তর্গত ধ্বনিতরঙ্গ হইতেছে 'পর্ব' এবং তরঙ্গিত ধ্বনিস্রোতের আনন্দদায়ক[৪] প্রবাহ-সৌন্দর্য হইতেছে 'ছন্দ'।]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বৈদিক ছন্দ এক'চরণে'র ছন্দ এবং এই চরণ সপর্বিক—তিন বা চারি পর্বযুক্ত। বৈদিক ছন্দের চরণে তিনটি বা চারিটি পর্বের সমাবেশ আকস্মিক ভাবে হয় নাই, ইহার মূলে বিভিন্ন যুগের চিন্তার বিবর্তন বর্তমান। বৈদিক ছন্দের গঠনে আদি মধ্য অন্ত্য, এই তিন যুগের দান স্বীকার্য। তিন যুগে ছন্দোবোধের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ফলে ছন্দের গঠনেও হইয়াছে পরিবর্তন।

আদি বৈদিক যুগেই হইয়াছে আর্যমানসে ছন্দোবোধের উৎপত্তি। তবে এই বোধ সুপরিণত নহে। নিরঙ্গ বস্তুতে সৌন্দর্য নাই, সুন্দর হইতে গেলে একাধিক অঙ্গবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কেবল এইটুকু ধারণা আদিযুগে হইয়াছে। সুতরাং বাক্যের ধ্বনিশ্রী সম্পাদনে অর্থাৎ ছন্দোরচনায় পর্ব-বিভাগের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পর্ব-চেতনাই আদি যুগের বৈশিষ্ট্য। এ যুগের মন সম্মিতি-সচেতন

৪। "চন্দেরাদেশ্চ ছঃ ইতি অসুন্, চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ" উণাদি সূত্র।

নহে, কেবল অঙ্গবহুত্ব-সচেতন। সুন্দরের কয়টি অঙ্গ থাকা উচিত, কেবল এই বিষয়েই এ-যুগের চিন্তা কেন্দ্রীভূত। এই চিন্তার ফলেই গায়ত্রী ছন্দের উৎপত্তি।

গায়ত্রী যে আদি যুগের আদি ছন্দ তাহার অন্যতম প্রমাণ সুপ্রাচীন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্তি—"গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা" (১০।২৬) অর্থাৎ গায়ত্রী সর্বছন্দের জননী। গায়ত্রীকে আদি যুগের আদি ছন্দ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। একে নহে, দুইয়ে নহে, তিনে অনুরাগ আদিম মনের বৈশিষ্ট্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন 'এক' মানবমনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে না। 'দুই' রহস্যোদ্দীপক নহে। হস্তপদাদি যুগ্ম অঙ্গের ক্রিয়ায় এবং ডাহিনে-বামে বা সামনে-পিছনের দ্বৈতবোধে মানুষ আজীবন অভ্যস্ত। তাহার পর শীতাতপে, জলস্থলে, দিবারাত্রির আলো-অন্ধকারে ও স্ত্রীপুরুষের যৌনজীবনে মানুষ 'দুই'য়ের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত। এই অতিপরিচয়ের ফলেই দুই সংখ্যা মানুষের কাছে বিস্ময়কর সংখ্যা নহে। 'তিন' সংখ্যার ব্যাপার কিন্তু স্বতন্ত্র। দুইয়ের পরবর্তী সংখ্যা হিসাবে 'তিন' আদিম মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে, আবার দুইয়ের মতো অতিপরিচিতও নহে। আদিম জীবনে তাই 'তিন' প্রথম রোমান্টিক সংখ্যা। অন্য এক কারণেও 'তিন' রহস্যময়। দুইয়ের ক্রিয়ায় কোন বেগ নাই, পদচারণের ন্যায় দুই যেন থামিয়া থামিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ"[১]। এই তিন যেন "গোলার মতো গোল, এই জন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়"[২]। তিনের অন্তর্নিহিত এই গতিবেগ আদিম মানুষকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রাচীন জগতে সর্বত্র মানুষের ধারণা হইয়াছিল—

১। পৃঃ ১৪৪ র-র (১৪), ২। পৃঃ ১৩৩ ঐ

তিন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রহস্যময় সংখ্যা। তাই প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা ও যাদুবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত সংখ্যা হইয়াছিল তিন। ত্রি-রহস্য প্রভাবে আর্য ঋষিগণ 'দেশ'কে 'ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ' রূপে এবং 'কাল'কে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতিকে ভাবিয়াছিলেন সত্ত্বরজস্তমোময়ী ত্রিগুণাত্মিকা, ঈশ্বরকে ভাবিয়াছিলেন ত্রি-তত্ত্ব সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ত্রিবিধ ক্রিয়ার কারণ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ত্রি-রহস্যমুগ্ধ ঋষিগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন—ত্রি-গায়ৎ (ত্রিধা-উচ্চারিত) মন্ত্র তিনের গতিবেগে তাঁহাদের হৃদয়ভাবকে দেবলোকে পৌঁছাইয়া দিবে। তাই তাঁহাদের বাক্যের প্রথম নৈবেদ্য ত্রিধা-বিভক্ত করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—

> তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
> ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। —ঋক্ ৩।৬২।১০

অনুমান করা অসঙ্গত নহে ত্রি-গায়ৎ বা 'গায়ৎ-ত্রিঃ' বলিয়াই এই আদি ছন্দের নাম গায়ত্রী। এইজন্য 'নিরুক্ত'কার বলিয়াছিলেন—

> গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ
> ত্রিগমনা বা বিপরীতা। —নিরুক্ত ৭।১২।৫

ছন্দ-প্রবর্তনের আদিযুগে প্রবর্তকদিগের শ্রুতিবিলাস প্রত্যাশা করা অনুচিত। তাঁহারা সচেতনভাবে অক্ষর গণনা করিয়া ছন্দ রচনা করেন নাই; হৃদয়াবেগে স্বাভাবিকভাবে ছন্দোবদ্ধ হইয়া মন্ত্রসমূহ তাঁহাদের মুখ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। তাই গায়ত্রীছন্দে রচিত মন্ত্রগুলির কোন কোনটির পর্বে পর্বে মোটামুটি দৈর্ঘ্যসমতা থাকিলেও নিখুঁত গাণিতিক হিসাবে দৈর্ঘ্যসাম্য সর্বত্র পাওয়া যায় না। পর্ব-

বৈচিত্র্যের দিক দিয়া গায়ত্রী ত্রিবিধ—আসমপর্বিক*, অসমপর্বিক ও সমপর্বিক। যথা—

(ক) আসমপর্বিক গায়ত্রী—

(১) মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। —ঋক্ ১।৯০।৬

—ইহার তিন পর্বে যথাক্রমে ৮ + ৮ + ৭ অক্ষর।

(২) তন্নোবাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা
পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ। —ঋক্ ১।৮৯।৪

—ইহার তিনটি পর্বে যথাক্রমে ৭ + ৮ + ৭ অক্ষর।

(খ) অসমপর্বিক গায়ত্রী—

(১) প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্। —ঋক্ ৮।৮৪।১

—ইহার পর্বগুলিতে যথাক্রমে ৬ + ৮ + ৭ অক্ষর।

(২) ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ
দেবেভি র্মানুষে জনে। —ঋক্ ৬।১৬।১

—ইহার পর্বগুলিতে যথাক্রমে ৬ + ৭ + ৮ অক্ষর।

(গ) সমপর্বিক গায়ত্রী—

(১) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্। —ঋক্ ১।২২।২০

—ইহাই সাধারণ গায়ত্রী, ইহার প্রতি পর্বে ৮ অক্ষর।

(২) যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাম্
ভূয়াম বাজদাব্নাম্। —ঋক্ ১।১৭।৪

—ইহা 'পাদনিচৃৎ গায়ত্রী,' ইহার প্রতিপর্বে ৭ অক্ষর।

---

* 'আ-সম' শব্দের অর্থ—ঈষৎ অসম বা প্রায়-সমান।

(৩) হুহীয়ন্মিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়েচনো মিমীতং বাজবত্যৈ
ইষে চনো মিমীতং ধেহুমত্যৈ। —ঋক্ ১।১২০।৯

—ইহা 'ত্রিপাদ বিরাট্ গায়ত্রী', ইহার প্রতি পর্বে ১১ অক্ষর।

লক্ষ্য করিতে হইবে—উল্লিখিত সমপর্বিক গায়ত্রীর দৃষ্টান্তগুলি একপ্রকার নহে। ইহাদের প্রথমটির পর্ব দৈর্ঘ্য ৮, দ্বিতীয়টির ৭ ও তৃতীয়টির ১১ অক্ষর। বলাবাহুল্য, সমপর্বিক গায়ত্রীগুলিতে যে 'সম্মিতি' দেখা যাইতেছে, উহা অবচেতন মনের স্বাভাবিক সম্মিতি-বোধ হইতে উৎপন্ন, উহা সচেতন মনের সৌন্দর্যপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন নহে।

বৈদিক ছন্দ প্রবর্তনের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য—ছন্দ চরণে চতুষ্পর্বিকতার প্রবর্তন। তিন সংখ্যায় যতই গতিবেগ থাক, পূর্ণতা নাই; পূর্ণতা আছে চতুঃসংখ্যায়। চতুষ্পদ পশু দর্শনে মানুষ চিরকাল অভ্যস্ত, ত্রিপদ তাহার কাছে শেষপর্যন্ত হীনাঙ্গতা বা অপূর্ণতা-বোধই জাগ্রত করে। পূর্ণতাবোধের বশবর্তী হইয়া জগতের সকল মানুষ পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চতুঃসীমায় বদ্ধ করিয়াছে। পূর্ণতা-বিধানের জন্য পরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্রে ব্রহ্মা হইয়াছেন চতুর্মুখ, বিষ্ণু চতুর্ভুজ, এবং যুগ-সংখ্যা চার—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি। আর্যদিগের পূর্ণ সৈন্যবল হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিকে চতুরঙ্গ। সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণে আর্যসমাজ পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মধ্য বৈদিক যুগে পূর্ণতাভাবের ভাবুক আর্যগণ যে বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিবেন এবং বৈদিক ছন্দকেও চতুরঙ্গে গঠন করিবেন, ইহা প্রত্যাশিত। তাই এই যুগে সাধারণ গায়ত্রীর অষ্টাক্ষর পর্ব চারিবার আবৃত্ত হইয়া সুবিখ্যাত অনুষ্টুপ্ ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে চতুরুক্ত হইয়া একাদশাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর পর্ব যথাক্রমে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দ উৎপন্ন করিয়াছে।

গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই চারিটি বৈদিক সাহিত্যে বহু-ব্যবহৃত ছন্দ। ইরানীয় ভাষাবিদ্ ডঃ সুকুমার সেন বিখ্যাত 'আবেস্তা' গ্রন্থেও এই চারিটি বৈদিক ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে এই চারিটি ছন্দের জনপ্রিয়তা অনুমেয়।

মধ্যবৈদিক যুগে ছন্দের চতুষ্পর্বিকতা আর্যদিগের মনে এমন দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে তাঁহারা প্রাচীন গায়ত্রীরও ত্রিপর্বিকতা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা গায়ত্রীর মোট ২৪ অক্ষরের পরিবর্তন করেন নাই, কিন্তু এই ২৪ অক্ষরকে নূতন করিয়া চারিভাগ করিয়াছেন, ফলে অষ্টাক্ষর পর্বে ত্রিপর্বিক প্রাচীন গায়ত্রী ষড়ক্ষর পর্বের চতুষ্পর্বিক অর্বাচীন গায়ত্রীতে পরিণত হইয়াছে। যথা—

দোষো গায় বৃহদ্ | গায় দ্যুমদ্ধেহি
আথর্বণ স্তুহি | দেবং সবিতারম্।

—অথর্ব বেদ ৬।১।১ সংকর্ষকাণ্ড

মধ্য বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় যত ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, অল্প কিছু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বাদ দিলে সেই সকল ছন্দের প্রায় সবগুলিই চতুষ্পর্বিক। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কালে কালে ছন্দের ও পর্বদৈর্ঘ্যের বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও আধুনিক কালের বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দে সেই পুরাতন চতুষ্পর্বিকতার জের চলিতেছে, এখনও সাধারণ ছন্দ-চরণ চতুষ্পর্বিক। যথা—

হিন্দী—

ঠুমক চলত | রামচন্দ্র | বাজত পাঁয় | জনিয়া

মৈথিলী—

ভণহি বি | দ্যাপতি | অচ্ছর | লেখ

ওড়িয়া—

কহ উপ | ইন্দ্র ভঞ্জ | টেকি বেণি | বাহাকু

বাংলা—

যতদূরহেরি | দিগদিগন্তে | তুমি আমি একা | কার

বেদান্ত (উপনিষৎ) ও বেদাঙ্গ রচনার যুগ বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় যুগ এবং বৈদিক ছন্দের অন্ত্যযুগ। শ্রুতি-বিলাসিতা এই যুগের বৈশিষ্ট ; ইহা ছন্দোগঠনে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা স্থাপনের যুগ। এই যুগ ধ্বনিসৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে এবং ছন্দের পর্বেপর্বে সমদীর্ঘতার দ্বারা সম্মিতি রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। পূর্ব প্রচলিত মন্ত্রের ছন্দোগত ত্রুটির যথাসম্ভব সংশোধন এই যুগ হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচার করা হয়—বৈদিক ছন্দের পর্বে অক্ষরাভাব দেখিলে উহাতে সন্ধ্যক্ষর য, ব, র, ল এবং এ, ঐ, ও, ঔ আছে কিনা দেখিতে হইবে; যদি থাকে তাহা হইলে উহাকে উহার উপাদান স্বরূপ দুই অক্ষরে বিশ্লিষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিয়া অক্ষরাভাব পূরণ করিতে হইবে ও এইভাবে পর্বগুলিকে সমদীর্ঘ করিয়া তুলিতে হইবে। যেমন, 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্'—ইহাতে অষ্টাক্ষর গায়ত্রী পর্বের একাক্ষর কম আছে বলিয়া ইহার 'বরেণ্য'কে 'বরেণিয়' রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। সেই রূপ প্রয়োজন হইলে 'দিবং গচ্ছ স্বঃপতে'কে 'দিবং গচ্ছ সুবঃ পতে' রূপে, 'ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্'কে 'ত্বামিন্দ্র বজরিন্,' রূপে, 'উপেন্দ্র'কে 'উপইন্দ্র'-রূপে এবং 'ব্রহ্মৈতু'কে 'ব্রহ্মা এতু'-রূপে বিশ্লিষ্ট করিয়া উচ্চার্য [পিঙ্গলের 'ইয়াদি পূরণঃ' সূত্রের হলায়ুধ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য]। পদ্যছন্দে পর্ব সম্মিতিতে গুরুত্ব প্রদানের ফলে এই নির্দেশের উৎপত্তি। মূল কারণ কিন্তু এ-যুগের ঋষিদিগের শ্রুতি-বিলাসিতা।

শ্রুতিবিলাসের ফলেই বৈদিক অন্ত্য ছন্দোযুগে ছন্দে পরপর গুরু

অক্ষর প্রয়োগ ঋষিদিগের কর্ণে শ্রুতিকটু বোধ হইয়াছিল; তাঁহারা পর্বের পরপর গুরু অক্ষরগুলির মধ্যে মধ্যে লঘু অক্ষর সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। পর্বে গুরু-লঘু অক্ষরের বিশেষ সমাবেশে ছন্দে যে একটি নূতন ধ্বনি মাধুর্য ফুটিয়া উঠে, ইহা বৈদিক অন্ত্যযুগেরই নূতন আবিষ্কার। পূর্বপূর্ব যুগের ছন্দপ্রবর্তক ঋষিগণ পর্বসম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন, অক্ষরের গুরুত্ব বা লঘুত্ব যে ছন্দকে কোন প্রকারে অলংকৃত করিতে পারে, সে সম্বন্ধে অবহিত হন নাই। অন্ত্যযুগে এই বোধের সূচনা এবং ছন্দপর্বের অলংকরণেরও সূচনা হয়। বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে উপনিষদে ও সূত্র সাহিত্যে যে-সকল ছন্দোবদ্ধ রচনা দেখা যায়, উহাদের সহিত পূর্বযুগে রচিত ঋক্ মন্ত্রের তুলনা করিলেই বুঝা যায় যে ঋক্‌ছন্দ অনলংকৃত ও বহু-স্থলে শ্রুতিকটু কিন্তু উপনিষদের ও সূত্র সাহিত্যের ছন্দ সচেতনভাবে লঘু-গুরু অক্ষর বৈচিত্র্যে অলংকৃত এবং আপেক্ষাকৃত অধিক শ্রুতিমধুর। যথা—

ঋক্ অনুষ্টুপ্—

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে | তং রায়ে তং সুবীর্যে
স শক্র উত নঃ শক | দিন্দ্রো বসু দয়মানঃ। —ঋক্ ১।১০।১০

উপনিষদ-অনুষ্টুপ্—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ | সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু | সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। —ঈশ ১৫

ঋক্ ত্রিষ্টুপ্—

অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো
মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না
মুষায় দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়া-
ন্বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা। —ঋক ১।৬১।৭

উপনিষদ্-ত্রিষ্টুপ্—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। —কঠ ১।২।১৮

সূত্র-ত্রিষ্টুপ্—

ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা
বর্ণ পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ।
—সাংখ্যায়ণ গৃহ্য সূত্র, ২।২।১

বৈদিক অন্ত্য ছন্দোযুগে রচিত মন্ত্রগুলির গঠন লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—এইখানেই রহিয়াছে পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত ছন্দের বীজ। অন্ত্য বৈদিক যুগের শ্রুতিবিলাসের ফলে ছন্দ প্রবর্তকেরা বুঝিতে পারেন—পর্বের বিশেষ কয়েকটি স্থানে গুরু অক্ষরই কর্ণ-পীড়ার জন্য দায়ী, লঘু অক্ষরই এই সকল স্থানের উপযোগী ; আবার পর্বে কেবল লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হইলে উহা দুর্বল ধ্বনিপ্রবাহে পর্যবসিত হয় ; কাজেই স্থান বিশেষে গুরু-অক্ষরও প্রয়োজনীয়। সমগ্র অন্ত্য বৈদিক যুগ এই গুরু-লঘু ধ্বনি পরীক্ষার কাল। এই পরীক্ষার শেষে প্রচারিত হয়—অনুষ্টুপ্ ছন্দের কোন পর্বে পঞ্চম অক্ষরকে গুরু করিলে চলিবে না, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বে সপ্তম অক্ষরও গুরু হইবে না। কিন্তু প্রতিপর্বের ষষ্ঠ অক্ষরকে গুরু করিতে হইবে। সম্ভবতঃ লৌকিক সংস্কৃত ভাষার আদিকবি বাল্মীকির সুমধুর রামায়ণ শ্লোকের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করিয়া ছান্দসিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিত' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের 'বিষ্কম্ভকে' দেখা যায়—'আত্রেয়ী'র নিকটে বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের কথা শুনিয়া বনদেবতা বলিতেছেন—"চিত্রম্ আম্নায়াদ্ অন্যোঽয়ং

নূতনশ্ছন্দসাম্ অবতারঃ"। অর্থাৎ বেদ হইতে পৃথক্ (নিয়মবদ্ধ) এই নূতন সুন্দর ছন্দের উৎপত্তি হইল। এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ভাষার পরিবর্তন হয়; ফলে উহার ছন্দেরও পরিবর্তন ঘটে। আর্যেতর জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবই বৈদিক ভাষার পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বুদ্ধদেবের অবির্ভাবকালেই দেখা যায়, আর্যদিগের কথ্যভাষা আর বৈদিক নাই, 'প্রাকৃতে' পরিণত হইয়াছে। সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা ভাষার এই প্রাকৃতমূর্তি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং ভাষার নিম্নগামী প্রবাহকে কঠিন ব্যাকরণ বিধির বাঁধের দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলে কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। বৈদিক আদর্শ-অনুযায়ী প্রাকৃত সংস্কারের জন্য এই নূতন ভাষার নাম হয় 'সংস্কৃত'। বৈদিকপরবর্তী যুগে এই কৃত্রিম সংস্কৃতভাষা আর্যদিগের লেখ্য ভাষা হইয়া উঠে। কথোপকথনকালে আর্যেরা স্বাভাবিক প্রাকৃত ব্যবহার করিতে থাকেন, কিন্তু সাহিত্য রচনা-কালে ব্যবহার্য ভাষা হয় সংস্কৃত। নিয়ম শৃঙ্খলিত ভাষার ছন্দও যে নিয়ম শৃঙ্খলিত হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। সংস্কৃত ভাষার জন্য যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাকরণ বিধি রচিত হয়, ছন্দের জন্য সেইভাবে রচিত হয় ছন্দোবিধি। নির্দেশ দেওয়া হয়, ছন্দ শাস্ত্রোক্ত ছন্দগুলির প্রতি পর্বের নির্দিষ্ট স্থানে বিধিসঙ্গত গুরু বা লঘু অক্ষর অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার যুগে ছন্দ আর কবির হৃদয়াবেগ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে নাই, কারণ ছন্দ সৃষ্টি কবির নিকট হইতে বৈয়াকরণের হাতে চলিয়া যায়। বৈয়াকরণেরাই ছন্দোবন্ধের নানাবিধ কৃত্রিম 'প্যাটার্ণ' তৈয়ারী করিয়া বিবিধ নামে নামাঙ্কিত করেন। ঐ সকল প্যাটার্ণ হইতে যে কোন একটি বাছিয়া লইয়া উহাতে শব্দ সন্নিবেশ হইয়া উঠে কবির

করণীয়। সংস্কৃত যুগে অধিকাংশ কবিই তাই ছন্দের শিল্পী বা স্রষ্টা নহেন, ছন্দের কারিগর মাত্র।

ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার আবির্ভাব বৈদিক ছন্দোযুগের যুগান্তনির্দেশক। সংস্কৃতভাষায় বৈদিক ছন্দের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ত্রিপর্বিক গায়ত্রী চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। চতুষ্পর্বিক বৈদিক ছন্দগুলির অধিকাংশই লোপ পায়। একমাত্র শৃঙ্খলিত অনুষ্টুপ্ ছন্দই স্বনামে বাঁচিয়া থাকে। উন্নাসিক ছান্দসিকেরা অবশ্য প্রচার করিয়া থাকেন—বৈদিক ছন্দ লুপ্ত হয় নাই, 'বৃত্ত' ছন্দের রূপেই বিভিন্ন নামে বর্তমান আছে; কারণ গায়ত্রী প্রভৃতির মধ্যেই বৃত্ত বীজাকারে ছিল—"গায়ত্র্যাদৌ ছন্দসি বর্ততে ইতি বৃত্তম্" (হলায়ুধ-ভাষ্য)। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শুদ্ধ বিরাট্, উপজাতি, বংশস্থা প্রভৃতি অল্প কয়েকটি ছন্দই শুদ্ধভাবে বৈদিক গোত্রজ; আমরা পরে দেখিব—অধিকাংশ বৃত্ত-ছন্দই বৈদিক অক্ষরছন্দ ও প্রাকৃত মাত্রাছন্দের মিলনজাত বর্ণসঙ্কর ছন্দ মাত্র, ইহাদের মধ্যে বিজাতীয় মাত্রাছন্দের লক্ষণ উৎকটভাবে পরিস্ফুট। এই গুলিকে যথার্থ বৈদিক গোত্রজ বলা চলে না। তবে বৈদিক অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রাণশক্তি অতুলনীয়, ইহা সংস্কৃত ভাষাতেও শ্রেষ্ঠ ছন্দ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ বর্ণসঙ্কর ছন্দ নহে, বৈদিক ছন্দই বটে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাকৃত ও সংস্কৃত মাত্রাছন্দ

ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সাহিত্যের ছন্দ ভাষার অধীন নহে। ছন্দের ক্রমবিকাশ যে উহার ভাষার ক্রমগতি অনুসারে হইবে, ইহা আশা করা চলে না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে আর্য-ভাষার বিবর্তন অনুযায়ী ছন্দোবিবর্তন ঘটে নাই। বৈদিক ভাষাই বিকৃত হইয়া প্রাকৃত ভাষা হইয়াছিল, কিন্তু বৈদিক ছন্দ বিকৃত হইয়া প্রাকৃত ছন্দ হয় নাই।

ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় প্রধানতঃ অনার্য-সংস্রবের ফলে বৈদিক ভাষার পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতে 'ঌ' প্রভৃতি ধ্বনি লোপ পায়, 'ঋ' প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তিত হয় এবং 'ড়' প্রভৃতি ধ্বনির আগম ঘটে। নানাবিধ বিকৃতির জন্য নূতন ভাষা প্রাকৃতকে আর্যেরা বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। [কেহ কেহ 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রকৃষ্টম্ অকৃতং যস্মিন্ তৎ" (যে ভাষায় অপকর্মই প্রধান, তাহাই প্রাকৃত)।[১]] আর্যেরা প্রথমে সাহিত্য রচনায় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য বৈদিক আদর্শে কথ্য প্রাকৃতকে যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা। বৈদিক ভাষার পরেই আর্যসাহিত্য-ভাষা সংস্কৃত, প্রাকৃত নহে। প্রাকৃতে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল অনেক পরে।

কথ্য প্রাকৃতে না হউক, বৈদিক আদর্শে সৃষ্ট লেখ্য সংস্কৃতে পুরাতন বৈদিক ছন্দগুলি ব্যবহৃত হইবে, ইহা প্রত্যাশা করা

১। শব্দ কল্পদ্রুম

স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। অধিকাংশ বৈদিক ছন্দই সংস্কৃতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; অথচ একটি সম্পূর্ণ নূতন বিজাতীয় ছন্দ বাহির হইতে আসিয়া সংস্কৃতের একাংশ দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহার নাম 'জাতি'[১] বা মাত্রাছন্দ। ছন্দ-শাস্ত্রের 'বৈতালীয়,' 'মাত্রা সমক' ও 'গাথা' শ্রেণীর ছন্দ এই মাত্রা ছন্দের অন্তর্গত। সংস্কৃতে বহুল-ব্যবহৃত জনপ্রিয় প্রাচীন[২] ছন্দ 'আর্যা'ও মাত্রাছন্দ-জাতীয়। মাত্রাছন্দের প্রকৃতি অভিনব। ইহা কোমল, লঘুগতি ও গীতিধর্মী; অক্ষরছন্দের ন্যায় প্রবল, গম্ভীর ও মন্থরগামী নহে। নিম্নোদ্ধৃত দুইটি দৃষ্টান্তের ধ্বনিগত পার্থক্য দ্রষ্টব্য :—

(১) ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংস্তনুভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

(২) মদকল খগকুল কলরব মুখরিণি
বিকসিত সরসিজ পরিমল সুরভিণি
গিরিবর পরিসর সরসি মহতি খলু,
রতি রতি শয়মিহ মম হৃদি বিলসতি।

—৪।৪৮, পিঙ্গল ছন্দ সূত্র, হলায়ুধ-ভাষ্য

—ইহাদের প্রথমটি যে অক্ষরছন্দ গোত্রীয় এবং দ্বিতীয়টি যে মাত্রাছন্দ গোত্রীয় তাহা বুঝিতে ছন্দশাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হয় না;

১। মাত্রাছন্দের 'জাতি'নাম ইহার অন্-আর্যত্বের অন্যতম প্রমাণ।

২। শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'মহাভাষ্য' হইতে আর্যা উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে আর্যা প্রচলিত ছিল। পৃঃ ১২, Jottings on Sanskrit Metrics গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উচ্চারণ মাত্রই বুঝা যায়। কারণ প্রথমটিতে অনুভব হয় শক্তির, দ্বিতীয়টিতে অনুভব হয় কোমলতার।

সংস্কৃতে নবাগত এই মাত্রাছন্দের প্রভাব ও কৃতিত্ব কিন্তু সামান্য নহে। অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি যে অল্প কয়েকটি বৈদিক অক্ষরছন্দ সংস্কৃতে আসিয়াছে, মাত্রাছন্দের প্রভাবে কোমলায়িত ও বিধিবদ্ধ হইয়া তবেই উহারা ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে। তাছাড়া সংস্কৃতে বহুপ্রচলিত 'বৃত্ত' ছন্দের মূলেও মাত্রাছন্দের কৃতিত্ব বর্তমান। আমরা পরে দেখিব, 'বৃত্ত' ছন্দ আসলে অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দের মিলনে উদ্ভূত বর্ণসঙ্কর ছন্দমাত্র।

মাত্রাছন্দের জন্মেতিহাস অজ্ঞাত। ইহার লাস্যময় প্রকৃতি ও গীতি-প্রবণতা হইতে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ আর্যেতর জাতির নৃত্যগীত হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কথ্য প্রাকৃতেই ইহার ভাষাবদ্ধ রূপের প্রথম প্রকাশ। আর্যেরা কথ্য প্রাকৃত হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতের মধ্যে স্থায়িত্ব দিয়াছেন। আর্যদিগের এই বিজাতীয় ছন্দ-প্রীতির কারণ গীতিপ্রেরণার চরিতার্থতা। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর ভাব ও চিন্তা সংস্কৃত অক্ষরছন্দে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু যথার্থ গান গাহিতে পারে নাই। ছন্দে কোমলতা ও লঘুতা না থাকিলে গান কখনও সার্থক হইয়া উঠে না। সংস্কৃতে অক্ষরছন্দের প্রাধান্য বলিয়া ইহাতে বহু মহাকাব্য ও খণ্ড কাব্য দেখা যায়, কিন্তু সার্থক সঙ্গীত-কাব্য দুর্লভ। বাঙ্গালী কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' সংস্কৃত ভাষাকে গান গাহাইয়াছিলেন ; তাহার কারণ জয়দেবের অবলম্বন ছিল মাত্রাছন্দ। সংস্কৃত নাটকে যখনই গানের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্রাছন্দ। প্রধান মাত্রাছন্দ আর্যার বিভিন্ন রূপের 'গীতি' 'উপগীতি' 'উদ্গীতি' 'আর্যাগীতি' প্রভৃতি নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মাত্রাছন্দ যে প্রাকৃত ভাষাতেই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা

যে প্রাকৃতেরই নিজস্ব ছন্দ, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। প্রাকৃত ভাষা ও মাত্রাছন্দ উভয়েই সমধর্মী। প্রথমতঃ ব্যঞ্জন-সংঘাত পরিহার দ্বিতীয়তঃ স্বরপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা এবং সেইজন্য দুর্বল উচ্চারণ উভয়ত্র দেখা যায়।

[ব্যঞ্জন সংঘাত পরিহার প্রবৃত্তির জন্যই প্রাকৃতে 'সপ্ত' হইয়াছে 'সত্ত', 'বিদ্যুৎ' হইয়াছে 'বিজ্জু' এবং স্বর প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই প্রাকৃতে 'রাজা' হইয়াছে 'রাআ', 'আর্যপুত্র' হইয়াছে 'অজ্জউত্ত'।]

'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকে কবি রাজশেখর বলিয়াছেন—

> পরুসা সকঅ বন্ধা
>
> পাউঅ বন্ধোবি হোউ সুউমারো।
>
> পুরুস মহিলাণং জেত্তিঅং
>
> ইহন্তরং তেত্তিঅং ইমাণং॥

(সংস্কৃত রচনা কঠোর, কিন্তু প্রাকৃত রচনা সুকুমার। পুরুষ-মহিলার পার্থক্য যেমন, ইহাদেরও পার্থক্য তেমনই।)

প্রাকৃতের এই 'সুকুমার'ত্বের যথার্থ কারণ ইহার শব্দ উচ্চারণে শক্তি প্রয়োগের অভাব। স্বরধ্বনির (vowel) উচ্চারণে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয় না বলিয়াই উহাকে সুকুমার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ব্যঞ্জন, বিশেষতঃ যুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণে কণ্ঠশক্তির প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য উহাকে কঠোর বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত প্রাকৃত কবিতাতেই ব্যঞ্জনবিলোপের চেষ্টা দ্রষ্টব্য; 'প্রাকৃত' হইয়াছে 'পাউঅ', 'সুকুমার' হইয়াছে 'সুউমার'; তাছাড়া যুক্তধ্বনিতে বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সংঘাত পরিহার প্রবৃত্তিও লক্ষণীয়; সেইজন্য 'সংস্কৃত' হইয়াছে 'সকঅ'। প্রাকৃত ভাষার এই দুর্বলতা উহার স্বভাবগত। সেইজন্য অবলা নারীর সঙ্গেই প্রাকৃত যথার্থ তুলনীয়।

প্রাকৃতে ব্যবহৃত মাত্রাছন্দও প্রাকৃত ভাষার ন্যায় সমভাবে দুর্বল। বৈদিক অক্ষরছন্দের তুলনায় মাত্রাছন্দের উচ্চারণ শিথিল, বিশ্লেষণধর্মী, স্বরপ্রধান ও সুরযুক্ত। 'বিশ্লিষ্ট' উচ্চারণে কখনও শক্তির প্রকাশ হইতে পারে না, 'সংশ্লিষ্ট' উচ্চারণেই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের অর্থ—একটি অক্ষরের অপরিসর ক্ষেত্রে দুইটি অক্ষরকে একত্র ঠাসিয়া উচ্চারণ ; শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। শক্তি প্রয়োগের ফলেই পর পর দুইটি স্বরধ্বনি একীভূত হইয়া একটি সন্ধ্যক্ষর (diphthong) উৎপন্ন করে, যথা—ঐ (অই), ঔ (অউ), ঈ (ইই), ঊ (উউ) প্রভৃতি (তথাকথিত 'দীর্ঘ'বর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সন্ধ্যক্ষরের প্রতীক মাত্র)। তাছাড়া শক্তি প্রয়োগের ফলেই স্বরধ্বনি পৃষ্ঠে ব্যঞ্জন বহন করিয়া এক একটি হলন্ত অক্ষরে পরিণত হয়, যথা—ওম্, কঃ (কহ্), সৎ, দিক্ ইত্যাদি। 'ছন্দোমঞ্জরী'-কার বলিয়াছেন—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরু র্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা ॥

—ছ-ম ১১

(অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘবর্ণ, যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ এবং পাদান্তগত বর্ণও গুরু হইয়া থাকে।)

ছন্দশাস্ত্রে 'গুরু' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ সূক্ষ্মভাবে চিন্তা না করিলে ভুল হইবেই। এই 'গুরু'র অর্থ শক্তিযুক্ত। স্বাভাবিক 'সংশ্লিষ্ট' উচ্চারণ ব্যতীত এই গুরুত্ব সম্ভব নহে। উল্লিখিত শ্লোকোক্ত সানুস্বারাদি বর্ণগুলিতে বৈদিক যুগে সংশ্লিষ্ট গুরু উচ্চারণই প্রচলিত ছিল ; সেইজন্য বৈদিক ছন্দে হ্রস্ব দীর্ঘ সকল বর্ণই উচ্চারণে একাক্ষর। অপরপক্ষে বিশ্লিষ্ট লঘু উচ্চারণই মাত্রাছন্দের ধর্ম ; এখানে দীর্ঘবর্ণ দেখিতে একাক্ষর মনে হইলেও উচ্চারণে দুই
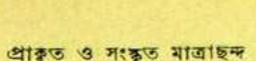
অক্ষর হইয়া যায়; ইহাকেই বলে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। মাত্রাছন্দের উচ্চারণে সকল দীর্ঘবর্ণই দুইটি লঘু অক্ষরে বিশ্লিষ্ট হয় বলিয়া উহার 'দীর্ঘ'ত্বই অবশিষ্ট থাকে 'গুরু'ত্ব হারাইয়া যায়; গুরু 'নৌ' হয় লঘু 'নউ', গুরু 'বৈ' হয় লঘু 'বই', সবল 'শ্রী' হয় দুর্বল 'শ্রি-ই', সবল 'মা' হয় দুর্বল 'মাআ' ইত্যাদি। বৈদিক পদ্ধতির গুরু অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিলে মাত্রাছন্দে রচিত কবিতায় ছন্দ-পতন হয়। ইহাতে কেবল দীর্ঘবর্ণের নহে, অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত বর্ণের অথবা যুক্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণের—অর্থাৎ হলন্ত অক্ষরেরও গুরুত্বের লঘূকরণ হয়, উহাও উচ্চারণকালে দুই অক্ষরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। যথা—'কিং' হয় 'কিইং', 'কঃ' হয় 'কঅঃ', 'সৎ' হয় 'সঅৎ', 'দিক্' হয় 'দিইক্'। প্রতিটি গুরু অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিলে তবেই মাত্রাছন্দের ছন্দ-ত্ব বজায় থাকে। যথা—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্॥

—চর্পট পঞ্জরিকা, শঙ্করাচার্য

ইহার উদ্দিষ্ট উচ্চারণ ঃ—

aamgaam galitaam palitaam muunḍaam
dasana bihiinaam jāātaam tuunḍaam
briiddhoo yāāti gri hiitvāā daanḍaam
tadapi na muunchaat yāā sāā piinḍaam

এই দৃষ্টান্তে প্রতিটি সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষরের স্বরবৃদ্ধিমূলক দীর্ঘায়ত উচ্চারণ হইয়াছে, তাই ছন্দ রক্ষা পাইয়াছে। অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি বৈদিক ছন্দের সংশ্লিষ্ট গুরু উচ্চারণে পাঠ করিলে ইহার ছন্দ-পতন ঘটে।

গুরু উচ্চারণে ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ১০টি অক্ষর এবং তৃতীয় পাদে মাত্র ৯টি অক্ষর উচ্চারিত হইয়া সামঞ্জস্যহানি করে। বলা বাহুল্য, লঘু-দীর্ঘ উচ্চারণের জন্যই উল্লিখিত ছন্দ অবৈদিক মাত্রাছন্দ।

[কোন কোন অর্বাচীন গ্রন্থে 'গুরু' ও 'দীর্ঘ'কে সমার্থক বলা হইয়াছে। কিন্তু যে বৈয়াকরণেরা স্বল্পবাক্ হইবার সাধনা করিতেন এবং সূত্রের অর্ধমাত্রা কমাইতে পারিলে পুত্রলাভের আনন্দলাভ করিতেন* তাঁহাদের পক্ষে পৃথক্ দুইটি পারিভাষিক শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। মূল 'গুরু' ও 'দীর্ঘ' ভিন্নার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং এখনও ভিন্নার্থে ব্যবহার্য। বলা বাহুল্য, 'লঘু' ও 'হ্রস্ব' এইভাবে সমার্থক নহে, প্রথমটি শক্তিজ্ঞাপক, দ্বিতীয়টি বিস্তার-জ্ঞাপক।]

কেবল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের জন্য নহে, চতুরঙ্গ ছন্দের অঙ্গে অঙ্গে প্রত্যঙ্গ-বিকাশের জন্যও মাত্রাছন্দ ভারতীয় ছন্দের ক্ষেত্রে অভিনব। বৈদিক যুগে গায়ত্রী ব্যতীত প্রতি ছন্দই ছিল 'চতুষ্পাদ'; প্রাকৃত-যুগে এই 'পাদ'ই পুনরায় অন্তর্বিভক্ত হইয়া পর্ববহুল হইয়া উঠে। মাত্রাছন্দকে কেবল পাদ-বিভক্ত করিয়া নহে, ইহার 'পাদ'কেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বে বিভক্ত করিয়া পাঠ করিতে হয়, তবেই মাত্রাছন্দের ধ্বনি-সৌন্দর্য পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে। যথা—

মধুরং বীণা রণিতং
পঞ্চম-সুভগশ্চ কোকিলালাপঃ
গীতিঃ পৌর বধূনা
মধুনা কুসুমায়ুধং প্রবোধয়তি।

এই ছন্দোবন্ধের নাম 'গীতি-আর্যা' কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে ইহার নামের সার্থকতা বুঝা যায় না, কারণ গীতিমাধুর্য ফুটে না।

* "মাত্রার্ধলাঘব করণেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ" —মহাভাষ্য

হইার পূর্ণসৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহার প্রতি পাদ নিম্ন-প্রদর্শিত রূপে পর্ব-বিভক্ত করিয়া পড়িতে হইবে :—

madhuraam | viināā | raṇitaam
paañchama | subhagaas | cha kooki | lāā lāā | paaḥ
giitiiḥ | paura ba | dhuu nāā
madhunāā | kusumāā | yudhaam pra | boodhaya | tii.

আর্যাছন্দের প্রতিপাদ পর্ববিভক্ত না করিলে উহার ছন্দোলক্ষণই সুস্পষ্ট হয় না। সম্মিতি বা অঙ্গে অঙ্গে সমদীর্ঘতাই পদ্য ছন্দের প্রধান লক্ষণ; অথচ আর্যার পদগুলি অ-সমদীর্ঘ। সেইজন্য পিঙ্গল-ভাষ্যে ভাষ্যকার হলায়ুধ ইহাকে চতুষ্পদী পদ্য বলিতে অস্বীকার করিয়া ৪।১৪ সূত্রে লিখিয়াছেন—"পাদ-ব্যবস্থা নাস্তি।" চতুর্মাত্রিক পর্বই আসলে আর্যার উপাদান এবং সম্মিতি অঙ্গগত না হইলেও প্রত্যঙ্গগত। কেবল আর্যা নহে, মাত্রাছন্দ মাত্রই সপর্বিক পাদের ছন্দরূপে পাঠ্য। মাত্রাছন্দ দেখাইয়াছে—ছন্দের পক্ষে প্রত্যঙ্গ-সম্মিতিই যথেষ্ট।

অবশ্য এইভাবে ছন্দ-পাদকে ক্ষুদ্রতর পর্বে বিভক্ত করিয়া ও সংশ্লিষ্ট গুরু অক্ষরকে বিশ্লিষ্ট করিরা পাঠ করা বৈদিক অক্ষর ছন্দে অভ্যস্ত পাঠকের নিকট অদ্ভুত ও কৌতুকজনক মনে হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—মাত্রাছন্দ সংস্কৃতের নহে, প্রাকৃতের ছন্দ এবং সাধারণ কবিতার নহে, গানের ছন্দ। শব্দগুলি এক ভাষার ও ছন্দ অন্য ভাষার হইলে রচনা কৌতুকজনক হওয়া স্বাভাবিক। মাত্রাছন্দের পূর্ণ সৌন্দর্য প্রাকৃত ভাষাতেই ফুটিয়া উঠে।

অর্বাচীন প্রাকৃতে অর্থাৎ প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রাছন্দের পাদে পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্ব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও সংস্কৃতে ও প্রাচীন প্রাকৃতে মাত্রাছন্দের সাধারণ পর্ব হইতেছে চতুর্মাত্রিক। এই জন্য পিঙ্গলাচার্য্য বলিয়াছেন—"লঃ সমুদ্রা গণঃ"

অর্থাৎ চারিটি লঘু অক্ষরের (=চতুর্মাত্রিক) পর্বই ইহার উপাদান (৪।১২)। শুধু প্রাচীন সংস্কৃতে ও প্রাচীন প্রাকৃতে নহে, পরবর্তীকালে অর্বাচীন সংস্কৃতে, বৌদ্ধ সংস্কৃতে ও প্রাকৃত অপভ্রংশেও মাত্রাছন্দের সাধারণ পর্ব চতুর্মাত্রিক। যথা—

(ক) অর্বাচীন সংস্কৃতে—

(১) 'বৈতালীয়' অন্তর্গত চারুহাসিনী—

মনাক্ প্র | স্৺ত দ | ন্ত দীধি | তিঃ
স্মরোল্ল | সিতগ | ণ্ড মণ্ড | লা।
কটাক্ষ | ললিতা | তু কামি | নী
মনো হ | রতি চা | রুহাসি | নী ॥ —হলায়ুধ ৪।৪০

(২) 'মাত্রা সমকে'র অন্তর্গত পাদাকুলক—

ত্বং কুচ | বল্গিত | মৌক্তিক | মালা
স্মিত সা | ন্দ্রীকৃত | শশিকর | জালা
হরি মভি | সর সু | ন্দরি সিত | বেশা
রাকা | রজনি র | জনি গুরু | রেখা ॥

—রূপ গীতিকাবলী ২৫

(৩) গাথা—

রতি সুখ | সারে | গতমভি | সারে | মদন ম | নোহর | বেশম্।
ন কুরু নি | তম্বিনি | গমন বি | লম্বন | মনুসর | তং হৃদ | য়েশম ॥

—গীতগোবিন্দ ৫।৮

(খ) বৌদ্ধ সংস্কৃতে গাথা—

পুরি তুম | নরবর | সুতু নৃপু | যদভু
নর তব | অভিমুখ | ইম গির | মবচী।
দদ মম | ইমমহি | সনগর | নিগমাং
ত্যজি তদ | প্রমুদিতু | ন চ মনু | ক্ষুভিতো ॥

—ললিত বিস্তর

(গ) জৈন প্রাকৃত-অপভ্রংশে পাদাকুলক[১] —

কুগুরু সু । গুরু সম । দীসহিঁ । বাহিরি
পরি জো । কুগুরু সু । অংতরু । বাহিরি ।
জো তসু । অংতরু । করই বি । যকৃখণু
সো পর । মপ্পউ । লহই সু । লকৃখণু ॥

—কালস্বরূপ কুলক. (জিনদত্ত সূরি) ১১

তাছাড়া পরবর্তী ভাষাযুগে হিন্দী, বাংলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় যত মাত্রাছন্দ দেখা দিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই সাধারণ উপাদান এই চতুর্মাত্রিক পর্ব। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় গান—

রঘুপতি । রা-ঘব । রা-জা- । রা-ম

এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত—

জনগণ । মন অধি । না-য়ক । জয় হে— । ভা-রত । ভাগ্য বি । ধা-তা-

চতুর্মাত্রিক পর্বের মাত্রাছন্দেই রচিত হইয়াছে। মাত্রাছন্দে ইহারই জনপ্রিয়তা সর্বাধিক।

আর্যভাষার ছন্দোবিবর্তনে মাত্রাছন্দের যদিও প্রধান দান দুইটি—(১) সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ এবং (২) ছন্দ-পাদে অন্তর্বিভাগ বা সপর্বিকতা প্রবর্তন, তথাপি কোন কোন ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রাছন্দের একটি তৃতীয় দানও আছে। ইহা হইতেছে সপর্বিক ছন্দ পাদে সাধারণ পর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর খণ্ড পর্ব প্রয়োগ। এই খণ্ড পর্ব অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও ছন্দের প্রয়োজনের দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খণ্ড পর্বই স্পষ্টভাবে ধ্বনিপ্রবাহের পূর্ণতা-বিধায়ক। নিজেকে পুনরাবৃত্ত করা ধ্বনিতরঙ্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

১। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে পাদাকুলক পাদের অন্ত্যবর্ণ গুরু, কিন্তু প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এরূপ কোন নিয়ম নাই।

পর পর সমদীর্ঘ পর্বে ধ্বনিপ্রবাহের গতিবেগ বাড়িয়াই যায়, পরিসমাপ্ত হয় না। কিন্তু পাদান্তে অসমদীর্ঘ পর্ব পাইলে উহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রবাহ স্তিমিত হইয়া যায়। সপর্বিক পাদে অসম খণ্ড পর্ব পাদান্তে বসিলে সমগ্র পাদগত ধ্বনি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি পূর্ণ প্রবাহিত ধ্বনি-স্রোতের আকার ধারণ করে। পাদ মধ্যে খণ্ড পর্ব বসিলে আবর্তনশীল ধ্বনিতরঙ্গ মধ্য-পথে বাধা পায় বটে কিন্তু স্তিমিত হয় না, কারণ আকস্মিক বাধার ঠিক পরেই পূর্ণ পর্বের আশ্রয় পাইয়া পুনরায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; ফলে সংঘাতজনিত অপূর্ব কলধ্বনি সৃষ্টি হয়। প্রাচীন মাত্রাছন্দ আর্যাতে এই খণ্ড পর্বের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। ফলে ইহার ধ্বনি বিচিত্রভাবে কল্লোলিত। আর্যায় খণ্ড পর্ব কোন কোন পাদে অন্ত্য পর্ব রূপে এবং কোন কোন পাদে মধ্য পর্ব রূপেও ব্যবহার লক্ষিত হয়। গীতি, উপগীতি, উদ্‌গীতি প্রভৃতি নামে আর্যা বহু প্রকার। সকল প্রকার আর্যাতেই খণ্ড পর্বকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে অন্ত্য পর্বরূপে দেখা যায়। তাছাড়া পাদমধ্যে খণ্ড পর্ব বিশেষ বিশেষ ছন্দোবন্ধের বিশেষ বিশেষ পাদে ব্যবহৃত হয়। অবস্থানভেদে খণ্ড পর্বই আর্যার ধ্বনি বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে মোটা হরফগুলিই খণ্ডপর্ব।

(দৃষ্টান্তগুলির দীর্ঘবর্ণ ও হলন্ত অক্ষর বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চার্য)

(ক) গীত্যার্যা (প্রাকৃত 'উগ্‌গাহা')—

(ইহাতে খণ্ডপর্ব অন্ত্যপর্বরূপেই আছে, অতিরিক্ত মধ্যপর্বরূপে নাই)

তুজ্ঝ ণ | আণে | হিঅঅং
মম উণ | মঅণো | দিবা বি | রত্তিম্‌ | **ম্মি**।
ণিগ্‌ঘিণ | তবই ব | লী অং
তুই বুৎ | ত মণো | রহাই | অঙ্গা | **ইং**॥

—শকুন্তলা, ৩য় অঙ্ক

(খ) আর্যা (প্রা° 'গাহা') ; আর্যা দ্বিবিধ—

(১) (ইহাতে অতিরিক্ত খণ্ডপর্ব চতুর্থ পাদে তৃতীয় মধ্যপর্বরূপে বর্তমান)

উগ্গলি | অ দব্ভ | কবলা
মিঈ প | রিচ্চৎ | ত ণচ্চ | ণা মো | রী ।
ও সরি | অ পণ্ডু | পত্তা
মুঅন্তি | অস্সূ | বি |
অলদা | ও ॥ —শকু, ৪র্থ অঙ্ক

(২) (ইহার চতুর্থ পাদের দ্বিতীয় পর্ব অতিরিক্ত খণ্ডপর্ব)

কেয়ম | বগুণ্ঠ | নবতী
নাতি প | রিস্ফুট | শরীর | লাব | ণ্যা ।
মধ্যে | তপোধ | নানাং
কিসলয় | মি |
ব পাণ্ডু | পত্রা | ণাম্ ॥

—শকু, ৫ম অঙ্ক

(গ) উদ্গীতি (প্রা° 'বিগ্গাহা')—

(ইহার দ্বিতীয় পাদের তৃতীয় পর্ব অতিরিক্ত খণ্ডপর্ব)

পরিহর | মাণিণি | মাণং
পেক্খহি | কুসুমা | ইঁ |
ণীবস্ | স ।
তুম্হ ক | এ খর | হিঅও
গেহ্লই | গুডিআ | ধণুংহি | কিল কা | মো ॥
—প্রাকৃত-পৈঙ্গল ৬৭

(ঘ) উপগীতি (প্রা° 'গাহূ')—

(ইহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ দুইটি পাদেরই তৃতীয় পর্ব অতিরিক্ত খণ্ড পর্ব)

ইঅ সিরি | 'হাল' বি | রই এ
পাউঅ | কব্বম্ | মি |
সত্তস | এ।
সত্তম | সঅং স | মত্তং
গাহা | ণ সহা | ব |
রমণি | জ্জম্ ॥

—গাথা সপ্তশতী

বিশিষ্ট কোন ছন্দোরসিকের মতে, আর্যার প্রথম পাদে হংসগতি, দ্বিতীয় পাদে সিংহগতি, তৃতীয় পাদে গজগতি ও চতুর্থ পাদে সর্পগতির সৌন্দর্য বর্তমান ("প্রথম পাদঃ হংসপদবৎ মন্থরং, দ্বিতীয়ঃ সিংহবিক্রমবদুন্নতং, তৃতীয়ো গজেন্দ্রপদবৎ স-লীলং, চতুর্থঃ সর্পগতি-বচ্চপলং পঠ্যতে"—শিরোমণি)। এই গতিভেদের কারণ পাদ'মধ্যে' পৃথক স্থানে খণ্ডপর্বের অবস্থিতি ; বাধাদায়ক খণ্ডপর্বের দূরত্ব অনুযায়ী সাধারণ পর্বজাত ধ্বনি-গতির তারতম্য ঘটে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধ্বনি-বিক্ষোভ হয়। গানের সুরে গীত হইলে এই মধ্য খণ্ডপর্বের ধ্বনি-বিক্ষোভ শ্রোতাকে চমৎকৃতই করে, 'পাঠে'র সময়ে ধ্বনি-বিক্ষোভ শ্রোতৃকর্ণে ততটা সুখদায়ক নহে। গানের ছন্দ বলিয়া আর্যাতেই কেবল খণ্ডপর্ব মধ্যপর্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে। অন্যান্য ছন্দে খণ্ডপর্ব কেবল অন্ত্য পর্ব-রূপেই থাকিয়া গিয়াছে। এই অন্ত্য খণ্ডপর্বের বৈচিত্র্য ও কৃতিত্ব অপভ্রংশযুগে দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৃত্ত ছন্দ

সংস্কৃত ভাষার অক্ষরছন্দের সাধারণ নাম 'বৃত্ত'। আর্যা-প্রভৃতি মাত্রাছন্দের ন্যায় বৃত্তছন্দ অসমপদী নহে; ইহা সমপদী এবং চতুষ্পদী। পদে পদে নির্দিষ্ট সংখ্যাক অক্ষরের 'আবর্তন' ঘটে বলিয়া এই ছন্দের নাম হইয়াছে 'বৃত্ত' (অর্থাৎ আবর্তিত) বা বর্ণবৃত্ত।[১] প্রাচীন ছান্দসিকদের উদ্দেশ্য ছিল বৃত্তছন্দের আভিজাত্য প্রচার, সেইজন্য তাঁহারা বিভিন্ন বৈদিক ছন্দের ও সংস্কৃত বৃত্তছন্দের পাদ-দৈর্ঘ্যগত সমতা দেখাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন—"গায়ত্র্যাদৌ ছন্দসি বর্ততে ইতি বৃত্তম্" (হলায়ুধ ভাষ্য), অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দে 'বর্তমান' আছে বলিয়াই ইহাদিগকে বলা হয় বৃত্ত। এই ব্যাখ্যা কিন্তু বস্তুভিত্তিক নহে; কারণ, বৃত্তছন্দগুলির গঠনে কেবল বৈদিক অক্ষর ছন্দের নহে, প্রাকৃত মাত্রাছন্দেরও উপাদান সুস্পষ্ট। বৃত্ত ছন্দের পদেপদে যেমন অক্ষর সমতা, তেমনি মাত্রাসমতাও বর্তমান। বৃত্তছন্দে সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষর যেমন বৈদিক অক্ষরছন্দের নিয়মে সংশ্লিষ্ট গুরু উচ্চারণে পাঠ করা চলে, তেমনি আবার প্রাকৃত মাত্রা-ছন্দের ধর্ম অনুসারে বিশ্লিষ্ট লঘু উচ্চারণেও পাঠ করা যায়। এই ছন্দ গুরু বা লঘু যে কোন ভঙ্গিতে উচ্চার্য বলিয়া একদিকে যেমন বেদোচিত গুরুগম্ভীর, অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতোচিত কোমল-মধুর। উপরন্তু বৃত্তছন্দের পাদ মাত্রাছন্দের পাদের মতোই সপর্বিক, এই পাদ-পর্বিকতা বৈদিক ছন্দে সম্ভব নহে। তাই 'বৃত্ত'কে কেবল বৈদিক-গোত্রীয় বলা সঙ্গত হয় না। ইহা বৈদিক অক্ষরছন্দ ও

১। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' ও 'বৃত্তরত্নাকরে' 'বৃত্তে'র বর্ণবৃত্ত-নাম দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃত মাত্রাছন্দ উভয়ের মিলনজাত বর্ণসঙ্কর ছন্দ। বৃত্ত সংস্কৃতেই প্রথম প্রবর্তিত, প্রাকৃত ইহাকে প্রথমে ঋণ হিসাবে লইয়াছে।

বৃত্তছন্দের সংখ্যা বিস্ময়জনকভাবে সুবিপুল, পিঙ্গলাচার্য এক কোটি সাতষট্টী লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত ষোলটি ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। সুদীর্ঘকালের পটভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্য সুবিশাল সন্দেহ নাই, তথাপি উহাতে দেড় কোটির অধিক ছন্দোবন্ধ সত্যসত্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে এগুলির অধিকাংশই ধ্বনি-বিলাসী বৈয়াকরণদিগের ছন্দক্রীড়ার ফল*। এই গুলিতে রহিয়াছে লঘু-গুরু বা হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনির বিচিত্র রূপকল্প বা 'প্যাটার্ণ'। এইগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যে অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য। সেকালে ভারতীয় জীবনে শ্রুতিবিলাসের কিরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছিল, বৃত্তছন্দের সংখ্যাবহুলতা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

না বলিয়া পারা যায় না--প্রাচীন ভারতে বৃত্তছন্দের বিপুল সংখ্যক প্যাটার্ণ রচনার মূলে সত্যকার ছন্দোবোধ, অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ ছিল না, ছিল ছন্দোবন্ধকে বিচিত্ররূপে অলংকৃত করিবার নেশা, উত্তেজনা ও বিলাস। ব্যক্তি বা বস্তুর অঙ্গ-বহুত্ব, অঙ্গ-সংহতি এবং অঙ্গগত সম্মিতি বা সঙ্গতি এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যই সৌন্দর্যের যথার্থ লক্ষণ (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সেই হিসাবে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের চতুষ্পাদীতা, পূর্ণতা ও পাদ-সাম্য যথার্থ সৌন্দর্যবোধ হইতেই উৎপন্ন।

---

* এই কারণেই 'ছন্দোমঞ্জরী'কার গ্রন্থ শেষে লিখিয়াছেন—

ব্যবহারোচিতং প্রায়ো ময়া ছন্দোঽত্র কীর্তিতম্।
প্রস্তারাদি পুনর্নোক্তং কেবলং কৌতুকং হি তৎ॥

(প্রস্তারাদি ছন্দ কৌতুক মাত্র, সেইজন্য পুনরুক্ত হইল না, ব্যবহারোচিত ছন্দই এখানে কীর্তিত হইল।)

কিন্তু অলংকারের উপরে সৌন্দর্য বা ছন্দ নির্ভর করে না। 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে রসিক কবি রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্
> সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে॥

(অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথোচিত সন্নিবেশ ও সুসঙ্গত মিলন থাকিলে তবেই সৌন্দর্য আছে, বলা চলে।)

অলংকারের আড়ম্বর প্রকৃত রূপপিপাসা হইতে উদ্ভূত নহে, ইহা একপ্রকার ঐশ্বর্যবিকার ও মনোবিলাসের ফল। কি রূপ-জগতে, কি ধ্বনি-জগতে, সর্বত্রই অলংকার-বাহুল্য সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রতিকূল, ইহা সূক্ষ্ম রসবোধকে পীড়িতই করে। দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্য-যুগের শেষের দিকে ভারতে বিলাসকলারই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। সেইজন্য এই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গিতে সর্বত্রই অলংকার বাহুল্য দেখা যায়। ছন্দের ক্ষেত্রেও তাই অংলকার-আতিশয্য দেখা দিয়াছিল।

ছন্দপাদে বিশেষ বিশেষ স্থানে গুরু বা লঘু অক্ষরের প্রয়োগ ছন্দকে অলংকৃত করার সহজ উপায়। চতুষ্পাদী ছন্দের পদে পদে দৈর্ঘ্যসাম্য বৈদিক ছন্দের ন্যায় অধিকাংশ বৃত্ত ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য। একমাত্র প্রভেদ গুরু-লঘু অক্ষর-সজ্জায় বা অলংকরণে। অলংকরণের ভিত্তিতেই সংস্কৃত অক্ষরছন্দের অর্থাৎ বৃত্ত-জাতীয় ছন্দোবন্ধগুলির শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। যেসকল ছন্দোবন্ধের চারিপাদই সমভাবে অলংকৃত, তাহারা 'সমবৃত্ত'। প্রথম ও তৃতীয় পাদ একভাবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ অন্যভাবে অলংকৃত হইলে ছন্দোবন্ধ হইয়াছে 'অর্ধসমবৃত্ত' এবং প্রতিপাদ পৃথক্‌ভাবে অলংকৃত হইলে ছন্দোবন্ধ 'বিষমবৃত্তে'র অন্তর্গত হইয়াছে।

বৃত্তছন্দের অলংকরণ যদি অনুষ্টুপ্ প্রভৃতির ন্যায় কেবল বিশেষ

স্থানে গুরু বা লঘু অক্ষরের দ্বারাই সাধিত হইত, তাহা হইলে উহার বৈদিক গোত্রীয়তার হানি বা বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্তি ঘটিত না। কিন্তু ছন্দোরচয়িতারা কেবল বিশেষ অক্ষরের দ্বারা অলংকরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ অক্ষর-গুচ্ছের দ্বারা অধিকাংশ ছন্দের পাদ অলংকৃত করিয়াছেন। ছন্দপাদের অলংকারগুলি একাধিক গুরু-লঘু অক্ষরের বিচিত্র বিন্যাসে উৎপন্ন এক একটি প্যাটার্ন। দুই অক্ষরে গঠিত অলংকারের প্যাটার্ন চারিটি—(১) গুরু-গুরু (– –), (২) গুরু-লঘু (– ⌣), (৩) লঘু-গুরু (⌣ –) এবং (৪) লঘু-লঘু (⌣ ⌣)। তিন অক্ষরের অলংকারের প্যাটার্ন আটটি—(১) সর্বগুরু (– – –), (২) সর্বলঘু (⌣ ⌣ ⌣), (৩) আদিগুরু (– ⌣ ⌣), (৪) আদিলঘু (⌣ – –), (৫) মধ্যগুরু (⌣ – ⌣), (৬) মধ্যলঘু (– ⌣ –, (৭) অন্ত্যগুরু (⌣ ⌣ –) এবং (৮) অন্ত্য-লঘু (– – ⌣)। এইভাবে অক্ষরসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধিতে অলংকারের আকার ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার প্যাটার্ন-বৈচিত্র্যের ক্রমবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এইজন্যই বিভিন্ন প্যাটার্নের বৃত্তছন্দের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে দেড় কোটির উপরে।

বৃত্তছন্দের গঠনে বিভিন্ন আকৃতির প্যাটার্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্যাটার্নগুলিকে সংস্কৃত ছান্দসিকেরা কেবল ছন্দপাদের 'অলংকার'রূপেই দেখিয়াছেন, ছন্দপাদের 'অঙ্গ'রূপে দেখেন নাই। কিন্তু উচ্চারণ-কালে অধিকাংশ প্যাটার্নই কেবল অলংকার হইয়া থাকে নাই, প্রতিপাদের অঙ্গরূপে, অর্থাৎ 'পর্ব' হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং অপর্বিক-পাদ অক্ষরছন্দের জাতিচ্যুতি ঘটাইয়া উহাকে সপর্বিক-পাদ মাত্রাছন্দের সগোত্র করিয়াছে। বৈদিক যুগে অক্ষর-ছন্দের পাদের মধ্যযতি-জাত অন্তর্বিভাগ ছিল না। ছন্দপাদে পর পর পর্ব সমাবেশ প্রাকৃতযুগীয় মাত্রাছন্দেরই বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতে অধিকাংশ বৃত্তছন্দের পাদ প্যাটার্নের অলংকারে সপর্বিক হইয়া উঠায় উহাতে

গীতিসুর প্রভৃতি মাত্রাছন্দের বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। বৃত্তছন্দের সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষর আর সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে 'গুরু' হইয়া থাকে নাই, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে 'লঘু-দীর্ঘে'* পর্যবসিত হইয়া যায়। এইজন্যই বৃত্তছন্দ সাধারণতঃ বর্ণসঙ্কর ছন্দ।

অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বৃত্তছন্দকে বর্ণসঙ্কর ছন্দ বলিয়া স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হইয়াছেন এবং অনেকে বৃত্তছন্দের পাদে অন্তর্বিভাগ-সূচক মধ্যযতিও স্বীকার করেন নাই ('শ্বেতমাণ্ডব্য-মুখ্যাস্ত্ব নেচ্ছন্তি মুনয়ো যতিম্'—ছন্দোমঞ্জরী), তাছাড়া পাদ মধ্যে বারংবার আবর্তিত বিশেষ প্যাটার্নের পর্বত্বও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অস্বীকার করা নিস্ফল ; তোটক, তূণক, ভুজঙ্গ প্রয়াত, মদিরা, দ্রুত-বিলম্বিত, ত্বরিত-গতি প্রভৃতি বহু সমবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ প্যাটার্নের পর্বতরঙ্গ সবেগে নাচিয়া থাকে। এই নৃত্য-চাপল্য শাস্ত্র-শাসনে প্রশমিত হইবার নহে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ছান্দসিকেরাও মালিনী, শিখরিণী, শার্দূলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দে পাদ-মধ্যযতি এবং যতি-জাত পর্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বৃত্তছন্দের বিবর্তনে দেখা যায়, চতুর্বিধ পদ্ধতির অলংকরণের দ্বারা চারিভাবে সমবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারি রূপের মধ্যে রহিয়াছে মাত্রাছন্দের জয়-পরাজয়ের ইতিহাস, অর্থাৎ অক্ষর-ছন্দের মধ্যে মাত্রাছন্দের যথাক্রমে প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব-হ্রাস ও প্রভুত্ব বিলোপের বিস্ময়কর কাহিনী।

সমবৃত্ত ছন্দোবন্ধ গঠনের প্রথম পর্যায়ে একটি বিশেষ প্যাটার্নের পর্বকেই বার বার আবৃত্ত করিয়া ছন্দপাদ রচনা করা হইয়াছে। এই পর্বেরই রন্ধ্রপথে মাত্রাছন্দ অক্ষরছন্দের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। পর্ব-প্যাটার্ন একপ্রকার হইলেও ছন্দপাদে পর্বসংখ্যার

---

* পৃঃ ২৬২-২৬৪ দ্রষ্টব্য।

ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধ গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া মাত্রাছন্দের, বিশেষ করিয়া আর্যা ছন্দের আদর্শে দৈবাৎ পাদান্ত পর্বকে খণ্ডপর্বে পরিণত করিয়াও পৃথক্ ছন্দ রচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দ্ব্যক্ষরতাই পর্বদৈর্ঘ্যের নিম্নতম সীমা। সমবৃত্ত ছন্দে সাধারণতঃ গুরু-গুরু, গুরু-লঘু ও লঘু-গুরু—এই ত্রিবিধ প্যাটার্নের দ্ব্যক্ষর পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দিক দিয়া এইগুলিকে দীর্ঘ-দীর্ঘ, দীর্ঘ-হ্রস্ব, ও হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্ণের প্যাটার্নও বলা চলে। দ্ব্যক্ষর প্যাটার্নে রচিত ছন্দের দৃষ্টান্ত ঃ—

(১) প্যাটার্ন – –(spondee)

(ক) বিদ্যুল্লেখা (ত্রিপর্বিকপাদ)—

গোপ | স্ত্রীণাং | মুখ্যা
বিদ্যু | ল্লেখা | রূপা।
কালি | ন্দী তী | রে সা
রেমে | শ্রী কৃ | ষ্ণেণ। —ছন্দোমঞ্জরী

(খ) বিদ্যুন্মালা (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

রাধা | পাণিং | সব্যেহ | সব্যে
পাণৌ | বিভ্রদ্ | বেণুং | কৃষ্ণঃ।
রেজে | কুঞ্জান্ | নির্যন্ | যদ্বদ্
বিদ্যু | ন্মালা | শ্লিষ্টোহ | ম্ভোদ ঃ॥

—গোবিন্দ লীলামৃত ১।৮১

(২) প্যাটার্ন –⏑ (trochee)

(ক) সমানিকা (চতুষ্পর্বিকপাদ, অন্ত্যপর্ব পূর্ণ)—

শম্ব | রী কি | শোর | লোল
লোচ | নাঞ্চ | লান্ত | রেণ।
স্থচ | রত্য | লং প্রি | য়ং কি
মপ্য | সৌ শ্র | তৌ ত্র | বীতি॥

—মন্দার মকরন্দ চম্পূ ১।২৩

(খ) তূণক (অষ্টপর্বিকপাদ, অন্ত্যপর্ব খণ্ড)—

তুণ্ড | কান্তি | দণ্ডি | তোরু | পাণ্ডু | রাংশু | মণ্ড | লং
গণ্ড | পালি | তাণ্ড | বালি | শালি | রত্ন | কুণ্ড | লম্ ।
স্ফুল্ল | পুণ্ড | রীক | খণ্ড | কৢপ্ত | মাল্য | মণ্ড | নং
চণ্ড | বাহু | দণ্ড | মত্র | নৌমি | কংস | খণ্ড | নম্ ॥

—মুকুন্দ মুক্তাবলী স্তব ৯

(৩) প্যাটার্ন ⏑ – (iambus)

(ক) প্রমাণিকা (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

রবা | বধূ | র্পিতে | ক্ষণং
বিল | ম্বিতা | কুলা | লকম্ ।
অসং | স্থিতৈঃ | পদৈঃ | প্রিয়া
করো | তি ম | ত্ত চে | ষ্টিতম্ ॥

—নাট্যশাস্ত্র ১৫।২২

(খ) পঞ্চচামর (অষ্টপর্বিকপাদ)—

জটা | টবী | গল | জ্জল | প্রবা | হ পা | বিত | স্থলে
গলেঽ | বল | ম্ব্য ল | ম্বিতাং | ভুজ | ঙ্গ তু | ঙ্গ মা | লিকাম্ ।
ডমড্ | ডমড্ | ডমড্ | ডমন্ | নিনা | দ বড্ | ডম | র্বয়ং
চকা | র চ | ণ্ড তা | ণ্ড বং | ত নো | তু নঃ | শিবঃ | শিবম্ ॥

—শিবতাণ্ডব স্তব ১

ত্র্যক্ষর পর্বের আটটি প্যাটার্নের মধ্যে সর্বলঘু ও সর্বগুরু প্যাটার্ন বাদে অন্য ছয় প্রকার প্যাটার্নই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সকল প্যাটার্নে রচিত ছন্দের দৃষ্টান্ত :—

(১) প্যাটার্ন – ⏑ ⏑ (dactyl)

(ক) মদিরা (অষ্টপর্বিকপাদ, অন্ত্যপর্ব খণ্ড)—

মাধব | মাসি বি | কস্বর | কেশর | পুষ্পল | সম্মদি | রা মুদি | তৈ-
ভৃঙ্গ কু | লৈ রুপ | গীত ব | নে বন | মালিন | মালিক | লা নিল | যম্ ।
কুঞ্জ গৃ | হো দর | পল্লব | কল্পিত | তল্প ম | নল্প ম | নোজ র | সং
তং ভজ | মাধবি | কা মৃদু | নর্তক | যামুন | বাত কৃ | তোপগ | মা ॥

(খ) সারবতী (চতুষ্পর্বিকপাদ, অন্ত্যপর্ব খণ্ড)—

পুত্ত প | বিত্ত ব | হুত্ত ধ | ণা
ভত্তি কু | টুম্বিণি | সুদ্ধম | ণা।
হক্ক ত | রা সই | ভিচ্চ গ | ণা
কো কর | বব্বর | সগ্ গ ম | ণা ॥

—প্রাকৃত পৈঙ্গল, বর্ণবৃত্ত ৯৫

(২) প্যাটার্ন ⏑ – –

ভুজঙ্গ প্রয়াত (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

ত্রিলোকী | স্ফুরৎ কী | র্তি পীযূ | ষ ধারঃ
প্রকাশী | কৃত প্রে | ম ভক্তি | প্রচারঃ।
লসৎ ত | প্ত কার্ত | স্বর শ্রী | মদঙ্গ-
চ্ছটা চ্ছ | ন্ন লাব | ণ্য তারু | ণ্য ভঙ্গঃ ॥

—চৈতন্ত চরিতামৃত (কবি কর্ণপুর) ১৬।৪২

(৩) প্যাটার্ন – – ⏑ (amphibrach)

মৌক্তিকদাম (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

ক আ ভ | উ হু ব্ব | রি তেজ্জি | গরাস
থনে থ | ণ জাণি | অ অচ্ছ | পিসাস।
কুহু র | ব তার | হুরন্ত | বসন্ত
কি পিন্ধ | অ কাম | কি পিন্ধ | অ কন্ত ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৩৪

(৪) প্যাটার্ন – ⏑ –

স্রগ্বিনী (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

বর্জয় | স্ত্যা জনৈঃ | সঙ্গমে | কান্তত-
স্তর্কয় | স্ত্যা সুখং | সঙ্গমে | কান্ততঃ।
যোষয়ৈ | ষ স্মরা | সন্নতা | পাঙ্গয়া
সেব্যতেহ | নেকয়া | সন্নতা | পাঙ্গয়া ॥

—শিশুপাল বধ ৪।৪২

(৫) প্যাটার্ন ⏑ ⏑—(anapaest)

তোটক (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

সরসাং | সরসাং | পরি মু | চ্য তনুং
পততাং | পততাং | ককুভো | বহুশঃ।
সকলৈঃ | সকলৈঃ | পরিতঃ | করুণৈ
রুদিতৈ | রুদিতৈ | রিব খং | বিততম্ ॥

—ভট্টিকাব্য ১০।৪

(৬) প্যাটার্ন — —⏑

সারঙ্গ (চতুষ্পর্বিকপাদ)—

রে গোড় | থক্কন্তি | তে হত্থি | জূহাই
পল্লট্টি | জুজ্ঝন্ত | পাইক্ক | বূহাই।
কাসীস | রাআ স | রাসার | অগ্‌গেণ
কী হত্থি | কী পত্তি | কী বীর | বগ্‌গেণ ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত, ১৩২

কেবল এই প্রকার দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর প্যাটার্ন নহে, সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘতর প্যাটার্নও ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত গুলিতে চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের কয়েকটি প্যাটার্ন দ্রষ্টব্য ঃ—

চতুরক্ষর পর্ব, প্যাটার্ন — ⏑ ⏑—

মাণবকাক্রীড়িতক (দ্বিপর্বিকপাদ)—

কোকবধূ | শোকহরং
পদ্মবনী | বোধকরম্।
গাঢ়তমো | নাশ করং
নৌমিতরাং | মুক্তকরম্ ॥

—বাণীভূষণ (দামোদর মিশ্র) ৭৬

পঞ্চাক্ষর পর্ব, প্যাটার্ন ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ —

ত্বরিত গতি (দ্বিপর্বিকপাদ)—

সুমুখি তত | ত্বরিত মিত-
স্ত্যজ শয়নং | ব্রজ ভবনম্।
উদয় ধরং | সরতি পরং
ত্বরিত গতি | দিবস পতিঃ ॥

—গোবিন্দ লীলামৃত ১।৩৬

ষড়ক্ষর পর্ব, প্যাটার্ন ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑

মালা (ত্রিপর্বিকপাদ, অন্ত্যপর্ব খণ্ড)—

নববিকশিত | কুবলয় দল | নয়নে
নিশময় নব | জলধর মিহ | গগনে।
অপনয় রুষ | মুপসর মম | সবিধং
যদি রতিসুখ | মভিলষসি ব | হুবিধম্ ॥

—হলায়ুধ ৭।১২

ছন্দপাদে গতিবেগ-সঞ্চারক অতিপর্বিক (hypermetric) ধ্বনির সচেতন ব্যবহার অপভ্রংশ ভাষা যুগের বৈশিষ্ট্য। তবে সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দের গঠনে একই পর্ব-প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তির কালেই দুইএকটি ছন্দে অতিপর্বিক ধ্বনিকে ছন্দকারের কতকটা অজ্ঞাতসারে হঠাৎ আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। যথা—

(১) দ্রুতবিলম্বিত (মধ্যগুরু প্যাটার্নের পর্ব)—

(বির) হতাপি | নি চন্দ | ন পাংশু | ভি-
(র্বপু) ষি সার্পি | ত পাণ্ডি | ম মণ্ড | না।
(বিষ) ধরাভ | বিসাভ | রণা দ | ধে
(রতি) পতিং প্র | তি শম্ভু | বিভীষি | কাম্ ॥

—নৈষধ চরিত (শ্রীহর্ষ) ৪।২৭

(২) মধুমতী (চতুর্লঘু প্যাটার্নের পর্ব)—

(রবি) দুহিতৃ ত | টে
(নব) কুসুম ত | তিঃ।
(ব্যধি) ত মধুম | তী
(মধু) মথন মু | দম্ ॥

—ছন্দোমঞ্জরী (গঙ্গাদাস)

দৃষ্টান্ত দুইটির পাদাগ্রবর্তী ( ) বন্ধনীবদ্ধ দ্ব্যক্ষর ধ্বনি গুলিই 'অতিপর্বিক'।

সমবৃত্ত ছন্দোবন্ধ গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছন্দপাদে একটি বিশেষ প্যাটার্নের পর্বের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্ষর ছন্দের মধ্যে মাত্রাছন্দের ধর্ম শুধু সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়াছে. তাহা নহে ; মাত্রাছন্দ এবার বৃত্তের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ করিয়া একেবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 'আর্যা'র পরেই প্রধান মাত্রাছন্দ হইতেছে 'মাত্রাসমক'। ছন্দ-পাদে ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নের অসম সংখ্যক অক্ষর বিশিষ্ট পর্বের সমাবেশ, অথচ পর্বে পর্বে মাত্রাসমতা রক্ষা 'মাত্রাসমক' ছন্দের বৈশিষ্ট্য। বৃত্তছন্দ গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি বৃত্তছন্দ এই মাত্রাসমক ছন্দের আদর্শেই গঠন করা হইয়াছে। এই গুলির ছন্দ-পাদে পর্ব-বৈচিত্র্য-সাধনের চেষ্টা সুস্পষ্ট। বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টায় পাদস্থ পর্বগুলিকে অক্ষর-সংখ্যায় পরস্পর অ-সম রাখা হইয়াছে, তবে মাত্রা-সংখ্যায় সমই রাখা হইয়াছে। ফলে প্রথমবারের ছন্দ-পাদের শ্রুতিগত সমপর্বিকতা দ্বিতীয় বারেও অক্ষুণ্ণ আছে ; তথাপি এইসকল ছন্দ-পাদে অসমপর্বিকতার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। এই ভ্রান্তির কারণ—সাধারণ মানুষের নিকটে কর্ণের সাক্ষ্য অপেক্ষা চক্ষুর সাক্ষ্যই অধিক বিশ্বাস যোগ্য। নিম্নোদ্ধৃত ছন্দগুলির পাদস্থ পর্ব-সমূহ শ্রুতিতে (মাত্রায়) সমদীর্ঘ কিন্তু দৃষ্টিতে (অক্ষরে)

অসম—

(১) চতুর্মাত্রিক পর্বের ভুজগশিশুভৃতা—

‿‿‿‿ ‿‿— ——
কু সু মি ত | ম ভি প | শ্য ন্তী
বি বি ধ ত | রু গ ণৈ | শ্চ য়ম্ ।
ব ন ম তি | শ য় গ | ন্ধা ঢ্যং
ভ্র ম তি ম | ধু ক রী | হৃ ষ্টা ॥

—ছন্দোমঞ্জরী (গঙ্গাদাস)

(২) ষণ্মাত্রিক পর্বের রুচিরা—

‿—‿— ‿‿‿‿– ‿—‿—
অ ভূ ন্নৃ পো | বি বু ধ স খঃ | প র ন্ত পঃ
শ্রু তা ন্বি তো | দ শ র থ ই | ত্যু দা হৃ তঃ ।
গু ণৈ র্ব রং | ভু ব ন হি ত | চ্ছ লে ন যং
স না ত নঃ | পি ত র মু পা | গ মৎ স্ব য়ম্ ॥

—ভট্টিকাব্য, ১।১

এই আদর্শ ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় যুগে এক একটি মাত্রাছন্দ হইতে বহু বৃত্ত ছন্দ গঠিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'পাদাকুলক' ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। ইহা চতুর্মাত্রিক পর্বজাত মোট ষোল মাত্রার চতুষ্পর্বিক পদের মাত্রা ছন্দ। ইহা হইতে (১) কুসুম-বিচিত্রা, (২) কুড্মলদন্তী, (৩) মত্তা, (৪) ভ্রমর বিলসিতা, (৫) রুক্মবতী বা চম্পকমালা, (৬) দোধক, (৭) জলোদ্ধত গতি, (৮) সুষমা, (৯) চক্রপদ (১০) শরভ প্রভৃতি বৃত্তছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত ঃ—

হরি রিতি | হরি রিতি | জপতি স | কামং।
বিরহ বি | হিত মর | ণেব নি | কামম্ ॥

ইহার দুইটি হ্রস্ব অক্ষরের পরিবর্তে একটি দীর্ঘাক্ষর প্রয়োগে এবং একটি দীর্ঘাক্ষরের স্থলে দুইটি হ্রস্বাক্ষর ব্যবহারে পূর্বোক্ত দশটি ছন্দের সৃষ্টি হয়। যথা—

(১) কুসুম বিচিত্রা—

‿ ‿ ‿ ‿ — — ‿ ‿ ‿ ‿ — —

বি গ লি ত | হা রা | স কু সু ম | মা লা
স চ র ণ | লা ক্ষা | ব ল য় সু | ল ক্ষা।
বি র চি ত | বে শং | সু র ত বি | শে ষং
ক থ য় তি | শ য্যা | কু সু ম বি | চি ত্রা॥

—হলায়ুধ ৬।৩৫

(২) কুড্মলদন্তী—

— ‿ ‿ — — ‿ ‿ ‿ ‿ — —

গো কু ল | ব ন্ধো | জ য় র স | সি ন্ধো
জা গৃ হি | ত ল্পং | ত্য জ শ শি | ক ল্পম্।
প্রী ত্য হ | কু লাং | শ্রি ত ভু জ | মূ লাং
বো ধ য় | কা ন্তাং | র তি ভ র | তা ন্তাম্॥

—গোবিন্দলীলামৃত ১।২৩

(৩) মত্তা—

— — — — ‿ ‿ ‿ ‿ — —

বৃ ন্দা | ব ন্ত্যা | দ ধি গ ত | বি ন্ধা
সা রী | হা রী | কৃ ত ব হ | প ন্থা।
রা ধা | স্নে হো | চ্চ য় ম ধু | ম ত্তা
ত স্যা | নি দ্রা | প ন য় ন | য ত্তা॥

—গোবিন্দ লীলামৃত ১।৩৩

(৪) ভ্রমর বিলসিতা—

— — — — ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ —

প্রী তৈ্য | যূ নাং | ব্য ব হি ত | ত প নাঃ
প্রৌ ঢ় | ধ্বা ন্তং | দি ন মি হ | জ ল দাঃ।
দো ষা | ম ন্যং | বি দ ধ তি | সু র ত-
ক্রী ড়া | য়া স | শ্র ম শ ম | প ট বঃ॥

—শিশুপাল বধ, ৪।৬২

(৫) রুক্মবতী বা চম্পকমালা

— ◡ ◡ — — — ◡ ◡ — —

ভ গ্ন ম | স ত্ত্যৈঃ | কা য় স | হ স্রৈঃ
মো হ ম | য়ী গু | বী ভ ব | মা য়া।
স্ব প্ন বি | লা সা | যো গ বি | যো গা
রু ক্ম ব | তী হা | ক ষ্ট রু | তে শ্রীঃ ॥

—সুবৃত্ত তিলক ১।১৭

(৬) দোধক—

— ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ — —

প র্ব ত | পং ক্তি প | তা বি হ | ব ল্গৎ
কু ঞ্জ র | কু ঞ্জ র | কু ঞ্জ স | মা জে।
কা স র | স স্ত তি | বা ত হ্ব | তেহ সৌ
স ঙ্গ র | স ঙ্গ র | স ঙ্গ ব | লা স্রৈঃ ॥

—সুরথোৎসব ৪।৪০

(৭) জলোদ্ধত গতি—

◡ — ◡ ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ ◡ —

স মী র | শি শি রঃ | শিরঃ সু | ব স তাং
সতাং জ | ব নি কা | নিকাম | সুখিনাম্।
বি ভ র্তি | জ ন য় | ন্নয়ং মু | দ ম পা
ম পা য় | ধ ব লা | ব লা হ | কততীঃ ॥

—শিশুপাল বধ ৪।৫৬

(৮) সুষমা—

— — — — — — ◡ ◡ ◡

ভো হা | কবিলা | উচ্চা | হি অ লা
মঝ্ ঝা | পিঅলা | নেত্তা | জু অলা।
রুক্ খা | ব অ ণা | দন্তা | বি র লা
সে সে | জিবিআ | তাকা | পিঅলা ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৯৭

(৯) চক্রপদ—

—⌣⌣ ⌣⌣⌣⌣ ⌣⌣⌣⌣ ⌣⌣—
খ ঞ্জ ণ | জু অ ল ণ | অ ণ ব র | উ প মা
চা রু ক | ণ অ ল ই | ভুঅ জুঅ | সুসমা।
ফু ল্ল ক | ম ল মু হি | গ অ ব র | গ ম ণী
ক স্‌স স্থ | কিঅ ফল | বিহি গঠ্‌ঠু | ত রু ণী॥

প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৫৩

(১০) শরভ

⌣⌣⌣⌣ ⌣⌣⌣⌣ ⌣⌣⌣⌣ ⌣⌣—
ত র ল ক | ম ল দ ল | স রি জু অ | ণ অ ণা
স র অ স | ম অ স সি | সু স রি স | ব অ ণা।
ম অ গ ল | ক রি ব র | স অ ল স | গ ম ণী।
ক ম ণ সু | কি অ ফ ল | বি হি গ ঠ | র ম ণী॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৬৭

(এই 'শরভ' হইতে আবার 'চন্দ্রাবর্তা' ও 'মণিগুণনিকর' ছন্দের জন্ম।)

এই ভাবের অপর একটি উৎপাদক মাত্রাছন্দ হইতেছে—'হাকলি,' ইহা হইতে বৃত্তছন্দের 'সারবতী' ও 'সুমুখী' উৎপন্ন হইয়াছে। হাকলিও চতুর্মাত্রিক পর্বের ছন্দ, ইহার চরণ চতুষ্পর্বিকও বটে, তবে ইহার অন্ত্যপর্ব খণ্ড ও দ্বিমাত্রিক। যথা—

উচ্চ উ | ছাঅণ | বিমল ঘ | রা
তরুণী | ঘরিণী | বিণঅ প | রা।
বিত্তক | পূরল | মুদ্দ হ | রা
বরিসা | সমআ | সুকৃথক | রা॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৭৪

এই মুক্ত-পবিক 'হাকলি'র প্রথম তিন পর্বকে আদিগুরু (—⌣⌣) হইতে বাধ্য করিলে 'সারবতী' ছন্দ উৎপন্ন হয় এবং প্রথম পর্বকে সর্বলঘু (⌣⌣⌣⌣) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বকে আদিগুরু (—⌣⌣) করিলে 'সুমুখী'র সৃষ্টি হয়। যথা—

সারবতী—

— ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ —
চে স্ত গ | ণ ত্রি ত | য়ং ক্র ম | তঃ
স্যাদ্ গু রু | র স্ত গ | তোঽ ত্র ম | তঃ।
শ্রী র স | ব স্ত নৃ | প প্র থি | তা
সা র ব | তী ক বি | ভিঃ ক থি | তা॥

—বৃত্তরত্নাবলী ২২

সুমুখী—

⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ —
ত র ণি সু | তা ত ট | কু ঞ্জ গৃ | হে
ব দ ন বি | ধু স্মি ত | দী ধি তি | ভিঃ।
তি মি র মু | দ স্ত মু | খং সু মু | খী
হ রি ম ব | লো ক্য চু | চু ম্ব চি | রম্॥

—ছন্দোমঞ্জরী ৮২

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে দেখা যায়, সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের দ্বিতীয় অবস্থাতে পর্বগত মাত্রা সমত্বের জন্য ছন্দ পাদে যথার্থ বৈচিত্র্য সাধন সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া মাত্রাছন্দের নৃত্য-চাপল্য বৃত্তছন্দ হইতে পরিহার করা দূরে থাকুক, উহাই বরং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সুতরাং সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের তৃতীয় পর্যায় দেখা দিয়াছে। এই পর্যায়ের চেষ্টা হইয়াছে—ছন্দ পাদে যথার্থ অ-সম পর্ব ব্যবহারের দ্বারা পর্ব-বৈচিত্র্য বিধান এবং উহাতে অক্ষর-ছন্দের লুপ্ত গাম্ভীর্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য তৃতীয় পর্যায়ে শুধু অক্ষরের দিক দিয়া নহে,

মাত্রার দিক দিয়াও পৃথক্ পৃথক্ দৈর্ঘ্যের পর্ব একই চরণে সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহাতে ছন্দ পাদে পর্বসম্মিতির হানি হইলেও পর্বসঙ্গতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে[১]। শালিনী, মালিনী, শিখরিণী, হরিণী, মন্দাক্রান্তা, শার্দূল বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি বৃত্তছন্দের এইভাবে উৎপত্তি। নিম্নে ইহাদের গঠন বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য—

শালিনী—

কল্পান্তাব্দে | স্বল্যয়োরপ্রযোধে
সংঘট্টোহভূৎ | সৈন্যয়োরন্তরালে।
গর্জ্জত্যুচ্চৈঃ | শক্র পক্ষেহস্তিকস্থে
মাধ্যস্থ্যং কঃ | শৌর্য শালী দধীত॥

—প্রদ্যুম্ন চরিত (মহাসেনাচার্য) ১০।১

মালিনী—

সরসিজ মনুবিদ্ধং | শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশো | র্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা | বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং | মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

—শকুন্তলা ১।১৮

শিখরিণী—

গরীয়ান্ মে প্রেমা | ত্বয়ি পরমিতি স্নেহলঘুতা
ন জীবিষ্যামীতি | প্রণয় গরিমাখ্যাপন বিধিঃ।
কথং নায়ানীতি | স্মরণ পরিপাটী প্রকটনং
হরৌ সন্দেশায় | প্রিয়সখি ন মে বাগবসরঃ॥

— হংসদূত (রূপগোস্বামী) ১০০

হরিণী—

ভবতু বিদিতং | ভব্যালাপৈ | রলং বত গম্যতাং
তনুরপিন তে | দোষোহস্মাকং | বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ।
তব যদি তথা | ভূতং প্রেম | প্রপন্নমিমাং দশাম্
প্রকৃতি তরলে | কা নঃ পীড়া | গতে হত জীবিতে॥

—অমরু শতক ২৭

১। সম্মিতি ও সঙ্গতির অর্থ ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মন্দাক্রান্তা—

গচ্ছন্তীনাং | রমণবসতিং | যোষিতাং তত্র নক্তম্
রুদ্ধালোকে | নরপতিপথে | সূচিভেদ্যৈ স্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা | কনকনিকষ | স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীম্
তোয়োৎসর্গ | স্তনিতমুখরো | মাস্ম ভূ র্বিক্লবাস্তাঃ॥

—মেঘদূত ৩৭

শার্দূল বিক্রীড়িত—

শৃঙ্গারী গিরিজাননে স করুণো | রত্যাং প্রবীরঃ স্মরে
বীভৎসোঽস্থিভি রুৎফণী চ ভয়কৃ | ন্মূর্ত্যাদ্ভুত স্তুঙ্গয়া।
রৌদ্রো দক্ষবিমর্দনে চ হসকৃ | ন্নগ্নঃ প্রশান্তশ্চিরাদ্
ইত্থং সর্বরসাশ্রয়ঃ পশুপতি | র্ভূয়াৎ সতাং ভূতয়ে॥

—শৃঙ্গারতিলক (রুদ্রভট্ট) ১।১

স্রগ্ধরা—

মৃত্যো স্তল্যং ত্রিলোকীং | গ্রসিতুম তিরসা | নিঃসৃতাঃ কিংনু জিহ্বাঃ
কিংবা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্ম | দ্যুতিভিররুণিতা | বিষ্ণুপদ্যাঃ পদব্যঃ।
প্রাপ্তাঃ সন্ধ্যাঃ স্মরারেঃ | স্বয়মুত হৃতিভি | স্তিস্র ইত্যূহ্যমানাঃ
দেবৈর্দেবী ত্রিশূলা | হত মহিষ জুষো | রক্তধারা জয়ন্তি॥

—চণ্ডীশতক (বাণভট্ট) ৪

লক্ষ্য করিতে হইবে, উল্লিখিত বৃত্তছন্দ সমূহে মাত্রাছন্দের ন্যায় পর্ব থাকিলেও তাহাদের সমমাত্রিক তালভঙ্গ হইয়াছে এবং সেইজন্য অনেকাংশে নৃত্যচপলতা নষ্ট হইয়াছে। পূর্বোক্ত সমপর্বিক বৃত্তছন্দ-গুলির ন্যায় ইহাদের মধ্যে কোমলমধুর ধ্বনি তরঙ্গের একঘেয়েমি নাই, তৎপরিবর্তে জাগিয়া উঠিয়াছে গাম্ভীর্যপূর্ণ বিশাল, প্রবল ও বিচিত্র কল্লোলধ্বনি। তবে এই বিশালতা পর্বের দৈর্ঘ্যবশতঃ এবং গাম্ভীর্য সমমাত্রিক তালভঙ্গের জন্য। এই ছন্দোবন্ধগুলির পাদ অসমপর্বিক হইলেও সপর্বিক; এইগুলিতে সমমাত্রিক তাল না

থাকিলেও অসমমাত্রিক তাল আছে; সেইজন্য এই সকল ছন্দও প্রধানতঃ গীতিকাব্যের ছন্দ। এইগুলিতে মাত্রাবৃত্তের ধর্ম সঙ্কুচিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত মাত্র, বিলুপ্ত নহে।

সমবৃত্ত ছন্দ গঠনের চতুর্থ পর্যায়ে ছন্দপাদকে পর্বমুক্ত করা হইয়াছে। ছন্দের পাদ পর্ববিভক্ত করিয়া পাঠ করা পাঠকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে, একত্র অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করাই স্বাভাবিক। তথাপি ছন্দপাদে বিশেষ প্যাটার্নযুক্ত পর্বের বারংবার আবর্তন থাকিলে পর্বগুলিকে পৃথক্‌ভাবে উচ্চারণ করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি হয়। অসমর্বিক ছন্দপাদে প্যাটার্নবিশেষের পুনরাবির্ভাব থাকে না বলিয়া সহজেই পর্বগুলির সংযোজন ও একীকরণ হইয়া যায়। শার্দূল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি তৃতীয় পর্যায়ের ছন্দের চরণে অসমপর্ব থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পর্ব-সংযোজন হয় নাই; তাহার কারণ, এইসকল ছন্দের চরণ অতি দীর্ঘ, একবারের প্রয়াসে একসঙ্গে আদ্যন্ত উচ্চারণ কষ্টকর এবং সেইজন্যই ছান্দসিকগণ ঐ সকল ছন্দপাদে মধ্যযতি ও পর্ব বিভাগের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন; সেইজন্যই পাঠককণ্ঠে এই পর্বগুলির একীকরণ হয় না। সেইজন্য চতুর্থবারে গঠিত ছন্দগুলিতে মধ্যযতির নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, ছন্দপাদও সুদীর্ঘ করা হয় নাই। এইগুলিতে বিশেষ প্যাটার্নের পুনরুক্তি নাই; কাজেই এই সকল ছন্দে ছন্দপাদ অবিভক্তভাবে উচ্চার্য হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধবিরাট্, স্বাগতা, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, ইন্দ্রবংশা, বংশস্থা প্রভৃতি ছন্দ চতুর্থ প্রচেষ্টাজাত ছন্দের দৃষ্টান্ত। প্রাকৃত মাত্রাছন্দের মালিন্য সংস্কার করিয়া এইগুলিকেই যথার্থ সংস্কৃত ছন্দে পরিণত করা হইয়াছে। এইগুলিতে মাত্রাছন্দের নৃত্যচপলতা বিলুপ্ত; কেবল কোমলতাটুকু অবশিষ্ট আছে। সেইজন্য এইগুলি সার্থকভাবে বৈদিক গোত্রীয়তা দাবী করিতে পারে। নিঃসঙ্কোচে বলা চলে—শুদ্ধবিরাট্ 'পঙ্‌ক্তি'-গোত্রজ, স্বাগতা, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি 'ত্রিষ্টুপ্'-

গোত্রজ, এবং ইন্দ্রবংশা, বংশস্থা 'জগতী' গোত্রীয়। ইহাদের দৃষ্টান্ত :—

শুদ্ধবিরাট্—

কংসারিক্রমনির্ঝরাপগা-
ধারাশুদ্ধবিরাট্‌ছদচ্ছবিম্।
ছন্দোভি র্বিবিধৈ রধীরধী
স্তোষ্যেঽহং চরমং জিনেশ্বরম্ ॥

—শ্রীবীরস্তব (জিনপ্রভাচার্য)

স্বাগতা—

মান্মথী মরকতোপলকোশা
ম্লানমুষ্টিরুচিরাঙ্কুরিকেতি।
কাপি চঞ্চুগত কিংশুক পুষ্পা
ভীতমৈক্ষত শুকী পথিকেন ॥

—নটেশবিজয় (বেঙ্কটকৃষ্ণ) ৯।২১

ইন্দ্রবজ্রা—

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তামালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বু রাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

—রঘুবংশ, ১৩ সর্গ

উপেন্দ্রবজ্রা—

সদৈব সম্পন্নব পুরণেষু
স দৈব সম্পন্নব পূরণেষু।
মহোদধেস্তারি মহা নিতান্ত-
মহো দধেস্তারি মহা নিতান্তম্ ॥

—শিশুপাল বধ, ১৪ সর্গ

উপজাতি—

তাবদ্দৃঢ়ং বন্ধনমস্তি লোকে
ন দারবং তান্তবমায়সং বা।
যাবদ্দৃঢ়ং বন্ধনমেতদেব
মুখং চলাক্ষং ললিতঞ্চ বাক্যম্ ॥

—সৌন্দরনন্দ (অশ্বঘোষ) ৭।১৪

ইন্দ্রবংশা— দৈবাদথো মন্দির মধ্যমাগতঃ
চক্ষুঃশ্রবাঃ ক্রূরতরঃ সুপামরঃ।
বধ্বাঃ পদং শারদপদ্মসৌরভং
ভেজে কঠোরৈর্দশনৈঃ কঠোরধীঃ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত (কবিকর্ণপুর) ৩।১০১

বংশস্থা— ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ্
অসত্যকণ্ঠার্পিত বাহুবন্ধনা॥

—কুমার সম্ভব ৫।৫৭

সমবৃত্ত ছন্দোধ্বনিকে বিচিত্রতর করিবার জন্য সমবৃত্ত হইতে অর্ধ সমবৃত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদ একপ্রকারে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ অন্য প্রকারে অলংকৃত। সমবৃত্ত ছন্দোবন্ধের পাদ বিশেষের ঈষৎ-পরিবর্তনে এইগুলির উৎপত্তি বলিয়াই ইহাদের নাম অর্ধসম বৃত্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পূর্ব-প্রদর্শিত 'দোধক' ছন্দ হইতে অর্ধসমবৃত্ত 'বেগবতী' ছন্দের উৎপত্তি সুস্পষ্ট। দোধকের প্রথম ও তৃতীয় পাদের দ্বিমাত্রিক প্রথমাক্ষরটি বাদ দিলেই 'বেগবতী'কে পাওয়া যায়। যথা—

—◡◡ —◡◡ —◡◡ — —
[দোধক— প র্ব ত | পংক্তি প | তা বিহ | ব ন্বৎ]
বেগবতী— (তব) মু ঞ্জ ন | রা ধি প | সেনাং
বে গ ব | তীং স হ | তে স ম | রেষু।
(প্রল) য়োর্মিমি | বাভি মু | খীং তাং
কঃ সক | লক্ষিতি | ভৃন্নিব | হেযু॥

—হলায়ুধ ৫।৩৪

ঠিক এইভাবেই সমবৃত্ত 'দ্রুতবিলম্বিত' হইতে প্রথম ও তৃতীয় পাদে আদ্যক্ষর বাদ দিলে অর্ধসমবৃত্ত 'হরিণপ্লুতা' উৎপন্ন হয়।

কালিদাসের রতিবিলাপের সুবিখ্যাত অর্ধসমবৃত্ত 'বিয়োগিনী'ও মূল ছন্দ নহে ; অষ্টমাত্রিক পর্বের দ্বিপর্বিক পাদযুক্ত মাত্রাছন্দ বিশেষের প্রথম ও তৃতীয় পাদে দুই মাত্রা বাদ দিলেই হয় বিয়োগিনী বা 'সুন্দরী'। যথা—

⏑⏑—⏑⏑ —⏑—⏑—
অ হ মে ত্য প | ত ঙ্গ ব র্ত্ম না
⏑⏑——⏑⏑ —⏑—⏑—
পু ন র ঙ্কা শ্র য় | নী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুর | কামিনী জনৈঃ
প্রিয় যাবন্ন বি | লোভ্যসে দিবি ॥

—কুমার সম্ভব ৪।২০

চতুষ্পদী বৃত্তছন্দের প্রতিপাদ পৃথক্‌ভাবে অলংকৃত হইলে উহাকে বলা হয় বিষমবৃত্ত। অর্ধসমবৃত্তের ন্যায় বিষমবৃত্তের উৎপত্তিও সমবৃত্তের পদে পদে অক্ষর পরিবর্তনের ফলে হইয়াছে। লৌকিক অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রতি পদে ক্রমশঃ চারিটি করিয়া অক্ষর বাড়াইবার ফলে দেখা দিয়াছে 'পদ-চতুরূর্ধ্ব' নামক বিষমবৃত্ত ছন্দ। এই পদ-চতুরূর্ধ্ব হইতে আবার 'আপীড়' নামক বিষমবৃত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। বিষমবৃত্ত ছন্দে পাদবৈচিত্র্য সাধনের আতিশয্য এবং সম্মিতি-হানি দেখা যায় ; সেইজন্য ইহাদের অধিকাংশই শ্রুতিসুখকর নহে ; ইহাদের জনপ্রিয়তাও অল্প।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে লৌকিক অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ইহাকে ভারতীয় ছন্দোমালার মধ্যমণি বলা যাইতে পারে। বৈদিকছন্দের ধ্বনিরুক্ষতা ইহার নাই, মাত্রাছন্দের বা সমবৃত্ত ছন্দের অত্যধিক কোমলতাও ইহাতে নাই, সন্ধ্যক্ষর ও হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ইহার মধ্যে যথার্থভাবে বর্তমান, পুরুষোচিত সবলতা ইহাতে পরিস্ফুট। ইহা অনতিদীর্ঘ,

অনতিহ্রস্ব, সর্ববিধ আতিশয্যহীন ও সাধারণোচিত। উপরন্তু ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ—মাত্রা বিন্যাসের কাঠিন্য ইহাতে সর্বাপেক্ষা অল্প। বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবন বর্ণনার উপযুক্ত ছন্দ এই অনুষ্টুপ্। ইহা প্রকৃত মহাকাব্যের ছন্দ। জগতের বহু ব্যাপার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপূর্ণ ও সরস নহে। এই সকল ক্ষেত্রে নৃত্যচপল মাত্রাছন্দ ও সপর্বিক পাদের সমবৃত্ত ছন্দ বর্জনীয়; কারণ নীরস বস্তুকে সরস ছন্দে প্রকাশ করিলে বর্ণনীয় বস্তু আরও তুচ্ছ হইয়া যায় এবং ছন্দোধ্বনিই কেবল পাঠকমন অধিকার করে। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ পুরাণ, ইতিহাস, মন্বাদি সংহিতা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি রচনায় সপর্বিকপদী ছন্দকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া অনুষ্টুপ্‌কেই গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু সংস্কৃত ভাষায় নহে, পালি ও জৈন প্রাকৃতেও অনুষ্টুপ্ প্রধান ছন্দ। ইহাদের দৃষ্টান্ত ঃ—

(১) অত্তনা চোদয়'ত্তানং | পটিমংসেথ অত্তনা।
অত্তা হি অত্তনো নাথো | অত্তা হি অত্তনো গতি ॥

—ধম্মপদ (পালি)

(২) ধনুং পরক্কমং কিচ্চা | জীবং চ হরিয়ং মযা।
ধিইং চ কেয়ণং কিচ্চা | সচ্চেন পলিমন্থএ ॥

—উত্তরজ্ঝয়ণ সুত্ত (জৈন প্রাকৃত)

(৩) সীহবাহুনরিন্দো সো | সীহং আদিন্নবা ইতি।
সীহলো তেন সম্বন্ধা | এতে সব্বে পি সীহলা ॥

—মহাবংস (পালি)

চতুর্দশ অধ্যায়

অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ছন্দ

ভারতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরবর্তী সাহিত্যভাষা হইতেছে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ। অর্বাচীন অপভ্রংশের নামই অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট)। ভাষাতাত্ত্বিক মতে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চারিশত বৎসর হইতেছে প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষার কাল। অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের কাল আরও প্রায় তিনশত বৎসর। আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির সর্বজ্যেষ্ঠ বাংলা আনুমানিক দশম শতাব্দীতেই প্রাচীন অপভ্রংশ হইতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ভাষাজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাত ভাষায় সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য বাংলা হিন্দী মৈথিলী আসামী জন্মের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত কৃত্রিম অবহট্‌ঠ ভাষা বঙ্গ বিহার আসামে সাহিত্য-ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত "কীর্তিলতা" অবহট্‌ঠ সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'ও বিবিধ ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে অনেকগুলি অবহট্‌ঠ কবিতা দেখা যায়।

অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—শ্রুতিবিলাসের সাধনা ও ভাষায় ধ্বনি-লালিত্য সম্পাদন। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন, বৈদিক 'গত' শব্দ প্রাকৃতে 'গদ' হইয়া অপভ্রংশে আসিয়া 'গঅ' রূপে পরিণত হইয়াছিল; সেইরূপ বৈদিক 'আকার' শব্দ প্রাকৃতে 'আগার' রূপ প্রাপ্ত হইয়া অপভ্রংশে 'আআর' মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাষায় এই প্রকার ব্যঞ্জন-বিলুপ্তি ধ্বনিগত কোমলতা সাধনেরই ফল। ছন্দের ক্ষেত্রেও যুগধর্মে দেখা দিয়াছিল কোমলতা-সম্পাদন। ছন্দে

অপভ্রংশ যুগের প্রধান দান তিনটি ; প্রথম, ছন্দ-পাদে* পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের প্রয়োগ ; দ্বিতীয়, ছন্দপাদে 'মিল' (rhyme) প্রবর্তন ; তৃতীয়, ছন্দের পাদ-সংখ্যার পরিবর্তন—চতুষ্পদী ছন্দের পরিবর্তে দ্বিপদী ও একপদী ছন্দের প্রচলন। এই তিনটিরই মূলে রয়েছে ধ্বনি-বিলাসিতা ও লালিত্যপ্রিয়তা।

প্রাকৃত বা সংস্কৃত যুগে মাত্রাছন্দের এবং অনেকগুলি বৃত্তছন্দের পর্ব ছিল চতুর্মাত্রিক,—পাদাকুলকজাত বৃত্তছন্দগুলির প্রত্যেকটির পর্ব-দৈর্ঘ্য চারিমাত্রা। প্রায় আট-নয় শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় পাঠক এই একঘেয়ে চতুর্মাত্রিক ছন্দপর্ব শুনিয়া শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় অপভ্রংশ যুগে মাত্রাছন্দে পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্ব প্রবর্তিত হয় এবং ইহারা পাঠককর্ণকে সচেতন ও সক্রিয় করিয়া তুলে। এইযুগে কেবল অপভ্রংশ ভাষায় নহে, সংস্কৃত ভাষাতেও এই সকল বিচিত্র দৈর্ঘ্যের পর্ব ব্যবহৃত হইয়া তাৎকালিক শ্রুতি-বিলাসের পরিচয় দেয়। অপভ্রংশ যুগের সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গীতগুলিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যথা—

পঞ্চমাত্রিক পর্ব—

অহহ কল | যামি বল | যাদি মণি | ভূষণম্।
হরি বিরহ | দহন বহ | নেন বহু | দূষণম্॥

---

* 'পাদ' ও 'পর্ব' হইতেছে যথাক্রমে ছন্দের 'অঙ্গ' ও 'প্রত্যঙ্গ'। যথা—

১ ২ ৩ ৪
(ক) সরস ম | সৃণ মপি | মলয়জ | পঙ্কম্।
(খ) পশ্যতি | বিষমিব | বপুষি স | শঙ্কম্॥

—ইহার (ক), (খ) হইতেছে 'পাদ' এবং ১, ২, ৩, ৪ হইতেছে পর্ব।

ষণ্মাত্রিক পর্ব—

বহতি মলয় | সমীরে
মদন মুপনি | ধায়।
ক্ষুটতি কুসুম | নিকরে বির | হি হৃদয় দল | নায় ॥

সপ্তমাত্রিক পর্ব—

মামিয়ং চলি | তা বিলোক্য বৃ | তং বধূ নিচ | য়েন।
সাপরাধত | য়া ময়াপি ন | বারিতাতি ভ | য়েন ॥

এই প্রকার ত্রিবিধ দৈর্ঘ্যের পর্ব অপভ্রংশ যুগের প্রথম দান।

অপভ্রংশ যুগের দ্বিতীয় দান ছন্দপাদে 'মিলে'র প্রবর্তন। ছন্দো-জগতে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মিল ছন্দের বাহ্য অলংকার মাত্র নহে, ইহা ধ্বনি প্রবাহগুলির ঐক্যবিধায়ক ও বেগবর্ধক, তাছাড়া গীতি-কবিতায় ভাব-প্রতিষ্ঠার সহায়কও বটে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত যুগের কবিতায় পদে পদে মিল ছিল না, সেইজন্য কবিতার চতুষ্পাদের ঐক্য যতটা মনে অনুভূত হইত, ততটা কানে অনুভূত হইত না। অপভ্রংশ যুগে ছন্দের পাদান্ত মিল প্রবর্তিত হওয়ায় চরণের দৈর্ঘ্যগত, ধ্বনিগত উভয়বিধ ঐক্যই সুস্পষ্ট হইয়াছে; মিল কান ও মনের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছে এবং কেবল ছন্দকে নহে, সমগ্র গীতি-কবিতাকেও ঐক্যাভিমুখী ও সুসঙ্গত হইতে সাহায্য করিয়াছে। তাছাড়া মিল আনিয়া দিয়াছে ছন্দপাদে দ্রুততা ও গতিবেগ। পূর্বযুগের ছন্দে বেগে চলিবার পথে যে ধ্বনিগত অমিলনের বাধা ছিল, অপভ্রংশ যুগ সেই বাধা অপসারিত করিয়া মসৃণ করিয়া দিয়াছে। এই যুগের ছন্দগুলি পাঠ করিলেই গতিবেগ অনুভূত হইবে। যথা—

(১) চতুর্মাত্রিক 'সুষমা'—

ভোহা | কবিলা | উচ্চা | হিঅলা
মঝ্ঝা | পিঅলা | ণেত্তা | জুঅলা।
রুকৃখা | বঅণা | দন্তা | বিরলা
কে সে | জিবিআ | তাকা | পিঅলা ॥

—প্রাকৃত পৈঙ্গল, বর্ণবৃত্ত ৯৭

(২) পঞ্চমাত্রিক 'কমল'—

স জঅই জ | ণন্দণা
অসুর কুল | মদ্দণা।
গরুড় বর | বাহণা
বলি ভূঅণ | চাহণা ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৭৫

(৩) ষণ্মাত্রিক 'দমণক'—

কমল ণঅণি
অমিঅ বঅণি।
তরুণি ঘরণি
মিলই সুপুণি ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৫৭

অপভ্রংশ যুগের মিল শুধু ছন্দপাদ অধিকার করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, পাদগত পর্বকেও ক্রমশঃ অধিকার করিয়াছে। পর্ব পাদাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বলিয়া অধিকতর ক্ষিপ্রগতি। মিলের বেগ-সঞ্চারের ফলে অপভ্রংশ যুগের ছন্দপর্ব শুধু চলিয়াছে নহে, ছুটিয়া চলিয়াছে। যথা—

(১) ষণ্মাত্রিক 'হীর'—

তিণ্ণি ধরহি | বেবি করহি | মত্ত পঅহি | লেক্‌খ এ
কোই জণই | দপ্প ভণই | 'হীর' সুকই | পেক্‌খএ ॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৯৯

(২) চতুর্মাত্রিক 'ত্রিভঙ্গী'—

(সির) কিজ্জিঅ | গংগং
গোরি অ | ধংগং
হণিঅ অ | ণংগং | পুর দহ | ণং।
(কিঅ) ফণি বই | হারং
তিহুঅণ | সারং
বন্দিঅ | ছারং | রিউ মহ | ণং ॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৯৫

—অন্ত্যমিল ও মধ্যমিল দ্বারা দৃষ্টান্তগুলির গীতি ও গতি দ্রষ্টব্য।

ছন্দপাদে পাদান্তিক মিল প্রবর্তনের ফল হইয়াছে সুদূর প্রসারী। মিল জিনিষটাই সম্মোহক, ইহা পাঠকের চক্ষু কর্ণকে একসঙ্গে মুগ্ধ করে এবং সমিল বস্তুগুলিকে অমিল বস্তুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। লক্ষ্য করিতে হইবে, অপভ্রংশ যুগের অনেক কবিতার চারিপাদ একই অনুপ্রাসের সমধ্বনিতে মিলিত হয় নাই, ইহাদিগকে জোড়ায় জোড়ায় মিলিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে এক মিল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে অপর এক মিল ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

(১) চতুর্মাত্রিক 'পাইত্তা'—

ফুল্লা। ণীবা। ভম ভম। রা
দিট্‌ঠা। মেহা। জল সম। রা।
ণচ্চে। বিজ্‌জু। পিঅ সহি। আ
আবে। কন্তা। কহু কহি। আ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৮১

(২) ষণ্মাত্রিক 'ধবলাংগ'—

তরুণ তরণি। তবই ধরণি। পবণ বহ খ। রা
লগ ণহি জল। বড় মরু থল। জণ জি অণ হ। রা।
দিসই চলই। হিঅঅ ডুলই। হম ইকলি ব। হু
ধর ণহি পিঅ। সুণহি পহিঅ। মণ ইছই ক। হু॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৯৩

(৩) সপ্তমাত্রিক 'সারংগিকা'—

হরিণ সরিস্‌সা। ণঅণা
কমল সরিস্‌সা। বঅণা।
জুঅ জণ চিত্তা। হরিণী
পিঅ সহি দিঠ্‌ঠা। তরুণী॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৭৯

—এই ভাবে জোড়ায় জোড়ায় পাদ-মিলনের ফলে ছন্দোরাজ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; মিলনের বন্ধনে বদ্ধ পাদদ্বয় পরস্পর পৃথক্ হইয়া গিয়াছে ; বহুকালের চতুষ্পদী ছন্দ দুইটি দ্বিপদী ছন্দোবন্ধে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পরবর্তী দেশীয় ভাষাযুগে ছন্দকে দ্বিপদী রূপেই দেখা যায়, চতুষ্পদীরূপে নহে ; তাহারই সূচনা হইয়াছে অপভ্রংশ যুগে। দেশীয় ভাষার 'পয়ার' 'চৌপাঈ' প্রভৃতি ছন্দ দ্বিপদী, চতুষ্পদী নহে।

সূক্ষ্ম বিচারে পাদান্তিক মিল দ্বিপদী ছন্দ সৃষ্টির জন্য দায়ী হইলেও চতুষ্পদীর দ্বিখণ্ডীকরণের জন্য দায়ী নহে ; কারণ মিলের কাজ কেবল মিলন সৃষ্টি, বিচ্ছেদ সৃষ্টি নহে। বিচ্ছেদ সৃষ্টির কারণ অন্য। ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে চতুষ্পদী ছন্দের পদচ্যুতি-প্রবৃত্তি প্রথম দেখা দেয় প্রাকৃত যুগে। ছন্দ-পাদের সপর্বিকতা উহার চতুষ্পদীতাকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে ; পরবর্তীকালে অপভ্রংশ যুগে পদান্তিক খণ্ডপর্ব ছন্দ-পাদেই সম্পূর্ণ ছন্দোলক্ষণ ফুটাইয়া তুলিয়া একপদী ছন্দ সৃষ্টি করে এবং একটি চতুষ্পদী ছন্দ অন্তর্বিভক্ত হইয়া চারিটি একপদী ছন্দে পরিণত হয়। পরিশেষে পদান্তিক মিল আসিয়া বিচ্ছিন্ন দুইটি একপদী ছন্দকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া 'দ্বিপদী' ছন্দোবন্ধে পরিণত করে। এইভাবে চতুষ্পদী শেষ পর্যন্ত দুইটি দ্বিপদীতে পরিণত হয়। ইহাই সংক্ষেপে ভারতীয় ছন্দের পদ-পরিবর্তনের প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস সংক্ষেপে নহে, বিশদভাবেই বোদ্ধব্য। তাই পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে।

বৈদিকযুগে ছন্দের ত্রিপদী বা চতুষ্পদী হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। এই যুগে গোটা ছন্দপাদই ছিল ছন্দের অঙ্গ (এই অঙ্গে পর্বরূপ কোন প্রত্যঙ্গ ছিল না)। অঙ্গ-বহুত্ব না থাকিলে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না,[১]

১। দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮ম সূত্র

কাজেই ছন্দ-সৃষ্টিতে পাদ-রূপ অঙ্গের একাধিকতা ছিল অপরিহার্য। তাই গায়ত্রী ত্রিপদী এবং অন্যান্য ছন্দ চতুষ্পদী হইয়াছিল। "পদ্যং চতুষ্পদী"—এই ধারণাই সেকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাকৃত যুগে এই ধারণা পরিবর্তনের কারণ ঘটে। এই সময়ে ছন্দের অঙ্গে অঙ্গে প্রত্যঙ্গ দেখা দেয় অর্থাৎ ছন্দপাদ পর্বে পর্বে অন্তর্বিভক্ত হইয়া যায়; অঙ্গ-বহুত্বের জন্য ছন্দপাদ নিজেই ছন্দো-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য ছন্দের পাদ-বহুত্বের আর প্রয়োজন থাকে না। তথাপি প্রাকৃতযুগে ছন্দ পূর্ববৎ চতুষ্পদী রূপেই প্রচলিত ছিল, তাহার একমাত্র কারণ নির্বিচার প্রথানুগত্য। প্রথাকে অস্বীকার করা ও বাস্তব সত্যকে বরণ করার সাহসিকতা দেখা দেয় অপভ্রংশ যুগে। সত্যনিষ্ঠ বাঙ্গালী কবি জয়দেব দেখাইয়া দেন—চিরকাল "পদ্যং চতুষ্পদী" বলিবার আবশ্যকতা নাই, ছন্দপাদ সপর্বিক হইলে 'পদ্যং' হয় একপদী। যথা—

(১) শ্রিত কম | লা কুচ | মণ্ডল | (ধৃত) কুণ্ডল |
কলিত ল | লিত বন | মাল।

(২) দিনমণি | মণ্ডল | মণ্ডন | (ভব) খণ্ডন | মুনিজন | মানস | হংস।

(৩) তব চর | ণে প্রণ | তা বয় | (মিতি) ভাবয় |
কুরু কুশ | লং প্রণ | তেষু।

—ইহাদের প্রতিটি পৃথক্ পৃথক্ একপদী এবং ছন্দোবিচারে প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ছন্দ।

চতুষ্পদী ছন্দের একপদী পরিণতির চরম কারণ কিন্তু পাদান্তিক খণ্ড পর্ব। পাদান্তিক খণ্ডপর্বের প্রথম ব্যবহার হয় প্রাকৃত যুগে আর্যাদি মাত্রাছন্দে, কিন্তু ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় অপভ্রংশ যুগে। নূতনত্বের মোহ বা বিলাসের জন্য খণ্ডপর্বের উৎপত্তি হয় নাই, ছন্দপাদের সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনেই ইহার প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে এই প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সপর্বিক

পাদের ছন্দ রচনায় প্রথমাবস্থায় কয়েকটি ছন্দে পূর্ণ পর্বকেই পাদান্তে বসাইয়া অন্ত্যপর্বরূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, পূর্ণপর্বে পাদ-সমাপ্তি-সূচক কোন লক্ষণ নাই। কেবল পূর্ণপর্বে গঠিত পাদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে বিন্যস্ত হইলে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু কোন কারণে যদি একাধিক পাদ এক পংক্তিতে মিলিত হয়, তাহা হইলে কাহার কোনটি অন্ত্যপর্ব ও কোথায় পাদ-সীমা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যথা—

সুমুখি তত | ত্বরিত মিত | ত্যজ শয়নং | ব্রজভবনম্

—ত্বরিতগতি (অপূর্ণ)

ইহাতে পাদ-সংখ্যা কত,—একটি, দুইটি না চারিটি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এই অসুবিধা দূর করিতেই খণ্ড পর্ব উদ্ভাবিত হয়। খণ্ডতার জন্যই খণ্ডপর্ব অসাধারণ, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাদান্তিক খণ্ডপর্বযুক্ত একাধিক ছন্দপাদ যদিও একপংক্তিতে মিলিত হয়, তথাপি খণ্ডপর্বকে খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর নহে, উহার সাহায্যে অনায়াসে পাদ-সীমা নির্ণয় হয়। যথা—

কটাক্ষ | ললিতা | তু কামি | নী | মনো হ | রতি চা | রু হাসি | নী

ইহাতে যে দুইটি ছন্দপাদ আছে, তাহা খণ্ডপর্ব "নী" স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয়।

পাদান্তিক খণ্ডপর্বের কৃতিত্ব কেবল ব্যবহারিক পাদসীমা নির্ণয়ে নহে, উহার গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব নির্দিষ্ট ছন্দপদের প্রবাহগত পূর্ণতা সাধনে। ছন্দপাদে ধ্বনিপ্রবাহের সম্পূর্ণতা পাদান্তিক পূর্ণ পর্বের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে ধ্বনি-প্রবাহ অবরুদ্ধই থাকিত, স্তিমিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইত না। ধ্বনি-তরঙ্গের স্বভাবধর্ম নিজেকে পুনরাবৃত্ত করা। এই চলিষ্ণু ধ্বনিতরঙ্গ সমদীর্ঘ পর্বাভাবে সংযত থাকে বটে, কিন্তু সমদীর্ঘ পর্ব পাইলেই সমবেগে নাচিয়া ওঠে। সেইজন্য উল্লিখিত 'ত্বরিত গতি' ছন্দের "সুমুখি তত | ত্বরিতমিত"

একটি পাদ হইলেও ধ্বনির গতি পাদান্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, পরবর্তী পাদের 'ত্যজ শয়নং' পর্বেও সমভাবে সমবেগে দেখা দিয়াছে। কাজেই "সুমুখি তত | ত্বরিত মিত"কে সমাপ্ত-গতি পাদ বলা চলে না। পাদান্তে খণ্ড পর্ব ব্যবহারের ফলেই আকাঙ্ক্ষিত গতি-সমাপ্তি বা প্রবাহ পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। দেখা যায়, খণ্ডপর্বের অসমতায় বাধা পাইয়া পূর্ণ পর্বের গতিবেগ সাধারণতঃ স্তিমিত ও সমাপ্ত হয়। যথা, পূর্বোক্ত 'চারুহাসিনী' ছন্দের চরণ—

মনোহ | রতি চা | রুহাসি | নী

এই খণ্ড পর্ব 'নী'র মধ্যেই ছন্দের ধ্বনি প্রবাহ সুসম্পূর্ণ ও লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে, পাদস্থ চলৎ পূর্ণ পর্বগুলি অন্ত্যখণ্ড পর্বের অধীনেই ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হইয়াছে; পাদান্তিক খণ্ড পর্বই ছন্দ পাদে পর্বসংহতিদাতা। ইহার অস্তিত্বের জন্যই ছন্দপাদে ধ্বনি-প্রবাহের সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এইবার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা কর্তব্য। ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে মাত্রাছন্দের আবির্ভাবে ছন্দপাদেই প্রথম ছন্দোলক্ষণ 'পর্ববত্ব' দেখা দেয়। মাত্রাসমকাদি পর্বগত সমমাত্রিকতায় ছন্দের দ্বিতীয় লক্ষণ 'পর্ব-সম্মিতি' প্রকাশ পায়, শেষে ছন্দ-পাদান্তে খণ্ডপর্বের প্রবর্তনে উহাতে তৃতীয় ও শেষ ছন্দোলক্ষণ 'পর্বসংহতি' প্রকাশিত হয়। অপভ্রংশ যুগে এইগুলির প্রতিষ্ঠা হয়; এইজন্যই অপভ্রংশ যুগের ছন্দ চতুষ্পদের অবলম্বন অনাবশ্যক মনে করিয়া একপদেই পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জয়দেবের সঙ্গীতের ধ্রুবপদগুলি সার্থক একপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত। যথা—

(১) (হরি হরি হ) তাদরতয়া | গতা সা কুপি | তেব।

(২) (সখি) সীদতি তব | বিরহে বন | মালী।

(৩) জয় জয় | দেব হ | রে ॥

এই আদর্শেই বাংলাভাষায় আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছে—

হায় রে উপমা | বিফল উপমা | যত
সকল উপমা | হারাইয়া যায় | ক্ষণিকের খেলা | ঘরে
হায় ক্ষণিকার | কবি
আঁধার নেমেছে | কৃষ্ণকলির | করুণ নয়ন | ছেয়ে
নেমেছে আঁধার | ময়না পাড়ার | মাঠে।

—সজনীকান্ত

একপদী রচনায় ছন্দোলক্ষণ পূর্ণভাবে প্রকটিত হইলেও কিন্তু অপভ্রংশ যুগ ও তৎপরবর্তী যুগে দ্বিপদী কবিতারই প্রচলন হইয়াছে সর্বাধিক ; অপভ্রংশযুগীয় শ্রুতিবিলাস ও মিল-মুগ্ধতা ইহার প্রধান কারণ। যুগল মিলন ব্যতীত মিলের সার্থকতা নাই। পাদান্তিক মিলের প্রয়োগে দুইটি ছন্দোযুক্ত চরণের মিলন সাধন ভারতীয় সৌন্দর্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে। সূক্ষ্ম বিচারে এই দ্বিপদী কবিতাগুলি হইতেছে দ্বয়ী বা দ্বিপদী ছন্দ স্তবক (stanza), কিন্তু কেবল দ্বিপদী 'ছন্দ' বলিলেও তাহাতে আপত্তি করা চলে না, কারণ দ্বিপদীতে ধ্বনি-সৌন্দর্যের আতিশয্যই ঘটিয়াছে অভাব ঘটে নাই।

যদিও অপভ্রংশ যুগের কবিতা মাত্রই প্রকৃতপক্ষে দ্বিপদী, তথাপি প্রথা রক্ষার জন্য এই যুগেও চতুষ্পদীতা 'দেখানো' হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি দ্বিপদীকে চারিপংক্তিতে সাজানো হইয়াছে। যথা—

(১) চতুর্মাত্রিক 'চউবোলা'—

রে ধনি | মত্ত ম | অং গজ | গামিণি
খঞ্জন | লো অণি | চন্দ মু | হী।
চঞ্চল | জুব্বণ | জাত ণ | জাণহি
ছইল স | মপ্পহি | কাই ণ | হী॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত, ১৩২

(২) পঞ্চমাত্রিক 'গাথা'—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্ত-রুচি | কৌমুদী
হরতি দর | তিমির মতি | ঘোরম্ ।
স্ফুরদধর | সীধবে | তব বদন | চন্দ্রমা
রোচয়তি | লোচন চ | কোরম্ ॥

—গীতগোবিন্দ ১০।২

—প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বিমাত্রিক 'হী' এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের চতুর্মাত্রিক 'ঘোরম্' ও 'কোরম্' খণ্ডপর্ব এবং চরণান্ত সূচক। আসলে দুইটি দৃষ্টান্তই দ্বিপদী মাত্র।

কখনো কখনো দুইটি দ্বিপদীকে একত্র করিয়া মিলের কৌশলে চতুষ্পদী-ভ্রান্তি উৎপন্ন করা হইয়াছে। যেমন নিম্নের দৃষ্টান্তে—

ঘর লগ্‌গই | অগ্‌গি জলই | ধহ ধহ
কই দিগ মগ | ণহ পহ অণ | লভরে।
সব দীসপ | সরি পাইক্ক | লুলঈ
ধণি থণ হর | জহণ দিআ | বকরে ॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৯০

প্রথা রক্ষার জন্য কখন কখন যথার্থ চারটি দ্বিপদীর আটটি পদকেও একটি চতুষ্পদীর অঙ্গরূপে চালানো হইয়াছে। যেমন নিম্নের দৃষ্টান্তে—

জং ণচ্চে | বিজ্‌জু
মেহং ধা | রা।
পংফুল্লা | ণীবা
সদ্দে মো | রা ॥
বাঅন্তা | মন্দা
সীআ বা | আ।
কংপন্তা | গাআ
কন্তা ণা | আ ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৮৯

—দৃষ্টান্তের প্রতি চরণের দ্বিতীয় পর্ব হইতেছে খণ্ডপর্ব ও সেইজন্য চরণান্তসূচক। এখানে আটটি খণ্ডপর্বের জন্যই পদ-সংখ্যা আট।

ছন্দে পর্ব-বৈচিত্র্য বিধান, মিল প্রবর্তন ও দ্বিপদীতা সম্পাদন ছাড়াও অপভ্রংশ যুগের উল্লেখযোগ্য অপর দান হইতেছে সাধারণতঃ ছন্দপাদের অগ্রদূত হিসাবে অতিপর্বিক (hypermetric) ধ্বনির প্রবর্তন। ইহা ছন্দপাদে খণ্ডপর্ব ব্যবহারেরই স্বাভাবিক ফল। খণ্ড পর্ব চরণান্তসূচক—ইহাতে ছন্দোধ্বনির গতিবেগের পরিসমাপ্তি ঘটে। অথচ গীতিকবিতায় গতিবেগের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এই প্রয়োজন মিটাইতেই পাদাতিরিক্ত সংযোজ্য ধ্বনি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাকেই বলা হয় অতিপর্বিক ধ্বনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা পাদ-সূচনায় প্রথম পর্বকে ধাক্কা দিয়া অতিরিক্ত গতিবেগ দান করে। খণ্ডপর্ব-যুক্ত চরণ সমাপ্ত-গতি চরণ বলিয়া সাধারণতঃ ইহাতেই অতিপর্বিক ধ্বনি সংযোজন আবশ্যক হয়। প্রাকৃত ও সংস্কৃত যুগে দ্রুতবিলম্বিত ও মধুমতী ছন্দে অতিপর্বিক ধ্বনির আকস্মিক আবির্ভাব দেখা যায়। 'তোটক'-পাদেরও প্রথম দুই অক্ষরকে অতিপর্বিক রূপে নিম্নপ্রকারে পাঠ করা চলে ঃ—

(সর) সাং স র | সাং প রি | মু চ্য ত | হৃং
(পত) তাং প ত | তাং ক কু | ভো ব হু | শঃ।

কিন্তু অপভ্রংশযুগে ইহাকে সচেতনভাবে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। অতিপর্বিক ধ্বনি অধিকাংশই দ্বিমাত্রিক এবং সাধারণতঃ ইহাদের স্থান চরণাগ্রে। যথা—[দৃষ্টান্তে ( ) বন্ধনীবদ্ধ ধ্বনিগুলি অতিপর্বিক।]

(১) চতুর্মাত্রিক 'সিংহাবলোক'—

(হণু) উজ্জর | গুজ্জর | রাঅ দ | লং।
(দল) দলিঅ চ | লিঅ মর | হট্‌ঠ ব | লং॥

(বল) মোলিঅ | মালব | রাঅ কু | লা।
(কুল) উজ্জল | কলচুলি | কণ্ণ ফু | লা ॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৮৫

(২) ষণ্মাত্রিক 'রোলা'—

(পঅ) ভরু দর মরু | ধরণি তরণি | রহ ধুল্লিঅ | ঝম্পিঅ।
(কম) ঠ পিট্‌ঠ টর | পরিঅ মেরু | মন্দর সির | কম্পিঅ ॥
(কো) হ চলিঅ 'হমি | ইর' বীর গ | অ জুহ সং | জুত্তে।
(কিঅ) উ কট্‌ঠ হা | কন্দ মুচ্ছি | মেচ্ছ হকে | পুত্তে ॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ৯২

[তৃতীয় চরণে 'হমীর' শব্দ বিশ্লিষ্ট 'হমিইর'রূপে উচ্চার্য।]

(৩) সপ্তমাত্রিক 'তোমর'—

(চলি) চুঅ কোইল | সাব।
(মহ) মাস পঞ্চম | গাব ॥
(মণ) মজ্ঝ বম্মহ | তাব।
(ণহ) কন্ত অজ্জ বি | আব ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ৮৭

(৪) সপ্তমাত্রিক 'গীতা'—

(জহ) ফুল্ল কেঅই | চারু চম্পঅ | চুঅ মঞ্জরি | বঞ্জুলা।
(সব) দীস দীসই | কেসু কাণণ | পাণ বাউল | ভম্মরা ॥
(বহ) পোম্ম গন্ধবি | বন্ধু বন্ধুর | মন্দ মন্দ স | মীরণা ॥
(ণিঅ) কেলি কোতুক | লাস লংগিম | লগ্‌গিআ তরু | ণী জণা ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৯৭

অসমদীর্ঘপাদের ছন্দই অতিপর্বিক ধ্বনির বিশেষ ক্ষেত্র। বহুপর্বিক দীর্ঘ চরণের সহিত যেখানে একপর্বিক বা দ্বিপর্বিক চরণের স্তবক বন্ধন

হইয়াছে, সেখানে প্রায়ই হ্রস্বচরণে অতিপর্বিক ধ্বনি যোগ করিয়া গতিবেগের সমতা রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। যথা—

চতুর্মাত্রিক 'দ্বিতীয় ত্রিভঙ্গী'—

(i) জঅই জ | অই হর
বলইঅ | বিসহর
তিলইঅ | সুন্দর | চন্দ।
মুণি আ | নন্দ
(জণ) কন্দ ॥

(ii) জঅই জ | অই হরি
ভুঅ জুঅ | ধরু গিরি
দহমুহ | কংস বি | ণাসা।
(পিঅ) বাসা
সুন্দর | হাসা ॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত, ২১৫

অসমদীর্ঘপাদের কয়েকটি ছন্দোবন্ধে অতিপর্বিক ধ্বনিকে পূর্বপাদান্তিক খণ্ডপর্বের পরিপূরকরূপে দেখা যায়। এইসকল অতিপর্বিক ধ্বনিতে পূর্বপাদান্তিক খণ্ডপর্বের সহিত একত্র হইবার প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে। ফলে একটি সংক্ষুব্ধ ধ্বনি কল্লোল সৃষ্টি হয়। যথা, (মোটা হরফের খণ্ডপর্ব ও অতিপর্ব দ্রষ্টব্য)—

(১) চতুর্মাত্রিক 'মঅণহরা'—

(**জিণি**) কংস বি | ণাসিঅ কিত্তি প | আসিঅ
মুট্‌ঠি অ | রিট্‌ঠি বি | ণাস ক | **রে**
(**গিরি**) হথ ধ | রে
(**জম**) লজ্জুণ | ভঞ্জিঅ পঅভর | গঞ্জিঅ
কালিঅ | কুল সং | হার ক | **রে**
(**জস**) ভুঅণ ভ | রে ॥

—প্রা-পৈ মাত্রাবৃত্ত, ২০৭

(২) চতুর্মাত্রিক **'ভ্রমরাবলী'**—

(তুঅ) দেব তু | রিত্ত গ | ণা হর | **ণা** ।
(**চর**) ণা ॥
(জই) পাবউ | চন্দ ক | লা ভর | **ণা**
(**সর**) ণা ॥
(পরি) পূজউ | তেজ্জি অ | লোভ ম | **ণা** ।
(**ভব**) ণা ॥
(সুথ) দেমহ | সোক বি | ণাস ম | **ণা** ।
(**সম**) ণা ॥

—প্রা-পৈ বর্ণবৃত্ত ১৫৫

দুই দুই চরণে বিচ্ছিন্ন মোটা হরফগুলির একত্র (১) 'রে গিরি', 'রে জস' (২) 'ণা চর', 'ণা সর' প্রভৃতি পরিণতিতে পূর্ণপর্বত্ব দ্রষ্টব্য।

চরণ'মধ্যে' অতিপর্বিক ধ্বনির ব্যবহার অপভ্রংশ ছন্দে দৈবাৎ দেখা যায়। একমাত্রিক অতিপর্বও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব একটি গানে চরণমধ্যে অতিপর্ব ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

শ্রিত কম | লা কুচ | মণ্ডল (ধৃত) কুণ্ডল
কলিত ল | লিত বন | মাল।

নিম্নোদ্ধৃত চতুর্মাত্রিক 'নীল' ছন্দে কেবল যে চরণমধ্যে অতিপর্বিক ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, এই অতিপর্বিক ধ্বনি 'একমাত্রিক' এবং একাধিকবার ব্যবহৃত; এই দিক দিয়া ছন্দটি বিশিষ্ট। যথা—

সজ্জিঅ | জোহ (বি) বঠ্ঠিঅ | কোহ
(চ) লাউ ধ | ণু।
পক্খর | বাহ (চ) লু রণ | ণাহ
(ফু) রন্ত ত | ণু॥

পত্তি চ | লন্ত (ক) রে ধরি | কুন্ত
(সু) খগ্‌গ ক | রা।
কন্ন ণ | রেন্দ (সু) সজ্জিঅ | বিন্দ
(চ) লন্তি ধ | রা॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১৭১

এই ছন্দের চরণে দুইবার অতিপর্বের প্রয়োগে ধ্বনিপ্রবাহে চমৎকার নূতন ধ্বনিবিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। পরবর্তী কালে কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার বাংলায় এই প্রকার যুগ্ম অতিপর্ব ছন্দপাদে প্রচলিত করিয়াছেন। যথা—

ফেনিল লহরী | দলে যায় (বায়ু) চলে যায়
(যেথা) মন যায়।
শীতল অতল | পারাবার (পেয়ে) সাড়া তার
(ডাকে) ঝঞ্ঝায়॥

এই সকল পাদমধ্যবর্তী অতিপর্ব পূর্ববর্তী খণ্ডপর্বের পরিপূরক বলিয়াই অধিকতর শ্রুতিসুখকর হইয়াছে।

অবহট্‌ঠ অপভ্রংশেরই অর্বাচীন রূপ মাত্র। কাজেই অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্যগুলি যে অবহট্‌ঠেও দেখা যাইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। অপভ্রংশ ছন্দের ন্যায় অবহট্‌ঠ ছন্দেও ছন্দপাদে সপর্বিকতা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাদান্ত মিল বর্তমান। বিশিষ্ট অবহট্‌ঠ ছন্দ প্রধানতঃ তিনটি—(১) 'গাহা' অর্থাৎ আর্যা, (২) 'দোহা' বা 'দোহড়িকা',* এবং (৩) 'পাদাকুলক'। অবহট্‌ঠ ভাষায় ইহাদের উদাহরণ—

* দোহা লক্ষণ :— তেরহ মত্তা পঢম পঅ, পুণু এগারহ দেহ।
পুণু তেরহ এগারহহি, দোহা লক্‌খণ এহ॥

—প্রা-পৈ, ৭৮

অর্থাৎ ১ম ও ৩য় পাদে ১৩ মাত্রা এবং ২য় ও ৪র্থ পাদে ১১ মাত্রা।

গাহা—

জই অং | থি ণঈ | গঙ্গা
তিয়লো | এ ণিচ্ | চ পয়ড়ি | য় পহা | বা।
বচ্চই | সায়র | সম্মু-
'হ'ত্তো | সে সস | রী মা | বচ্চন্ | তু ॥

—সংণেহয় রাসউ (অদ্দহমান)

[চতুর্থ চরণের স্থচনায় 'হ' দীর্ঘভাবে পাঠ্য।]

দোহা—

দিঅহা | জন্তি ঝ | ড়প্ পড়া | হিঁ
পড়হিঁ ম | ণোরথ | পচ্ছি।
জং অচ্ | ছই তং | মাণিঅ | ই
হোসই | করতু ম | অচ্ছি ॥

—হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ

[প্রথম পাদের তৃতীয় পর্বের 'ড়া' হ্রস্বভাবে উচ্চার্য।]

পাদাকুলক—

সক্কয় | বাণী | বুহঅণ | ভাবই
পাউঅ | রস কো | মম্মণ | পাবই।
দেশিল | বয়ণা | সবজণ | মিট্‌ঠা
তেঁ তৈ | সন জম্ | পওঁ অব | হট্‌ঠা ॥

—বিদ্যাপতির কীর্তিলতা

[চতুর্থ পাদের তৃতীয় পর্বের 'ওঁ' হ্রস্বভাবে পাঠ্য।]

অপভ্রংশ যুগে ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দীর্ঘ স্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি। বর্ণমালার 'আ, ঈ, ঊ, এ, ও' কে টানিয়া টানিয়া দুই মাত্রায় উচ্চারণ করা প্রাচীন প্রথা; কিন্তু অপভ্রংশ যুগে স্বাভাবিক উচ্চারণে এইগুলি হ্রস্ব বা একমাত্রিক হইয়া যায়। ভারতীয়েরা সহজে প্রথা পরিবর্তন চাহে না। সেইজন্য অপভ্রংশ ছন্দেও দীর্ঘ স্বরবর্ণে প্রাচীন দীর্ঘ উচ্চারণ অব্যাহত রাখার আপ্রাণ

চেষ্টা হইয়াছে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবিগণ কৃত্রিম দীর্ঘ উচ্চারণের মধ্যে মধ্যে অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অবহট্‌ঠ রচনায় তো বটেই, অপভ্রংশ রচনাতেও দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ দেখা যায়। ছন্দ বজায় রাখিয়া পড়িতে হইলে এই সকল দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ অপরিহার্য। যথা—

(১) চিত্ত ম | ণোভব | সর হণ | ই
দূর দি | গন্তর | কন্ত।
কিম পরি | অপ্‌পউ | বারিহ | উ
'এ'ম পরি | পলিঅ হু | রন্ত॥

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১৩৫

(২) পণ্ডব | বংসহি | জম্ম ধ | রীজে
সংপঅ | অজ্জিঅ | ধম্মক | দিজ্জে।
সোউ জু | হুঠ্‌ঠির | সংকট | পাবা
দেবক | লিক্‌খিঅ | কেন 'মে' | টাবা॥

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ১০১

[দৃষ্টান্ত দুইটির চতুর্থ চরণে 'এম' ও 'মে' শব্দে 'এ'-কারের হ্রস্ব উচ্চারণ দ্রষ্টব্য। অবশ্য 'কেন মে' পর্বের দুইটি এ-কারের একটি হ্রস্ব]

এই কারণেই 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'কার না বলিয়া পারেন নাই—

জই দীহো বিঅ বণ্ণো
লহু জীহা পঢ়ই হোই সো বি লহু।

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ৮

(যদি দীর্ঘ বর্ণও লঘু-জিহ্বায় পঠিত হয়, তাহা হইলে সেও লঘু অর্থাৎ হ্রস্ব।)

—প্রাকৃত পৈঙ্গলকারের এই নির্দেশ চূড়ান্ত বিপ্লবসূচক ও যুগান্ত-নির্দেশক। এই নির্দেশ স্পষ্ট দেখাইয়া দেয়—'আ, ঈ, ঊ, এ, ও' বর্ণগুলির বিশ্লিষ্ট দীর্ঘ উচ্চারণ জাতীয় কণ্ঠে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং উহাদের একমাত্রিক হ্রস্ব উচ্চারণই সমাজে কেবল প্রচলিত নহে,

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্বাভাবিক উচ্চারণকে সেইজন্য ছন্দশাস্ত্রে অস্বীকার করা চলে না। আশ্চর্যের বিষয়, অপভ্রংশ যুগে বজ্রকঠিন সংস্কৃত রচনাতেও মধ্যে মধ্যে এই বিপ্লবাত্মক স্বাভাবিকতা—অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণ—দেখা দিয়াছে। যথা, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'—

(১) সজল ন | লি'**নী**' দল | শীলিত | শয়নে
হরিমব | লোকয় | সফলয় | নয়নে ॥ —৯ম সর্গ

[—এখানে 'নলিনী' শব্দের 'নী' হ্রস্ব 'নি'রূপে উচ্চারিত।]

(২) অনিল ত | রল কুব | লয় নয় | নেন
তপতি ন | সা কিশ | লয় শয় | নেন
সখি যা | রমিতা | বন '**মা**'লি | না ॥ ধ্রু ॥
—৭ম সর্গ

[—এখানে তৃতীয় পাদের 'বনমালিনা' শব্দের 'মা' দীর্ঘ নহে, হ্রস্ব। এইসকল ক্ষেত্রে কেহ কেহ ছন্দপতন ঘটাইয়াও সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ অব্যাহত রাখেন, কিন্তু ভাষা ও ছন্দের বিরোধে ছন্দই রক্ষণীয়; বৈদিক ছন্দের 'ইয়াদি পূরণঃ' সূত্রে ছন্দোরক্ষার্থে ভাষার বিকৃতি সাধনকেই কর্তব্য বলা হইয়াছে।*]

অপরিবর্তনীয় সংস্কৃত ভাষায় একপদী ছন্দ প্রবর্তনে জয়দেবীয় সাহসিকতা স্মরণ করিলে এইপ্রকার হ্রস্ব উচ্চারণ প্রচলনকে আর দুঃসাহস বলিয়া মনে হইবে না।

---

* বর্তমান গ্রন্থের ৯ ও ২৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলা বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের জন্ম

ক্রম-বিবর্তনের ধারায় আর্যভাষাগোত্রীয় প্রাকৃত ভাষা ক্রমশঃ অপভ্রংশ রূপ গ্রহণ করিয়া পরিশেষে হিন্দী বাংলা মৈথিলী গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় পরিণত হয়। সেই ক্রমগতি সূত্রে প্রাকৃতজ মাত্রাছন্দ অপভ্রংশ হইতে আসিয়া হিন্দী মৈথিলী প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মাত্রাছন্দোজ 'দোহা' এবং 'চৌপাঈ' হইয়া উঠে হিন্দী প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমা ভাষার প্রধান ছন্দ। প্রাকৃত মাত্রাছন্দের এইপ্রকার ক্রমিক প্রবাহ কিন্তু পূর্বভারতীয় বাংলা অসমীয়া ওড়িয়া ভাষায় অব্যাহত থাকে নাই ; এখানে ছন্দোধারা হইয়াছে বিচ্ছিন্ন। নবজাত বাংলা অসমীয়া ওড়িয়া নিজেদের জন্য নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন চর্যাপদে ও ব্রজবুলিপদে মাত্রাছন্দোজ কয়েকটি পুরাতন ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, এইগুলির ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা নহে। চর্যাপদ ও ব্রজবুলিপদের ভাষা অবহট্‌ঠ-মিশ্রিত। বিশুদ্ধ বাংলা রচনার সূচনা হইতেই প্রাচীন ছন্দের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে—পয়ার, লাচাড়ি (ত্রিপদী) ও ধামালী* প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত নূতন ছন্দ।

---

* 'পয়ার' নামের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' গ্রন্থে (১৫ শতক)—

ভাগবত অর্থ যত 'পয়ারে' বান্ধিয়া
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ॥

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এ-গুলি পদ্যছন্দই বটে ; ইহাদের চরণ সপর্বিক এবং দুই দুই চরণে চরণান্তিক মিল বর্তমান। তবে এ-গুলি কীজাতীয় ছন্দ, কোন মানদণ্ডে গণনীয় ও কোথা হইতে উৎপন্ন, তাহা পণ্ডিতী বিতণ্ডার বিষয়। পণ্ডিতদের কেহ কেহ মনে করেন—পয়ার ও লাচাড়ি অক্ষর-ছন্দ, ইহাদের মূল বৈদিক অনুষ্টুপ্ ছন্দে। কেহ বলেন—ইহারা বৃত্তছন্দ, উৎস 'বসন্ত তিলক'। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন —ইহারা মাত্রাছন্দ 'পাদাকুলক' হইতে উৎপন্ন। কাহারও ধারণা —পয়ারের মূল তামিল ছন্দ 'পারনী' এবং লাচাড়ির মূল 'অলবড়ি'। কাহারও কাহারও মতে, ফারসী 'বয়েৎ' হইতে পয়ারের জন্ম। কবি আলাওল (১৭ শতক) লিখিয়াছেন—

তে কারণে সভা আগে করি অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া 'বয়েৎ' ছন্দ রচিতে পয়ার ॥

সেখ সাদীর 'পন্দ্ নামা' হইতে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে' এই 'বয়েৎ' ছন্দের নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

করীমা ববখ্সায় বর্হাল্মা।
কে হাস্তেম্ আসিরে কমন্দে হাওয়া ॥

'লাচাড়ি' শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' (১৫ শতক)—

মৃদঙ্গ হানিয়া ঘায় মনসা মধুর গায়
বসন্তে কোকিল গায় সারি।
শুনিয়া মধুর গীত অস্থির চান্দর চিত
বিজয় গুপ্ত রচিল 'লাচাড়ি' ॥

'ধামালী' নামের আদি ব্যবহার দেখা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' (১৫ শতক)—

'ধামালী' বুলিতে কাহ্নে না দিহলি আস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥

পয়ারাদি নূতন ছন্দগুলির জন্মবৃত্তান্ত আসলে বঙ্গীয়। অবশ্য পয়ার ও ত্রিপদী কেবল বাংলা সাহিত্যের নহে, অসমীয়া ও ওড়িয়া সাহিত্যেরও প্রধান ছন্দ। তথাপি পয়ারাদি নূতন ছন্দের জন্মেতিহাস জানিতে হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতেই জানিতে হইবে। কারণ, প্রথমতঃ পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত যে সকল বিভিন্ন ভাষার পুথি এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাংলা ভাষার পুথিগুলিই যথার্থ সুপ্রাচীন। দ্বিতীয়তঃ অসমীয়া ও ওড়িয়া পুথি শুধু অর্বাচীন নহে, ইহাদের পয়ার ও ত্রিপদী সুমার্জিত অর্থাৎ সুপরিণত এবং সেইজন্যই ঐতিহাসিক আলোচনার অযোগ্য। যথা, অসমীয়া পয়ার—

> দুধ' পিউ দুধ' পিউ বোলোরে যশোবা।
> দুধ' না খাঞা গোপাল' কান্দে ওবাঁ ওবাঁ॥
>
> —ছন্দ সরস্বতী (সত্যেন্দ্রনাথ)

ওড়িয়া পয়ার—

> নির্মল' দৃষ্টিরে নাথ' মোতে ন চাহছ'।
> বেণি ভুজে আলিঙ্গন' কিম্পা ন করুছ'॥
>
> —ছন্দ সরস্বতী (সত্যেন্দ্রনাথ)

[ইলেক (') চিহ্নিত শব্দ অকারান্তরূপে উচ্চার্য।]

অপর পক্ষে প্রাচীন বাংলা পয়ারাদি ছন্দ আদিম, অপরিণত, অমার্জিত এবং ঐতিহাসিক আলোচনার পক্ষে বেশী নির্ভরযোগ্য। ইহাদের দুর্বোধ্যতার জন্যই পণ্ডিতেরা বাংলা ছন্দে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান নাই। সেই কারণে পয়ারাদি ছন্দের স্বরূপ ও উৎপত্তি বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখা দিয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়—"পূর্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। আমরা বাংলা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না।···হস্তলিখিত পুথি যত প্রাচীন, যতি ও

অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক।"[১] তবে প্রাচীন বাংলা কাব্যে পয়ারাদি ছন্দের আদর্শরূপ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে।

অপভ্রংশ যুগীয় ছন্দগুলির পরে যে সকল ছন্দকে নূতন বলা হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি ছয়টি—(১) পয়ার, (২) দীর্ঘ ত্রিপদী, (৩) দিগক্ষরা, (৪) লঘুত্রিপদী, (৫) লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী এবং (৬) একাবলী। এখন পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলার প্রমাণিক প্রাচীনতম কাব্য হইতেছে পঞ্চদশ শতকে রচিত বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যেও উল্লিখিত ছয় প্রকার ছন্দের আদর্শ রূপের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

[শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অকারান্ত ভাবে উচ্চার্য শব্দগুলি ইলেক (') চিহ্নিত হইল। বাংলায় দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলি হ্রস্বভাবে উচ্চার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ২য় সংস্করণ হইতে নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি গৃহীত হইল।]

১। পয়ার (চরণের গঠন দ্বিপর্বিক, ৮+৬ অক্ষর)—

কমল' বদনী রাধা | হরিণ' নয়নী।
আনত' কপাল' তার' | আধ' শশি জিনী॥

—পৃঃ ১৫, তাম্বুলখণ্ড,

২। দীর্ঘ ত্রিপদী* (চরণ ত্রিপর্বিক, ৮+৮+১০ অক্ষর)—

শুন' ল' সুন্দরি রাধা | পস্থত' কৈলোঁ বিরোধা | তোক' বৈরী আবাল' গোপালে।
মোএঁ গদা হাথে ধরোঁ | আজি দাপ' চুর' করো | দেহ দান' নাকর' কচালে॥

—পৃঃ ৩৯, দানখণ্ড.

১। পৃঃ ৪০-৪১, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

* ঊনবিংশ শতকের আলংকারিক পণ্ডিতেরা অত্যন্ত শিথিলভাবে 'পদ' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনার বাধা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ ত্রিপদীর ত্রি-পদ 'পর্ব' অর্থে ব্যবহৃত, লঘু ত্রিপদীর তৃতীয় পদ 'পর্ব-গুচ্ছ' অর্থে ব্যবহৃত, চতুর্দশপদী কবিতার চৌদ্দটি পদ 'চরণ',

৩। দিগক্ষরা (চরণ একপর্বিক, ১০ অক্ষর)—

চাহ' মোরে আড়' করি দীঠে।
কোন' দোষে দিআঁ যাহ' পীঠে॥

—পৃঃ ৩৯, দানখণ্ড

৪। লঘুত্রিপদী (চরণ চতুষ্পর্বিক, ৬+৬+৬+১ অথবা ৬+৬+৬ +২ অক্ষর)—

(ক) যত আলঙ্কার' | বহুমূল' সার' | সব' রাধা মোর' | নে।
সুবর্ণে জড়িত | হিরাএ' রচিত | বাঁশী গুটি মোরে | দে॥

—পৃঃ ১৪৭, বংশীখণ্ড

(খ) প্রথম' যৌবন' | মুদিত ভাণ্ডার' | তাত না সম্বাএ | চুরী।
আহ্মার' যৌবন' | কাল' ভুজঙ্গম' | ছুঁইলে খাইলে | মরী॥

—পৃঃ ৪৫, দানখণ্ড,

৫। লঘুভঙ্গ ত্রিপদী (ভঙ্গ অর্থে পূর্ণপর্বের সংখ্যার অসমতার জন্য অসমপদী), ইহা দুইচরণ বা তিন চরণের ছন্দ—

(ক) দ্বিপাদ— তেজ' ভয় মান' | রাগে।
গএ গদাধর' | প্রেয়াগে মাধব' | তোকে আলিঙ্গন' | মাঙ্গে॥

—পৃঃ ১৯, দানখণ্ড

(খ) ত্রিপাদ— না বুঝেঁ রঙ্গ ধা | মালী।
না জানো সুরতী | কেলী॥
বাহুড়িয়া চল' | নিষধ' সে বন | মালী॥

—পৃঃ ১০, ঐ

৬। একাবলী (চরণ দ্বিপর্বিক, ৬+৫ অক্ষর)—

নাচএ নারদ' | ভেকের' গতী।
বিকৃত বদন' | উমত' মতী॥

—পৃঃ ১, জন্মখণ্ড

অর্থে ব্যবহৃত, পদাবলীর পদ 'কবিতা'-অর্থে ব্যবহৃত। ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি শব্দ সেই জন্য কেবল নাম হিসাবেই গ্রহণীয়। ছন্দোগ্রন্থে কেবল 'চরণ' (পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহ) অর্থেই 'পদ' বা 'পাদ' শব্দ ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে কেবল 'চতুর্দশপদী' নামটি সার্থক।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হইতে গৃহীত উপরিউদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি দীনেশচন্দ্র কথিত উচ্ছৃঙ্খলতার নহে, শৃঙ্খলারই দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ছন্দ অক্ষরবৃত্তই বটে এবং কবিও যথার্থ ছন্দোবিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রকার গঠনের আদর্শ চরণের সংখ্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে অতি অল্প, আঙ্গুলে গোনা যায়। অধিকাংশ চরণই অক্ষরবৃত্তের আদর্শবিচ্যুত ও অনিয়মিত ; অধিকাংশ-কেই পয়ার প্রভৃতি বলিতে সংশয় হয়। মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত দুই একটি আদর্শ চরণ বাদ দিলে মনে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ছন্দ নাই, আছে পদে পদে ছন্দ-পতন। সাধারণ চরণগুলির পর্বে পর্বে না আছে মাত্রা-সাম্য, না আছে অক্ষর-সাম্য। এই জন্য দীনেশচন্দ্রের অভিযোগ আপত্তিকর বলিয়া মনে হয় না। যথা—

১। পয়ার (চরণাদর্শ ৮ + ৬ অক্ষর)—

রাধাএ বুলিল' কাহ্ন' | ঝাট' বাহি যা ... ৮ + ৫ অক্ষর
ঢেউ দেখি মোর' | হালে সব' গা ॥ ... ৬ + ৫ „
... ...
আলিঙ্গন' পাইল' কাহ্নাঞি | রাধার' তরাসে। ... ১০ + ৬ „
বাসলী শিরে বন্দী | গাইল' চণ্ডীদাসে ॥ ... ৭ + ৭ „

—পৃঃ ৭৪, নৌকাখণ্ড

২। দীর্ঘত্রিপদী (চরণাদর্শ ৮ + ৮ + ১০ অক্ষর)

হংস রহে সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে
কুম্বিলী সে নন্দন' বনে। ... ৮ + ৬ + ৯ অক্ষর
একেঁ একেঁ সখিজন' সঙ্ধাক' বোলাইলোঁ
না পাইলোঁ তোহ্মার' বচনে ॥ ... ৮ + ৭ + ১০ „

—পৃঃ ৩৫, দানখণ্ড

৩। দিগক্ষরা (চরণাদর্শ ১০ অক্ষর)—

মাহাপুট নাশা দণ্ডহীনে। ... ১০ অক্ষর
উন্নত গণ্ড কপোল' খীনে ॥ ... ১০ „

কাঠী সম বাহু যুগলে। ... ৯ অক্ষর
নাভিমূলে দুঈ কুচ ঝুলে॥ ... ১০ „

—পৃঃ ৪, জন্মখণ্ড

৪। লঘুত্রিপদী (চরণাদর্শ ৬+৬+৬+২ অক্ষর)—

ওলাহা রাধা | মাথার' চুপড়ী | দেখোঁ মো তোহ্মার' প | সারা।

৫+৬+৭+২ অক্ষর

কোণ বধু লআঁ | জাহা মথুরা | তাহার' দেহ বি | চারা॥

৬+৫+৬+২ „

—পৃঃ ১৭, দানখণ্ড

৫। লঘুভঙ্গ ত্রিপদী (অসম পদী, পূর্ণ পর্ব ৬, অন্ত্যপর্ব ২ অক্ষর)—

ক্ষেমা কর' কাহ্ন' | মনে ... ৬+২ অক্ষর
ধরুক' মোর' ব | চনে ... ৬+২ „
যবে না মরিবে | রাধা রস' নির | কারণে॥ ... ৬+৬+৩ „

—পৃঃ ১০, তাম্বুল খণ্ড

৬। একাবলী (চরণাদর্শ ৬+৫ অক্ষর)—

মিলে ঘন' ঘন' | জীহের' আগ'। ... ৬+৫ অক্ষর
রাম্ভ কাঢ়ে যেন' | বোকা ছাগ'॥ ... ৬+৪ „
দেখি আঁ কংসেত' | উপজিল' হাস। ... ৬+৬ „
বাসলী বন্দী | গাইল' চণ্ডীদাস॥ ... ৫+৭ „

—পৃঃ ২, জন্মখণ্ড

কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নহে, এইরূপ অনিয়মিত রচনা কয়েকটি প্রাচীন বাংলা কাব্যে প্রায় সর্বত্র। কাজেই এ-কালের পাঠকেরা যে প্রাচীন বাংলা কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষণ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কথা নাই। অনেকেরই ধারণা—প্রাচীন বাঙ্গালীদের ছন্দোবোধ ছিল না, ছন্দের শৃঙ্খলা আধুনিক। প্রাচীন রচনা-শৈথিল্যে

বিরক্ত হইয়া কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন—"কান মলিয়া দিলেও যদি কাহারও ছন্দোবোধ জন্মিত তবে এ জাতির কান ছিঁড়িয়া যাইত, তথাপি ছন্দোবোধ জন্মিত না।...বাঙালীর ছন্দোবোধ জন্মিয়াছে রবীন্দ্রযুগে।"[১]

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ সম্বন্ধে মোহিতলালের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। এ-কথা অবশ্য সত্য, কবির ছন্দোমূর্খতা হইতে জাতির দুরবস্থা বুঝা যায়; জাতি ছন্দোবোধহীন না হইলে ছন্দোদুষ্ট কাব্য সমাজে চলিতে পারে না। তবে যেহেতু কয়েকজন পণ্ডিত প্রাচীন বাংলা কবিতায় শৃঙ্খলা বুঝিতে পারেন নাই, সেইহেতু সমগ্র জাতির ছন্দশ্রুতি ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেই শ্রুতির বিকাশ হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন যৌক্তিকতা নাই। যে-জাতি প্রাচীনকালে জয়দেব-গোবিন্দদাস-শশিশেখরের কবিতার জয়ধ্বনি করিয়াছে, সে-জাতির ছন্দোবোধ সুপ্রমাণিত। পণ্ডিতেরা প্রাচীন বাংলা কবিতার, বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে যে বুঝিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এ-ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ নূতন। পুরাতন ছন্দপাঠের সংস্কার লইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নূতন প্রকৃতির ছন্দপাঠ করিলে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিবেই। আসলে যে ছন্দকে ভিত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা পয়ারাদি ছন্দ বা অক্ষরবৃত্ত নহে; তাহা হইতেছে—পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত দিয়া উচ্চার্য এক নবজাতীয় ছন্দ; তবে ইহার কোন কোন চরণে অক্ষরবৃত্ত-ভ্রান্তি হয়। ইহার আধুনিক নাম 'বলবৃত্ত' এবং প্রাচীন নাম 'ধামালী'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে অন্য কোন জাতীয় না বলিয়া বলবৃত্ত-জাতীয় বলিবার কারণ আছে। যেমন তরোয়ালের খাপের মধ্যে

১। পৃঃ ৬ বাংলা কবিতার ছন্দ (১ম সং)

তরোয়াল ছাড়া খাঁড়া, বন্দুক প্রভৃতি অন্য কোন অস্ত্র প্রবেশ করানো যায় না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমগ্র কবিতাকে একমাত্র বলবৃত্ত ছন্দের ছাঁচেই ফেলা যায়, অন্য কোন ছন্দের ছাঁচে খাপ খাওয়ানো যায় না। পরবর্তী পরীক্ষা হইতে এ কথা প্রমাণিত হইবে।

পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে বলবৃত্ত বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, তাহারও অবশ্য কারণ বর্তমান। স্বাভাবিক অবস্থায় খনিজ স্বর্ণ অন্যান্য ধাতু প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ছন্দের দশা সেই প্রকার। ইহাতে ছন্দ অপরিস্ফুট ও প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন বস্তুকে চিনিতে না পারাই স্বাভাবিক। ইহার জন্য পণ্ডিতদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। দুর্বোধ্যতাই পণ্ডিতী বিতণ্ডার কারণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুর্বোধ্য ছন্দের রহস্যভেদ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ব্যবহৃত একটি অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। শব্দটি হইতেছে—'ধামালী'। ধামালীর অর্থ 'দামাল' বা বা দুরন্ত ছেলের 'দুরন্তপনা'। যথা—

আহ্মে সুখমতী নারী আঠ' কপালী।
আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের' ধামালী॥

—পৃঃ ৪৪, দানখণ্ড

পঞ্চদশ শতকে বঙ্গদেশে কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য বিষয়ক এক শ্রেণীর জনকাব্য প্রচলিত ছিল; এ-গুলিকে বলা হইত 'ধামালী কাব্য'। দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে 'ধামালী-কাব্য'ই বলিয়াছেন।[১] ধামালী-

১। "আসল ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইয়া থাকে। তাহা এত অশ্রাব্য যে গ্রামের ভিতরে তাহা গাহিবার প্রথা নাই।......কিন্তু শুভ্রা ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধুভাষায় প্রবর্তিত করিয়া কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছেন।"

—পৃঃ ২০২-৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং)

কাব্যের ছন্দ ধামালী ছন্দ নামেই পরিচিত হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। পঞ্চদশ শতকের পরে ষোড়শ শতকে আবার এই ধামালী নামে অভিহিত হয় বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের কবিতা। লোচন দাসের পদাবলীতে অবশ্য কাহারও কোন প্রকার ধামালী বা দুরন্তপনা নাই, 'নদীয়া-নাগরী'র গৌর-প্রেমই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে; তথাপি লোচন-পদাবলীকে বলা হইয়া থাকে—লোচন দাসের ধামালী। যে কবিতার বিষয় ধামালী নহে, তাহাকে ধামালী বলা হয় কেন—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। আসলে ছন্দের নামেই এখানে কাব্যের নাম হইয়াছে। ধামালীকাব্যে ব্যবহৃত বিশিষ্ট ছন্দেই লোচন-পদাবলী রচিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে লোচনদাসের ধামালী, ইহাই ব্যাখ্যা। লোচন-ধামালীর দৃষ্টান্ত :—

[ষোড়শ শতক হইতে বাংলা ভাষায় অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ স্থায়িভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। লোচন ধামালীতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। ইহাতে অধিকাংশ অ-কারান্ত শব্দ হসন্তভাবে রচিত।]

(১) আর্ শুন্যাছ' | আলো সই | গোরা ভাবের্ | কথা।
কোণের্ ভিতর্ | কুলবধু | কান্দ্যা আকুল্ | তথা ॥
হল্‌দি বাঁ | টিতে গোরী | বসিল য | তনে।
হল্‌দি বরণ্ | গোরা চান্দ্ | পড়ি গেল | মনে ॥
কিসের্ রান্ধন্ | কিসের্ বাড়ন্ | কিসের্ হল্‌দি | বাঁটা।
আঁখির্ জলে | বুক্ ভিজিল | ভাস্যা গেল | পাটা ॥

(২) এমন্ কেউ ব্য | থিত থাকে   কথার্ ছলে | মানিক্ রাখে
নয়ান্ ভরি | দেখি রূপ | খানি।
লোচন্ দাসে | বলে কেনে   নয়ান্ দিলি | উহার্ পানে
কুল্ মজালি | আপনা আ | পনি ॥

(৩) চাই্‌লে নয়ান্ | বান্ধা রবে | মন্ চোরা তার্ | রূপ্।
হাস্য বয়ান্ | রাঙ্গা নয়ান্ | এই না রসের্ | কূপ ॥
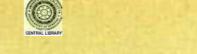
চাইলে মেনে | মর্‌বি ক্ষেপি | কুল্‌ সে রবে | নাই।
কুল্‌শীল্‌ তোর্‌ | রাখ্‌বি যদি | থাক্‌ না বিরল্‌ | ঠাঁই॥
কুল্‌ খোয়াবি | বাউ্‌রি হবি | লাগ্‌বে রসের্‌ | ঢেউ।
লোচন্‌ বলে | রসিক্‌ হলে | বুঝ্‌তে পারে | কেউ॥

দৃষ্টান্তগুলির পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত সুস্পষ্ট, সেইজন্য ইহাদের ছন্দ বলবৃত্ত। ইহারই প্রাচীন নাম ধামালী ছন্দ (অর্থাৎ ধামালী কাব্যের ছন্দ)। প্রাচীন ধামালী-কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত 'দুর্বোধ্য' ছন্দ তাই বলবৃত্ত জাতীয় না হইয়া পারে না।

লোচন দাসের ছন্দকে সহজে বলবৃত্ত বলিয়া বুঝা যায়, অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে ঐ প্রকার বলিয়া সহজে বুঝা যায় না, একথাও সত্য। ইহার কারণ, লোচন-ছন্দ সুপরিণত ও প্রায় আধুনিক যুগোচিত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ অপরিণত ও অমার্জিত। লোচন দাসের রচনায় অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণের জন্য পর্বাদ্যে শ্বাসাঘাত সুস্পষ্ট (শব্দান্তিক স্বরধ্বনির বিলুপ্তির কারণ একমাত্র আদ্য শ্বাসাঘাত)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই হসন্ত উচ্চারণ নাই, অকারান্ত শব্দ অকারান্ত রূপেই উচ্চার্য; কাজেই পর্বাদ্যে শ্বাসাঘাত পরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহাতে শ্বাসাঘাতের আভাস আছে। অপরিস্ফুট বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে সূক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, স্থূল বুদ্ধিতে অনায়াসে বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্বাসাঘাত সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন অনেক 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ আছে, যাহা শব্দাদ্যে প্রচ্ছন্ন শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'আসুখ' (অসুখ), 'আনল' (অনল), 'আতি' (অতি), 'আমৃত' (অমৃত), 'আন্তর' (অন্তর), 'আধিক' (অধিক) প্রভৃতি স্বরাদ্য শব্দ এবং 'পাঙ্ক' (পঙ্ক), 'নান্দ' (নন্দ), 'পাঞ্জী' (পঞ্জী), 'বান্ধন' (বন্ধন), 'রান্ধন' (রন্ধন), 'কাঞ্চুলী' (কঞ্চুলী) প্রভৃতি ব্যঞ্জনাদ্য শব্দ দেখা যায়, যাহাদের আদ্য স্বর অস্বাভাবিক-

ভাবে দীর্ঘীকৃত। এই দীর্ঘীকরণ ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পন্ন। শব্দান্তে প্রবল শ্বাসাঘাতই এই দীর্ঘীকরণের জন্য দায়ী। শব্দান্ত স্বরের দীর্ঘীকরণ হইতেই উহার আন্ত শ্বাসাঘাতকে বুঝিয়া লইতে হইবে। এই যুক্তি অখণ্ডনীয়।

শব্দান্তের শ্বাসাঘাতই পর্বান্তের শ্বাসাঘাত দেখাইয়া দেয়। যে-যুগে শব্দের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে-যুগে ধ্বনিপর্বের বা ছন্দপর্বের আদিতেও যে প্রবল শ্বাসাঘাত সুরু হইয়াছিল, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই।

লোচন-পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একই বলবৃত্ত ছন্দে রচিত হইলেও লোচন-ধামালীর পর্বান্তে শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে আসিয়া যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর্বান্তে স্বাভাবিকভাবে আসে না; ইহার গূঢ় কারণ আছে। লোচন-পদাবলীতে ছন্দ ভাষাগত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাষা ছন্দোগত। লোচন-পদাবলীতে ছন্দ ভাষাগত বলিয়া কাব্য পাঠ কালেই ছন্দ পরিস্ফুট হয়; অপরপক্ষে সাধারণ 'পাঠে' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ বুঝা যায় না, 'শুনিলে' বুঝা যায়, উহাতে ছন্দ আছে। এইরূপ হইবার কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ উহার ভাষায় নহে, ভাষার বাহিরে 'ঢোলে' বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতেছে জন-সাহিত্য ধামালী কাব্য এবং প্রাচীন ধামালী কাব্য ছিল 'নাট-গীত' অর্থাৎ নৃত্য-গীত। বঙ্গদেশের প্রাচীন বাদ্য ঢোলের তালে তালে হইত ধামালীর নৃত্য এবং ঢোলের তালে তালেই হইত ইহার গান। অক্ষর-গণনার কৃত্রিম পণ্ডিতী পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত নহে, ইহার রচনার মূলে রহিয়াছে কবির শ্রুতি-নির্ভরতা। কবি ধামালী গানের ঢোল বাদ্যকে স্মরণ করিয়া উহারই তালে কান পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছেন। কবির কানে এই বাদ্যধ্বনি সদাজাগ্রত ছিল বলিয়া রচনা কালে কবি হইয়াছেন নিশ্চিন্ত ও নিরঙ্কুশ। কবির ছন্দ-পতনের আশঙ্কা নাই, তিনি ভাষাকে 'স্প্রিং'-এর
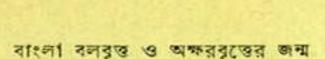
মতো কখনও চাপে ছোট করিয়া কখনও বা টানে বাড়াইয়া বাদ্য-তালের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন ; অর্থাৎ আদর্শ সংখ্যার অতিরিক্ত অক্ষরগুলিকে দ্রুত উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত করিয়া এবং অক্ষরাভাব-স্থলে বিলম্বিত উচ্চারণে দীর্ঘায়ত করিয়া অসম হ্রস্ব-দীর্ঘ পর্বকে সমদীর্ঘ পর্বে পর্যবসিত করিয়াছেন। এইজন্যই বলিতে হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ছন্দ ভাষাগত নহে, ভাষাই ছন্দোগত। সেইজন্য 'পাঠ' করিলে মনে হয়, ইহার ভাষায় ছন্দ নাই ; কিন্তু গানে 'শুনিলে' বুঝা যায়, ইহাতে ছন্দ বর্তমান। আধুনিক যুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ বজায় রাখিয়া পাঠ করিতে হইলে ইহার প্রতি পর্বের অন্তর্নিহিত ঢোলের আঘাত স্মরণ করিতে হইবে। বর্তমানে আমরা অবশ্য ঢোল বাজাইয়া পড়িতে পারি না, কিন্তু বাদ্যে তাল দেওয়ার প্রতীকরূপে পর্বাদ্যে শ্বাসাঘাত দিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ ভাষাগত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শ্বাসাঘাতও সর্বত্র ভাষাগত হয় নাই, তথাপি পর্বাদ্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাসাঘাত প্রদান ইহাতে অপরিহার্য। পর্বাদ্যে শ্বাসাঘাত দিয়া পড়িলে তবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদে সার্থক ছন্দ অনুভূত হইবে, নচেৎ দেখা যাইবে পদে পদে ছন্দ-পতন।

ভ্রান্ত ধারণা হইতে সাবধান হওয়া কর্তব্য। বাংলা শব্দের ও ছন্দ-পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাত দিয়া উচ্চারণ করার রীতি ঢোল বাদ্য হইতে কৃত্রিমভাবে আসে নাই; ঢোল বাদ্য হইতে কৃত্রিমভাবে আসিলে পরবর্তীকালে বাদ্যহীন অবস্থায় উহা বাঁচিয়া থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন হইতেছে বাদ্যভিত্তিক 'নাট-গীত' এবং উহার ছন্দ পূর্ণভাবে ভাষাগত নহে ; এইজন্যই উহাতে ঢোলবাদ্য স্মরণীয় এবং কৃত্রিম-ভাবে শ্বাসাঘাত প্রযোজ্য। লোচনদাসের ধামালীতে, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের রচনায় ঢোল বাদ্য স্মরণ করিতে হয় না, অথবা শ্বাসাঘাতকে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করিতে হয় না ; এই-সকল ক্ষেত্রে ছন্দ সম্পূর্ণভাবে ভাষাগত হইয়াছে, তাই পাঠ করিতে

গেলেই ভাষার ভিতর হইতে শ্বাসাঘাত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে।

আদ্য শ্বাসাঘাতযুক্ত চতুরক্ষর পর্বের ছন্দ বা বলবৃত্ত মূলতঃ পূর্ব ভারতেরই দেশজ ছন্দ—পূর্ব ভারতীয় আদিম কোনো অন-আর্য জাতির কণ্ঠেই উহার জন্ম। সাওঁতালদিগের কোনো কোনো প্রবচনে, গানে, মাদলের ও বাঁশীর বোলে ইহার দেখা পাওয়া যায়। যেমন—

সাওঁতালী প্রবচন :—

এড়ে কাথা | সারি আ
রসম্ রুয়া | গগঃই্ আ।
এড়ে কাথা | পেড়েদাং
গঃই্ কাট্‌কোম্ | দিড়িদাং ॥

—ভূমিকা পৃঃ ।/০, সাওঁতালী ভাষা (প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

'বাহা' বা বসন্তোৎসবের গান :—

আলোং নাজিঞ্ | ঞাতেয়া হো | তোওয়া বাহা | ঞাতেয়া।
আলাং নাজিঞ্ | ঞাতেয়া হো | নাট্টাল্ বাহা | ঞাতেয়া ॥
ঞিন্দায়্ তালাং | ঞাতেয়া হো | তোওয়া বাহা | ঞাতেয়া।
ঞুতাই্ তালাং | ঞাতেয়া হো | নাট্টাল্ বাহা | ঞাতেয়া ॥
... ...
গালাং কেদাঞ্ | ঞাতেয়া হো | নাট্টাল্ বাহা | ঞাতেয়া ॥

—পৃঃ ৩-৪, সাওঁতালী বাহা সেরেঞ্ (চারু সিংহ সিদোপ সরেন)

সাওঁতালী মাদলের বোল :—

দি-পির্-দি-পাং | দি-পির্-দি-পাং | দি-পির্-দি-পাং | পাং
ধি-তাং-তা-লা | ধি-তাং-তা-লা | ধি-তাং-তা-লা | তা

সাওঁতালী বাঁশীর বোল :—

তু-তুর্-তু-আ | উ-তুর্-তু-আ | তু-তুর্-তু-আ | তু

—ছন্দের টুং টাং (সুনির্মল বসু)

বাঙালী জাতির উপাদানে অনার্য-ত্ব পণ্ডিতগণের স্বীকৃত। অনার্য বলবৃত্ত তাই বাংলার নৃত্যগীতবাদ্যে, প্রবাদ-প্রবচনে, হেঁয়ালীতে, ছেলে-ভুলানো ছড়ায়, যাদুমন্ত্রে, 'ভাদু' প্রভৃতি মেয়েলীগানে, কবির লড়াইয়ে, তর্জায়, ঝুমুরে, ভাটিয়ালী-বাউল-প্রসাদী সঙ্গীতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণ-স্পন্দন হইতেই বলবৃত্ত-পর্ব ঢোলের তালে নামিয়া আসিয়াছে। ঢোলের তাল হইতে উহা সঞ্চারিত হইয়াছে 'নাট-গীত' ধামালী কাব্যে। বাংলা-ভাষার বয়স মাত্র হাজার বছর ; তাহারও অনেক পূর্ব হইতে বঙ্গদেশে বলবৃত্তছন্দের তালে ঢোল বাজিয়াছে। আধুনিককালে বলবৃত্তে চার অক্ষরের সাধারণ পর্ব ও তিন অক্ষরের বিশেষ পর্ব দেখা যায়। যথা—

(১) কু-ঞ্জে গো-পন | গ-ন্ধ বা-জায় | নি-কু-ন্দে-শের | বাঁশী।
দোঁ-হার ন-য়ন | খুঁ-জে বে-ড়ায় | দোঁ-হার মু-খের | হাসি ॥

(২) খো-কন্-ধন | ঘুম্ চায় গো | ঘুম্ আয় গো।
চোখ্ পিট্ পিট্ | মিট্ মিট্ মিট্ | ঘুম্ পায় গো | ঘুম্ আয় গো ॥

এই দুইটি দৃষ্টান্তের প্রথমটির পূর্ণ পর্ব চার অক্ষরের এবং দ্বিতীয়টির পূর্ণ পর্ব তিন অক্ষরের। বাংলা ভাষায় বলবৃত্ত আবির্ভাবের সময়েও যে ইহার উক্ত প্রকার দ্বিবিধ পর্ব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দ্বিবিধ পর্বের তালেই বাঙ্গালীর বাদ্য সুদীর্ঘকাল বাজিয়াছে। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র অপভ্রংশ কবিতায় এই দ্বিবিধ তালেরই ছন্দ দেখা যায়। আর্য অপভ্রংশ ছন্দে শ্বাসাঘাতযুক্ত অনার্য বলবৃত্ত পর্ব থাকার কথা নহে ; সম্ভবতঃ বাঙালীর বাদ্যতালে মুগ্ধ হইয়া কবিগণ এইরূপ ছন্দে কবিতা না লিখিয়া পারেন নাই। নিম্নোদ্ধৃত অপভ্রংশ কবিতায় শ্বাসাঘাতযুক্ত বঙ্গীয় বলবৃত্তছন্দের চতুরক্ষর পর্ব সুস্পষ্ট :—

জাআ জা অদ্ | ধংগ সীস' | গঙ্গা লোলন্ | তী।
সব্বাসা পু | রন্তি সব্ব | দুক্‌খা তোলন্ | তী ॥

গাআ রাআ | হার' দীস' | বাসা ভাসন্ | তা।
বেআলা জা | সঙ্গ গট্ট | ছুট্‌ঠা গাসন্ | তা ॥

[বাদ্য :— টাক্-ডু-মা-ডুম্ | টাক্-ডুমা-ডুম্ | টাক্-ডুমা-ডুম্ | ডুম্]

—প্রা-পৈ, মাত্রাবৃত্ত ১১৯

[এই দৃষ্টান্তের দীর্ঘ স্বরবর্ণ গুলিকে অপভ্রংশযুগীয় হ্রস্ব উচ্চারণে পাঠ করিলে ছন্দ আর ভারতীয় মাত্রাবৃত্ত থাকে না, বঙ্গীয় বলবৃত্তেই পরিণত হয়। আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ অপভ্রংশ-যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং এই ভাবে পাঠ করা অসঙ্গত নহে।]

আবার নিম্নোক্ত অপভ্রংশ-কবিতায় ত্র্যক্ষর পর্বের বলবৃত্তকে দেখা যায় :—

জং ণ চ্চে | বিজ্‌জু
মে-হং ধা | রা।
পংকুল্লা | ণীবা
সদ্দে মো | রা ॥
বাঅন্তা | মন্দা
সীআ বা | আ।
কম্পন্তা | গাআ
কন্তা ণা | আ ॥
[বাদ্য :—ধা-তি-না, না-তি-না]

—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত, ৮৯

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত তথাকথিত পয়ার প্রভৃতি ছয় প্রকারের ছন্দ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—বলবৃত্তের উক্ত প্রকার চতুরক্ষর পর্ব এই কাব্যের পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী ও দিগক্ষরার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং ত্র্যক্ষর পর্ব লুকাইয়া আছে ইহার লঘুত্রিপদী, লঘুভঙ্গ ত্রিপদী ও

একাবলীতে। ইহাদের প্রতিটিরই পর্বান্তে শ্বাসাঘাত ও বাহ্য তাল রহিয়াছে প্রচ্ছন্নভাবে। যথা—

(ক) চতুরক্ষর পর্বিক—

(১) পয়ার—

(i) নঠ' হৈল' : ঘোল' দুধ' | আর' নঠ' : ঘী।
এড়ি জাএ : মোক' সব' | গোআলার' : ঝী॥

—পৃঃ ৪৬, দানখণ্ড

(ii) মুনি মণ : মোহিনী র | মণী অহ্ন : পামা।
পদ্মিনী : আহ্মার' না | তিনী রাধা : নামা॥

—পৃঃ ৬, তাম্বুলখণ্ড

(২) দীর্ঘ ত্রিপদী—

এ তোর রূ : প যৌবন তাহাত' ম : জিল মন'
এ বেঁ দেহ : আলিঙ্গন' : দানে।
তোহ্মে রাধা : চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব : বনমালী
আহ্মা পরি : হর' আকা : রণে॥

—পৃঃ ৮৪, ভারখণ্ড

(৩) দিগক্ষরা—

সে নেহ' তি : অজ' নাহি : সহে।
সে পুণি আ : হ্মার' দোষ' : নহে॥

—পৃঃ ১০৫, বৃন্দাবন খণ্ড

(খ) ত্র্যক্ষর পর্বিক—

(১) লঘু ত্রিপদী—

আহ্মার' : বচন' | ধর' ল' : বড়ায়ি | মনে না : করিহ' | হেলা।

ছুসহ : বিরহ | সাগরে : বড়ায়ি | তোহ্মেসি : আহ্মার' | ভেলা ॥

—পৃঃ ৮-৯, তাম্বুল খণ্ড

(২) লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী—

ঘন' চা : লিআঁ ব | সনে।

রাধিকা : আড়' ন | য়নে।

চাহিআ : কাহ্নের' | মনে চি : আইল' | মদনে ॥

—পৃঃ ১১৮, যমুনা খণ্ড

(৩) একাবলী—

কাঁখের' : কলস' | নাম্বাঅ : তোহ্মে।

কথা চা : রি পাঁচ' | কহিব : আহ্মে ॥

—পৃঃ ১১, যমুনা খণ্ড

এই ভাবের শ্বাসাঘাতযুক্ত উচ্চারণ অনেকের কাছে হাস্তকর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। ('জল' শব্দের 'জল্-অ' উচ্চারণ এ-কালেই কৃত্রিম, সেকালে নহে।) ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোচনায় উচ্চারণেও পরিবর্তন ও পরিণতি অবশ্য স্বীকার্য। তাছাড়া এইভাবে পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত দিয়া পাঠ করিলে তবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ধ্বনিশ্রীমণ্ডিত বলিয়া বুঝা যায়; নচেৎ মনে হয়—কবি ছন্দোমূর্খ, কাব্যে ছন্দ নাই, আছে কেবল ছন্দপতন।

এইজন্যই আমরা বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিতা বাঁকা তরবারির মতো, ইহার একমাত্র খাপ বলবৃত্ত, অন্য কোন খাপে ইহাকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে-সকল চরণকে পণ্ডিতেরা অনিয়মিত ও ছন্দোহীন বলিয়া মনে করেন, সেইগুলিকেও বলবৃত্তের ছাঁচে ফেলিলে নিয়মিত ও ছন্দোযুক্ত বলিয়া বুঝা যাইবে। কিন্তু এই পরীক্ষার পূর্বে বলবৃত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য—শ্বাসাঘাতের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

শ্বাসাঘাত সঙ্গীতের বাদ্যতালের ন্যায় ছন্দের বাহিরের বস্তু অথচ বাহির হইতেই পাঠকের ছন্দোবোধ-উদ্দীপক। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বারংবার প্রদত্ত শ্বাসাঘাত পাঠকচিত্তকে এমনই 'তাল'-গ্রস্ত করিয়া তুলে যে রচনাগত আকস্মিক অসম পর্বকেও পাঠক কৃত্রিমভাবে সম করিয়া তুলিতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ তাল রক্ষা করিবার জন্য পাঠক দীর্ঘ পর্বকে দ্রুত উচ্চারণে সঙ্কুচিত ও হ্রস্ব পর্বকে বিলম্বিত উচ্চারণে প্রসারিত করে। পাঠকের এই সক্রিয় সহযোগিতার সুযোগ লইতে প্রাচীন কবিরা দ্বিধা করিতেন না এবং পাঠকের সংশোধন-সাপেক্ষ ভাবে বলবৃত্ত চরণে অসম পর্ব সমাবেশ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেও রহিয়াছে এই প্রাচীন কবি-প্রবৃত্তি। ইহার অসম পর্বগুলি কবির ছন্দোমূর্খতার নিদর্শন নহে, এইগুলি পাঠকের পর্ব-সংকোচন ও পর্ব-প্রসারণের উদ্দেশ্যে রচিত।

লিখিত দুই অক্ষরকে উচ্চারণে একাক্ষর করিতে না পারিলে পর্ব সংকোচন হয় না। দ্রুতভঙ্গির উচ্চারণে কোন কোন অক্ষরের স্বরধ্বনি অর্ধোচ্চারিত হইয়া ভগ্ন 'হসন্ত স্বরে' পরিণত হয়, অথবা সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত হইয়া স্বরান্ত ব্যঞ্জনকে 'হসন্ত ব্যঞ্জনে' পরিণত করে। নবজাত 'হসন্ত স্বর' অথবা 'হসন্ত ব্যঞ্জন' দ্রুত উচ্চারণে পার্শ্ববর্তী অক্ষরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সন্ধ্যক্ষর (diphthong) গঠন করে। এইভাবে লিখিত দুই অক্ষর উচ্চারণে একাক্ষরে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে অর্ধোচ্চারিত 'হসন্ত স্বরে'র দ্বারা পর্ব-সংকোচন দ্রষ্টব্য ঃ—

[শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দৃষ্টান্তের পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত অবশ্য প্রদেয়। মোটা হরফে 'হসন্ত স্বর' ও 'হসন্ত ব্যঞ্জন' সূচিত।]

(১) যমুনার' | ঘাটে রাধা | বাঁশী নাদ' | শুনি।
জল' লঞাঁ | ঘর' আই্লী | আই্হনের' | রাণী॥

[মূল রচনা—"আয়িলী", "আইহনের"

—পৃঃ ১৩৬ বংশীখণ্ড

(২) কে না বাঁশী | বাএ বড়াই্ | কালিনী **নৈ** | কূলে।
কে না বাঁশী | বাএ বড়াই্ | এ গোঠ' গো | কুলে॥
আকুল' শ | রীর' মোর' | বেআকুল' | মন'।
বাঁশীর' শ | বদেঁ মো আ | উলাই্লো রান্ | ধন'॥

[মূল রচনা—'বড়ায়ি,' 'নই,' 'আউলাইলো'

—পৃঃ ১৩৬ ঐ

(৩) আই্হন' সে | জীএ কিকে হেন' নারী | পাঠায়্ বিকে
গোপ' জাতী | ধনের' কা | তরে।
যার' ঘরে | হেন' নারী সে কেহ্নে ধ | ন' ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা | দেউ মোর' | ঘরে॥

[মূল রচনা—'আইহন', 'পাঠাএ'

—পৃঃ ৪৯ দানখণ্ড

নিম্নের দৃষ্টান্ত গুলিতে উচ্চারণে স্বরবিলুপ্তি জাত 'হসন্ত ব্যঞ্জনে'র দ্বারা পর্বসঙ্কোচন হইয়া থাকে ঃ—

(১) বড়ায়ির' | মুখ্ চাহি সব্ | সখি গোআ | লিনী।
মথুরা ল | ড়িলী বড়াই্ | হঞাঁ আগু | য়ানী॥

[মূল রচনা—'মু' চাহি সব']

—পৃঃ ৬৬, দানখণ্ড

(২) কি কৈলি কি | কৈলি বিধি | নিরমিআঁ | নারী।
আপনার' | মাঁসেহ্‌রিণী (=মাঁসেত্রিণী) | জগতের' | বৈরী॥
[মূল রচনা—'মাঁসে হরিণী'
—পৃঃ ৪১, ঐ

(৩) বাহিরেঁ | ভিতরেঁ | তোঁ কাহ্ন | কাল'।
মুকুট' | ধুয়িআঁ | আহুক্‌ তেঁ | ভাল॥
[মূল রচনা—'আহুকিতেঁ
—পৃঃ ১১২, যমুনাখণ্ড

এইভাবে আদ্য শ্বাসাঘাতে বলবৃত্ত ছন্দে সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি এবং উহার সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ সম্ভব হইয়াছে।

নির্দিষ্ট কালান্তরে শ্বাসাঘাত অসম পর্ব-দৈর্ঘ্যের কেবল সংকোচন নহে, প্রসারণও করে। অক্ষরাধিক্য-স্থলে যেমন সংকোচন, অক্ষরাভাব-স্থলে তেমনি হয় প্রসারণ। প্রসারণ অর্থে পর্বস্থ অক্ষর বিশেষের স্বরধ্বনির বৃদ্ধি। যথা—

(১) মোরে নাহিঁ | ছোঁ কাহ্নাঞি | বারাণসি | যা।
আঘো 'ও'র' | পাপেঁ তোর' | বেআপিল' | গা॥
[মূল রচনা—'আঘোর'
—পৃঃ ১৩১ বাণখণ্ড

(২) পা 'আ' গলী | রা 'আ' ধা গো | আ 'আ' লিনী | গো।
কথা পাব' | না 'আ'ন্দো য। শো'ও'দার' | পো॥
[মূল রচনা—'পাগলী', 'রাধা', 'গোআলিনী,' 'নান্দো,' 'যশোদা'
—পৃঃ ১৫৫, বিরহ খণ্ড

(৩) নাগর' : কাহ্নাঞি | মো'ও'কে : বিগুতে | আশেষ : নেআঅ | জুড়ী।
কো'ও'ন' : বিবুধি | এ'এ'হে : ন পথে | আনিলে : দারুনী | বুঢ়ী॥
[মূল রচনা—'মোকে', 'কোন,' 'এ হেন'
—পৃঃ ৪৫, দান খণ্ড

(৪) বা 'আ' ঘ' : ভালুকে | আতি গ : হনে ।
কেমনে : যাইবেঁ | সে বৃন্দা : বনে ॥

[মূল রচনা—'বাঘ'
—পৃঃ ১৫৭ রাধাবিরহ

ছন্দপর্বের স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে ছন্দপর্বের সঙ্কোচন ও প্রসারণ কেবল যে 'নাটগীত' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই বৈশিষ্ট্য তাহা নহে, ইহা প্রাচীন বলবৃত্তেরই স্বধর্ম। যে-সকল প্রাচীন রচনার সহিত বাদ্যের বা নাচের সম্পর্ক নাই, সেখানেও মধ্যে মধ্যে বলবৃত্তপর্বে অক্ষরাধিক্য ও অক্ষরাভাব দেখা যায়, অর্থাৎ সেখানেও সমভাবে পর্বসংকোচন বা পর্ব প্রসারণের অপেক্ষায় অসমদীর্ঘ পর্ব রচিত। যথা—

[নিম্নরেখ পর্বগুলি অ-সম পর্ব ; হাইফেন (-) স্বর প্রসারণের চিহ্ন ।]

(১) তুই কোন ঠা | কুরের বেটা | তোরে ভ-য়্ | কি ।
আমি কে তা | জানিস নাই | শোন্ পরিচয় | দি ॥
—অঙ্গদ রায়বার, কৃত্তিবাসী রামায়ণ

(২) আর শুন্যাছ' | খুল্ল-না | আছেন ভালো | নাটে ।
ঘরের পো ষ | রেতে আছে | বেড়ায় গোলা | ঘাটে ॥
—চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম

(৩) একদিন দেখিলাম | বন কুড়ুনী | পরণে দেখিলাম | ছালা ।
আজ এসেছেন | শাড়ীর ঘেরণ | গলায় চুলিয়া | মালা ॥
—প্রাচীন রূপকথার ছড়া, বঙ্গভাষাও সাহিত্য

(৪) প্রসাদ বলে | ঢা-ক্ ঢো-ল্ | কাজ কিরে তোর | সে বাজনে ।
কালী বলে দাও | কর তালি | মনে রাখ সেই | শ্রীচরণে ॥
—রামপ্রসাদ সেন, শ্যামাসঙ্গীত

(৫) চান্দ যদি হইতে | বন্ধু আরে বন্ধু | | জাইগা সারা | নিশি।
চা-ন্দ্ মু-খ | দেখিতা-ম্ | নিরালা-য় | বসি ॥
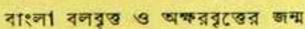
—কমলা, মৈমনসিংহ গীতিকা

এইবার বুঝা যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত অধিকাংশ পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী, দিগক্ষরা, লঘুত্রিপদী, লঘুভঙ্গ-ত্রিপদী এবং একাবলী আসলে ঐসকল নাম পাইতে পারে না; ইহারা অক্ষরবৃত্ত-গোত্রীয় নহে, সকলেই শ্বাসাঘাতযুক্ত বলবৃত্ত-গোত্রীয়। পরবর্তীকালের কেবল অক্ষর গণনামূলক অক্ষরবৃত্তজাতীয় ছন্দগুলিকেই সত্যকার পয়ারাদি নামে অভিহিত করা সঙ্গত; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে এইসকল নাম ব্যবহার অযৌক্তিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বলবৃত্ত জাতীয় ছন্দগুলি প্রকৃত পক্ষে পয়ারাদি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপরিণত পূর্বরূপ।* এইগুলি হইতেই পয়ারাদি ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বলবৃত্ত চরণের **কোন কোন পর্বের শ্বাসাঘাত বিলুপ্তিতে ঐসকল পর্ব পূর্ববর্তী পর্বের শ্বাসাঘাতের অধীনস্থ ও পূর্ববর্তী পর্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে**; এই পর্ব-সংযোগের ফলে হইয়াছে অক্ষরবৃত্তের অষ্টাক্ষর, দশাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের উৎপত্তি। ইহাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা অক্ষরবৃত্তের জন্মবৃত্তান্ত। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে পয়ারাদি ছয়প্রকার ছন্দের ভ্রূণাবস্থার বলবৃত্তের রূপ ও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী

---

* কোন কোন পণ্ডিতের মতে, অষ্টমে যতিযুক্ত চতুর্দশাক্ষর চরণের ছন্দই পয়ার, উহার অপরিণত বা পরিণত রূপ থাকিতে পারে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে রূপের ক্রমবিবর্তন স্বীকার্য। কুঁড়িকে ফুল বলা চলে না বটে, কিন্তু ইহাকে ফুলেরই অপরিণত অবস্থা বলিলে ভুল হয় না।

অক্ষরবৃত্ত রূপ পাশাপাশি দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরণগুলি হইতেই এই রূপ পরিবর্তন বুঝা যাইতে পারে। যথা—

(১) **পয়ার**

(ক) অপরিণত রূপ (পর্ব চতুরক্ষর, প্রতি পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাত)—

/ / / /
০ ০ ০ ০ : ০ ০ ০ ০ : ০ ০ ০ ০ : ০ ০
১ ২ ৩ ৪
আহ্মে হ রী | আহ্মে হ র | আহ্মে মাহা | যোগী

—পৃঃ ৯১, ছত্রখণ্ড

ইহার ২য় ও ৪র্থ পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে—

(খ) পরিণত রূপ :—

/ /
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ : ০ ০ ০ ০ ০ ০
আহ্মে হরী আহ্মে হ র | আহ্মে মাহা যোগী
অর্থাৎ পয়ারের চরণ ৮ + ৬ অক্ষর।

(২) **দীর্ঘ ত্রিপদী**

(ক) অপরিণত রূপ (পর্ব চতুরক্ষর ও পর্বান্তে শ্বাসাঘাত)—

/ / / /
০ ০ ০ ০ : ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ : ০ ০ ০ ০
১ ২ ৩ ৪
দৈবেঁ মোক' | নিন্দ পাইল' তোহ্মে এথা | বাঁশী নিল'

/ / /
০ ০ ০ ০ : ০ ০ ০ ০ : ০ ০
৫ ৬ ৭
বাঁশী দেহ | না কর নি | রাশ',

—পৃঃ ১৪৮ বংশীখণ্ড

ইহার ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে—

(খ) পরিণত রূপ—

/ /
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
দৈবেঁ মোক' নিন্দ্ পাইল' তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল'

/
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
বাঁ শী দে হ না ক র নিরাশ'

অর্থাৎ দীর্ঘ ত্রিপদীর চরণ ৮ + ৮ + ১০ অক্ষর।

(৩) **দিগক্ষরা**

দীর্ঘ ত্রিপদীর দশাক্ষর অন্ত্যপর্বই দিগক্ষরার একপর্বিক চরণ। যথা—

বসি থাকে কদমের' তলে

—পৃঃ ৫১, দানখণ্ড

ইহার উৎপত্তি দীর্ঘত্রিপদীর তৃতীয় পর্বের উৎপত্তির মতো। চরণ ১০ অক্ষর।

(৪) **লঘু ত্রিপদী**

(ক) অপরিণত রূপ (পর্ব ত্র্যক্ষর ও পর্বান্তে শ্বাসাঘাত)—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

তোহ্মার' | যৌবন' | কাল' ভু | জঙ্গম' | আহ্মে হো | ভাল' গা | রুড়ী

—পৃঃ ৪৫, দানখণ্ড

ইহার ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে—

(খ) পরিণত রূপ—

তোহ্মার' যৌবন' | কাল' ভুজঙ্গম' | আহ্মে হো ভাল' গা | রুড়ী

অর্থাৎ লঘুত্রিপদীর চরণ ৬+৬+৬+২ অক্ষর। কখন কখন অন্ত্য পর্ব দুই অক্ষরের পরিবর্তে একাক্ষরও হয়, সেক্ষেত্রে চরণ ৬ + ৬ + ৬ + ১ অক্ষর ; যথা—

সুবর্ণে জড়িত | হিরাঞঁ রচিত | বাঁশী গুটি মোরে | দে

—পৃঃ ১৪৭ বংশীখণ্ড

(৫) **লঘুভঙ্গ ত্রিপদী**

লঘু ত্রিপদীর চরণের সহিত একটি বা দুইটি হ্রস্বতর খণ্ডিত চরণের মেল বন্ধন হইলে লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী হয়। ইহার পর্ব ও চরণের

জন্মবৃত্তান্ত লঘু ত্রিপদীরই অনুরূপ। ত্রিপাদ লঘুভঙ্গ ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত :—

দেখিআ পোড়ে হৃ | দয়ে,
যেন' মোর' প্রাণ' | জাএ,
কাহাকে কহিব | কেনা পাতিআএ | বড়ু চণ্ডীদাস' | গাএ।

—পৃঃ ১০৩, বৃন্দাবন খণ্ড

ইহার তিনটি চরণ যথাক্রমে ৬+২, ৬+২ ও ৬+৬+৬+২ অক্ষর।

(৬) একাবলী

(ক) অপরিণত রূপ (পর্ব ত্র্যক্ষর, পর্বান্তে শ্বাসাঘাত)—

১ ২ ৩ ৪
জলেত' | শাম্বিলী | লাঙ্গট' | হআঁ

—পৃঃ ১২০, যমুনাখণ্ড

ইহার ২য় ও ৪র্থ পর্বের শ্বাসাঘাত লোপে—

(খ) পরিণত রূপ :—

জলেত' শাম্বিলী | লাঙ্গট' হআঁ

অর্থাৎ একাবলীর চরণ ৬+৫ অক্ষর।

আমরা বলিয়াছি, বলবৃত্ত চরণের কোনো কোনো পর্বের শ্বাসাঘাত-বিলোপে ঐগুলি পূর্ববর্তী পর্বের সহিত একীভূত হইয়া অক্ষরবৃত্ত-পর্ব গঠন করিয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিবে—এই শ্বাসাঘাত বিলুপ্তির কারণ কি? ইহার উত্তর হইতেছে—কালক্রমে কবিতা 'পাঠ'কালে নৃত্য ও বাদ্যের অনুপস্থিতি এই শ্বাসাঘাত-বিলুপ্তির প্রধান কারণ। গানের সঙ্গে নাচ ও বাজনার সঙ্গত থাকিলে পাঠক উহার তালে তালে
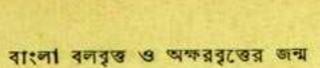
কবিতায় প্রবল শ্বাসাঘাত দিতে বাধ্য হয়, নচেৎ পাঠকের বিলাসী জিহ্বা কখনই প্রবল শ্বাসাঘাতের প্রয়াস স্বীকার করে না। কালক্রমে ধামালী কাব্য-বিলুপ্তির সঙ্গে সাহিত্যের আসর হইতে নৃত্য ও বাদ্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং উহাদের পরিবর্তে সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত ভাগবত-রামায়ণাদি ধর্মশাস্ত্রের চাপল্যবর্জিত কথকতা বা 'পাঠ' আরম্ভ হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত বলবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাকেও 'পাঠক' বা কথক শ্বাসাঘাতের পরিবর্তে সংস্কৃত রামায়ণের অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের সুরে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বলবৃত্ত চরণে শ্বাসাঘাত-বাহুল্যের হ্রাস হয় এবং মূল শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ পরিণত হইয়া যায় তানপ্রধান ছন্দে।

বলবৃত্ত হইতে বাংলা অক্ষরবৃত্ত জন্মলাভ করিলেও মূল বলবৃত্ত যে বঙ্গ সাহিত্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। বলবৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত উভয় ধারাই প্রবাহিত থাকে। তবে কিছুকাল বলবৃত্তের প্রবাহ থাকে কতকটা প্রচ্ছন্ন। বলবৃত্ত পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে অষ্টাদশ শতকে গোপীচন্দ্রের গানে, শ্যামা-সঙ্গীতে, বাউল পদে, পাঁচালীতে ও মৈমনসিংহ গীতিকায়। অপরপক্ষে অক্ষরবৃত্ত প্রতিষ্ঠা পায় রামায়ণাদি অনুবাদ সাহিত্যে, চৈতন্য ভাগবতাদি বৈষ্ণব জীবনীকাব্যে এবং সমস্ত মঙ্গলকাব্যে। আশ্চর্যের কথা, এই সকল গম্ভীর ও অভিজাত সাহিত্যে অক্ষরবৃত্তের অবিরল সুর স্রোতের মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রগল্‌ভ বলবৃত্তের দুই একটি চরণকে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। যথা—

প্রণমহোঁ নারায়ণ' | অনাদি নিধন'।
সৃষ্টি স্থিতি | প্রলয়্‌ যত | তাঁহার' কা | রণ' ॥

—শ্রীকৃষ্ণবিজয়, প্রথম শ্লোক

বিরুদ্ধার্থ | কহ তুমি | কহিতে কর | রোষ।
তোমার্‌ অর্থে | অবিমৃষ্ট | বিধেয়াংশ | দোষ ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ২য় পরি

উহার হাতে | রাঙ্গা শাঁখা | উহার গোরা | গা।
ঐ সে পরে | পাটের শাড়ী | ঐ সে পুতের | মা॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধনপতি পালা

সুরিক্ষা কহেন কহ | হেঁয়ালীর সন্ধি।
বিরল বাটে | বন পালাল | বন জন্তু | বন্দী॥

—ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম

(সই রে বলি) না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘু | মাইতে দেখোঁ | বাঁশিয়ার ব | য়ান॥

—গোবিন্দ আচার্য, বৈষ্ণব পদাবলী

চতুরক্ষর পর্বিক বলবৃত্তের ন্যায় ত্র্যক্ষর পর্বিক বলবৃত্তও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় নাই; প্রবল শ্বাসাঘাতহীন অবস্থায় লঘুত্রিপদী একাবলী প্রভৃতি ষড়ক্ষর পর্বিক অক্ষরবৃত্তরূপে ইহা দুইশত বৎসর থাকিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে শ্যামা-সঙ্গীতে ও লোকসঙ্গীতে যখন বলবৃত্তের পুনরুজ্জীবন হয়, তখন হইতে চতুরক্ষর পর্বিক বলবৃত্তের সঙ্গে ত্র্যক্ষর পর্বজাত ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দগুলিও প্রবল শ্বাসাঘাত পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘায়ত বলবৃত্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইগুলিতে হলন্ত অক্ষর মাত্রই সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চার্য, এবং পর্বান্তে শ্বাসাঘাত অনিবার্য :—

(১) উমা সঙ্গীতে—

আর্ জাগাস্ নে জয়া | অবোধ অভয়া
কত করে উমা | এই ঘুমাল'।
(মা) জাগিলে এক্‌বার | ঘুম্ পাড়ানো ভার
(মায়ের) চঞ্চল স্বভাব | আছে চিরকাল'॥

—রামপ্রসাদ

(৩) শ্যামা সঙ্গীতে—

ভণে রাম্‌প্রসাদ | মায়ের একি সূত্র
মা হয়ে হ'লি মা | সন্তানের শত্রু

দিবা নিশি ভাবি | আর কি করিবি
দিবি দিবি পুনঃ | জঠর যন্ত্রণা ॥
—রামপ্রসাদ

(৩) যাত্রা সঙ্গীতে—

(বঁধু) আম্‌রা কুলনারী | কিঙ্করী তোমারি
সই্‌তে নারি দারুন | বিরহ বেদন।
হয়েছিল যখন | সে মথুরায় আসা
বলেছিলে তখন | হবে ত্বরায় আসা
(মোদের) আশা পাশ দিয়ে | গিয়েছ বাঁধিয়ে
নিরাশ্বাস দিয়ে | করহ মোচন ॥
—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

(৪) পাঁচালী সঙ্গীতে—

(ধনি) আমি কেবল্‌ নিদা | নে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা | কি কর কৌতুক
আমারি স্থষ্টি যে | করা চতুর্মুখ
হরি বৈদ্য আমি | হরিবারে দুখ | ভ্রমণ করি ভুব | নে ॥
—দাশরথি রায়

ঊনবিংশ শতকে এই ষড়ক্ষর পর্বিক দীর্ঘায়ত বলবৃত্ত বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শর্মা ও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য'কাব্যের কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়। যথা—

(আমায়্‌) ছয়্‌ জনায়্‌ মিলে | পথ্‌ দেখায়্‌ বলে
পদে পদে পথ | ভুলি হে।
নানা কথার্‌ ছলে | নানান্‌ মুনি বলে
সংশয়ে তাই | দুলি হে ॥
—রাজর্ষি (রবীন্দ্রনাথ)

ষোড়শ অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মাত্রাবৃত্ত

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভাষাও যে বাংলা ভাষা তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি ইহার দুইটি রূপ স্বীকার করিতে হয়,—একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অপরটি ঈষৎ কৃত্রিম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অবিমিশ্র অকৃত্রিম বাংলা, কিন্তু চর্যাপদ ও ব্রজবুলি পদের ভাষা অবঙ্গীয় অবহট্‌ঠ শব্দমিশ্রিত এবং সেইজন্য ঈষৎ কৃত্রিম। আশ্চর্যের বিষয়, ভাষারূপ পৃথক্ বলিয়া ইহাদের ছন্দও হইয়াছে পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ বাংলার নিজস্ব বলবৃত্ত এবং বলবৃত্তজাত অক্ষরবৃত্ত। অপরপক্ষে চর্যা ও ব্রজবুলিপদের ছন্দ সর্বভারতীয় মাত্রাবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তের জন্ম প্রাকৃতে কিন্তু পুষ্টি অপভ্রংশে। অপভ্রংশ হইতেই ইহা বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় গৃহীত হয়। ইহাই হিন্দী প্রমুখ উত্তর-পশ্চিমী ভাষা গোষ্ঠীর একমাত্র ছন্দ। পূর্বী ভাষায় অর্থাৎ বাংলা - ওড়িয়া - অসমীয়াতে কিন্তু উহা উক্ত প্রকার একাধিপত্য পায় নাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কেবল অবহট্‌ঠ-প্রভাবিত চর্যা ও ব্রজবুলি পদে মাত্রাবৃত্তের পূর্ণ অধিকার দেখা যায়। কিন্তু ষোড়শ শতকের পূর্বে বিশুদ্ধ বাংলা কবিতায় ইহা স্থান পায় নাই, পরে ক্রমশঃ স্থান দখল করিয়া উনবিংশ শতকে অক্ষরবৃত্ত ও বলবৃত্তের সমপর্যায়ের ছন্দ হইয়া উঠে।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গুরুত্ব অসাধারণ। হ্রস্বদীর্ঘতার সন্ধান মাত্রাবৃত্তেই প্রাপ্য। চর্যাপদের মাত্রাবৃত্তই দেখাইয়া দেয়—তৎকালে বাঙ্গালীর উচ্চারণে দীর্ঘ স্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং যতটুকু দীর্ঘ উচ্চারণ অবশিষ্ট আছে, সেটুকু

কেবল ছন্দের পাদপূরণের জন্য। বঙ্গভাষার সূচনা হইতেই স্বরবর্ণ মাত্রই উচ্চারণে হ্রস্ব, উহার দীর্ঘীকরণ কেবল ছন্দের প্রয়োজনে; তাহার প্রমাণ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্ব-পূরণে হ্রস্ববর্ণকেও দীর্ঘবর্ণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা—

[চর্যা ও ব্রজবুলিতে অ-কারান্ত শব্দ হসন্তভাবে নহে, অ-কারান্তরূপেই উচ্চার্য ; হাইফেন (-) স্বরধ্বনির দীর্ঘত্বসূচক। মোটা হরফের দৃষ্টিগোচর 'দীর্ঘ' বর্ণ উচ্চারণে হ্রস্ব]

(ক) চর্যাপদে—

(১) দুলি দুহি | 'পি'-টা- | ধরণ ন | জা-ই- ।
রুখে-র | তেন্তলি | **কুম্ভীরে** | খা-ই- ॥

—চ° ২

(২) **এত কাল** | **হাঁউ** অচ্ | ছিলেঁ।- স্ব | মো-হেঁ- ।
এবে মই | 'বু'-ঝিল' | সদ্‌গুরু | বো-হেঁ- ॥

—চ° ৩৫

(খ) ব্রজবুলি পদে—

(১) অন্ত**রে** | 'উ'-য়ল | শ্যা-মর | ইন্দু- ।
'উ'-ছল | মনহি ম | নো-ভব | সিন্ধু- ॥

—গোবিন্দ দাস, পদকল্পতরু ৩৪২

(২) রাইক বি | পতি শুনি বিদগধ | শি**রো**মণি
'পু'-ছই | গদ গদ | ভা-সা- ।
নিজ মন্ | দির **তেজি** চলু বর | না-গর
পুন পুন | পরশই | না-সা- ॥

—নরহরি, ক্ষণদা, ১৪।৬

উল্লিখিত চর্যাপদের প্রথম দৃষ্টান্তে 'পি' (পিটা), দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'বু' (বুঝিল) এবং ব্রজবুলি পদের প্রথম দৃষ্টান্তে 'উ' (উয়ল), 'উ' (উছল), দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'পু' (পুছই) লিপিতে হ্রস্ব স্বরান্ত হইয়াও

উচ্চারণে দীর্ঘ। ছন্দ-পর্বের দৈর্ঘ্য পূরণের প্রয়োজনেই এই দীর্ঘ উচ্চারণ। অপরপক্ষে চর্যাপদের প্রথম দৃষ্টান্তে 'ভী' 'রে' (কুম্ভীরে) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'এ', 'কা', 'হাঁ', 'এ', 'বে' (এতকাল, হাঁউ, এবে) এবং ব্রজবুলিপদের প্রথম দৃষ্টান্তে 'রে' (অন্তরে), দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'রো', 'তে' (শিরোমণি, তেজি) লিপিতে দীর্ঘ স্বরান্ত হইয়াও উচ্চারণে হ্রস্ব। এখানে চেষ্টাকৃত হ্রস্বীকরণের ব্যাপার নাই, হ্রস্ব উচ্চারণই বাংলা ভাষার স্বভাবসঙ্গত ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলায় দীর্ঘ স্বরবর্ণ প্রাকৃত উচ্চারণের নির্জীব কঙ্কালমাত্র।

বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রাকৃত অপভ্রংশ কবিতা এবং সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' হইতেই মাত্রাছন্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে অপভ্রংশ যুগীয় মাত্রাবৃত্তের ঐশ্বর্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র এবং 'গীতগোবিন্দে'র বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবন্ধগুলি বিচিত্র কারুকার্যে অলংকৃত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সর্বপ্রথম চর্যাপদে গৃহীত বাংলা মাত্রাবৃত্তে এই ঐশ্বর্য নাই, ইহা নিরাভরণ সাধারণ মাত্রাবৃত্ত মাত্র। চর্যা কবিগণ চর্যা'পদে'র* 'চরণে'* কেবল চতুর্মাত্রিক পর্ব ব্যবহার করিয়াছেন, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার পর্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। তাছাড়া চর্যায় মাত্র দুইপ্রকার চরণ স্থান পাইয়াছে। প্রথমটি চতুষ্পর্বিক পাদাকুলক ছন্দের চরণ, ইহার আদর্শ :—

১ ২ ৩ ৪
সরস ম | সৃণ মপি | মলয়জ | পঙ্কম্

দ্বিতীয়টি সপ্তপর্বিক গাথার চরণ, ইহার আদর্শ :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
চন্দন | চর্চিত | নী-ল ক | লে-বর | পী-ত ব | সন বন | মা-লী-

---

* এখানে 'পদ' ও 'চরণ' সমার্থক নহে, 'পদ' রূঢ়ার্থক। চর্যাপদ ও বৈষ্ণবপদে 'পদ' হইতেছে 'গীতিকবিতা'।

চর্যায় চতুষ্পর্বিক চরণের দৃষ্টান্ত :—

(১) কা-আ- | তরুবর | পঞ্চ বি | ডা-ল- ।
চঞ্চল | চী-এ- | পইঠো- | কা-ল- ॥

—চ° ১

(২) ভবণই | গহণ গ | ম্ভীর বেগেঁ | বা-হী- ।
দুআন্তে | চি-খিল | মাঝে-ন | থা-হী- ॥

—চ° ৫

(৩) আলি এঁ- | কালি এঁ- | বাট রুন্ | ধে-লা- ।
তা-দেখি | কাহ্নু- | বিমন ভ | ই-লা- ॥

—চ° ৭

চর্যায় সপ্তপর্বিক চরণের দৃষ্টান্ত :—

(১) উ-চা- | উঁ-চা- | পা-বত | ত-হিঁ- | বসব- | সবরী- | বা-লী-
মোরঙ্গি | পীচ্ছ- | পরহিণ | সবরী- | গি-বত | গুঞ্জরী | মা-লী-

—চ° ২৮

(২) কিন্তো- | মন্তে- | কিন্তো- | তন্তে- | কিন্তোরে | ঝা-ণ ব | খা-নে-
অর্প ই | ঠা-ন- | মহাসুহ | লী-লেঁ- | দুলক্খ | পরম নি | বা-নে-

—চ° ৩৪

(৩) রাউতু ভ | ণই কট | ভুসুকু ভ | ণইকট |
সঅলা- | অইস স | হা-ব-
জইতো- | মূ-ঢা- | অচ্ছসি | ভা-ন্তী- | পুচ্ছতু | সদ্গুরু | পা-ব-

—চ° ৪১

এইপ্রকার সপ্তপর্বিক চরণের কবিতা চর্যাগ্রন্থে অপেক্ষাকৃত অল্প। মোট সাতচল্লিশটি পদের মধ্যে সাঁইত্রিশটি পদ চতুষ্পর্বিক চরণেই রচিত; অবশিষ্ট দশটি মাত্র পদে সপ্তপর্বিক চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহাও সর্বত্র আদ্যন্ত নহে। এ-ছাড়া ক্বচিৎ কোন সপ্তপর্বিক চরণের কবিতায় 'দোহা' (দোহড়িকা) ছন্দ মিশ্রিত দেখা যায়। ৪১ সংখ্যক কবিতার সাধারণ চরণ সপ্তপর্বিক কিন্তু আরম্ভ হইয়াছে দোহায়।

[দোহা৺ চতুর্মাত্রিক পর্বের চতুষ্পদী স্তবক, ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণ চতুষ্পর্বিক, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ত্রিপর্বিক।] যথা—

আই এ- | অনু অনা | এ-জগ | রে
ভান্তি এঁ | সো-পড়ি | হা-ই।
রা-জ- | সাপ দেখি | জো চমক | ই
সাঁ-চে কি | তা- বোড়ো | খা-ই ॥

আবার ৩৪ সংখ্যক পদের শেষ হইয়াছে দোহায়—

রাআ রাআ | রা-আ- | রে-অব | র
রা-অ- | মোহে রে- | বা-ধা।
লুই পা- | অপ সা- | এঁ- দারি | ক
দ্বা-দশ | ভুঅণে- | লা-ধা ॥

এইখানে বলা যাইতে পারে,—চতুষ্পর্বিক পাদাকুলক ও সপ্তপর্বিক গাথা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও দোহা বাংলায় স্থান পায় নাই ; ইহা হিন্দী প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমী ভাষারই অন্যতম প্রধান ছন্দ হইয়া গিয়াছে।

চর্যাপদ ক্ষুদ্রকায়, পদের সংখ্যাও অল্প ; অপভ্রংশ যুগের ছন্দোগত ঐশ্বর্য এবং বিচিত্র বিলাস ইহার মধ্যে আশা করা যায় না। তথাপি ছন্দোজগতে চর্যাপদেরও কিছু দান আছে। ইহাই যথার্থ মুক্তবন্ধ কবিতার, অর্থাৎ 'মুক্তকে'র প্রবর্তন করিয়াছে। মুক্তক সৃষ্টির গৌরব রবীন্দ্রনাথের নয়, চর্যাকবিরই প্রাপ্য। সমসংখ্যক পর্ববিশিষ্ট সমদীর্ঘ চরণের স্তবক রচনাই ছিল বহুকালের প্রথা। সংস্কৃত, প্রাকৃত, এমনকি অপভ্রংশেরও অধিকাংশ কবিতা এই প্রথায় আবদ্ধ। সর্বপ্রথম অপভ্রংশে 'মঅণহরা', 'ত্রিভঙ্গী', 'ভ্রমরাবলী' প্রভৃতি অল্প কয়েকটি ছন্দে এবং সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দে' সমসংখ্যক পর্বের বন্ধন

৺ ৩০৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'দোহা' লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

হইতে স্তবক-চরণকে মুক্ত করিয়া অসমপদী কবিতা রচনার প্রয়াস দেখা যায়। যথা—

(ক) প্রাকৃত পৈঙ্গলে—

(১) মুট্‌ঠি অ | রিট্‌ঠি বি | ণাস ক | রে।
(গিরি) হথ ধ | রে॥
—মন্থণ হরা, মাত্রাবৃত্ত ২০৭

(২) দহমুহ | কংস বি | ণাসা।
(পিঅ) বাসা।
সুন্দর | হাসা॥
—ত্রিভঙ্গী, বর্ণবৃত্ত, ২১৫

(৩) (তুঅ) দে-ব দু | রিত্ত গ | ণা- হর | ণা।
(চর) ণা॥
—ভ্রমরাবলী, বর্ণবৃত্ত, ১৫৫

(খ) গীতগোবিন্দে—

(১) প্রলয় প | য়ো-ধি জ | লে- ধৃত | বা-নসি | বে-দম্‌।
বিহিত ব | হিত্র চ | রিত্র ম | খে-দম্‌॥

(২) না-থ হ | রে-।
সী-দতি | রা-ধা- | বা-স গৃ | হে- ॥

দৃষ্টান্তগুলির চরণ অসমদীর্ঘ ও অসমসংখ্যক পর্ববিশিষ্ট বটে, তথাপি চরণগুলি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের স্তবকের অঙ্গ ; এই প্যাটার্ন পরিবর্তনীয় নহে। এইভাবে সজ্জিত চরণগুলি স্তবকের অঙ্গ বলিয়া বার বার আবর্তনীয়। সেইজন্য এখানেও কবিতা যথার্থ মুক্তবন্ধ বা স্বাধীন নহে। কিন্তু বিশেষ প্যাটার্নের স্তবকবন্ধন অস্বীকার করিয়াছেন চর্যাকবি। নিম্নোদ্ধৃত চর্যাপদটি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, 'মুক্তক' প্রবর্তনের গৌরব চর্যাকবিরই প্রাপ্য :—

উঁ-চা- | উঁ-চা- | পা-বত | ত-হিঁ- | বসব- | সবরী- | বা-লী-।
মোরঙ্গি | পীচ্ছ- | পরহিণ | সবরী- | গি-বত | গুঞ্জরী | মা-লী-॥

উমতো- | সবরো- | পা-গল | সবরো -
মা-কর | গুলী গুহা | ড়া-তোহো | রি- ।
শিত্ম ঘরি | নী-নামে | সহজ- | সুন্দ- | রী- ॥

না-না- | তরুবর | মোউলিল | রে-
গঅণত | লা-গেলি | ডা-লী- ।
একেলী- | সবরী- | এ-বন | হিণ্ডই
কর্ণ- | কুণ্ডল | বজ্রধা | রী- ॥
তিঅ ধাউ | খা-ট- | পাড়িলা- | সবরো- | মহা-সু | হে-সেজি | ছাইলী-।
সবরো- | ভুজঙ্গ | নৈরা- | মণি দারী | পেম্ক- | রা-তি পো | হাইলী- ॥
হিঅ তাঁ- | বো-লা-
মহাসুহে | কা-পুর | খা-ই- ।
সুন নৈ | রা-মণি | কণ্ঠে- | লইয়া- | মহাসুহে | রা-তি পো | হা-ই- ॥
গুরুবাক্ | পুঞ্ছি- | আ-
বিন্ধ নি | অ-মণ | বা-ণে- ।
একে শর | সন্ধানে | বিন্ধ- | হ-
বিন্ধহ | পরম নি | বা-নে- ॥
উমতো- | সবরো- | গরুআ- | রো-ষে- ।
গিরিবর | সিহর স | ন্ধি- পই | সন্তে | সবরো- | লো-ড়িব | কই সে- ॥

—চ° ২৮

ব্রজবুলি পদে মাত্রাবৃত্তের আবির্ভাব চর্যাপদের অনেক পরে। চর্যাপদের ছন্দে যে ঐশ্বর্যের অভাব ছিল, তাহার পূরণ দেখা যায় ব্রজবুলি পদে। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব ব্যবহার অপভ্রংশে থাকিলেও চর্যাকবিগণ কেবল চতুর্মাত্রিক পর্বই ব্যবহার করিয়াছেন, চর্যায় পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের প্রয়োগ দেখা যায় না। ব্রজবুলিপদে কিন্তু এইসকল দৈর্ঘ্যের ছন্দের অভাব নাই। গোবিন্দদাস, বলরামদাস, যদুনাথ দাস, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, রায়শেখর

প্রভৃতি কবিগণ ব্রজবুলিতে বিচিত্র পর্ব প্রয়োগে ছন্দোমাধুর্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যথা—

(ক) পঞ্চমাত্রিক পর্ব—

(১) তুহুঁ মণি | মন্দিরে- ঘন বিজুরী | সঞ্চরে-
মে-ঘ রুচি | বসন পরি | ধা-না- ।
যত যুবতি | মণ্ডলী- পন্থ ইহ | পে-খলি-
কো-ই নহি | রা-ইক স | মা-না- ॥

—শশিশেখর

(২) কা-হে তুহুঁ | কলহ করি কান্ত সুখ | তে-জলি-
অব সে বসি | রোয়সি কাহে | রা-ধে- ।
মে-রু সম | মা-ন করি উলটি ফিরি | বৈঠলি-
না-হ যব | চরণ ধরি | সা-ধে- ॥

—চন্দ্রশেখর

(৩) গ্রাম্য গোপ | বা-লিকা- সহজে পশু | পা-লিকা-
হা-ম কিয়ে | শ্যা-ম উপ | ভোগ্যা- ।
রা-জ কুল | সম্ভবা- সরসিরুহ | গৌরবা-
যোগ্য জনে | মিলয়ে অসু | যোগ্যা- ॥

—শশিশেখর

(খ) ষণ্মাত্রিক পর্ব—

(১) কষিল কনয়া | কমল কিয়ে ।
থী-র বিজুরী | নিছনি দিয়ে ॥

—যদুনাথ দাস

(২) অতি শী-তল | মলয়া-নিল | মন্দ মন্দ | বহনা ।
হরি বৈমুখী | হামারি অঙ্গ | মদনা-নল | দহনা ॥

—শশিশেখর

(৩) নটবর নব | কিশোর রা-য় | রহিয়া রহিয়া | যায় গো।
ঠমকি ঠমকি | চলত রঙ্গে
ধূ-লি ধূসর | শ্যা-ম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ | ঘন যে বোলত | মধুর মুরলী | বায় গো ॥

—বলরাম দাস

(গ) সপ্তমাত্রিক পর্ব—

(১) নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত | অঙ্গ।
জলদ সুন্দর। কম্বু কন্ধর | নিন্দি সিন্ধুর | ভঙ্গ ॥

—গোবিন্দদাস

(২) মা-স গণি গণি | আ-শ গে-লহি | শ্বা-স রহ অব | শে-ষিয়া।
কো-ন সমুঝব | হিয়ক বে-দন | পিয়া সে গেল পর | দে-শিয়া ॥

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

(৩) তরল জলধর | বরিখে ঝর ঝর | গরজে ঘন ঘন | ঘোর।
শ্যা-ম না-গর | একলি কৈছনে | পন্থ হে-রই | মোর ॥

—রায়শেখর

ব্রজবুলিতে পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের ব্যবহার বিশেষ ঘটনা; সাধারণ বহু-প্রচলিত পর্ব হইতেছে চতুর্মাত্রিক। ব্রজবুলির মাত্রাছন্দের চরণস্থ পর্বসংখ্যাও বিচিত্র,—দ্বিপর্বিক হইতে অষ্টপর্বিক চরণ পর্যন্ত দেখা যায়। তবে দ্বিপর্বিক, ত্রিপর্বিক ও অষ্টপর্বিক চরণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহাদের দৃষ্টান্ত :—

দ্বিপর্বিক চরণ—

১ ২
জলকেলি | সা-ধে-।
চলু ধনী | রা-ধে- ॥

—শেখর

ত্রিপর্বিক চরণ—

১ ২ ৩
(১) নখপদ | হৃদয়ে তো | হা-রি-।
অন্তর | জলত হা | মা-রি- ॥

—গোবিন্দ দাস

(২) তুহুঁ মঝু | প্রাণক পি | য়া-রী- ।
রা-খব | হৃদয় বি | দা-রি- ॥

—রাধানন্দ

অষ্টপর্বিক চরণ—

(১) অধর সু | ধা- ঝরু | মুরলী ত | রঙ্গিণী
বিগলিত | রঙ্গিণী | হৃদয় দু | কু-ল ।
মা-তল | নয়ন ভ্র | মর জিনি | ভ্রমি ভ্রমি
উড়ত প | ড়ত শ্রুতি | উতপল | ফু-ল ॥

—রায় বসন্ত

(২) কুসুমিত | কুঞ্জ কু | টির মন | মো-হন
কুসুম শে | জে- দুহুঁ | নয়ল কি | শো-র ।
কো-কিল | মধুকর পঞ্চম | গা-বই
বন বৃন্ | দা-বন | আনন্দ হি | লো-র ॥
['আনন্দ' 'আনর্দ'রূপে উচ্চার্য ।] —নরোত্তম দাস

ব্রজবুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে চতুষ্পর্বিক পাদাকুলক। যথা—

(১) হো-রি- | খে-লত | গৌর কি | শো-র- ।
রসবতী | না-রী গ | দা-ধর | কো-র- ॥

—শিবানন্দ

(২) পহিলহি | রা-গ ন | য়ন ভঙ্গ | ভে-ল- ।
অনুদিন | বা-ঢ়ল | অবধি ন | গে-ল- ॥
['ভঙ্গ' 'ভগ'রূপে উচ্চার্য ।] —রায় রামানন্দ

(৩) কা-জর | রুচিহর | রয়নী বি | শা-লা- ।
তছুপর | অভিসার | করু ব্রজ | বা-লা- ॥

—রায় শেখর

বহুল ব্যবহারের দিক দিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে জয়দেবীয় সপ্তপর্বিক গাথা। যথা—

(১) মন্ত্র ম । হৌষধি । তুহুঁ জা- । নসি যদি
মঝুলাগি । করবি উ । পা-য়।
বাসুদেব । ঘোষ কহে । শুন শুন । এ- সখি
গোরালাগি । প্রাণ মোর । যা-য়॥
—বাসু ঘোষ

(২) রূ-পে ভ । রল দিঠি সোঙরি প । রশ মিঠি
পুলক ন । তে-জই । অঙ্গ-।
মোহন মু । রলী রবে শ্রুতি পরি । পূ-রিত
না-শুনে । আন পর । সঙ্গ- ॥
—গোবিন্দ দাস

ব্রজবুলিতে সাধারণতঃ সপ্তপর্বিক চরণে মধ্যে মধ্যে অপভ্রংশযুগীয় 'নরেন্দ্র' ছন্দের* অনুকরণে শব্দখণ্ডন ও তৎফলে ছন্দোহিন্দোল-সৃষ্টি দেখা যায়। সপ্তপর্বিক চরণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মধ্যবর্তী সংযোজক শব্দের দ্বিখণ্ডীকরণ নরেন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মূল চতুর্মাত্রিক ছন্দের দ্বিতীয় পর্বকে ত্রিমাত্রিক ও তৃতীয় পর্বকে পঞ্চমাত্রিক বলিয়া ভ্রম হয়। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুইটির দ্বিতীয় চরণে মোটা হরফের পর্বগুলি দ্রষ্টব্য :-

(১) তপত কি । রণ যদি অঙ্গনা । দগধল
কি করব । জল অভি । যে-কে-।
দুখ ভরে । **প্রা-ণ** **বাহিরে যব** । নিকসব
কি করব । ঔষধ বি । শে-খে- ॥
—মুরারি গুপ্ত

---

* নরেন্দ্র ছন্দের দৃষ্টান্ত :—
ফুল্লিঅ । কে-সু । চন্দ তহ । পঅলিঅ । মঞ্জরি । তেজ্জই । চু-আ-।
দক্খিণ । **বা-উ । সী-অভই** । পবহই । কম্প বি । ওইণি । হী-আ- ॥
—প্রা-পৈ, বর্ণবৃত্ত ২০৩

(২) মলু মলু । শ্যাম অনু । রা-গে- ।
মনোহর । **মধুর** **মুরতি নব** । কৈশোর
সদাই হি । যার মাঝে । জা-গে- ॥
—বসু রামানন্দ

মনে হইতে পারে—মোটা হরফের পর্বগুলি পরস্পর দৈর্ঘ্যগত অসমতা পর্ব-সম্মিতিহানি ও ছন্দপতন ঘটাইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা দৃষ্টি-বিভ্রমের ফল মাত্র। উচ্চারণকালে এইসকল ক্ষেত্রে পঞ্চমাত্রিক পর্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং অসম পর্বদ্বয়ের ৩+৫ মাত্রা শেষ পর্যন্ত ৪+৪ মাত্রায় বিভক্ত হয়; ফলে ছন্দ অসমপর্বিক না হইয়া সমপর্বিক হইয়া দাঁড়ায়। যথা—

(১) দুখ ভরে । প্র-াণ বা হিরে যব । নিকসব
কি করব । ঔষধ বি । শে-খে- ।
(২) মনোহর । মধুর মু রতি নব । কৈশোর
সদাই হি । যার মাঝে । জা-গে- ॥

কয়েকটি ক্ষেত্রে ছন্দোরচনায় শব্দবিশেষের সুকৌশল প্রয়োগের জন্য মনে হয়—এইসকল শব্দ অবিভাজ্য এবং পর্বে পর্বে সমতা সাধন সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিলে বুঝা যায়—এই বিশেষ শব্দগুলি দৃষ্টিতে মাত্র অবিভাজ্য, শ্রুতিতে নহে। পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলিতে মোটা হরফের শব্দগুলির উচ্চারণ দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) চম্পক । শো-ন কু । সুম কন । কা-চল
জিতল **'গ । উর'** তনু । লা-বণি । রে- ।
উন্নত । গী-ম **'সি । ইম'** নাহি । অনুভব
জগমন । মো-হন । ভা-ঙনি । রে- ॥
[চিহ্নিত শব্দের মূল 'গৌর' ও 'সীম']

(২) অঙ্কুর । তপন **'তা । আপে'** যদি । জা-রব
কি করব । বা-রিদ । মে-হে- ॥
[মূল শব্দ 'তাপে']

(৩) যো-তুহুঁ | হৃদয়ে **'প্রে | এম'** তরু | রো-পলি
শ্যা-ম জ | লদ রস | আ-শে- ।
সো-অব | নয়ন **'নি | ইর'** দেই | সী়ঁ-চহ
কহত হি | গোবিন্দ | দা-সে- ॥
[মূল শব্দ 'প্রেম', 'নীর']

চরণান্তে খণ্ডপর্বের ব্যাপক ব্যবহার ব্রজবুলি-মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য। ছন্দের ইতিহাসে খণ্ড অন্ত্যপর্বকে প্রথম দেখা যায় আর্যা ছন্দে, কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধিকাংশ ছন্দের চরণই খণ্ডপর্ব বর্জিত। অপভ্রংশের অনেকগুলি ছন্দে খণ্ডপর্ব দেখা যায়, কিন্তু চর্যাপদে 'দোহা' ব্যতীত অন্যত্র ইহাকে দেখা যায় না। পরবর্তী বাংলাতে ইহার হইয়াছে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা। বাংলায় খণ্ডপর্ব পূর্বযুগের মাত্রাছন্দের অনুকরণজাত বলিয়া মনে হয় না; কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বলবৃত্ত ছন্দ এবং উহার চরণান্তিক খণ্ডপর্ব, দুইই বাংলার নিজস্ব। যথা—

(১) দ́ধির' চু | প́ড়ি মোর' | প́ার' করি | দে́

(২) মো́রে নাহি | ছোঁ́া কাহ্নাই | বা́রাণসী | যা́

(৩) ক́র্থা পাবো | না́-ন্দো য | শো́-দার' | পো́ ইত্যাদি

অধিকাংশ খণ্ডপর্ব অন্ত্যপূর্ণপর্বেরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই পরিণতির ইতিহাস ব্রজবুলির মাত্রাবৃত্ত হইতে জানা যায়। অপভ্রংশ যুগের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং বাংলার আদ্য শ্বাসাঘাত ও অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বাংলা অন্ত্যপর্বের খণ্ডতা প্রাপ্তির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। প্রাচীন চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের অন্ত্যপর্বেরও দৈর্ঘ্য ছিল চতুর্মাত্রা কিন্তু অধিকাংশ অন্ত্যপর্ব ছিল দীর্ঘ দুই বর্ণে রচিত। যথা—

(১) স্মর সম | রো-চিত | বিরচিত | বে-শা- ।
দলিত কু | সুম দর | বিলুলিত | কে-শা- ॥

(২) চন্দন | চর্চিত | নী-ল ক | লে-বর | পী-ত ব | সন বন | মা-লী- ।
কে-লি চ | লন্মণি | কুণ্ডল | মণ্ডিত | গণ্ড যু | গ স্মিত | শা-লী- ॥

দীর্ঘ স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণে ইহাদের অন্ত্যপর্ব 'বেশা', 'কেশা', 'মালী,' 'শালী' প্রতিটিই চতুর্মাত্রিক এবং পূর্ণ পর্ব, মোটেই খণ্ড নহে। কিন্তু দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলির হ্রস্ব উচ্চারণ করিলে এইগুলি আর পূর্ণ পর্ব থাকে না, খণ্ডপর্বে পরিণত হয়। অপভ্রংশ যুগে যখন হইতে দীর্ঘ স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণ প্রচলিত হইয়াছে, তখন হইতেই দুই বর্ণের চতুর্মাত্রিক অন্ত্যপর্বে দ্বিমাত্রিক খণ্ডপর্ব-প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে। তারপর বাংলা ভাষায় যখন শব্দান্তে শ্বাসাঘাত দেখা দিয়াছে, তখন বহু শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব বা দুর্বল নহে, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাংলায় অধিকাংশ অকারান্ত শব্দই হইয়াছে হসন্তরূপে উচ্চারিত; যথা—'অরুণ্' 'সলিল্' 'দিবাকর্' ইত্যাদি। ব্রজবুলির মাত্রাবৃত্তে দেখা যায়, অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণের ফলে চতুষ্পর্বিক পাদাকুলক ও সপ্তপর্বিক জয়দেবীর গাথা বহুস্থলেই উহাদের অন্ত্য পর্বের পূর্ণতা নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিয়া নবজন্মলাভ করিয়াছে। যথা—

(১) কি কহব | রে-সখি | আনন্দ | ওর।
চিরদিনে | মা-ধব | মন্দিরে | মোর ॥

—বিদ্যাপতি

(২) সখিগণ | তে-জি চ | ললি এ- | কেশ্বরী | হেরি সহ | চরীগণ | ধায়।
অদভুত | প্রে-ম ত | রঙ্গে ত | রঙ্গিত | তে-জ্ঞি স | ঙ্গ নহি | পায় ॥

—জ্ঞানদাস

এই দুইটির অন্ত্যপর্ব হসন্ত 'ওর্' 'মোর্', ও 'ধায়্', 'পায়্' হইয়া উচ্চারিত হয়; 'ওর্-অ', 'মোর্-অ', 'ধায়্-অ', 'পায়্-অ' রূপে উচ্চারিত হয় না; কাজেই চতুর্মাত্রিক হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। দৃষ্টান্ত দুইটি পূর্ণ অন্ত্যপর্ব বিশিষ্ট পাদাকুলক ও গাথার আদর্শেই

রচিত, তথাপি বঙ্গীয় উচ্চারণে অন্ত্যপর্বের খণ্ডতার ফলে পৃথক্ ও নূতন ছন্দই বলিতে হইবে।

বাঙ্গালীর অন্ত্য খণ্ডপর্ব প্রীতির চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায় একাক্ষর অন্ত্যপর্ব প্রয়োগে। যথা—

(১) এ-ধনি | এ-ধনি | বচন শু | ন।
মা-ধব | মিলয়ে- | বহুত পু | ন॥

—চৈতন্য দাস

(২) জয় শচী | নন্দন | রে।
ত্রিভুবন | মণ্ডন | কলিযুগ | কা-ল ভু | জগ ভয় | খণ্ডন | রে॥

—গোবিন্দদাস

(৩) শুনলো রাজার | ঝি,
(তোরে) কহিতে আসিয়া | ছি,
কানু হেন ধন | পরাণে বধিলি | এ-কাজ করিলা | কি॥

—বাঙ্গালী বিদ্যাপতি

অসমদীর্ঘ চরণ লইয়া বিচিত্র স্তবক বন্ধন রচনা ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য, ব্রজবুলি এইখানে অপভ্রংশ যুগের চেষ্টাকে বহুদূর আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। সমদীর্ঘ চরণের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছিল সংস্কৃত ও প্রাকৃত যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীর কর্ণ ইহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই, বাঙ্গালী চর্যাকবি 'মুক্তক' রচনা করিয়া চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রকাশ করেন। ব্রজবুলির কবিরা মধ্যপন্থী। পুনরাবৃত্তিমূলক স্তবকই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই স্তবক বৈচিত্র্যপূর্ণ অ-সম চরণে রচিত। চরণের অসমতার দিক দিয়া প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের স্তবক বন্ধন দেখা যায় ব্রজবুলিতে। (বাংলায় ছন্দের সাধারণ চরণ চতুষ্পার্বিক অথবা সপ্তপর্বিক।) যথা—

(১) চতুষ্পার্বিক ছন্দে এক পর্বহীন চরণের সহিত পূর্ণ চরণের মিলন :—

০ ০ ০ ০ | হাম নব | নায়রী মা | ধাই।
বলে জনু | পরশহ | মদন দো | হাই ॥

—নৃপ বৈদ্যনাথ

(২) দ্বিপর্বহীন একটি চরণের সহিত পূর্ণ চরণের মিলন :—

০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | তুয়া দরশন | কাজে।
আধ পদচারি | করত সুন্দরি | বাহির দেহলী | মাঝে ॥

—যশোরাজ খান

(৩) দ্বিপর্বহীন দুইটি খণ্ড চরণের সহিত একটি পূর্ণ চরণের মিলন :—

০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | (ধনী) অলপ বয়সী | বালা,
০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | (জনি) গাঁথল পুহপ | মালা,
থোরি দরশনে | আশা না পুরল | রহল মদন | জ্বালা ॥

—বাঙ্গালী বিদ্যাপতি

(৪) দুইটি দ্বিপর্বিক পর্ববন্ধের* সহিক একটি দ্বিপর্বিক চরণের সংযোগে নূতন ষট্‌পর্বিক চরণের রূপায়ণ :—

কিয়ে অপরূপ | ঝুলন কে-লি
শ্যা-ম হৃদয়ে | হৃদয় মে-লি
রা-ধা-রহু | জা-গি।
অপরূপ রূপ | কি দিব তুল
ইন্দিবর মাঝে | চম্পক ফুল
নব নব অনু | রা-গী ॥

—উদ্ধব দাস

(৫) দুইটি দ্বিপর্বিক পর্ববন্ধের সহিত একটি চতুষ্পার্বিক পূর্ণ চরণের সংযোগে নূতন অষ্টপর্বিক চরণ রচনা :—

(i) আ-জু বিপিনে | আওত কা-ন
মূরতি মূরত | কুসুম বা-ণ

---

* চরণান্তর্গত স্বতন্ত্র পর্বগুচ্ছের নাম পর্ববন্ধ পৃঃ ৪৭ দ্রষ্টব্য।

জম্বু জলধর | রুচির অঙ্গ | ভাও নটবর | শোহনী।
ঈষত হসিত | বদন চন্দ
তরুণী নয়ন | বয়ন ফন্দ
বিম্ব অধরে | মুরলী খুরলী | ত্রিভুবন মন | মোহনী ॥
—গোবিন্দ দাস

[তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—
পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট | চম্পক বনে
স্নানে চলেছেন | যত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণা।]

(ii) স্বর্ণ বর্ণ বি | বর্ণ ভৈ গেল
পূর্ণ বিধুমুখ | তূর্ণ নীরসল
নয়ন পঙ্কজ | নীর হি ভী-গল | হিয়াক অম্বর | গো।
মা-ন ভেল তুয়া | প্রা-ণ গ্রা-হক
নহিলে উপেখসি | রসিক না-য়ক
যো ভেল সো-ভেল | অবহু অবুধিনী | আপন সম্বর | গো ॥
—চন্দ্রশেখর

[তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—
বিদায় বেলা এল | মেঘের মতো ব্যেপে
গ্রন্থি বেঁধে দিতে | দুহাত গেল কেঁপে
সেদিন থেকে থেকে | চক্ষু দুটি ছেপে | ভরে যে এল জল | ধারা।]

সংস্কৃতে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের প্রধান পার্থক্য স্বাধীনতাগত, অক্ষরবৃত্তে প্রতি অক্ষর নির্দিষ্ট—হ্রস্ব বা দীর্ঘ বর্ণে বদ্ধ, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে অক্ষর স্বাধীন। এই স্বাধীনতা-স্পৃহা বাঙ্গালীর মজ্জাগত। যখনই বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের কোন ছন্দোবন্ধকে ব্রজবুলিতে চালাইতে গিয়াছেন, তখনই অক্ষরবৃত্তের বন্ধন অস্বীকার করিয়া উহা মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কবি নৃসিংহ ব্রজবুলিতে তোটক প্রয়োগ করিয়াছেন —

(ব্রজ) নন্দকি | নন্দন | নী-ল ম | ণি।
(হরি) চন্দন | তি-লক | ভা-লে ব | নি ॥

কিন্তু আদ্যন্ত এই প্যাটার্ন রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই ; এই কবিতার শেষ দুই চরণ হইয়াছে :—

(সু) রা-সুর | লজ্জিত | শান্ত ম | নে।
(পদ) সে-বক | দে-ব নৃ | সিংহ ভ | ণে ॥

লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানে অতিপর্ব-অংশে দুই অক্ষরের পরিবর্তে একাক্ষর 'সু' (সুরাসুর) প্রয়োগে তোটকত্ব খণ্ডিত হইয়া ছন্দ মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে। নৃসিংহের নিম্ন দৃষ্টান্তের প্রথম চরণ তোটকের, কিন্তু দ্বিতীয় চরণ অতিপর্বহীন স্বাধীন মাত্রাবৃত্তের ;—

(নব) নী-রদ | নী-ল সু | ঠা-ম ত | নু।
ঝলমল | ও-মুখ | চন্দ জ | নু ॥

যেখানে মূল তোটকের ধ্বনি অক্ষুন্ন, সেখানেও চরণ-বিন্যাসে তোটকের অভিনবত্ব সুস্পষ্ট :—

(যব) নন্দ সু | নন্দন | পা-দে প | ড়ে
(তব) কো-প ব | ঢ়ে,
(অভি) মা-ন চ | ঢ়ে ॥

—শশিশেখর

আধুনিক যুগের বাংলা 'তোটক' তুলনীয় :—

(নিজ) বা-স ভু | মে
(পর) বা-সী হ | লে।
(পর) দা-স খ | তে
(সমু) দা-য় দি | লে ॥

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

—ইহারই সুপরিণত ও স্বাধীনতর মাত্রাবৃত্ত-রূপ সত্যেন্দ্রনাথের 'সুধা' কবিতায়—

(সুধা) ছিল নিঝু | মে
(বুঝি) মগন ঘু | মে,
(তব) প্রথম চু | মে
(এল) মরত ভু | মে ॥······

—ফুলের ফসল

সপ্তদশ অধ্যায়

বাংলা অক্ষরবৃত্তের প্রসার

অক্ষরবৃত্ত বাংলার নিজস্ব ছন্দ। বৈদিক ছন্দও অক্ষরছন্দ, কিন্তু বাংলা অক্ষরবৃত্ত বৈদিক ভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই; ইহা বঙ্গজ ধামালী বা বলবৃত্তেরই পরিণত রূপ এবং সেই হিসাবে বঙ্গীয়। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ অক্ষরবৃত্তেই সর্বাধিক পরিস্ফুট। বলবৃত্তের শ্বাসাঘাত-যুক্ত উচ্চারণ হ্রস্ব বাক্‌পর্বে স্বাভাবিক হইলেও দীর্ঘ বাক্‌পর্বে অস্বাভাবিক। মাত্রাবৃত্তের উচ্চারণ আবার অধিকতর কৃত্রিম; ইহাতে সকল হলন্ত অক্ষর বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চার্য। সাধারণ বাংলা গদ্যে হলন্ত অক্ষর শব্দের আদিতে বা মধ্যে থাকিলে সংশ্লিষ্ট ভাবে এবং শব্দান্তে থাকিলে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। যথা, বঙ্গীয় উচ্চারণে 'বৈদান্তিক' শব্দের 'বৈ' এবং 'দান্‌' হয় সংশ্লিষ্ট এবং 'তিক্‌' হয় বিশ্লিষ্ট। বাংলা গদ্যের এই সাধারণ উচ্চারণভঙ্গি অক্ষরবৃত্তেরও রীতি। বলবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের তুলনায় অধিকতর স্বাভাবিক উচ্চারণের জন্য অক্ষরবৃত্ত হইয়াছে বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান ছন্দ। প্রাচীন বাংলায় অন্য দুইজাতীয় ছন্দের স্থান সংকীর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল চর্যাপদে ও ব্রজবুলি পদে, বলবৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল লোকসঙ্গীতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, বাউল গানে, শ্যামাসঙ্গীতে এবং মৈমনসিংহ গীতিকায়। অপরপক্ষে অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগ বহুল ও ব্যাপক; বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ সাহিত্যে, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি জীবনী কাব্যে, মনসামঙ্গলাদি মঙ্গলকাব্যে এমনকি বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতেও হইয়াছে অক্ষরবৃত্তের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা।

অক্ষরবৃত্তের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ইহাতে প্রথমে বাহ্য সুর সংযোগ ও পরে সুর মুক্তি। দীর্ঘ অষ্টাক্ষর পর্বিক বা দশাক্ষর পর্বিক ছন্দ হিসাবে অক্ষরবৃত্ত চিরকাল 'তান'-প্রধান ছন্দ, কিন্তু 'সুর'-প্রধান ছন্দ নহে। 'তান' সাধারণ উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা ঈষৎ টান বা স্বর-সম্প্রসারণ, কিন্তু 'সুর' কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পন সংখ্যা-ভিত্তিক পৃথক্ সাঙ্গীতিক ব্যাপার। এই সুরই প্রাচীন অক্ষরবৃত্তকে আধুনিক অক্ষরবৃত্ত হইতে পৃথক্ করিয়াছে। আধুনিক অক্ষরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কেবল 'তান'; প্রাচীন অক্ষরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কেবল তান নহে, 'সুর'ও বটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অক্ষরবৃত্তের আবির্ভাব কালেই ইহাতে সুর সংযোগ ঘটে। অক্ষরবৃত্তের পক্ষে এই সুর সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও বহিরাগত। সংস্কৃত রামায়ণাদির বঙ্গানুবাদই অক্ষরবৃত্তে সুরসংযোজনের জন্য দায়ী। বৈদিক ভাষা ছিল সুরে উচ্চার্য অর্থাৎ 'গেয়'। সংস্কৃত ভাষা 'গেয়' ছিল না, তথাপি সভা-রঞ্জনের উদ্দেশ্যে পাঠক ও কথকেরা বেদগানের অনুকরণে কৃত্রিম সুরের সহযোগে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতেন। এই প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এইপ্রকার সুরসহযোগে উচ্চারণের কৃত্রিমতা সংস্কৃত শ্লোক হইতে বাংলা অক্ষরবৃত্তে সংক্রামিত হয়।

পঞ্চদশ শতকে কবি কৃত্তিবাস রামায়ণকে এবং মালাধর বসু ভাগবতকে সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদ করেন। উভয়ত্র মূল গ্রন্থের প্রধান ছন্দ অষ্টাক্ষর পর্বিক অনুষ্টুপ্। সেইজন্য কবিদ্বয় বাংলা অনুবাদে হ্রস্বপর্বিক মাত্রাছন্দকে গ্রহণ না করিয়া অষ্টাক্ষর-পর্বিক অক্ষরবৃত্ত—পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাজেই পুরাণ পাঠকেরা রামায়ণাদির পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীকেও অনুষ্টুপ্ ছন্দ উচ্চারণের মতো কৃত্রিমসুরে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এইপ্রকার সুরযুক্ত পাঠ কমপক্ষে তিন শত বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। পরিশেষে উনবিংশ শতকে ইংরেজ আমলে অক্ষরবৃত্তের

সুরমুক্তি ঘটে। মাইকেল মধুসূদন পুরাতন পয়ার ছন্দকে অমিত্রছন্দে পরিণত করেন। এই ছন্দে চরণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অপ্রত্যাশিত বাক্য বিরতি ও বাক্য সূচনায় কৃত্রিম সুরস্রোত অবিরত বাধা পাইয়া শেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে উনবিংশ শতক হইতে বাংলা রামায়ণাদি কাব্যেরও 'গান' নহে, 'পাঠ'ই প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, পর্বদীর্ঘতা বশতঃ অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক 'তান' অদ্যাপি বর্তমান আছে।

অক্ষরবৃত্তে অধুনাবিলুপ্ত কৃত্রিম সুর প্রাচীন বাংলা কাব্যের বহুপ্রকার ত্রুটি ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী। কৃত্রিম সুরের আশ্রয় পাইয়াই বহু পঙ্গু, নীরস, গদ্যাত্মক রচনা কাব্যরূপে বাংলা সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে; ছন্দোগত ত্রুটিও এই সুরের জন্য শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপীড়া উৎপন্ন করে নাই। প্রাচীন অক্ষরবৃত্তে প্রধান ছন্দত্রুটি দ্বিবিধ। প্রথম ত্রুটি পর্ব-দৈর্ঘ্যের আদর্শচ্যুতি। পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর আদর্শ চরণ যথাক্রমে ৮+৬ ও ৮+৮+১০ অক্ষরে রচিত; কিন্তু প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বহু স্থলে এই আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, পর্বে অক্ষর সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির নিম্নরেখ পর্ব দ্রষ্টব্য :—

[আধুনিক হসন্ত শব্দ প্রাচীন অক্ষরবৃত্তে অকারান্তরূপে উচ্চার্য।]

পয়ার—

(১) গুণ নাহি অধম মুঞি | নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম | গুণরাজ খান॥

—শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

(২) মুড়া লই ফেলা ফেলি | কেহ নাহি খায়ে।
মাচার তলে থাকি বিড়াল | আড় চোখে চাহে॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

(৩) মহাদেবের শিষ্য তুমি | আমার হও ভাই।
আমাকে মন্দ বোলি তুমি | বাড়াহ বড়াই॥

—নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল

দীর্ঘ ত্রিপদী—

(১) নস্কর পরাগল খান দাতাকর্ণ সমান
দরিদ্র পূজয়ে নিতি নিতি।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র করি জোড় হাতে
সভাপর্ব সমাপ্ত ইতি॥

—পাণ্ডব বিজয়

(২) চৈতন্ত লীলা সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

(৩) ডিহিদার আরোজ রোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্ত গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

দ্বিতীয় ছন্দ-ত্রুটি হইতেছে—অক্ষরবৃত্তের পর্বে শব্দ-সমাবেশের স্বাভাবিক ক্রম অস্বীকার। অক্ষরবৃত্তের পর্বে যুগ্মাক্ষর ও অযুগ্মাক্ষর শব্দের সহচারিতা হয় না; যুগ্মাক্ষর শব্দের পরে যুগ্মাক্ষর শব্দ এবং অযুগ্মাক্ষর শব্দের সহিত অযুগ্মাক্ষর শব্দ ব্যবহার্য (৫ম সূত্র, ৯ম অধ্যায়)। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বহু স্থলে এই রীতিও লঙ্ঘিত হইয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই এ-কথা বুঝা যাইবে। প্রাচীন বাংলায় অক্ষরবৃত্তে সংযোজিত কৃত্রিম সুর ছন্দোধ্বনিকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল; ফলে শ্রোতৃবৃন্দ সুরেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, ছন্দ-ত্রুটি লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইতেন না।

প্রাচীন অক্ষরবৃত্তের সুর সর্বাধিক ক্ষতি করিয়াছে ভাষাপরিচয়ের ক্ষেত্রে। ইহা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিকে বহুকাল চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। ইহা বাংলা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ লুকাইয়াছে। পঞ্চদশ শতকেই কথ্য বাংলা শব্দের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত সুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের 'আতি' (অতি), 'আনুমতি' (অনুমতি), 'আনুপম' (অনুপম), 'নান্দন' (নন্দন), 'রান্ধন' (রন্ধন), 'মাহাযোগী' (মহাযোগী) প্রভৃতি শব্দের আদ্যক্ষরে স্বরবৃদ্ধি শব্দাদ্যের শ্বাসাঘাতকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, শ্বাসাঘাতের প্রভাবে যোড়শ শতাব্দী হইতেই কথ্য বাংলায় অকারান্ত শব্দের অন্ত্য 'অ' দুর্বল হইতে সুরু করে এবং সপ্তদশ শতকে একেবারে লোপ পায়,—'অ'-কারান্ত ফল, রাম, সলিল, অরুণ প্রভৃতি শব্দ হসন্ত ফল্, রাম্, সলিল্, অরুণ্ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে অক্ষরবৃত্তের সুর এই শ্বাসাঘাত ও শ্বাসাঘাত-জাত শব্দ-পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকারই করিয়াছে। সেইজন্য যোড়শ, সপ্তদশ, এমনকি অষ্টাদশ শতকেও কবিগণ অক্ষরবৃত্তে ব্যবহার্য স্বাভাবিক হসন্ত শব্দকেও প্রাচীন উচ্চারণ অনুযায়ী অ-কারান্ত কল্পনা করিয়া কৃত্রিম উচ্চারণে কাব্য রচনা করিয়াছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে রচিত নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলির চরণান্তিক মিলের (rhyme) দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, তৎকালোচিত স্বাভাবিক হসন্ত উচ্চারণের পরিবর্তে এইগুলিতে প্রাচীন যুগীয় অস্বাভাবিক অ-কারান্ত উচ্চারণই চালানো হইয়াছে; এই অন্ত্য মিল গুলিই হইতেছে তাৎকালিক সাহিত্যিক উচ্চারণের 'টেপ-রেকর্ড'। যথা—

(১) যেই শিব সেই আমি যে-আমি সে শিব্-অ।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
—ব্যাসের শিব নিন্দা, অন্নদামঙ্গল

(২) নীলবর্ণ কণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ্-অ।
নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত ॥

—কাশীদাসী মহাভারত

(৩) অপর আপনি লবে সবাকার তত্ত্ব।
পিতামাতার চরণে জানিবে দণ্ডবৎ-অ ॥

—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল

(৪) হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকর-শেখর শঙ্কর্-অ ॥

—শিব বন্দনা, অন্নদামঙ্গল

—দৃষ্টান্তের পদান্তিক নিম্ন-রেখ শব্দগুলিতে উক্তপ্রকার কৃত্রিম অ-কারান্ত উচ্চারণ না করিয়া সেকালের স্বাভাবিক হসন্ত উচ্চারণ করিলে পদে পদে মিল বজায় থাকে না। সেকালে কৃত্রিম সুর-সহযোগে অক্ষরবৃত্ত পঠিত হইত বলিয়া উহার শব্দোচ্চারণে কৃত্রিমতা কর্ণপীড়া উৎপন্ন করে নাই। ঊনবিংশ শতকে অক্ষরবৃত্তে সুরবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হসন্ত-শব্দে অকারান্ত উচ্চারণের কৃত্রিমতা অনাবৃত ও অসহ হইয়া পড়ে; ফলে তখন হইতে কবিগণ অক্ষরবৃত্তে হসন্ত শব্দকে হসন্তরূপেই ব্যবহার করিতে থাকেন।

মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রেও অক্ষরবৃত্তের আধিপত্য-বিস্তার ষোড়শ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ষোড়শ শতাব্দীতে দশাক্ষর পর্বের ক্ষেত্র (দিগক্ষরা) ও অষ্টাক্ষর পর্বের ক্ষেত্র (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী) ছাড়াও হ্রস্বতর দৈর্ঘ্যের অন্যান্য পর্বের ক্ষেত্রেও অক্ষরবৃত্ত-রীতিতে ছন্দোগঠনের চেষ্টা হয়। চর্যাপদে ও ব্রজবুলি পদে মাত্রাবৃত্ত রীতিতে রচিত কয়েকটি হ্রস্বপর্বিক ছন্দ পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। জয়দেবের সময় হইতেই চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, ষণ্মাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্বের ছন্দ ছিল মাত্রাবৃত্ত গোত্রীয়; ইহাদের হলন্ত অক্ষর

মাত্রই ছিল বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চার্য। কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ যে কৃত্রিম—এসম্বন্ধে যোড়শ শতকের কবিগণ সচেতন হইয়া ওঠেন। তাঁহাদের ধারণা হয়—চর্যাভাষা ও ব্রজবুলি ভাষা কৃত্রিম এবং সেই হিসাবে এই দুই ভাষায় হলন্ত অক্ষরের কৃত্রিম উচ্চারণ চলিতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলায় কৃত্রিম উচ্চারণ অসঙ্গত ; বাংলা ছন্দ-পর্ব দীর্ঘই হউক, হ্রস্বই হউক, তাহা স্বাভাবিক বাঙ্গালী উচ্চারণকে ভিত্তি করিয়াই রচিতব্য। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই কবিগণ বাংলা চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর,[১] যড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের ছন্দেও গদ্যোচিত অক্ষরবৃত্তের ভঙ্গি অর্থাৎ শব্দের আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ এবং অন্ত্য হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রয়োগ করেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়, সমদীর্ঘ পর্বের ছন্দে একই কবি ব্রজবুলিতে মাত্রাবৃত্ত রীতি ও বাংলায় অক্ষর-বৃত্ত রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত নিম্নের হ্রস্বপর্বিক নিম্নরেখ শব্দাবলীতে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ দ্রষ্টব্য ঃ—

(ক) চতুরক্ষর পর্ব ঃ—

(১) কষিতে ক | ষিল নহে | কুন্দন হে | ম।
তুলনা দি | বার নাহি | হুঁহার প্রে | ম॥

—গোবিন্দদাস

১। বিশুদ্ধ বাংলায় পঞ্চাক্ষর পর্বের প্রাচীন অক্ষরবৃত্ত দুর্লভ। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'বাসবদত্তা' কাব্যেই বোধ হয় প্রথম পঞ্চাক্ষর পর্বিক অক্ষরবৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা— হৃদি বিলসে | পট্ট বসনা।
কুচ কলসে | কৃত কসনা॥......

—কামিনীর সজ্জা, বাসবদত্তা

(২) করভের | কর জিনি | বাহুর ব | লনি গো
হিঙ্গুল ম | ণ্ডিত তার | আগে।
যৌবন ব | নের পাখী | পিয়াসে ম | রয়ে গো
উহারি প | রশ রস | মাগে॥

—শ্রীনিবাস আচার্য

(খ) ষড়ক্ষর পর্ব—

(১) লঘু ত্রিপদী :—

কলঙ্ক পানায় | সদা লাগে গায় | ছানিয়া খাইলুঁ | যদি।
অন্তরে বাহিরে | কুটুকুটু করে | সুখে দুখ দিল | বিধি॥

—চণ্ডীদাস

(২) লঘুভঙ্গ ত্রিপদী :—

(সখি) হের দেখ'সিয়া | বা।
নিন্দ যায় ধনী | ও চান্দ বদনী | শ্যাম অঙ্গে দিয়া | পা॥

—জগন্নাথ দাস

(৩) একাবলী :—

আনিব তুলিয়া | গগন ফুল।
একেক ফুলের | লক্ষেক মূল॥
সে ফুল গাঁথিয়া | পরাব হার।
সোনার বাছারে | না কান্দ আর॥

—মুকুন্দরাম (চণ্ডীমঙ্গল)

(৪) মিশ্র একাবলী :—

মালিনী আনিল | ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন | বনের সার
বিবিধ বন্ধন | জানে কুমার
সহায় হইলা | কালিকা।

কুসুম আকর | কিঙ্কর তায়
মলয় পবন | গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী | গুণ গুণায়
ভুলিবে নৃপতি | বালিকা ॥

—ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর

(গ) সপ্তাক্ষর পর্ব :—

(১) সুশীলা রূপবতী | হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিল আ | সনে।
যতেক দ্বিজমণি | করেন বেদধ্বনি
কস্তার গন্ধাধি বা | সনে ॥

—মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল

(২) পূজার সমাধানে | প্রণমি সাবধানে | সকলে পাইলেন | বর।
অন্নদা পদতলে | বিনয় করি বলে | ভারত রায় গুণা | কর ॥

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল

বিশুদ্ধ বাংলায় চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর, ষড়ক্ষর ও সপ্তাক্ষর পর্বের ছন্দে উক্তপ্রকার অক্ষরবৃত্তোচিত উচ্চারণ প্রাক্-রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। মানসী কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই রীতির পরিবর্তন করিয়া হ্রস্বপর্বিক ছন্দে মাত্রাবৃত্তরীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত খেয়ালে এই রীতি পরিবর্তন হয় নাই; রীতি পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। শব্দের আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ সাধারণ গদ্যে ও পয়ারাদি দীর্ঘপর্বিক ছন্দে কৃত্রিম বলিয়া বোধ হউক না কেন, ইহা হ্রস্বপর্বিক ছন্দের বিশেষ ক্ষেত্রে সুসঙ্গত। প্রাকৃত, সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষার হ্রস্বপর্বিক ছন্দেও হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রচলিত ছিল; বহুযুগের অভ্যাসে হ্রস্বপর্বিকতার ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই ভারতের স্বভাবীকৃত হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার রবীন্দ্র-পূর্ব কবিরা হ্রস্বদীর্ঘ সকল

পর্বের ছন্দেই আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরে কেবল সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ চালাইতে চাহিয়াছিলেন; এইখানেই ভুল হইয়াছিল। অবস্থাভেদে রীতিপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ অবস্থায় যাহা কৃত্রিম, বিশেষ অবস্থায় তাহা অকৃত্রিম হইয়া উঠে। স্থলে সাঁতার কাটা কৃত্রিম হইলেও জলে অকৃত্রিম। সেই প্রকার শব্দের আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ দীর্ঘপর্বের ছন্দে অসঙ্গত হইলেও হ্রস্বপর্বের ছন্দে সঙ্গতই বটে। "লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদ-মর্যাদা",[১] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সমস্ত পয়ারজাতীয় ছন্দ বা অক্ষরবৃত্তের মূলতত্ত্ব। পর্ব দৈর্ঘ্য অষ্টাক্ষরের কম হইলে উহাতে অক্ষরবৃত্ত-ধর্ম তিষ্ঠিতে পারে না, মাত্রাবৃত্ত ধর্মই আসিয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ জোর করিয়া বাংলা হ্রস্বপর্বের ছন্দেও অক্ষর-বৃত্ত-ধর্ম চালাইয়াছেন বটে, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বভাবসঙ্গত মাত্রাবৃত্তধর্ম আপনা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি বিশুদ্ধ প্রাচীন বাংলারই দৃষ্টান্ত, ব্রজবুলি বা চর্যার দৃষ্টান্ত নহে। প্রথানুসারে এইগুলিতে অক্ষরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রত্যাশিত, তথাপি কবিদের সূক্ষ্ম শ্রুতি তাঁহাদের অজ্ঞাতে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করাইয়াছে। দৃষ্টান্তে মোটা হরফের শব্দগুলি দ্রষ্টব্য :—

(ক) চতুরক্ষর পর্বে :—

(১) **চন্দ্র** ব | দনী ধনী | মৃগ নয় | নী।
রূপেগুণে | অনুপমা | রমণী ম | ণি ॥

—রঘুনাথ দাস, পদকল্পতরু ২৪৬

(২) **দক্ষের** | নিজশির | কা-টিয়া | মহাবীর | ফে-লিল | **যজ্ঞের** | **কুণ্ডে**
মুকুন্দ | নিবেদন | শুন গো- | জগজন | মহাদেব | **নিন্দার** | **দণ্ডে** ॥

—মুকুন্দ রাম, চণ্ডীমঙ্গল

১। পৃঃ ১৪২ র-র (১৪)

(৩) জয় জগ | **দীশ্বর** | জয় জগ | **দম্বে** ।
জয় ভব | রা-ণী- | ভব শ্বব | **লম্বে** ।
শিব শিব | কা-য়া- হর হর | জা-য়া-
পরিহর | মা-য়া- | অব অবি | **লম্বে** ॥

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল

(খ) ষড়ক্ষর পর্বে :—

(১) এমন কঠিন | নারীর পরাণ | বাহির নাহিক | হয় ।
না জানি কি জানি | হয় পরিণামে | দাস **গোবিন্দ** | কয় ॥

—গোবিন্দ দাস, প-ক-ত, ১৫২

(২) প্রভাতে জাগিল | **গৌর** চান্দ ।
হেরই সকলে | বয়ন ছান্দ ॥

—যদুনাথ দাস, প-ক-ত ২৫১২

(৩) নগ**নন্দিনি** | সুর **বন্দিনি** | রিপু **নিন্দিনি** | গো ।
জয় কা-রিণি | ভয় হা-রিণি | ভব তা-রিণি | গো ॥

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল

(৪) কহিছে প্রসাদ | না কর বিবাদ | পড়িল প্রমাদ | স্বরূপে গণি ।
(সমরে) হবে না জয়ী রে | **ব্রহ্ম**ময়ীরে | করুণাময়ীরে | বল জননী ॥

—রামপ্রসাদ, শাক্ত পদাবলী

(৫) জয়তি জয়তি | ধরণী-পতি | জয়তি জয়তি | রা-ম ।
জনক নৃপতি | দুহিতা-পতি | **নির্মল** গুণ | ধা-ম ॥

—রঘুনন্দন, রাম রসায়ন

উল্লিখিত বিশেষ দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যায় যে হ্রস্বপর্বিক ছন্দে বঙ্গীয় অক্ষরবৃত্তধর্ম স্বাভাবিক নহে, এইগুলিকে বঙ্গীয় অক্ষরবৃত্ত করিতে গেলে ইহারা ভারতীয় মাত্রাবৃত্তেই পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ চতুরক্ষর হইতে সপ্তাক্ষর পর্বের ছন্দের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। তিনশত বৎসরের অধিক-কাল লঘুত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি হ্রস্বপর্বিক ছন্দ অক্ষরবৃত্ত রূপে
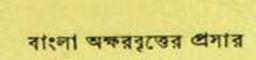
প্রচারিত হইলেও উহারা স্বভাবতঃ মাত্রাবৃত্ত জাতীয়। সূক্ষ্ম শ্রুতিধর রবীন্দ্রনাথ এই সত্য সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি হ্রস্বপর্বিক বাংলা ছন্দে অক্ষরবৃত্ততার পরিবর্তে মাত্রাবৃত্ততার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ছন্দোজগতে ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

মাত্রাছন্দের অনুকরণে বাংলায় বিচিত্র হ্রস্বপর্বিক অক্ষরবৃত্ত-ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী হইতে নূতন নূতন ছন্দের গঠন কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছে। শূন্য হইতে নূতনের উৎপত্তি হয় না, সাধারণতঃ অভ্যস্ত ও পুরাতন বস্তুর অল্পবিস্তর পরিবর্তনেই নূতনের আবির্ভাব ঘটে। পুরাতন পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীই প্রকৃত পক্ষে নূতন নূতন অক্ষরবৃত্ত ছন্দোগঠনের উপাদান। ষোড়শ শতক হইতেই অক্ষরবৃত্তে নূতন ছন্দোগঠনের চেষ্টা হয়। পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর চরণের মধ্যে (১) একাধিক মিল বসাইয়া, (২) পর্ব-বিলোপ বা পর্ব-সংযোগ করিয়া অথবা (৩) অতিপর্বিক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করিয়া কয়েকটি নূতন ছন্দ রচিত হয়। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম এবিষয়ে অগ্রগণ্য। তিনিই সম্ভবতঃ 'ভঙ্গপয়ার' প্রবর্তনের জন্য দায়ী। পয়ারের প্রথম অষ্টাক্ষর পর্ব বাদ দিয়া, ষড়ক্ষর অন্ত্যপর্বে দুই অক্ষরের অতিপর্ব যোগ করিয়া ও সমস্তটিকে পুনরুক্ত করিয়া অপর একটি পূর্ণ পয়ার-চরণের সহিত মিলনে 'ভঙ্গ পয়ার' রচনা করা হইয়াছে। নামে দুই চরণের 'পয়ার' হইলেও ইহা আসলে দুইটি খণ্ড ও একটি পূর্ণ মোট তিন চরণের স্তবক বা ত্রয়ী। একটানা প্রবাহিত পয়ারকে বৈচিত্র্য মণ্ডিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে 'ভঙ্গপয়ার' ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

ফুল্লরার কত আছে । কর্মের বিপাক ।
মাঘ মাসে কাননে তু । লিতে নাহি শাক ॥

(দুঃখ) কর অবধান।
(দুঃখ) কর অবধান।
জাহু, ভাহু, কৃশাহু শী | তের পরিত্রাণ ॥

—ফুল্লরার বারমাস্যা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে বন্ধনীবদ্ধ শেষ তিনটি চরণই 'ভঙ্গ পয়ার'। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নায়ক 'সুন্দর' আত্মপরিচয় দিয়াছে এই ছন্দে :—

(শুন) শ্বশুর ঠাকুর।
(শুন) শ্বশুর ঠাকুর।
আমার পিতার নাম | বিদ্যার শ্বশুর ॥

কিন্তু যখনই ইহার দ্ব্যক্ষর অতিপর্ব ষড়ক্ষর প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের অঙ্গীভূত হইয়া উহাদিগকে অষ্টাক্ষরপর্বে পরিণত করিয়াছে, তখনই ভঙ্গ পয়ার আর তিন চরণের ছন্দ থাকে নাই, চতুষ্পর্বিক এক চরণের ছন্দে পর্যবসিত হইয়াছে। যথা—

নিদারুণ মাঘ মাস,
নিদারুণ মাঘ মাস,
সর্বজন নিরামিষ | কিংবা উপবাস ॥

—এই প্রকারের একচরণস্থ ভঙ্গপয়ারের সাধারণ ঘটনা নহে, বিশেষ ঘটনা।

ভঙ্গপয়ারের ভাষাগত পুনরুক্তি আধুনিক যুগে অচল। ঊনবিংশ শতকে ইহাকে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা'য় দেখা যায়। ভঙ্গপয়ারে রঙ্গলাল ভাষার পুনরুক্তি বর্জন করিয়াছেন এবং প্রথম চরণের দ্ব্যক্ষর অতিপর্বকে চতুরক্ষর করিয়াছেন। যথা—

(ধর সবে) মনোহর বেশ,
(বাঁধ) বিনাইয়া কেশ।
চলহ অমরাবতী | করিব প্রবেশ ॥

—সহচরীদের প্রতি উৎসাহ বাক্য

মদন মোহন পুনরুক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া ত্রিপাদ ভঙ্গপয়ারকে দ্বিপাদে পরিণত করিয়াছেন—

(তারা) সব সখীগণ।
প্রবেশ করিল কামি | নীর নিকেতন ॥
(ধনী) বিনত বদনে।
এসো এসো বসো বলি | তোষে সম্বোধনে ॥

—বাসবদত্তা

মদন মোহনের এ-ছন্দের বিপরীত মূর্তি দেখাইয়াছেন ঈশ্বর গুপ্ত। ইনি দ্বিতীয় চরণে প্রথম চরণের অন্ত্যপর্বের ভাষার পুনরুক্তি করিয়াছেন—

লাঠালাঠি কাটাকাটি | কিসে তুমি কম।
(বাবা) কিসে তুমি কম।
ফাইট লড়েগা ফের | কম্ কম্ কম্
(বাবা) কম্ কম্ কম্ ॥

—কানকাটা

রবীন্দ্রনাথ আবার ঈশ্বরগুপ্তের পুনরুক্তি বর্জন করিয়া এবং অতিপর্বিক অংশ বাদ দিয়া ইহাকে নবরূপ দিয়াছেন—

আধ ঢাকা আধ খোলা | ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়।
প্রেমের বারতা আনে | হৃদয়ের মাঝে,
সঙ্গে আনে ভয় ॥

—প্রকৃতির প্রতি, মানসী

—এই ছন্দেই অক্ষয় বড়াল 'এষা' কাব্যের শোক-বিষয়ক দ্বিতীয় কবিতা এবং সুবিখ্যাত 'মানব-বন্দনা' রচনা করিয়াছেন।

পর্ব মধ্যে একাধিক অনুপ্রাস (মিল) প্রয়োগে পয়ার ছন্দের বৈচিত্র্য বিধান দেখা যায় 'তরল' ও 'মালঝাঁপ' পয়ারে। পয়ারের অষ্টাক্ষর পর্বে চতুর্থাক্ষর ও অষ্টমাক্ষর অনুপ্রাসে বদ্ধ করিয়া উহার নাম

দেওয়া হইয়াছে—'তরল পয়ার'। সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাস বাংলা মহাভারতে এই তরল পয়ারে অর্জ্জুনের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

দেখ দ্বিজ মনসিজ | জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম | নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি | করিয়াছে শোভা ॥

কবি রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই তরল পয়ারে 'সুন্দরে'র মাল্য রচনা বর্ণনা করিয়াছেন। তরল পয়ারের চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরের সহিত দ্বাদশ অক্ষরকেও মিলবদ্ধ করিয়া উহাকে 'মালঝাঁপ পয়ার' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

দন্তাবলি শিশু অলি | কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অনু কামধনু | হেমতনু সাজে ॥

—এই মালঝাঁপে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের কোতোয়াল চোর-ধরার উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে, রঙ্গলালের 'কর্মদেবী' কাব্যে 'যোধমল' ও 'সাধু' মল্লযুদ্ধ করিয়াছে এবং 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' চিতোর অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই তরল ও মালঝাঁপ পয়ার যেভাবে বঙ্গ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটিকে নূতন ছন্দো-গঠনের সার্থক দৃষ্টান্ত বলা চলে না। ইহারা শেষ পর্যন্ত পয়ারই থাকিয়া গিয়াছে; ইহারা হইয়াছে বিচিত্রিত বা অলংকৃত পয়ার। এই দুইটিতে চারি চারি অক্ষরে অনুপ্রাস প্রয়োগের পশ্চাতে কবিগণের উদ্দেশ্য ছিল যতি স্থাপন ও উহার দ্বারা অষ্টাক্ষর-পর্বিক পয়ারকে চতুরক্ষর-পর্বিক ছন্দে পরিবর্তন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, চতুরক্ষর-পর্বিক ছন্দ কেবল মাত্রাবৃত্ত গোত্রীয়; অনুপ্রাস প্রয়োগে নহে, মাত্রাবৃত্তের রীতিতে হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণেই পয়ার পর্ব প্রকৃত দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে। যথা—

দেখ দ্বিজ | মনসিজ | জিনিয়া মু | রতি।
পদ্ম প | লাশ আঁখি | পরশয়ে | শ্রুতি ॥
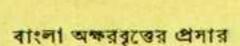
কিন্তু প্রাচীন রচনায় শব্দের আদ্য ও মধ্য হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ তরল ও মালঝাঁপ পয়ারকে অপরিবর্তিত পয়ারের অবস্থাতেই রাখিয়া দিয়াছে।

পয়ারের আদিতে বা অন্তে নূতন অক্ষরের যোগ বা বিয়োগ করিয়া যাঁহারা নূতন ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মদন মোহন তর্কালঙ্কার, রামনিধি গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মদন মোহন পয়ারের চরণের আদিতে দুই অক্ষর যোগ দিয়া সেই নব গঠিত ছন্দে বাসবদত্তা কাব্যের নায়ক কন্দর্পকেতুকে হরিহর দর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ এই নব-সংযোজিত দুই অক্ষর পয়ার চরণের অতিরিক্ত বাহ্য অংশ রূপে অর্থাৎ অতিপর্ব রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ততক্ষণ ইহা হইয়াছে পাঠকের সহনীয়। যথা—

(যথা) দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্র | বীণ চিত হয়।
(যথা) হরষিত তৃষিত সু | শীত পেয়ে পয়॥

কিন্তু যখনই অতিরিক্ত দুই অক্ষর অতিপর্বরূপে প্রযুক্ত না হইয়া মূল চরণের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তখনই রচনা হইয়াছে কর্ণ-পীড়াদায়ক। যথা—

(১) দোঁহে দেখে এই দৈব দুঃখে দুঃখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয়॥

(২) মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে॥

—এখানে প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় চরণ কর্ণপীড়াদায়ক।

পয়ারের চরণের অন্তে অর্থাৎ ষড়ক্ষর অন্ত্যপর্বে একাক্ষর যোগ

দিয়া নূতন ছন্দোগঠনের সার্থক চেষ্টা দেখা যায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এবং নিধুবাবুর টপ্পায়। যথা—

(১) কেন না শুনেছি পুরা | তন লোকে কয় লো।
জলেতে কাটয়ে জল | বিষে বিষ ক্ষয় লো॥

—ভারতচন্দ্র

(২) মিলনে যতেক সুখ | মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই | নিধি ত্যজা যায় না॥

—নিধুবাবু

—লাল মোহন বিদ্যানিধি এ-ছন্দের নাম দিয়াছেন 'মালতী'। বিহারী লালের 'সাধের আসন' কাব্যে এই ছন্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যে শিব কর্তৃক সৃষ্টির আচ্ছাদন এই ছন্দেই অপসারিত হইয়াছে; শিব-নারদ বার্তাও এই ছন্দে রচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন কবিগণ ইহাকে অক্ষর-বৃত্ত গোত্রীয় মনে করিয়া ইহার শব্দান্তে ও শব্দ মধ্যে হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে পয়ারের "অন্ত্যপর্বের ঈষৎ হ্রাস বৃদ্ধিতে ইহা চতুর্মাত্রিক পর্বে বিভক্ত হইয়া মাত্রাবৃত্ত মূর্তি ধারণ করে" (৯ম অধ্যায়, ৭ ম সূত্র)। উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুইটির যথার্থ উচ্চারণ :—

(১) কেননা শু | নেছি পুরা | তন লোকে | কয় লো।
জলেতে কা | টয়ে জল | বিষে বিষ | ক্ষয় লো॥
(২) মিলনে য | তেক সুখ | মননে তা | হয় না।
প্রতিনিধি | পেয়ে সই | নিধি ত্যজা | যায় না॥

'বাসবদত্তা'র কবি মদন মোহন তর্কালঙ্কার ইহা কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রকার রচনায় চারি চারি অক্ষরে অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়াছিলেন :—

এ কি রীত বিপরীত ও পিরীত তোর রে।
যারে ধর প্রাণ হর শেষ কর ভোর রে॥

তবে ইহা যে মাত্রাবৃত্ত গোত্রীয় তাহা তিনিও বুঝিতে পারেন নাই। তাই আদ্য মধ্য হলন্ত অক্ষরে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ দেখা যায় না।

রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' এই মালতী ছন্দের শেষাক্ষর, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের 'লো', নিধুবাবুর 'না' ও মদন মোহনের 'রে' কে শেষ পর্যন্ত 'হে'-তে পরিবর্তিত করিয়া এবং মূল পয়ার চরণের ষড়ক্ষর অন্ত্যপর্বকে পুনরুক্ত করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন :—

স্বাধীনতা হীনতায় | কে বাঁচিতে চায় হে—
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল | কে পরিবে পায় হে—
কে পরিবে পায়॥

ইহার পুনরুক্ত অংশকে মূল পয়ারের শাখা মনে করিয়া সেকালের আলংকারিকেরা এই ছন্দের নাম দিয়াছিলেন—বিশাখ পয়ার। পুনরুক্তি বর্জন করিয়া এই ছন্দেই মাইকেল লিখিয়াছেন :—

নাচিছে কদম্ব মূলে | বাজায়ে মুরলী রে—
রাধিকা রমণ।

—ব্রজাঙ্গনা

—নামে 'বিশাখ পয়ার' হইলে কি হইবে, আসলে ইহা নূতন 'সঙ্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদী'র অপরিণত পূর্বরূপ ; ইহার পরিণত রূপ সম্ভবতঃ প্রথম দেখা যায় উল্লিখিত চরণটির সঙ্গী পরবর্তী চরণে—

চল সখি ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

—এই ছন্দের চরণের প্রকৃত গঠন ৮+৮+৬ অক্ষর। মাইকেল এই ছন্দেই তাঁহার সুবিখ্যাত 'আত্মবিলাপ' লিখিয়াছেন :—

আশার ছলনে ভুলি | কি ফল লভিনু হায় | তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি | কাল-সিন্ধু পানে ধায় | ফিরাব কেমনে॥

রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের 'স্পর্শমণি,' 'চিত্রা' কাব্যের 'মৃত্যুর পরে' ও 'কল্পনা' কাব্যের 'অশেষ' 'বিদায়' প্রভৃতি বহু কবিতা এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন।

কেবল পয়ার হইতে নহে, দীর্ঘ ত্রিপদী হইতেও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে অনেকগুলি নূতন ছন্দ জন্ম লাভ করিয়াছে। চরণস্থ পর্ব-বিশেষের যোগ-বিয়োগে বা ঈষৎ পরিবর্তনে এই সকল নূতন ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে, পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীকে নূতন ছন্দোগঠনের উপাদান রূপে চিন্তা করার কারণ আছে। ছন্দের গঠনে কবির সৃজন-প্রতিভাই যথেষ্ট নহে, উপাদানও প্রয়োজন; অক্ষরবৃত্তে পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী হইতেছে উপাদান। আমরা পয়ারজ ছন্দের কথা বলিয়াছি। পয়ারের ন্যায় দীর্ঘ ত্রিপদীও বাঙ্গালীর পুরাতন ও অভ্যাসগত ছন্দ। বস্তুতঃ ইহাও কয়েকটি ছন্দের উপদান।

অষ্টাদশ শতকের শেষাংশের কবি রামনিধি গুপ্তের টপ্পায় একটি নূতন ছন্দ দেখা যায়, ইহা অষ্টাক্ষর পর্বের দ্বিপর্বিক ছন্দ, ইহার চরণের গঠন ৮ + ৮ অক্ষর :—

> না হতে পতন তনু | দাহন হইল আগে।
> আমার এ অনুতাপ | তারে যেন নাহি লাগে॥
> চিতে চিতা সাজাইয়ে | তাহে দুখ তৃণ দিয়ে।
> আপনি হইব দগ্ধ | আপনারি অনুরাগে॥

কবি বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সাধের আসন' কাব্যে বহু স্তবকের পূর্ণ চরণ এই আদর্শেই রচনা করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের 'প্রভাস' কাব্যের একাদশ সর্গ এবং 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সপ্তদশ সর্গ রচিত হইয়াছে এই ছন্দে। কামিনী রায়ের বিখ্যাত "মা আমার" কবিতাও এই ছন্দে লিখিত। অলংকারিকেরা এই ছন্দের নাম

দিয়াছেন—'পয়ারাঙ্গ'। কিন্তু আসলে ইহা দীর্ঘ ত্রিপদীরই অঙ্গ, পয়ারের অঙ্গ নহে। গঠনের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, এই ছন্দের ৮+৮ অক্ষরের চরণ দীর্ঘ ত্রিপদীর ৮+৮+১০ অক্ষরের চরণ হইতেই উৎপন্ন। দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্ত্য দশাক্ষর পর্ব পূর্ণ চরণ হইতে বাদ দিলেই অবশিষ্ট ৮+৮ অক্ষরের চরণ দেখা দেয়। অপরপক্ষে পয়ারের ৮+৬ হইতে ৮+৮-এর উৎপত্তি কষ্টকল্পনা মাত্র।
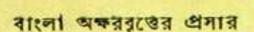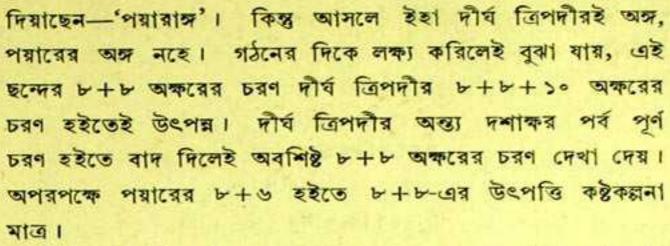
যেমন দীর্ঘ ত্রিপদীর ৮+৮+১০ অক্ষরের চরণ হইতে শেষ পর্ব বিলুপ্ত হওয়ায় 'পয়ারাঙ্গ' ছন্দ উদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম পর্ব বিলুপ্ত হওয়ায় অবশিষ্টাংশ ৮+১০ অক্ষরের চরণ পরিণত হইয়াছে 'মহাপয়ারে'। 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের 'স্বপ্ন প্রয়াণে' এর প্রথম প্রবর্তন দেখা গেছে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ছন্দকে প্রথম দেখা যায় রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'। যথা :—

> যথা শেফালিকা ফুল | বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
> প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে | ঝরি পড়ে ধরণী উপর॥
> সেইরূপ অরিসিংহ | যুদ্ধ শেষে হয়ে বলহত।
> অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে | অবশেষে জীবন বিগত॥

—এই ছন্দ দীর্ঘ ত্রিপদীজাত বলিয়া ইহাতে গীতিকাব্যোচিত সুর আছে, আবার পর্বের দীর্ঘতার জন্য ইহা গম্ভীর, মন্থর ও উদাত্ত। এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে', 'ভাষা ও ছন্দ', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবিতা রচনা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' 'বড়দিনে' প্রভৃতি কবিতা, মোহিতলালের 'পান্থ', 'বুদ্ধ', প্রভৃতি কবিতা এই ছন্দেই রচিত হইয়াছে। এই মহাপয়ারে রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন সেন 'সনেট'ও রচনা করিয়াছেন।

চৌপদী ছন্দের মূলেও রহিয়াছে ত্রিপদী। দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ

পর্বে একাক্ষর যোগ করিয়া ভারতচন্দ্র রচনা করিয়াছেন 'তরল দীর্ঘ চৌপদী'। যথা—

শিবনাম লয়ে মুখে
তরিব সকল দুখে
দমন করিব সুখে
শমনে।

শিবগুণ কি কহিব
কোথায় তুলনা দিব
জীব শিব হয় শিব
সেবনে॥

—অন্নদামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যের 'লজ্জা' কবিতা এবং 'চিত্রা' কাব্যের 'দিনশেষে' কবিতার পূর্ণ চরণ এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। রঙ্গলাল 'কর্মদেবী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে এই তরল দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম পর্ব বাদ দিয়া তরল ত্রিপদীতে নায়কের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—

আইলাম বিধুমুখী | বিদায় লইতে তব | কাছে হে।
নিবেদন তব প্রতি | আমার আর কি বল | আছে হে॥

'গীতালি' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 'মিলন' কবিতায় এই রঙ্গলালীয় তরল ত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, তিন অক্ষরের খণ্ড পর্বকে অন্ত্য পর্বে ব্যবহার করিবার ফলে তরল দীর্ঘ চৌপদী এবং ত্রিপদী উভয়েই সূক্ষ্ম বিচারে হইয়া উঠিয়াছে চতুর্মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত।

পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী কেবল যে পৃথক্ ভাবে নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে, উভয়ের মিলনেও নূতন ছন্দের জন্ম হইয়াছে। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম দুই পর্বের সহিত পয়ারের পূর্ণ

চরণের সংযোগে দেখা দিয়াছে সাধারণ দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের সিদ্ধিভক্ষণ হইয়াছে এই ছন্দে। যথা—

নয়নে ধরিল রঙ্গ আলসে অবশ অঙ্গ
লট পট জটা জূট | গঙ্গা হুল থুল।
খসিল বাঘের ছাল আলু থালু হাড় মাল
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা | পিণাক ত্রিশূল॥

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' ও অক্ষয় বড়ালের 'এষা' কাব্য প্রধানতঃ এই ছন্দে রচিত হইয়াছে। নবীন সেনের 'রৈবতক' কাব্যের একাদশ সর্গের ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'পরশ-পাথর' কবিতার ছন্দ ইহাই। এই দীর্ঘ চৌপদী সম্পূর্ণ অক্ষরবৃত্ত গোত্রীয় বিশুদ্ধ ছন্দ; ইহার মধ্যে মাত্রাবৃত্তের কোন আভাস নাই। তবে ইহা হইতে দুইটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার অন্ত্যপর্বে একাক্ষর যোগ করিয়াছেন ভারতচন্দ্র এবং বিয়োগ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। যথা :—

(১) যথন বিরলে পাব তখনি নিকটে যাব
যদি ক্রোধে গালি দেয় | তবু সয়ে রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি ফল কিংবা ফুল ধরি
চারি চক্ষু এক হলে | ইশারায় কহিব॥

—ভারতচন্দ্র, রসমঞ্জরী

(২) আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম | দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকি ঝিনি
কে গো তুমি একাকিনী | আসিছ নীরে॥

—রবীন্দ্রনাথ, হৃদয় যমুনা

এইগুলিকে অবশ্য অক্ষরবৃত্ত রূপেই রচনা করা হইয়াছে কিন্তু অন্ত্যপর্বের ষড়ক্ষরত্বের পরিবর্তনে দেখা দিয়াছে মাত্রাবৃত্তের প্রবৃত্তি। ইহাদের হলন্ত অক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ কর্ণপীড়াই উৎপন্ন করে।

ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণের সহিত দীর্ঘ ত্রিপদীর মেল বন্ধন করিয়াছেন রঙ্গলাল :—

(দেখ) পথিক সুজন।
এইখানে পদ্মিনীর কলেবর সুরুচির
দাহন করিল হুতাশন॥

—পদ্মিনী উপাখ্যান

'পদ্মিনীর অগ্নি প্রবেশ' বর্ণিত হইয়াছে এই ছন্দে।

পয়ার, মহাপয়ার ও দীর্ঘত্রিপদীর পরস্পর মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথও অক্ষর বৃত্তের কয়েকটি নূতন ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন। যথা—

(১) পয়ার + দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্ত্যপর্ব ; অর্থাৎ ৮ + ৬ + ১০ অক্ষর—

এই কল্লোলের মাঝে | নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন।
নীরবে মিটিয়া যাবে | সকল সন্দেহ
থেমে যাবে সহস্র বচন॥

—মঙ্গল গীতি, কড়ি ও কোমল

(২) মহাপয়ার + পয়ারের অন্ত্যপর্ব ; অর্থাৎ ৮ + ১০ + ৬ অক্ষর—

ঈশানের পুঞ্জ মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা বন্ধ হারা।
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে | নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘ ধারা॥

—বর্ষ শেষ, কল্পনা

(৩) মহাপয়ার + দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্ত্যপর্ব ; অর্থাৎ ৮ + ১০ + ১০ অক্ষর—

মোরে কর সভাকবি | ধ্যান মগ্ন তোমার সভায়
হে শর্বরী হে অবগুণ্ঠিতা।
তোমার আকাশ জুড়ি | যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা ॥

—রাত্রি, কল্পনা

—অসমদীর্ঘ ও দীর্ঘায়ত পর্ব সমাবেশের জন্য এই সকল ছন্দ স্রগ্ধরা, শার্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় বিশাল গম্ভীর ধ্বনিকল্লোল সৃষ্টি করে।

অক্ষরবৃত্তে নূতন ছন্দোগঠনের দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। কিন্তু সকল ছন্দের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। সংক্ষেপে মূল কথা হইতেছে—পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী হইতেই অক্ষরবৃত্ত গোত্রীয় সমস্ত ছন্দ উৎপন্ন। (পয়ার বা দীর্ঘ ত্রিপদীর) অষ্টাক্ষর মুখপর্ব, (পয়ারের) ষড়ক্ষর অন্ত্যপর্ব এবং (দীর্ঘত্রিপদীর) দশাক্ষর অন্ত্যপর্ব—এই ত্রিবিধ পর্ব ব্যতীত অন্য কোন উপাদানে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গঠিত হইতে পারে না। অক্ষরবৃত্তে অন্যান্য দৈর্ঘ্যের পর্ব বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ উদ্রিক্ত করে না। যথা—

(১) শিব শঙ্করী ক্ষেম ক্ষেমঙ্করী জননী
হের হর মোহিনী।
চরণ তরণী দিয়ে ত্বরায় তরাও তারিণী ।।

—বাসবদত্তা (মদন মোহন তর্কালংকার)

(২) কুবাসনা খল হৃদয়ে সদা রহে,
মহাসুখী সুজন গণের পীড়নে।
প্রবঞ্চকে কখন করে কি ভাবনা
অকারণে সরল মনে দিতে ব্যথা ॥

—ছন্দ : কুসুম (ভুবন মোহন রায় চৌধুরী)

(৩) শোক স্বর উঠে উভয় মেলায়
নিরাশ্বাস অরণ্য কমল।
কর্মদেবী জীবন ত্যজিলা শুনি
হলো অতি হৃদয় বিকল ॥
—কর্মদেবী (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৪) গত দিনে যেই প্রিয়জন ফুল্ল
বদন সরোজ, সুললিত বাণী
মধুময় হেরি, লভিল বিশুদ্ধ
সুখ মম চিত্ত মধুকর ; অদ্য
নিরখি বিশুষ্ক, বিগলিত তাহা
বিষম শোক দহন দহে রে !
—সদ্ভাব শতক (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

(৫) বর্ষাকাল গতে সুনির্মল জলে কাসার শোভা করে।
নানা জাতি জলে চরাণ্ডজ গণে নীরে সুখে সঞ্চরে ॥
পেয়ে পদ্মকলি প্রমত্ত পবনে তদ্‌বাস হর্ষে হরে।
গন্ধে অন্ধ হয়ে দ্বিরেফ নিকরে মিষ্টস্বরে গুঞ্জরে ॥
—ললিত কবিতাবলী (বলদেব পালিত)

অষ্টাদশ অধ্যায়

বাংলা ছন্দে ভারতচন্দ্র-মধুসূদন-যুগ

—১—

আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—কৃত্রিমতা-বর্জন ও বাস্তবতা-প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন বাংলা ছন্দের গঠনে ও উচ্চারণে যে কৃত্রিমতা ছিল, তাহা পরিহার করিবার প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতকের সূচনা হইতেই দেখা দেয়। বাস্তব-প্রিয়তার ফলে এই যুগে পয়ারের বহুকালের সঙ্গী কৃত্রিম সুর দূরীভূত হয়; তাছাড়া পয়ারের ভাষায় ক্রমশঃ ছন্দপ্রাধান্য হ্রাস পায় এবং গদ্যাভি-মুখিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। আখ্যায়িকা-কাব্যের পয়ারে এই আধুনিক প্রবৃত্তির সূচনা ভারতচন্দ্রে এবং পূর্ণতা মধুসূদনে ও রবীন্দ্রনাথে। অবশ্য ভারতচন্দ্র যুগ-সন্ধির কবি, তাঁহার মধ্যে প্রাচীন প্রবৃত্তিও অপ্রত্যাশিত নহে। সংস্কৃত যুগ হইতে পণ্ডিতদিগের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রুতিবশে নহে, অক্ষর-গণনার কৃত্রিম পদ্ধতিতে ছন্দো-রচনার প্রথা প্রচলিত হয়। পণ্ডিতী প্রবৃত্তির বশেই ভারতচন্দ্র বাংলা ছন্দের গঠনে ও অনুবাদে অক্ষর গণনামূলক কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও কিন্তু আধুনিক যুগ-ধর্মকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার আধুনিক মন সেকালের ছন্দোবদ্ধ ভাষায় আড়ষ্টতা, পঙ্গুতা ও কৃত্রিমতা অনুভব করিয়াছে। তাই তাঁহার আখ্যায়িকা-কাব্যের ভাষাকে ছন্দের অধীন না করিয়া ছন্দকেই ভাষার অধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্য-ভাষায় গদ্যতা সঞ্চারের চেষ্টা এবং ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে কিছু পরিমাণে স্বাধীন সাবলীল ও স্বাভাবিক করিবার সাধনা তাঁহার আধুনিক মনোবৃত্তির ফল।

ভারতচন্দ্র

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্র ছন্দ-শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত। ঐতিহাসিকের ভাষায়—"ছন্দে ভারতচন্দ্রের যেরূপ দক্ষতা ছিল, তাহা

পূর্ববর্তী এক গোবিন্দদাস ছাড়া আর কাহারও ছিল না।"[১] এই উক্তির যাথার্থ্য 'দক্ষতা' শব্দের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। ভারতচন্দ্রের ছন্দো-দক্ষতা তাঁহার সংস্কারগত নহে, গাণিতিক অভ্যাসগত ; এই দক্ষতার কারণ অনায়াসলব্ধ শ্রুতিসূক্ষ্মতা নহে, সচেষ্ট হিসাব-নৈপুণ্য। স্বাভাবিক শ্রুতিনির্ভরতার পরিবর্তে কৃত্রিম অক্ষর-গণনাই রহিয়াছে তাঁহার ছন্দো-রচনার মূলে। সেইজন্য তাঁহার রচনায় যদিও পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য বর্তমান, হিসাবেরও গলদ নাই, তথাপি মধ্যে মধ্যে দুই একটি ছন্দ-পতন থাকিয়া গিয়াছে। ছন্দোরচনার গাণিতিক পদ্ধতিই এই পতনগুলির জন্য দায়ী। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণে চরণে অক্ষর-সমতা বজায় থাকিলেও ছন্দ বজায় থাকে নাই ;—

(১) প্রাণ কেমন রে করে না দেখি তাহারে। ... ১৪ অক্ষর
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ ... ১৪ „

—সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর

[ছন্দ রক্ষা করিতে হইলে ইহার সংশোধিত রূপ হইবে—
প্রাণ 'রে' কেমন করে | না দেখি তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ | কহিব কাহারে॥]

(২) শিবনাম বল রে জীব বদনে। ... ... ১২ অক্ষর
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥ ... ... ১২ „

—প্রস্তুতি স্তবে দক্ষ জীবন, অন্নদামঙ্গল

[ছন্দ বজায় রাখিতে ইহার রূপ হইবে 'রে' বর্জিত ,—
শিব নাম | বল জীব | বদনে।
(যদি) আনন্দে | যাবে শিব | সদনে॥]

(৩) মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ... ... ১২ অক্ষর
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥ ... ... ১২ „

—শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, অন্নদামঙ্গল

১। পৃঃ ৮৭০, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ১ম সং)
—শ্রীসুকুমার সেন

[ইহা সংস্কৃত 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' ছন্দের অনুবাদ, 'শিঙ্গা'র পরিবর্তে 'শিঙা' ব্যবহৃত হইলে তবেই ছন্দ রক্ষা পায়।]

সংস্কৃত বৃত্তছন্দের অন্তর্গত তোটক, তূণক ও ভুজঙ্গ-প্রয়াতকে বাংলায় ভাষান্তরিত করিবার প্রচেষ্টার জন্য ভারতচন্দ্র সুবিখ্যাত। কিন্তু এখানেও তাঁহার ছন্দোদক্ষতা স্বীকার্য নহে; তাঁহার এই চেষ্টা সার্থক নহে। তিনি মূল ছন্দের ধ্বনিকে বাংলায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, বরং বাঙ্গালী উচ্চারণকে অগ্রাহ্য করিয়া অনুবাদের ক্ষেত্রে অযত্নকৃত শিথিল রচনার অপদৃষ্টান্তই স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গীয় উচ্চারণে ভারতচন্দ্রের অনুবাদগুলি পাঠ করিতে গেলে, বাঙ্গালীর মুখে মূল ছন্দোধ্বনি ফুটে না ও কবির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়; বরং বহু-স্থলে কর্ণপীড়া উৎপন্ন হয়। যথা—

(১) ভয় না টুটিছে | ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি | দেই দয়া করিলে ॥

[তোটক ছন্দ,—বিহারারম্ভ, বিদ্যাসুন্দর।]

(২) ভার্গবের | সৌষ্ঠবের | দাড়ি গোঁপ | ছিণ্ডিল।
পূষণের | ভূষণের | দন্তপাতি | পাড়িল ॥

[তূণক ছন্দ—দক্ষযজ্ঞ নাশ, অন্নদামঙ্গল।]

(৩) অদূরে মহারুদ্র | ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ | দে রে সতীরে ॥

[ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ—শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, অন্নদামঙ্গল।]

কবির উদ্দেশ্য হইতেছে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে নিম্ন-প্রদর্শিতভাবে 'আ, ঈ, উ, এ, এবং ও' কে কৃত্রিমভাবে টানিয়া দুই মাত্রায় বিশ্লিষ্ট করিয়া উচ্চারণ:—

[হাইফেন (-) স্বর প্রসারণের চিহ্ন]

(১) ভয় **না-** | টুটি**ছে-** | ভয় **না-** | তুড়ি**লে-**।
রস **ইক্** | খুকি **দে-** | ই দ**য়া-** | করি**লে-** ॥

(২) ভার্গ | বে-র | সৌ ষ্ঠ | বে-র | দা-ড়ি | গোঁ-প | ছিণ্ডি | ল- |
পূ-ষ | ণে-র | ভূ-ষ | ণে-র | দন্ত | পা-তি | পা-ড়ি | ল- ॥
(৩) অদূ-রে- | মহা-রুদ্ | র ডা-কে- | গভী-রে- |
অরে-রে- | অরে-দক্ | ষ দে-রে- | সতী-রে- ॥

—এইভাবে পড়িলে মূল সংস্কৃত ছন্দ বজায় থাকে বটে কিন্তু বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকে না, ভাষা কিম্ভূতকিমাকার হইয়া যায়। বাংলাভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াও বাংলায় যে সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদ সম্ভব, তাহার প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ (ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ছন্দ-অনুবাদেও ভারতচন্দ্রের 'দক্ষতা' স্বীকার করা যায় না।

ভারতচন্দ্রের প্রকৃত কৃতিত্ব ছন্দোবদ্ধ ভাষার কৃত্রিমতা দূরীকরণে। তিনিই প্রথম ছন্দোবদ্ধ ভাষার আড়ষ্টতা দূর করিয়া কবিতাকে করিয়াছেন সাবলীল এবং ছন্দকে করিয়াছেন কবিতার 'শৃঙ্খল' নহে অলংকার। শক্তিমান কবির রচনায় ছন্দ ভাষারই অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু কবি অক্ষম হইলে ছন্দই প্রবল হয় ও ভাষা ছন্দের অধীন হইয়া থাকে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি, তাহলে সেই প্রগল্ভ ছন্দকে ধিক্কার দেব।..শরীরের স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।"[২] ভারতচন্দ্রেরও মনের গভীরে এই বোধ ছিল, ভারতচন্দ্রীয় পয়ারই তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গানুবাদ কালে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এইগুলিতে কাব্য নহে, ছন্দই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের প্রাধান্য দমন অনুবাদকের সাধ্য-বহির্ভূত। এইজন্য তাঁহার কবিসত্তা পীড়া অনুভব করিয়াছে এবং বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছে। তবে সে-যুগে সমগ্র কাব্যকে ছন্দোবন্ধন-মুক্ত করা সম্ভব ছিল না।

২। পৃঃ ২৩৮ র-র (১৪শ খণ্ড)

সেইজন্য তিনি সুযোগ পাইলেই মধ্যে মধ্যে কাব্যভাষাকে কিছু পরিমাণে ছন্দোবন্ধন মুক্ত, সাবলীল ও গদ্যধর্মী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বাভাবিক ও গদ্যধর্মী হওয়ার পক্ষে কাব্যভাষার প্রধান বাধা ছিল ছন্দোযতি। ছন্দোযতিতেই অর্থগত ছেদ স্থাপন ছিল সেকালে অপরিহার্য। চরণান্তিক যতিতে দীর্ঘ বাক্যের ও পর্বান্তিক যতিতে হ্রস্ববাক্যের পরিসমাপ্তি ছিল অবশ্য পালনীয়। এই বাধ্যতা, অর্থাৎ যতির শাসনই ছন্দোগত বাক্যের আড়ষ্টতা ও বদ্ধতার জন্য দায়ী। বঙ্গসাহিত্যে ভাষার এই বদ্ধতা প্রথম অনুভব করিয়াছেন ভারতচন্দ্র এবং ভারতচন্দ্রই প্রথম কাব্যভাষার মুক্তিসাধক। কবিতার ভাষায় গদ্যরীতির প্রবর্তন ও ছন্দ-প্রাধান্য দমনের দ্বারা তাঁহার মুক্তিসাধন প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। যতির গুরুত্বের উপর ছন্দ নির্ভর করে। তাই কাব্যভাষায় ছন্দ-প্রাধান্য দমন করিতে গিয়া তিনি প্রথমেই করিয়াছেন যতি-দমন। সর্বত্র দেখা যায়, শব্দকে উচ্চারণে খণ্ডিত না করিয়া অখণ্ডরূপে পাঠ করা পাঠকের স্বভাব; এই স্বভাবকে ভারতচন্দ্র কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি যতি-দমন বা ছন্দোদমনের উদ্দেশ্যে তাঁহার পয়ার-প্রবাহের মধ্যে কোন কোন চরণে অপ্রত্যাশিত ভাবে শব্দ-মধ্যে যতি বসাইয়াছেন; ফলে অখণ্ডভাবে উচ্চারিত শব্দ-মধ্যে ঐ যতি প্রচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। যতি-প্রচ্ছাদনের জন্য ভারতচন্দ্রীয় পয়ারে অষ্টমাক্ষরে যতি নাই বলিয়া ভুল হয়। যথা—

[মোটা হরফের শব্দ মধ্যে যতি প্রচ্ছাদন দ্রষ্টব্য।]

(১) কান্দে রাণী মেনকা **চ** | **ক্ষুর** জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে **না** | **রদ** মুনি হাসে॥

—কন্দল ও শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল

(২) অন্নপূর্ণা উত্তরিলা | গাঙ্গিনীর তীরে।
'পার কর' বলিয়া **ডা** | **কিলা** পাটুনীরে॥

—অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা, ঐ

(৩) পরম্পরা পরস্পর ! শুনি এই সূত্র ।
স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, **পুরু** | **ষের** ভাগ্যে পুত্র ॥

—হরগৌরী কন্দল, ঐ

ছন্দোদমনে ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয় কৌশল হইতেছে বাক্যের পর্বাতিক্রমণ। ইহার দ্বারা তিনি কবিতায় সর্বপ্রথম গদ্যাভাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাক্যদ্বয়ের একটির সমাপ্তি ও অপরটির সূচনা তিনি পর্বান্তে নহে, পর্বমধ্যেই দেখাইয়াছেন ; ফলে বাক্য হইয়াছে পর্ব-বন্ধন-মুক্ত ও পর্বাতিক্রমী। ইহাতে বাক্য-সমাপ্তি সূচক 'ছেদে' যতি-ভ্রান্তি হইয়াছে। এখানে শব্দ-মধ্যে নহে, পর্বাতিক্রমী বাক্য মধ্যে যথার্থ যতি প্রচ্ছাদিত। যথা—

[তারকা-চিহ্নে 'ছেদ' ও দণ্ড-চিহ্নে 'যতি' সূচিত]

(১) ভূমে ঠেকে থুথি, * **হাঁটু** | **কান ঢেকে যায়**।*
কুঁজ ভরে পিঠ-ডাঁড়া | ভূমিতে লুটায় ॥*

—জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা, অন্নদামঙ্গল

(২) 'শীঘ্র আসি নায়ে চড়, * | দিবা কিবা বল'।*
দেবী কন, * 'দিব, * **আগে** | **পারে লয়ে চল'** ॥*

—অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা

(৩) গঙ্গা নামে সতা, * **তার** | **তরঙ্গ এমনি**।*
জীবন স্বরূপা সে, * **স্বা** | **মীর** শিরোমণি ॥*

—অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা

(৪) পাটুনী বলিছে, * **মাগো** | **বৈস ভাল হয়ে**।*
পায়ে ধরি, কিজানি, **কু** | **মীরে** যাবে লয়ে ॥*

—অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা

[তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় চরণে যতি শব্দমধ্যে প্রচ্ছন্ন।]

ছন্দোদমনে ভারতচন্দ্রের তৃতীয় কৌশল হইতেছে বাক্যের চরণাতিক্রমণ। বঙ্গ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই প্রথম চরণাপেক্ষা দীর্ঘতর বাক্য প্রয়োগ করিয়া চরণের ঊর্ধ্বে বাক্যকে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং

পদ্যের মধ্যে গদ্যের প্রবৃত্তি অনেকখানি আনিয়াছেন। এই প্রকার চরণাতিক্রমী বাক্য রচনার জন্য ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম অর্থ বুঝিতে গদ্য-অন্বয়ের (prose order) প্রয়োজন বোধ হয়। যথা—

(ক) এক চরণ-অতিক্রমী বাক্য :—

(১) আমার দ্বিতীয় কিম্বা | দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে, তবে হবে | দ্বিতীয় কাশীর॥

—ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, অন্নদামঙ্গল

[অন্বয়—যদি আমার দ্বিতীয় কিংবা শূলীর দ্বিতীয় থাকে, তবে কাশীর দ্বিতীয় হবে।]

(২) মেনকা নারদ বাক্যে | দুনা মন দুখে।
পলাইতে গোবিন্দের | পড়িলা সমুখে॥

—শিব বিবাহ, অন্নদামঙ্গল

[অন্বয়—নারদ বাক্যে দুনা মনদুখে পলাইতে (গিয়া) মেনকা গোবিন্দের সমুখে পড়িলা।]

(খ) দুই চরণ-অতিক্রমী বাক্য :—

(১) বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র | যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ | ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী | সেঁউতী উপরে।

—অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা

[অন্বয়—যে পদ বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র ধেয়ায়. যে পদ ভূতনাথ হৃদে ধরিয়া ভূতলে লুটায়, সে পদ দেবী সেঁউতী উপরে রাখিলা।]

(২) কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ | শুদ্ধ শান্ত মতি॥
প্রতাপ তপনে কীর্তি | পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী | অচলা করিয়া॥

—গ্রন্থ সূচনা, অন্নদামঙ্গল

[অন্বয়—শুদ্ধ শান্ত মতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতাপতপনে কীর্তিপদ্ম বিকাশিয়া রাজলক্ষ্মীকে অচলা করিয়া রাখিলেন।]

ভারতচন্দ্রের রচনায় পরবর্তী গদ্যের এবং মাইকেলী প্রবহমাণ

ছন্দের আগমনী সূচিত হইয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই প্রমাণ—বাংলার মাটিতে অমিত্র ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য বীজাকারে ছিল; মাইকেল যদি মিল্‌টনের অমিত্র ছন্দের সহিত পরিচিত না-ও হইতেন, তাহা হইলেও উহা অভিব্যক্ত হইত।

—২—

অক্ষরগণনা-মূলক ছন্দোরচনা হইতেছে সেকালের সংস্কৃত-পণ্ডিতী কৃত্রিম পদ্ধতি। শ্রুতি-নির্ভর রচনা পদ্ধতিই ছন্দের ক্ষেত্রে অকৃত্রিম এবং সেই হিসাবে বাস্তবধর্মী ও আধুনিক। ভারতচন্দ্র-পরবর্তী লোক-সঙ্গীতের কবি অর্থাৎ 'কবি-ওয়ালা'র রীতিকেও এই দিক দিয়া আধুনিক বলিতে হইবে। কেবল কানের উপর নির্ভর করিয়াই কবি-ওয়ালাগণ কবিগান রচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কবি-ওয়ালাদিগের ধারণা ছিল—গান-রচনায় নিখুঁত ছন্দ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক নহে। সেইজন্য কবি-গানে প্রায়ই ছন্দ-শৈথিল্য, ছন্দ-পতন ও ছন্দ-সাঙ্কর্য দেখা যায়। তাই বলিয়া কবি-ওয়ালাগণ যে ছন্দোবোধ বর্জিত ছিলেন এবং গদ্যে গান রচনা করিয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহাদের গান ছন্দোগন্ধি অর্থাৎ ছন্দের আভাসযুক্ত। তাহাদের মনে ছন্দের আদর্শ না থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা ছন্দোগন্ধি রচনা সম্ভব হইত না। তাঁহারা পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দের ভঙ্গিতেই গান রচনা করিয়াছেন; তবে এই ছন্দ নিখুঁত নহে, বিকৃত ও শৈথিল্যযুক্ত। যথা—

কবি-ওয়ালা

(১) বিকৃত দীর্ঘ ত্রিপদী :—

ত্বং হি তারা ভবার্ণবে কি হবে বল গো শিবে
আমি অতি অভাজন।
(আমি) স্বখাত সলিলে ডুবে রই ওগো তারা ব্রহ্মময়ী
আমায় কোরো না বিড়ম্বন॥

—লালুনন্দলাল (পৃঃ ১১০, প্রাচীন কবিওয়ালার গান)

(২) বিকৃত লঘু ত্রিপদী :—

অনেক দিনের পরে সখা তোমারে
দেখতে পেলেম | চোখেতে।
(ভালো) বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভালো তো আছেন | প্রাণেতে ॥
—যজ্ঞেশ্বরী (পৃঃ ২৭১, ঐ)

(৩) বিকৃত বলবৃত্ত :—

দেশ চলালেম্ | প্রেম করে সই | প্রাণ গেল বাঁ | চি
বিচ্ছেদ বিষে | লোকের রিষে | দুই জ্বালাতে | জ্বলতেছি ॥
না বুঝে ম | জেছি প্রেমে
কপাল ক্রমে
একে হলো | আর।
(আমি) প্রাণ জুড়াতে | গেলেম শেষে | প্রাণ বাঁচানো | ভার ॥
(একে) নব ভাব | অনুরাগ | পড়ে- ম | নে।
প্রাণ সঁপিলাম | তারে আমি | না জেনে শু | নে ॥
চোরেরো রমণী | যেমন সই | তেমনি মর্মে | মরে আছি ॥
—রাম বসু (পৃঃ ২৩৪-৫ ঐ)

(ইহার নিম্নরেখ দুইটি চরণ মাত্রাবৃত্তের, অন্যান্য চরণ বলবৃত্তের।)

—৩—

শ্রুতিনির্ভর অকৃত্রিম পদ্ধতিতে সঙ্গীত রচনা শাক্ত পদাবলীতেও দেখা যায়। শাক্ত পদাবলী দ্বিবিধ, উমা সঙ্গীত ও শ্যামা সঙ্গীত।

শাক্ত কবি

উমা সঙ্গীত হইতেছে আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক গান। এই গানগুলি সাধারণ কবি-গানের মতোই ছন্দোগন্ধি রচনা। ইহাদের আদর্শে ছন্দ থাকিলেও ব্যবহারে রচনা শৈথিল্য, ছন্দপতন ও ছন্দোমিশ্রণ সুস্পষ্ট। যথা—

(১) (আমি) কি হেরিলাম | নিশি স্বপ | নে।
গিরিরাজ | অচেতনে | কতনা ঘু | মাও হে।

এখনি শি | য়রে ছিল গৌরী আমার্ | কোথা গেল
আধো আধো | মা বলিয়ে | বিধু বদ | নে ॥
—কমলাকান্ত (পৃঃ ৬, শাক্ত পদাবলী ৪র্থ সং)

(২) গিরিরাজকে | ডেকে দে গো | আমার গৃহে | গৌরী এলো।
নাশিতে আঁ | ধার রাশি | উমাশশী | প্রকাশিল।
এই নগরে
(লোক ছিল) ঘরে ঘরে
না-ডাকিতে | আমার ঘরে | কেবা কবে | এসেছিল ॥
—শ্রীধর কথক (পৃঃ ৫২ ঐ)

উমা সঙ্গীতের তুলনায় শ্যামা সঙ্গীতে ছন্দ-শৈথিল্য অনেক কম। বিশেষ করিয়া প্রসাদী সুরে রচিত গানগুলির অধিকাংশই প্রায় নিখুঁত ছন্দে রচিত। এইগুলির সাধারণ ছন্দ বলবৃত্ত, চরণগুলি প্রায়ই একটি মিলে আবদ্ধ, কোন কোন চরণে একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষর অতিপর্ব বর্তমান, তাছাড়া গানের প্রথম একটি বা দুইটি চরণ দ্বিপর্বিক ও অন্যান্য চরণ চতুষ্পর্বিক। যথা—

মা আমায় ঘু | রাবে কত।
(কলুর) চোখ ঢাকা ব | লদের মতো ॥
ভবের গাছে | **জুড়ে দিয়ে মা** | পাক দিতেছ | অবিরত।
(তুমি) কি দোষ ক | রিলে আমায় | ছটা কলুর | অনুগত ॥
মা শব্দ ম | মতা যুত | কাঁদলে কোলে | করে সুত।
(দেখি) ব্রহ্মাণ্ডেরই | এই রীতি মা | আমি কি ছা | ড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা | দুর্গা বলে | তরে গেল | পাপী কত।
(একবার) খুলে দে মা | চোখের ঠুলি | দেখি শ্রীপদ | মনের মত ॥
কুপুত্র অ | নেক হয় মা | কুমাতা নয় | কখনো তো।
রাম প্রসাদের | এই আশা মা | অন্তে থাকি | পদানত ॥
—রামপ্রসাদ, (পৃঃ ১১৪, ঐ)

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে মোটা হরফের পর্বটি মাত্র রচনা শৈথিল্যের

নিদর্শন। রামপ্রসাদের বলবৃত্ত প্রায়ই সুপরিণত, সাবলীল ও অকৃত্রিম। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলাছন্দের গতি হয়, তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুগামী হইবে।"[৩]

—৪—

বলবৃত্ত ছন্দের যথার্থ সুপরিণত রূপ প্রথম দেখা যায় বাউল গানে। বলবৃত্তের এই প্রকার নিটোল, সম্পূর্ণ ও সাবলীল মূর্তি পূর্বে অন্যত্র দেখা যায় নাই। চরণান্তে খণ্ডপর্বের প্রয়োগ, চরণে ইচ্ছামতো পর্ব-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির স্বাধীনতা, পর্বে পর্বে ইচ্ছামতো মিল প্রদান, প্রভৃতি বিচিত্র মণ্ডনকলা দেখা যায় বাউল গানের ছন্দে। বাউল গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য নৃত্যবেগ সঞ্চারের জন্য ইহাতে অতিপর্বের বহুল প্রয়োগ। এক বা দুই অক্ষরের অতিপর্ব অন্যান্য সঙ্গীতেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তিন অক্ষরের অতিপর্ব বাউল কবিরই নূতন দান ; যথা—

বাউল কবি

(১) (আছে যার) মনের মানুষ | আপন মনে
(সে কি আর) জপে মালা।
নির্জনে সে | বসে বসে | দেখছে খেলা।
(কাছে রয়) ডাকে তারে | উচ্চস্বরে | কোন পাগেলা।
(ওরে) যে যা বোঝে | তাই সে বুঝে | থাকে ভোলা।
(যেথা যার) ব্যথা নেহাত | সেইখানে হাত | ডলা মলা
তেম্‌নি জেনো | মনের মানুষ | মনে তোলা॥

—লালন ফকির (রবীন্দ্র সংগৃহীত গান)

৩। পৃঃ ১২২, র-র (১৪)

(২) (যদি হয়) ভাবুক জেলে
(ধর্ম মাছ) ধরতে পারে
(শুরু ভাব) ভক্তি জালে।
(সদা সু) সঙ্গে থাকে,
(পড়ে না) মায়ার ফাঁকে,
(চলে সে) ফাঁকে ফাঁকে,
(গুরুর ঐ) রুপা বলে ॥

—উপেন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত গান

বলবৃত্ত ছন্দে তিন অক্ষরের অতিপর্ব ব্যবহার বাউল গান হইতেই আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রচলিত হইয়াছে। কাজি নজরুল ইসলাম চতুষ্পর্বিক বলবৃত্তে এই তিন অক্ষরের অতিপর্ব প্রয়োগ করিয়া 'গজল' গানের ছন্দোভঙ্গি বাংলায় প্রবর্তন করিয়াছেন। যথা—

(আমারে) চোখ ইশারায় | ডাক দিলে হায় | কে গো দর | দী।
(খুলে দাও) রংমহলার | তিমির দুয়ার | ডাকিলে য | দি ॥
(গোপনে) চৈতী হাওয়ায় | গুল বাগিচায় | পাঠালে লি | পি।
(দেখে তাই) ডাকছে ডালে | কু কু বলে | কোয়েল নন | দী ॥

—৫—

যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে ঊনবিংশ শতকে যে সকল কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কবি তিনজন—দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহারা সকলেই মোটা-মুটি ভাবে ভারতচন্দ্রের শিষ্য, তথাপি প্রত্যেকেই ছন্দের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় কবিওয়ালাদিগের যমক ও অনুপ্রাসে আসক্তি অধিক পরিমাণে দেখা যায়। যমকের ভার সত্ত্বেও দাশু রায়ের ভাষা ভারতচন্দ্রের

দাশরথি রায়

ভাষার মতোই সাবলীল ; তাছাড়া দাশু রায়ের রচনায় ভাষা ও ছন্দের বিরোধ অল্প। তাঁহার পয়ার প্রায় ভারতচন্দ্রীয় ঃ—

এমন দরিদ্র নারী | ছিল ক্ষুধা ভরে।
নিঙাড়ি খেয়েছ সুধা | শ্যাম সুধাকরে ॥
চলে যেতে পায়ে লাগে | পড়িতেছ ভূমে।
কেন উঠে কালাচাঁদ | এলে কাঁচা ঘুমে ॥

বলবৃত্ত ছন্দ লইয়া অভিনব পরীক্ষার ক্ষেত্রে দাশু রায় বিশিষ্ট। ষড়ক্ষর পর্বিক লঘু ত্রিপদীর অনুকরণে দাশু রায় চতুরক্ষর পর্বিক বলবৃত্তকে ষড়ক্ষর পর্বিক বলবৃত্তে দীর্ঘায়ত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার অনেকগুলি গান ষড়ক্ষর পর্বিক বলবৃত্তে রচিত। এইগুলিতে হলন্ত অক্ষর মাত্রই সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চার্য এবং পর্বান্তে প্রবল শ্বাসাঘাত প্রদেয়। যথা ঃ—

(মুনি) এই্ ভয় মম মা | নসে।
কে বাঁচাবে আমায়্ | হয়ে ধন্বন্তরি | শমন তক্ষক | বিষে ॥
মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত | হয় সামান্য ফণী
সে তো নহে মণি | মন্ত্রে বশ মুনি
কাল্ পেয়ে অমনি | দংশিবে কাল্-ফণী
হৃদয় মন্দিরে | এসে ॥

পরবর্তীকালে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আলেখ্য' কাব্যে দাশু রায়ের এই ষড়ক্ষরপর্বিক বলবৃত্তকে গান হইতে কবিতাতে সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ইহা চলে নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বিভিন্ন জাতীয় ছন্দের মিশ্রণে বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তের 'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের সহিত চতুরক্ষর পর্বিক বলবৃত্তের মিশ্রণের চেষ্টা দেখা যায়। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে

প্রথম ও তৃতীয় চরণ মাত্রাবৃত্তের। কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ বলবৃত্তের :—

"(সখা হে) পাপী বটু | কথা কটু | বলে তো।"
"বলুক্ বলুক্ | বলুক্ যতো | বল্‌তে পারে | বল্‌তে পারে ॥"
"(যাবে হে) ছারেখারে | অহঙ্কারে | জলে তো।"
"জলুক্ জলুক্ | জলুক্ যতো জল্‌তে পারে | জল্‌তে পারে ॥"

—প্রথম অঙ্ক, বোধেন্দু বিকাশ

লক্ষ্য করিতে হইবে, এই দৃষ্টান্তে পৃথক্ চরণে পৃথক্ ছন্দ আশ্রিত বলিয়া চরণ ভেদে উচ্চারণ ভঙ্গির পরিবর্তন হয় মাত্র, যথার্থ ছন্দ-সাঙ্কর্য ঘটে না ; সেইজন্য যথার্থ কর্ণ-পীড়া উৎপন্ন হয় না।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত যমক-প্রয়োগ। এই যমক একদিকে তাঁহার পয়ারকে আড়ষ্ট ও দুর্বোধ্য করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি আবার পাঠক মনকে ছন্দে নিবিষ্ট হইতে না দিয়া অর্থের দিকেই টানিয়াছে। ফলে ঈশ্বর গুপ্তও প্রকারান্তরে পরবর্তী প্রবহমাণ অমিত্র ছন্দের পথ সুগম করিয়াছেন। তাঁহার পয়ারের দৃষ্টান্ত :—

লোকে বলে আনা-রস | আনারস নয়।
'আনা' রস হলে কেন | জানা রস হয় ॥
'তারে' তার জানা যায় | রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু | বলে তারে 'আনা' ॥

—'আনারস' কবিতা

অক্ষরবৃত্তে বহু নূতন ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাঁহার পরীক্ষার ফলেই

আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে—বাংলার জনপ্রিয় ছন্দোবন্ধ 'মহাপয়ার'। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' অরিসিংহের যুদ্ধ ও মৃত্যু[৪] এই মহাপয়ারে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে ৩৭৭ পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে মধুসূদনের সুবিখ্যাত সঙ্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদীর মূলেও রহিয়াছেন রঙ্গলাল। অর্থাৎ রঙ্গলালের—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।

হইতে মাইকেলের—

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা রমণ।

উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে—

আশার ছলনে ভুলি | কি ফল লভিনু হায় | তাই ভাবি মনে।

ভারতচন্দ্রের ন্যায় রঙ্গলালও পয়ারে রচিত কবিতায় পর্বান্তিক যতিকে শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া ছন্দকে ভাষার অধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির মোটা হরফের শব্দের মধ্যে যতি-প্রচ্ছাদন দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) যাঁর প্রিয়তমা সে **প** | **দ্মিনী** মনোরমা।
রূপে গুণে জ্ঞানে **অব** | **নীতে** অনুপমা॥

—পংক্তি ১৫৩-৫৪, পদ্মিনী উপাখ্যান

৪। দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে | মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তারে | তারাকারে এগার কুমার॥
সেই দিন রাজা তথা | পরিহরি ছত্র সিংহাসনে।
রাজ্য পাটে যথাবিধি | বরিলেন প্রথম নন্দনে॥

—পদ্মিনী উপাখ্যান

(২) যায় যাক রাজ্য ধন | যায় যাক দেশ।
যায় যাক বংশ **ক্ষত্র** | **কুল** হোক শেষ ॥

—পংক্তি ৭৪-৭৪ ঐ

(৩) তদন্তে শোভিত **দেবা** | **লয়** দুই ভিতে।
পদ্মবীথি পূর্ণ **সারি** | **সারি** পসারিতে ॥

—পংক্তি ৬৭-৬৮ ঐ

(৪) না দেখে পর্যঙ্কে **মহী** | **পতি** মৃত কায়।
কেবল প্রফুল্ল **পদ্ম** | **জাল** শোভা পায় ॥

—পংক্তি ১৪১-৪২ ঐ

অনুমান করিবার কারণ আছে যে রঙ্গলাল ঠিক শ্রুতিনির্ভর হইয়া ছন্দোরচনা করেন নাই, ভারতচন্দ্রের মতো তাঁহারও অক্ষর-গণনার কৃত্রিম পদ্ধতিই অবলম্ব্য ছিল। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুইটিতে পর্বে পর্বে অক্ষর সংখ্যার হিসাব ঠিকই আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এগুলি ছন্দ-পতনেরই দৃষ্টান্ত। রঙ্গলাল শ্রুতিনির্ভর কবি হইলে এইগুলিকে কাব্যে স্থান দিতেন না ;—

(১) বিচেতন শোকে মন প্রাণ ... ... ১০ অক্ষর
কর্মদেবী প্রিয় সহচরগণ। ... ... ১২ „
ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমে জ্ঞান হারা ... ... ১০ „
দাবদগ্ধ মৃগী স্বরূপ লক্ষণ ॥ ... ... ১২ „

—জয়তঙ্গের উক্তি, কর্মদেবী

(২) নন সাধু সামান্য মানুষ ভাই ... ... ১২ অক্ষর
শাপভ্রষ্ট জনমিলা কাম। ... ... ১০ „
কিছুক্ষণ করি খেলা চলি গেলা ... ... ১২ „
নিজস্থান যথাযোগ্য ধাম ॥ ... ... ১০ „

—ঐ, কর্মদেবী

সূক্ষ্ম ছন্দ-শ্রুতি থাকিলে রঙ্গলাল বুঝিতে পারিতেন—দশাক্ষর পর্বই বাংলা পদ্যছন্দে দীর্ঘতম পর্ব, দ্বাদশাক্ষর পর্ব বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ উদ্রিক্ত করে না।

—৬—

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, বিশেষ করিয়া অমিত্র পয়ারে তিনি যে সৃজনী শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সূক্ষ্ম শ্রুতি সম্পন্ন* কবি, তাঁহার রচনা সম্পূর্ণ শ্রুতিনির্ভর। তাঁহার অমিত্র পয়ার প্রবর্তন বঙ্গসাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই অমিত্র ছন্দের দ্বারাই বাংলা মহাকাব্য প্রথম ছন্দের 'দাসত্ব' হইতে মুক্তিলাভ করে এবং পদ্যের ভঙ্গি হইয়া উঠে গদ্যধর্মী। অবশ্য মধুসূদনের পূর্বে ভারতচন্দ্রের পয়ারে কতকটা ছন্দোমুক্তির চেষ্টা ও গদ্য-প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রয়াস যৎসামান্য এবং ইহা ঠিক সচেতন প্রয়াসও নহে। ছন্দো'দাসত্ব' মুক্তির যথার্থ সচেতন সাধনা ও সিদ্ধি মাইকেলের রচনাতেই দ্রষ্টব্য।

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত

কবিতায় ছন্দোমুক্তি কথাটি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। পদ্যছন্দ সকল ক্ষেত্রে কবিতার বন্ধন নহে, বরং ইহা গীতিকাব্যের যথার্থ বন্ধু; শৃঙ্খল নহে, শৃঙ্খলা। গানের বাদ্যতালের ন্যায় গীতিকবিতার ছন্দও উহার ভাব-প্রতিষ্ঠার সহায়ক। সকল হৃদয়-ভাবই একনিষ্ঠ—ঐক্যের উপরেই ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। পদ্যছন্দের পর্বগুলি সম্মিতিযুক্ত বলিয়া

---

* মধুস্থদনের রচনায় যে দুই-একটি ছন্দ-পতন দেখা যায়, সে-গুলি তাঁহার শ্রুতিহীনতার ফল নহে; কয়েকটি কবির ইচ্ছাকৃত—তাঁহার কবিতাকে গীতিসুর মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত।

ঐককেন্দ্রিক। মিল অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাসও সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ চরণের ঐক্যদাতা। সেইজন্য পদ্যছন্দ ও চরণান্তিক মিল উভয়েই গীতি সুর সৃষ্টিকারী, ভাবের সহায়ক এবং গীতিকবিতার যথার্থ বন্ধু। গীতি-কবিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তাই সমিল পদ্যছন্দ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গীতিকবিতায় সেই কারণে ছন্দের বন্ধন, দাসত্ব, ছন্দ-শৃঙ্খল, ছন্দোমুক্তি প্রভৃতি কথা অর্থহীন। অপরপক্ষে আখ্যায়িকা-কাব্যের বা মহাকাব্যের উদ্দেশ্য গীতিকাব্যের ন্যায় হৃদয়ভাবের উদ্দীপন নহে; এই প্রকার কাব্য জীবনধর্মী, ঐককেন্দ্রিক হৃদয়ের পরিবর্তে প্রবহমাণ প্রাণের উদ্দীপন এইগুলিতে কাম্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রেই বলা চলে—ছন্দ এখানে কাব্যের অনুকূল নহে, প্রতিকূল; শৃঙ্খলা নহে, শৃঙ্খল; বন্ধু নহে, বন্ধন। ছন্দোবদ্ধ আখ্যায়িকা-কাব্যে বা মহাকাব্যে তাই ছন্দো-দমন বা ছন্দোমুক্তির প্রয়োজন হয়। আখ্যায়িকা-কাব্যে বর্ণহীন বহু সাধারণ ঘটনা থাকে, এই সাধারণ ঘটনা ছন্দোবিরোধী। কিন্তু রোমান্টিক গীতিকাব্যে যে সকল ঘটনা থাকে, সেগুলি অসাধারণ, গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ণোজ্জ্বল হয় বলিয়া অনায়াসেই ছন্দের দোলায় দুলিতে পারে; এই দোলা বে-মানান হয় না। অপরপক্ষে আখ্যায়িকা-কাব্যের দৈনন্দিন জীবনের নীরস তুচ্ছ ঘটনা ছন্দের দোলায় দুলিবার উপযুক্ত নহে; দুলিলে ছন্দই হইয়া উঠে প্রবল, পাঠক মনে করে—ছন্দই পড়িতেছি, কবিতা নহে। যথা—

বিধবা ভি | খারী পাঁচী | একটি ছে | লে,
ভালে তার | জুটিল না | ঢোঁড়া কি হে | লে,
খাঁটি বাম্ | নেরি শাপ—
কাটিল কে | উটে সাপ,
যেদিন ছ | দিন পরে | পথ্য পে | লে।
ঢলে প'ল | মার কোলে | মায়ের ছে | লে॥

—দুঃখের পার, মরুমায়া

এরূপ ক্ষেত্রে পদ্যছন্দ কবিতাকে ধিক্কৃতই করে। এইখানেই ছন্দো-মুক্তির প্রয়োজনীয়তা।

সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দের ন্যায় বাংলা অক্ষরবৃত্তের পয়ার ছন্দে নৃত্য-চাপল্য কম, সেই জন্য ইহা জীবনধর্মী কাব্যের অধিক উপযোগী ; তথাপি ইহাতেও কতকটা গীতিসুর আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। চরণে চরণে সমপর্বিকতা, পর্বান্তিক যতি ও চরণান্তিক মিলের প্রাধান্য এই গীতিসুরের জন্য দায়ী। সূক্ষ্ম শ্রুতিসম্পন্ন কবি মাইকেল ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছন্দোবর্জন করিতে চাহেন নাই, ছন্দকে দমন করিয়া কাব্যের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ছন্দে বাক্যবিন্যাসের তাৎকালিক প্রথায় ছন্দো-দমন সহজ ছিল না; কারণ, প্রথানুযায়ী যতিতে ছেদ স্থাপনে, অর্থাৎ পর্বান্তে ও চরণান্তে বাক্য সমাপ্তির ফলে ছন্দই পাঠকের কাছে প্রাধান্য লাভ করিত। যথা—

[তারকা চিহ্নে 'ছেদ,' দণ্ড চিহ্নে মধ্য 'যতি' বুঝিতে হইবে।]

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে* | গুণে মন ভোর*।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে | প্রতি অঙ্গ মোর* ॥

—জ্ঞানদাস

(উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রথম চরণের পর্বান্তিক যতিতে এবং দ্বিতীয় চরণের চরণান্তিক যতিতে বাক্য সমাপ্তি দ্রষ্টব্য।)

যতিতে ছেদ বসিলে যতিরই শক্তি বৃদ্ধি ঘটে, ভাষা তখন যতিকে আর উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যতি-প্রাধান্য বুঝাইয়া দেয়—রচনারীতি গদ্য নহে, পদ্য। তাছাড়া চরণান্তিক মিলও পৃথক্‌ভাবে বিভিন্ন চরণকে ঐক্যবদ্ধ করে ও পদ্যধর্মের প্রমাণ দেয়। যতি ও মিল, এই দুইয়ের মধ্যে যতি অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন এবং ছেদ ও যতির সহাবস্থান সূচক মিত্রতাই যতিশক্তি ও ছন্দ-প্রাবল্যের প্রধান কারণ। এই মিত্রতা না থাকিলে অর্থাৎ ছেদ ও যতির পৃথক্ অবস্থান

হইলে পাঠকের অর্থলোভী মন ছেদকেই প্রাধান্য দেয় ও যতিকে করে উপেক্ষা। মাইকেল যে যতিস্থলে মোটেই ছেদ স্থাপন করেন নাই, তাহা নহে; তবে বহুস্থলেই পর্বাতিক্রমী ও চরণাতিক্রমী বাক্য ব্যবহার করিয়া যতি ও ছেদের প্রচলিত মিত্রতার বা সহাবস্থানের বাধ্যতা উচ্ছেদ করিয়াছেন। এইজন্যই মাইকেলী পয়ারের নাম—অমিত্র ছন্দ।[৫] এই ছন্দে চরণান্তিক মিলের অভাব অতিরিক্ত অমিত্রতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু অক্ষরের মিলহীনতা অমিত্রছন্দের বাহ্য লক্ষণ; রবীন্দ্রনাথের স-মিল অমিত্রছন্দই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মাইকেলের অমিত্রছন্দ আসলে পয়ার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার চরণে সাধারণ পয়ারের মতোই অষ্টমে ও চতুর্দশে যতি—অর্থাৎ অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্ব যথাক্রমে বর্তমান; কেবল বিশেষত্ব এই—অমিত্রছন্দে চরণের যে-কোন স্থানে বাক্য-সমাপ্তির স্বাধীনতা বর্তমান, সাধারণ পয়ারের ন্যায় যতিস্থলেই ছেদ-স্থাপন অবশ্য কর্তব্য নহে।

কবিতার অর্থ পাঠকের মনের ক্রিয়ার ও ছন্দ প্রাণ-স্পন্দনের অন্তর্গত। সাধারণ পয়ারে ছেদ যতিগত বলিয়া প্রাণের ক্রিয়ার সহিত মনের ক্রিয়া মিলিয়া যায়। কিন্তু অমিত্র পয়ারে বাক্য পর্বাতিক্রমী বলিয়া ছেদ ও যতির পৃথক্ অবস্থিতি ঘটে এবং সেইজন্য মনের ক্রিয়া ও প্রাণের ক্রিয়া পৃথক্ হইয়া থাকে। অমিত্র পয়ারে যখন পাঠকের মন বিশ্রাম করে ছেদে, তখন প্রাণ বিশ্রাম করে

৫। মাইকেলী অমিত্র ছন্দের প্রথমে নামকরণ হইয়াছিল—'অমিত্রাক্ষর' (চরণান্তে মিলবর্জিত) ছন্দ। ইংরেজি নাম **blank verse**-এর অনুবাদে এই নামের প্রবর্তন হয়। কিন্তু চরণান্তিক অক্ষরের অমিত্রতা ইহার মূল লক্ষণ নহে বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম দেন 'অমিতাক্ষর'। কিন্তু এ-নামও ত্রুটিপূর্ণ। গদ্য বাক্যই অমিতাক্ষর হইতে পারে, পদ্যছন্দ নহে। মাইকেলী পয়ার অষ্টমে ও চতুর্দশে যতিযুক্ত মিতাক্ষর ছন্দ, অমিতাক্ষর নহে। 'অমিত্র ছন্দ' নামই ইহার উপযুক্ত।

যতিতে। অর্থলোভী পাঠক ছেদের বিশ্রামই স্পষ্ট বুঝিতে পারে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রাণের ক্রিয়ার ন্যায় যতির বিশ্রাম অত স্পষ্ট বুঝিতে পারে না ; অর্থাৎ এখানে ছন্দ হয় প্রচ্ছন্ন, কাব্যই হয় সুপ্রকাশিত। ইহাই আসলে কবিতার ছন্দোমুক্তি ; কবিতার ছন্দো-বর্জনকে যথার্থ ছন্দোমুক্তি বলা চলে না। ছন্দের 'বন্ধন'-মুক্ত বা 'দাসত্ব'-মুক্ত কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাইকেলী রচনা। যথা—

[তারকা চিহ্নে 'ছেদ', দণ্ড চিহ্নে মধ্য 'যতি' সূচিত।]

সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে
অকালে, * কহ হে দেবি | অমৃত ভাষিণি,*
কোন বীরবরে বরি | সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষকুল নিধি
রাঘবারি ?* কি কৌশলে | রাক্ষস-ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে,* | অজেয় জগতে,*
ঊর্মিলা-বিলাসী নাশি | ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা।*

—প্রথম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য

প্রাণ-ক্রিয়া ও মনঃক্রিয়ার পৃথক্ উপলব্ধিতে এবং যতি ও ছেদের সংঘাত-জাত বিচিত্র ধ্বনিকল্লোলে পাঠকমাত্রই এখানে মুগ্ধ হন। এমন কি বিকর্ণ পাঠকেরাও ইহার রস উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহারও প্রমাণ আছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম যুগের বিখ্যাত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র কানে কম শুনিতেন —ইহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে বলিয়াছেন।[৬] এই রাজেন্দ্রলালও মাইকেলের অমিত্রছন্দকে ভুল বুঝেন নাই। তাঁহার ভাষায়—"ফলতঃ যে প্রকারে বিরাম চিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার চিহ্ন

৬। পৃঃ ১০৬ রবীন্দ্ররচনাবলী (১০)

(ছেদ) ব্যতীত ছন্দের দুই (৮ম ও ১৪শ অক্ষরে) যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য"[৭]।

আশ্চর্যের বিষয়, অমিত্রছন্দের মর্মোপলব্ধি রাজেন্দ্রলালের ন্যায় বিকর্ণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব হইলেও কোন কোন আধুনিক ছান্দসিকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। একজন 'ছেদ'কেই যতি বুঝাইয়া প্রচার করিয়াছেন—"মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম তিনটি পংক্তিতেই মধুসূদন-প্রবর্তিত যৌগিক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দের শক্তি এবং যতি স্থাপনের ত্রুটিরও (?) প্রমাণ রয়েছে।……মধুসূদন পংক্তির যে-কোন স্থানে যতি (?) স্থাপন করতে দ্বিধা করতেন না; অসম সংখ্যক মাত্রার পরে বিরতি ঘটানো যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।" আর একজন ছন্দশাস্ত্রী উপেক্ষণীয় ছন্দ-ত্রুটির একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া মাইকেলের ছন্দোজ্ঞানহীনতা প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু ছন্দে মাইকেলের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না।

কেবল অ-মিল অমিত্রছন্দ নহে, স-মিল অমিত্রছন্দেরও প্রবর্তক মাইকেল। মাইকেল-প্রবর্তিত চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের ছন্দ হইতেছে স-মিল অমিত্র পয়ার। নির্দিষ্ট-সংখ্যক মিলের প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ চরণের মেলবন্ধন সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সনেট প্রথমে ইতালীয় ভাষায় ও পরে ইংরেজিতে রচিত হয়। ইতালীয় এবং ইংরেজি সনেটের অনুকরণেই মাইকেল বাংলায় পয়ার ছন্দে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। চতুর্দশ চরণে সীমাবদ্ধ বলিয়া সনেট আকারে ক্ষুদ্র এবং মিল-প্রধান বলিয়া গীতিস্বরযুক্ত। এই উভয় কারণে সনেট গীতি-কবিতারই অধিক উপযোগী। মাইকেলী সনেটের ছন্দেও বাক্য পর্বাতিক্রমী ও চরণাতিক্রমী; সেইজন্য মাইকেলী সনেটের পয়ার

৭। বিবিধার্থ সংগ্রহ নভেম্বর সংখ্যা, ১৮৬০, মধুস্মৃতি পৃঃ ১২২ হইতে উদ্ধৃত।

গীতিযুক্ত হইয়াও গম্ভীর। ইহা একাধারে রোমান্টিক ও ক্লাসিক। ভাব ও গঠনের দিক দিয়া ইতালীয় সনেট অষ্টক ও ষট্ক, এই দুই স্তবকে বিভক্ত; অষ্টকের মিল দুইটি (কখখক কখখক) এবং ষট্কের মিল দুইটি (চছ চছ চছ) বা তিনটি (চছজ চছজ); একই মিলে শেষ দুই চরণ মিলিত করা ইতালীয় সনেটে নিষিদ্ধ। অপর পক্ষে ইংরেজি, বিশেষতঃ শেক্স্‌পীরীয় সনেট ভাবে ও গঠনে পরপর তিনটি চতুষ্ক ও একটি দ্বয়ীতে বিভক্ত; সাতটি পর্যন্ত মিল এই সনেটে ব্যবহৃত হইতে পারে পারে; যথা—কখ কখ, গঘ গঘ, চছচছ, জজ। ইতালীয় ও ইংরেজি—উভয় প্রকার রীতিতেই মাইকেল চতুর্দশ পদী কবিতা রচনা করিয়াছেন। অবশ্য মিল-বিন্যাসে কতকটা স্বাধীনতাও তিনি দেখাইয়াছেন; কারণ মিল ছন্দের বাহ্য অলঙ্কার মাত্র (৪র্থ অধ্যায়, ২৭ সূত্র); মিলের কমবেশীতে ও পরিবর্তনে ছন্দের যথার্থ পরিবর্তন হয় না। ইতালীয় রীতিতে রচিত মাইকেলের সনেটের দৃষ্টান্ত—

মিত্রাক্ষর	মিল
বড়ই নিষ্ঠুর আমি | ভাবি তারে মনে	ক
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা | গড়িল যে আগে	খ
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি। | কত ব্যথা লাগে	খ
পর যবে এ নিগড় | কোমল চরণে—	ক
স্মরিলে হৃদয় মোর | জ্বলি উঠে রাগে!	খ
ছিল নাকি ভাবধন | কহ লো ললনে	ক
মনের ভাণ্ডারে তার | যে মিথ্যা সোহাগে	খ
ভুলাতে তোমারে দিল | এ তুচ্ছ ভূষণে?	ক
... ...	
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি | কমলের দলে	চ
নিজ রূপে শশিকলা | উজ্জ্বল আকাশে	ছ

কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে | জাহ্নবীর জলে — চ
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি | পারিজাত বাসে ? — ছ
প্রকৃতি কবিতা রূপী | প্রকৃতির বলে — চ
চীন-নারী সম পদ | কেন লৌহ ফাঁসে ? — ছ

আবার ইংরেজি রীতিতে রচিত তাঁহার সনেটের নিদর্শন—

কাশীরাম দাস — মিল

চন্দ্রচূড় জটাজালে | আছিল যেমতি — ক
জাহ্নবী, ভারত রস | ঋষি দ্বৈপায়ন — খ
ঢালিয়া সংস্কৃত হ্রদে | রাখিলা তেমতি — ক
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ | করিত রোদন। — খ

... ...

কঠোর গঙ্গায় পূজি | ভগীরথ ব্রতী— — ক
সুধন্য তাপস ভবে | নরকুল ধন— — খ
সাগর বংশের যথা | সাধিলা মুকতি — ক
পবিত্রিলা আনি মায়ে | এ তিন ভুবন। — খ

... ...

সেইরূপ ভাষাপথ | খননি স্ববলে — চ
ভারত রসের স্রোত | আনিয়াছ তুমি — ছ
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা | এ বিমল জলে — চ
নারিবে শোধিতে ধার | কভু গৌড় ভূমি। — ছ

.. ..

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। — জ
হে কাশি কবীশ দলে | তুমি পুণ্যবান। — জ

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সনেট রচনা পয়ার হইতে মহাপয়ারে সম্প্রসারিত হয়।

কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন—অসমদীর্ঘ চরণের স্তবকবন্ধন-মুক্ত কবিতা বা 'মুক্তকে'র প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ ধারণা সত্য

নহে। মাত্রাবৃত্তে প্রথম মুক্তক দেখা যায় চর্যাপদে। অক্ষরবৃত্তে মুক্তক প্রবর্তনের গৌরব মাইকেলের প্রাপ্য। ছাত্র-পাঠ্য 'নীতিগর্ভ কবিতাবলী'তে মাইকেলই প্রথম সমিল অক্ষরবৃত্তকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের চরণ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছেন; ইহাতে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্নের স্তবক বন্ধন নাই। যথা—

মধ্যাকাশে শোভিল তপন	০ + ১০	অক্ষর
উজ্জ্বল যৌবন	০ + ৬	„
প্রচণ্ড কিরণ;	০ + ৬	„
তাপিল উত্তাপে মহী | পবন বহিলা	৮ + ৬	„
আগুনের শ্বাস রূপে; | সব শুকাইলা।	৮ + ৬	„
শুকাল কাননে ফুল,	৮ + ০	„
প্রাণিগণ ভয়াকুল	৮ + ০	„
জলের শীতল দেহ | দহিয়া উঠিল,	৮ + ৬	„
কমলিনী কেবল হাসিল।	০ + ১০	„
হেনকালে পতনের দশা—	০ + ১০	„
আমরি সহসা—	০ + ৬	„
আসি উতরিল	০ + ৬	„
হিরণ্ময় রাজাসন | তেজিতে হইল।	৮ + ৬	„

—সূর্য ও মৈনাক গিরি

'মানসী' কাব্যের 'নিস্ফল কামনা' কবিতায় এবং 'বলাকা' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের এই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন।

—৭—

মধুসূদনের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ছোট বড় বহু কবি বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে এ-যুগের যথার্থ উল্লেখযোগ্য কবি মাত্র তিনজন—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র

ও বিহারীলাল। ইঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র হইতেছেন মধুসূদনীয় ধারার পরিশিষ্ট এবং বিহারীলাল হইতেছেন রবীন্দ্রীয় ধারার ভূমিকা। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দানই আলোচ্য ; বিহারীলালের স্থান পরবর্তী অধ্যায়ে।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনই হইতেছেন গুরু এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র হইতেছেন শিষ্য। এক্ষেত্রে গুরুর গুরুত্ব শিষ্যে দেখা দেয় নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের বিষয় গ্রহণ করিলেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হস্তে কাব্যে ছন্দোমুক্তির পরিবর্তে ছন্দোবন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। অমিত্রছন্দের পুষ্টির পরিবর্তে অবক্ষয়ই ঘটিয়াছে ; তাঁহারা অমিত্রছন্দের বাহিরটাকেই দেখিয়াছিলেন, ভিতর দেখিতে পান নাই। জীবনধর্মী আখ্যায়িকা কাব্যে গদ্যতা সঞ্চার ও ছন্দোনৃত্য দমনের জন্যই যে অমিত্রছন্দের উৎপত্তি—সে কথা উভয়ের কেহই বুঝিতে পারেন নাই ; তাঁহারা ইহাকে ভাবিয়াছেন, অন্যান্য গীতিছন্দের সমপর্যায়ভুক্ত অতিরিক্ত একটি নূতন ছন্দ রূপে। সেই কারণে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র নিজ নিজ কাব্যে জীবন চিত্রণে অমিত্র ছন্দকে একমাত্র ছন্দরূপে ব্যবহার করেন নাই, অন্যান্য গীতিছন্দের সহিত সমমূল্যে ব্যবহার করিয়াছেন ; ফলতঃ হেমচন্দ্রীয় ও নবীনচন্দ্রীয় অমিত্র পয়ার সাধারণ ভাবে পুরাতন পয়ারেরই বিশেষ রূপ মাত্র, ইহার অমিত্রতা কেবল চরণান্তিক অক্ষর গত, সাধারণতঃ ইহাতে যতি-ছেদে অমিত্রতা নাই—যতিস্থলেই বাক্য সমাপ্ত। এই কারণে হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের অমিত্র পয়ারকে মধুসূদনীয় পয়ারের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ অমিত্রছন্দ বলা চলে না ; ইহা অঙ্গহীন ও পঙ্গু অমিত্রছন্দ। তথাপি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদনেরই শিষ্য, কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের শিষ্য নহেন ; মধুসূদনের প্রভাব ইঁহাদের

মধ্যে ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পয়ার যে মিলহীন কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী পয়ার হইয়াছে, তাহা নহে; প্রাচীন আদর্শ-অনুযায়ী ইঁহাদের বাক্য পয়ারের চরণান্তিক নহে, মধুসূদনীয় রীতিতেই চরণাতিক্রমী। তবে মধুসূদনের বাক্য শুধু চরণকে নহে, পর্বকেও অতিক্রম করে; কিন্তু ইঁহাদের বাক্য সাধারণতঃ পর্বান্তিক— মধ্য যতিতে সমাপ্ত হয়। এইখানেই পার্থক্য, নচেৎ ইঁহারাও মধুসূদনীয়। এমন কি ইঁহাদের রচনায় মধুস্থদনোচিত যতি ও ছেদের অমিত্রতা দুর্লভ হইলেও যে একেবারেই নাই তাহা নহে। যথা, (দৃষ্টান্তের মোটা হরফের পর্ব সম্পূর্ণ মধুসূদনীয়।) হেমচন্দ্রের পয়ার—

অমরার প্রান্তভাগে | মন্দাকিনী তীরে
মন্দির পাষাণময়;* | নিভৃত আলয়
অনুতপ্ত অমরের | চির চিন্তাধাম;*
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া | সে তপোমন্দিরে।*
চতুর্দিকে সেই সব | নিকুঞ্জ কানন;*
স্বর্গজাত তরুরাজি | সৌরভ পূরিত;*
সেই পারিজাত পুষ্প | শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেব চিত্ত।* | শোভিছে আলোকে
দূরে বৈজয়ন্তী পুরী,* | ইন্দ্র অট্টালিকা
চারু কারুকার্যে যায় | সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমর শিল্পী | শিল্পিকুল রাজ
বিশ্বকৃৎ।* সুখিত অ | মর বাস গৃহ।*

—বৃত্রসংহার, ১৪শ সর্গ

নবীনচন্দ্রের পয়ার—

“লক্ষী পূর্ণিমার উষা | ধীরে ধীরে ধীরে।”*
প্রভাসের তীরে বসি | কৃষ্ণ ধনঞ্জয়

শিলাসনে ধ্যানমগ্ন।* | স্থানে স্থানে স্থানে
দুই পার্শ্বে ধ্যান মগ্ন | বসি ঋষিগণ
স্থির অচঞ্চল।* যেন | চারু শিল্পকর
বেদীর প্রস্তর হতে | তুলিছে কাটিয়া
পবিত্র মুরতিচয় | মহিমা মণ্ডিত।*
পূরব গগন পানে | কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
স্থির নেত্রে মুগ্ধ চিত্তে | চাহি আত্মহারা।*

—রৈবতক, ১ম সর্গ

নাটকীয় কথোপকথন রচনার ক্ষেত্রেও নবীনচন্দ্র মধুসূদনের শিষ্য। মাইকেলের সংলাপ নাটকে, নবীনচন্দ্রের সংলাপ কাব্যে, এইখানে মাত্র পার্থক্য। তাছাড়া উভয়ত্র একই প্রকার পদ্ধতিতে অমিত্র পয়ার চরণ খণ্ড খণ্ড রূপে রচিত। পাত্রপাত্রীর উক্তিগুলি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে উহাদের ছন্দোবদ্ধতা বুঝা যায় না বটে, কিন্তু পর পর অবিচ্ছিন্নরূপে দেখিলে সমগ্রের মধ্যে অমিত্র পয়ার সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যথা—

(বন্ধনীবদ্ধ পংক্তিদ্বয় একত্র পাঠ্য)

সত্যভামা। বীরমণি বল তুমি | চাহ কি ভদ্রায় ?
অর্জ্জুন। দেখেছি সুন্দরতর | রূপ কোহিনুর।
সত্য। কে সে পার্থ ? }
অর্জ্জুন। সত্যভামা। }
সত্য। সুভদ্রা অভাগি
কি দশা হইবে তোর !
সুলোচনা। সেও শ্রেষ্ঠতর
দেখিয়াছে বীরবর।
সত্য। কে সে ? }
সুলো। সুলোচনা। }

—রৈবতক, ১৬শ সর্গ

ইহার সহিত মধুস্দন-রচিত নিম্নলিখিত সংলাপ তুলনীয় :—

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা | যতনে ইন্দ্রানি
বিদায় করহ এবে | যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে)
কোথায় রেখছ তারে ?

কলি। এই ঘোর বনে।
সখী সহ আনি তারে | রেখেছি মহিষি।

—পদ্মাবতী নাটক, ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক

উনবিংশ অধ্যায়

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্র-যুগ

—১—

বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন-পরবর্তী যুগ-কবি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইনি মধুসূদনের অসমাপ্ত কর্মের উত্তরসাধক। বাংলা ছন্দে কৃত্রিমতা-বর্জন ও সঙ্গতি-স্থাপন মধুসূদনের মতো রবীন্দ্রনাথেরও কার্য; তবে কৃত্রিমতা বর্জনে ও স্বাভাবিকীকরণে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কর্ম-পদ্ধতি সমপ্রকার নহে। ক্ষেত্র-ভেদ অনুযায়ী প্রকার-ভেদ ঘটিয়াছে। মধুসূদনের ক্ষেত্র মহাকাব্য (এপিক), রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র গীতিকাব্য (লিরিক)। গীতি-সুরের প্রাধান্য মহাকাব্যীয় জীবনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম; তাই ছন্দোদমনের দ্বারা মাইকেলের কাব্যে স্বাভাবিকতা সঞ্চার হইয়াছে। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যীয় হৃদয়-ভাবের কবি। গীতিসুর হৃদয়-ভাবের অনুকূল ও স্বভাবসঙ্গত; এখানে ছন্দোদমন অনাবশ্যক। চরণাতিক্রমী অমিত্রছন্দকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ছন্দোদমনের জন্য মধুসূদন উহাকে করিয়াছেন মিলবর্জিত; অপরপক্ষে ছন্দ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় উহাকে করিয়াছেন মিল-সংযুক্ত। প্রয়োজন-অনুযায়ী এই উভয় ক্রিয়াই স্বাভাবিক। ছন্দোগত কৃত্রিমতা বর্জনে রবীন্দ্র পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য অবশ্য স্বীকার্য্য। বাংলা গীতিছন্দে অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ বর্জন এবং খামখেয়ালী উচ্চারণের পরিবর্তে উচ্চারণ ভঙ্গিকে বস্তুনিষ্ঠ ও পর্বভিত্তিক করিয়া তোলাই হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিকীকরণ।

বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান যুগ হইতেছে রবীন্দ্রযুগ। মধুসূদন স্বক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেও আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বেশী। মধুসূদনের পরে তাঁহার প্রবর্তিত অমিত্রছন্দের সার্থক

অনুসরণ হয় নাই, কিন্তু রবীন্দ্র-রীতির গীতিছন্দ যথাযথরূপে গৃহীত হইয়া অদ্যাবধি অনুসৃত হইতেছে। উভয়ের কবি-প্রতিভার অল্পাধিক্য ইহার কারণ নহে, আধুনিক যুগধর্ম ও বাঙ্গালীর অভ্যাস ইহার জন্য দায়ী। বঙ্গদেশ চিরকাল গানের দেশ। চর্যাগীতি, বৈষ্ণবগীতি, শাক্তগীতি, বাউলগীতি প্রভৃতিতে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর কানে রাবীন্দ্রিক গীতিছন্দই অধিক আদৃত হইবে—ইহাই স্বাভাবিক।

বাংলা কাব্যের ছন্দোভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন ছন্দোবন্ধ উপহার দিয়াছেন (সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত); কিন্তু এইগুলি তাঁহার শক্তির যথার্থ পরিচায়ক নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে—বহুযুগপ্রচলিত কৃত্রিম উচ্চারণের সংস্কারে, অপরিচ্ছন্ন গীতি-ছন্দের শোধনে ও সঙ্গতি স্থাপনে। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গীতি-কবিতা ভাবের দিক দিয়া যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের ছন্দ ছিল কৃত্রিমভাবে বাহির হইতে গৃহীত। ইহারা কোথাও গঠনে শিথিল, কোথাও উচ্চারণে অস্বাভাবিক, কোথাও বা ভাবের সহিত অসঙ্গত*।

অপরিচ্ছন্ন অসঙ্গত ও শ্রুতিদুষ্ট ছন্দ যুগ যুগ ধরিয়া বাংলা

---

* নিম্নোক্ত কবিতার ভাব গম্ভীর কিন্তু ছন্দ প্রগল্ভ :—

ব্রাহ্মণে | মা-রিয়া | পুথি নিল | কা-ড়িয়া | ডোর দিয়া |
দুই ভুজ | বান্ধে।
ব্রাহ্মণে | না-মার | ব্রাহ্মণে | না-মার | বলিয়া- | দ্বিজবর | কান্দে ॥
—চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম)

আবার নিম্নোক্ত কবিতায় ছন্দ গম্ভীর কিন্তু ভাব প্রগল্ভ :—

কানামাছি বোল্‌তা ডাঁশ | সারা রাত্রি ধরে
দংশিবে যে আজ তোরে | বিন্ধিতে থাকিবে
ভীমরুলের চাক যথা | তেমি হবে ফুলে।
—নলিনীবসন্ত (হেমচন্দ্র)

কবিতায় চলিয়া আসিয়াছে; তাহার কারণ বাঙ্গালীর ছন্দোমূর্খতা নহে, প্রকৃত কারণ প্রাচীন গীতি কবিতায় গানের সুরের প্রভাব। স্মরণ রাখিতে হইবে, সেকালের গীতিকবিতা একালের মতো 'পাঠ্য' ছিল না, ছিল 'গেয়'। প্রাচীন কবিতামাত্রই কৃত্রিম সুর-সংযোগে গান করা হইত। সুরের প্রচ্ছাদনে কবিতায় উচ্চারণের অস্বাভাবিকতা ও ছন্দোদোষ ধরা পড়িত না। ফলে কবি নিরঙ্কুশভাবে গীতিকবিতা রচনা করিতেন; উহাতে ছন্দ-শুদ্ধির প্রয়োজন বোধ করিতেন না। প্রাচীন কবিতায় কৃত্রিম সুর সংযোগ কাহারও ব্যক্তিগত খেয়ালে ঘটে নাই, ইহারও ঐতিহাসিক কারণ ছিল। গানের সুরই ছিল সেকালে কবিতা প্রচারের একমাত্র বাহন। উনবিংশ শতকে এদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হয়; তখন হইতে উহাই সাহিত্য প্রচারের বাহন হইয়া উঠে। অবশ্য আধুনিক যুগে 'গেয়' কবিতায় সুর পূর্ববৎ থাকিয়া যায়, কিন্তু 'পাঠ্য'কবিতা সুরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়। উনবিংশ শতকের সূচনা হইতেই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পাঠ্য কবিতা গেয় কবিতা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। সুর বিলুপ্ত হওয়ায় ছন্দের ত্রুটি ক্রমশঃ ধরা পড়ে এবং সংশোধন আবশ্যক হইয়া উঠে।

কিন্তু অভাব বোধ ও অভাব মোচনে পার্থক্য আছে। বহু-প্রচলিত ছন্দের ত্রুটি সংশোধন ও সংশোধিত রূপের প্রতিষ্ঠা প্রদান সহজ নহে। সূক্ষ্মশ্রুতি, রসবোধ, মাত্রাজ্ঞান, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও দুর্দম সাহসের উপরে ছন্দ-সংস্কার কার্য নির্ভর করে। এ-সকল গুণের সমাবেশ রবীন্দ্র-পূর্ব কোন কবিতে দেখা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ-সকল গুণ ছিল, তাই তাঁহার পক্ষে ছন্দ-সংস্কার সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কবি বিহারীলাল কিছু পরিমাণে ছন্দ-সংশোধন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক অহংমুখী গীতি কবিতা ও উহার শ্রুতিসম্মত ছন্দের প্রথম পথ-প্রদর্শক

বিহারীলাল। সর্বপ্রথম ইনিই প্রচলিত গীতি-ছন্দে শ্রুতিকটুতা অনুভব করিয়া উহার প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হন। দৈবক্রমে বিহারীলালের অনুরাগী পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের অভিনব পন্থায় বাংলা ছন্দ-সংস্কার তাঁহাকে ভাবাইয়া তোলে ও গীতিছন্দের সংশোধনে প্রেরণা দেয়। এই জন্যই বিহারীলাল বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্মরণীয়।

—২—

আধুনিক যুগের আদি পর্বের কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিহারীলাল স্বতন্ত্র। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমনকি মধুসূদনও গীতিছন্দের ক্ষেত্রে গতানুগতিক, কিন্তু বিহারীলাল আশ্চর্যভাবে মৌলিক। তিনিই প্রথম লঘুত্রিপদী ও অন্যান্য ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দের হলন্ত অক্ষরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ সহ্য করিতে পারেন নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে—বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার প্রথম কবি হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারীলাল বাদে সমস্ত রবীন্দ্রপূর্ব কবি ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দে সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরকে অপ্রতিবাদে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য ঊনবিংশ শতকের পূর্বের কবিদের কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ তখন তাহাদের ছন্দ ছিল সুর-মিশ্রিত এবং ছন্দোদোষ ছিল উপেক্ষণীয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে সুরমুক্তির যুগেও কবিদের কর্ণে লঘু ত্রিপদীর সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর শ্রুতিকটুতা উৎপন্ন করে নাই। বরং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সর্ববিধ ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলন্ত অক্ষর প্রয়োগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। যথা :—

বিহারীলাল

(১) হেথা ইন্দ্রালয়ে | নন্দন ভিতর
পতিসহ প্রীতি | সুখে নিরন্তর
দানব রমণী | করিছে ক্রীড়া।

রতি ফুল মালা | হাতে দেয় তুলি
পরিছে হরষে | সুষমাতে ভুলি
বদনমণ্ডলে | ভাসিছে ব্রীড়া ॥

—হেমচন্দ্র, বৃত্রসংহার ২য় সর্গ

(২) দেখে ক্ষত্রিয়েরা | নেত্রে অনিমেষ
অর্জ্জুন সারথি | পাঞ্চজন্য ধর।
রথচক্র মত | মহা রণচক্র
করিছে চালন | কি বিস্ময় কর ॥

—নবীনচন্দ্র, প্রভাস, ৫ম সর্গ

বিহারীলাল এই যুগেরই কবি, কিন্তু তাঁহার কর্ণে উক্তপ্রকার কবিতার ধ্বনি হইয়াছিল পীড়াদায়ক। বিহারীলালের কবিতায় সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের প্রয়োগ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; তবে ঐগুলি ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন। তাঁহার রচনা সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর বর্জিত। সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর বাংলা লিপিতে যুক্তবর্ণেই প্রকাশিত হয়; সেইজন্য বিহারীলালের রচনায় সাধারণতঃ যুক্তবর্ণ দেখা যায় না। যথা—

(১) আননে লোচনে | কপোলে অধরে
সে হৃদি কানন | কুসুম রাশি।
আপনা আপনি | আসি থরে থরে
হইয়ে রয়েছে | মধুর হাসি ॥

—নারী বন্দনা, বঙ্গ সুন্দরী

(২) ললিত রাগেতে | গলিবে পরাণ
উথুলে উঠিবে | হৃদয় মন।
বিষাদের নিশা | হবে অবসান
ফুটিয়া হাসিবে | কমল বন ॥

—সুরবালা, ঐ

ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দের সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরে বিহারীলাল যে কর্ণপীড়া

অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম প্রমাণ উল্লিখিত ধরণে যুক্ত-বর্ণ-বর্জিত শব্দের প্রয়োগ, দ্বিতীয় প্রমাণ যুক্ত-বর্ণ বিশিষ্ট শব্দে অতিরিক্ত স্বর সন্নিবেশের দ্বারা শব্দবিকৃতি সম্পাদন। যে ক্ষেত্রে যুক্ত বর্ণ বিশিষ্ট শব্দকে বিহারীলাল অত্যাজ্য মনে করিয়াছেন, সেখানে তিনি ছন্দোভঙ্গ পরিহার করিতে সংশ্লিষ্ট অক্ষরের মধ্যে নূতন স্বরধ্বনি সন্নিবেশ করিয়া একটি হলন্ত অক্ষরকে দুইটি স্বরান্ত অক্ষরে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—'কল্পনা'কে করিয়াছেন 'কলপনা', 'স্ফূর্তি'কে করিয়াছেন 'স্ফুরতি', 'মুগ্ধা'কে করিয়াছেন 'মুগুধা'। যথা—

(১) সে সুরললনা | 'কলপনা' বিনে
কে বাজাবে প্রাণে | ভোরের বাঁশী।
—সুরবালা

(২) ঢুলু ঢুলু সেই | নেশার নয়নে
যেমন মূরতি | 'স্ফুরতি' পাবে।
—ঐ

(৩) কালো রূপে আলো | করি চরাচর
কে গো এ বিরাজে | 'মুগুধা' বামা।
—ঐ

ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দে এই প্রকার যুক্তবর্ণ-বিমুখতা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর বিরোধিতার মূলে বিহারীলালের কোন মানস বিকৃতি নাই। সূক্ষ্ম বিচারে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ মাত্রই শক্তি ব্যঞ্জক এবং শক্তি সকল ক্ষেত্রেই কোমলতার বিরোধী। দীর্ঘ—অর্থাৎ অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বের ছন্দই যথার্থ সবল ও ভারসহ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত"।[১] অপর পক্ষে ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দ হ্রস্ব বলিয়াই কোমল; সংশ্লিষ্ট অক্ষরের বলিষ্ঠতা এখানে অসঙ্গত। সেইজন্য হ্রস্ব পর্বিক ছন্দে বিহারীলালের শ্রুতির সাক্ষ্য প্রামাণিক।

১। পৃঃ ১৯৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড

—৩—

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শ্রুতির উত্তরাধিকারী ; উপরন্তু তাঁহার মাত্রাজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, বিচার শক্তি ও সাহস অনন্যসাধারণ। তাই তিনি বিহারীলালের উদ্দেশ্যেরই সমর্থক কিন্তু তাঁহার পদ্ধতির সমর্থক নহেন। কোমল ভাবের খাতিরে ভাষার যথেচ্ছ বিকৃতি সাধনকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। বিহারীলালের পদ্ধতিতে হলন্ত অক্ষরকে স্বরান্তে পরিণত করিলে শব্দ অতিরিক্ত দুর্বল হইয়া যায়। তাই এই প্রকার পদ্ধতিতে ছন্দোরচনাকে রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করিয়াছেন—"বাংলা যে ছন্দে যুক্ত (= হলন্ত) অক্ষরের স্থান হয় না ; সে ছন্দ আদরণীয় নহে। যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে।"[২] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন—ক্ষেত্রবিশেষে ছন্দে কোমলতা প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই কোমলতার সীমা আছে। মাত্রাছন্দ হ্রস্ব পর্বিক এবং কোমল ছন্দ, তথাপি ইহাকেও কিছু পরিমাণে সবল করিয়া তোলা যায়। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে ও প্রাচীন বাংলায় মাত্রাবৃত্তের হলন্ত অক্ষরকে হলন্তই রাখিয়া এবং শব্দকে বিকৃত না করিয়া কেবল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা উহাতে কোমলতা বজায় রাখা হইয়াছে। সেই চিরন্তন পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ছন্দে বিশেষ করিয়া মাত্রাবৃত্তে রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নাই। তবে এই দান একটু সতর্কভাবে চিন্তনীয়। কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন—বাংলা মাত্রাবৃত্ত "রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি", "মানসী কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়া যে বিশিষ্ট রীতি 'প্রবর্তন' করিলেন, তাহা অবিলম্বে সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং ইতিহাসে নূতনধারা প্রবাহিত হইল।" কিন্তু এ-কথা

২। পৃঃ ১২৭ র-র (১৪)

সত্য নহে। মাত্রাবৃত্ত রবীন্দ্র-সৃষ্ট নহে; ইহা সর্বভারতীয় ছন্দ এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত যুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। এমনকি বাংলায় 'মানসী' কাব্যে মাত্রাবৃত্ত প্রথম প্রবর্তিত নহে, বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ম হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হলন্ত অক্ষরের বিশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ সকল মাত্রাবৃত্তের চিরন্তন ধর্ম; ইহাও নব-প্রবর্তিত নহে। চর্যাপদে, ব্রজবুলি পদে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, অন্নদামঙ্গলে বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষরের মাত্রাবৃত্ত দেখা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সহিত মাত্রাবৃত্তের সম্পর্ক আর যাহাই হউক, পিতা-পুত্র সম্পর্ক নহে। সূক্ষ্ম বিচারে রবীন্দ্রনাথ বাংলা মাত্রাবৃত্তের মুক্তিদাতা— অক্ষরবৃত্তের দাসত্ব হইতে ইহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। সুরপ্রভাবিত ও শৈথিল্যপূর্ণ প্রাচীন রচনার যুগে সূক্ষ্ম শ্রুতির শাসন ছিল না। সেই যুগে প্রাচীন পণ্ডিতেরা হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে সর্ববিধ পর্বের ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত রূপে চালাইয়া ছিলেন। লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী, একাবলী প্রভৃতি ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দ এবং চতুরক্ষর পর্বিক ছন্দগুলি যে ধ্বনিধর্মে মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত নহে, তাহা এই সকল পণ্ডিত স্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা এই সকল হ্রস্বপর্বিক ছন্দে নিঃসঙ্কোচে সংশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইহা প্রথায় পরিণত হইয়া যায়। অস্বাভাবিক ব্যবহারে হলন্ত অক্ষরগুলি যে সেকালে কর্ণ-পীড়া উৎপন্ন করে নাই তাহা নহে, বিহারীলালের ন্যায় প্রাচীন কবিরাও ইহাতে অস্বস্তি অনুভব করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে হ্রস্বপর্বিক ছন্দে হলন্ত অক্ষরকে বিশ্লিষ্টভাবে প্রয়োগ করিয়া ফেলিতেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ইহারও প্রমাণ আছে।*

---

* (১) এমন কঠিন | নারীর পরাণ | বাহির নাহিক | হয়।
নাজানি কিজানি | হয় পরিণামে | দাস গোবিন্দ | কয়॥

[পরপৃষ্ঠার পাদটীকায় অন্যান্য দৃষ্টান্ত] —গোবিন্দদাস

তথাপি প্রথাবদ্ধতার জন্য কেহই অগ্রসর হইয়া এই হ্রস্বপর্বিক ছন্দগুলিকে অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন নাই। অস্বাভাবিকতার প্রতিবিধান করেন প্রথম রবীন্দ্রনাথ। ছন্দের ক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাহস করিয়া বলেন—ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দগুলিকে দিয়া বিজাতীয় সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করানো 'অপরাধ'জনক। তিনি দৃষ্টান্ত প্রয়োগে দেখাইয়াছেন—

"আকাশের ওই | আলোর কাঁপন
নয়নেতে ওই | লাগে।
সেই মিলনের | তড়িৎ তাপন
নিখিলের রূপে | জাগে॥

—আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার (ষড়ক্ষর পর্বের) ছন্দকে নিচের রূপে রূপান্তরিত করা 'অপরাধ'—

ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিকেতে লাগে।
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ ঝম্পন
বিশ্বমূর্তি হয়ে জাগে॥"[৩]

---

(২) দক্ষের | নিজশির | কা-টিয়া | মহাবীর | ফে-লিল | যজ্ঞের | কুণ্ডে।
মুকুন্দ | নিবেদন | শুন গো- | জগজন | মহাদেব | নিন্দার | দণ্ডে॥
—মুকুন্দরাম

(৩) সহচরী | গণ যদি | সন্নিধি | আ-ইল | নম্র মু | খী-অতি | লাজে।
ভা-রত | চন্দ্র ক | হে-শুন | সুন্দরি | লা-জ ক | রো-কোন | কাজে॥
—ভারতচন্দ্র

(৪) চল চল চল | তড়িৎ ঘটা মণিমরকত | কান্তিছটা
(একি) চিত্ত ছলনা | দৈত্য দলনা | ললনা নলিনী | বিড়ম্বিনী।
—রামপ্রসাদ

৩। পৃঃ ১৮৪ র-র (১৪)

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ কেহ প্রচার করেন—রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টান্তই নিখুঁত; উহারা পৃথক্ রীতির ছন্দ, প্রথমটি নির্দোষ মাত্রাবৃত্ত ও দ্বিতীয়টি নির্দোষ অক্ষরবৃত্ত।* এই বিভ্রান্তি দূর করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আরও স্পষ্ট করিয়া 'ছন্দোভঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করিতে হয়। তিনি বিহারীলালের—

অপ্সরী কিন্নরী | দাঁড়াইয়া তীরে
ধরিয়ে ললিত | করুণ তান

উদ্ধৃত করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—"অপ্সরী কিন্নরী যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে 'ছন্দোভঙ্গ' করিয়াছে।"[৪]

কেবল ষড়ক্ষর পর্বিক ছন্দে নহে, সপ্তাক্ষর, ষড়ক্ষর, পঞ্চাক্ষর ও চতুরক্ষর পর্বের ছন্দে হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ অস্বাভাবিক এবং বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই স্বাভাবিক (অর্থাৎ ইহারা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ), তাহা রবীন্দ্রনাথ নানা দৃষ্টান্তে স্পষ্ট করিয়া তুলেন। অপরপক্ষে অক্ষরবৃত্তের যথার্থ অধিকার যে কেবল অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর পর্বের ছন্দে, তাহাও স্পষ্টীকৃত হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে; বুঝা যায়—পয়ার (৮+৬ অক্ষর), দীর্ঘ ত্রিপদী (৮+৮+১০ বা ৮+৮+৬ অক্ষর), মহাপয়ার (৮+১০ অক্ষর) ও দিগক্ষরা (১০ অক্ষর), ইহারাই প্রকৃত অক্ষরবৃত্ত বা পয়ার জাতীয় ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"লম্বা নিঃশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের (= পয়ার জাতীয়

---

* বহুকাল যাবৎ লোকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল—অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত পরস্পরের বিপরীত। মাত্রাবৃত্তের হিসাবে যাহা ছন্দোদুষ্ট, অক্ষরবৃত্তের হিসাবে তাহা নির্দোষ ছন্দ হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়া দেন—অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত পরস্পরের বিপরীত নহে, পরিপূরক। একই রচনা একবার উৎকৃষ্ট, একবার নিকৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্র-রচিত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিই ছন্দোদুষ্ট।

৪। পৃঃ ১২৭ র-র (১৪)

ছন্দের*) পদ-মর্যাদা।"[৫] হ্রস্ব নিঃশ্বাসের লঘু চালে, অর্থাৎ হ্রস্ব পর্বে গঠিত হইলে পয়ার-জাতীয় ছন্দে আর পয়ারত্ব থাকে না। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়া দেন—পর্বদৈর্ঘ্যের উপরেই বাংলা ছন্দ নির্ভর করে, ব্যক্তিগত খেয়ালের উপরে নহে। পর্বদৈর্ঘ্যের উপরে ছন্দের উচ্চারণ ভঙ্গিকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দকে বস্তুনিষ্ঠ, নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলেন। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়। ছন্দের স্বাভাবিকী-করণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে 'ছন্দোগুরু'।

মাত্রাবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অক্ষরবৃত্তের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন তাহা নহে, অ-বাঙ্গালী উচ্চারণের কৃত্রিমতা হইতেও মুক্তি দিয়াছেন। বাংলা ভাষার জন্মকাল হইতেই বাঙ্গালীর কণ্ঠে 'দীর্ঘ' স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। তথাপি অনুকরণ পরিহার করা হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে চর্যা ও ব্রজবুলি পদের মাত্রাবৃত্তে কৃত্রিম দ্বিমাত্রিক উচ্চারণের দীর্ঘ স্বরবর্ণ দেখা যায়। কেবল 'গেয়' কবিতার যুগে নহে, 'পাঠ্য' যুগেও হেমচন্দ্র-প্রমুখ কবিগণ মাত্রাবৃত্তে হঠাৎ কোন কোন দীর্ঘ স্বরবর্ণে অবঙ্গীয় কৃত্রিম দীর্ঘ (দ্বিমাত্রিক) উচ্চারণ চালাইয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকেরা পাছে স্বভাবের বশে হ্রস্বভাবে পাঠ করিয়া বসেন, এই ভয়ে তাঁহারা লিপিতে দীর্ঘত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

(১) রে-সতি | অরে সতি কাঁ-দিল | পশুপতি
পা-গল | শিব প্রম | থে-শ।

---

* "(দীর্ঘ) ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ার জাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই পয়ার নাম দিচ্ছি।"—পৃঃ ১৯২ র-র (১৪)

৫। পৃঃ ১৪২ র-র, ঐ

যো-গ ম | গন হর 　　　　　　 তা-পস | যতদিন
ততদিন | না-ছিল | ক্লে-শ ॥
—দশমহাবিদ্যা, হেমচন্দ্র

(২) 　 (কত) কা-ল প | রে- বল | ভা-রত | রে-
(দুখ) সা-গর | সাঁ-তারি | পা-র হ | বে- !
—ভারত বিলাপ, গোবিন্দ রায়

দীর্ঘ স্বরবর্ণের এই প্রকার কৃত্রিম দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট নির্দেশ—"বাংলায় এ-জিনিব চলবে না, কারণ বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরের পরিমাণ-ভেদ সুব্যক্ত নয়।"[৬] তাছাড়া দীর্ঘ স্বরবর্ণের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ "গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা।"[৭] হেমচন্দ্রাদির ন্যায় "চিহ্ন উঁচিয়ে চোখে খোঁচা দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করলে পাঠকের প্রতি অসৌজন্য করা হয়।"[৮] বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত 'পাঠ্য' কবিতায় এইরূপ কৃত্রিম উচ্চারণ পরিত্যাগ করিয়া বাংলা মাত্রাবৃত্তকে সম্পূর্ণ বঙ্গীয় ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের গৌরব প্রধানতঃ প্রয়োগশিল্পে। সংস্কৃত কবিতার অনুকরণে শ্লোক-বদ্ধতা বা স্তবক-বদ্ধতাই ছিল অক্ষরবৃত্তে রচিত বাংলা কবিতার বহুকালের বৈশিষ্ট্য। সেকালের গীতিকবিতা ছিল পয়ার, ত্রিপদী, দিগক্ষরা প্রভৃতি নির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধে গ্রথিত। উহা হইত পুষ্পমাল্যের পুষ্পের মতো কৃত্রিমভাবে পরস্পর সংযুক্ত, নদীপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো অকৃত্রিমভাবে প্রবাহিত হইত না। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন নদীপ্রবাহের মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায়; কাজেই তাঁহার ছন্দকেও করিতে হইয়াছে বিশেষ ছন্দোবন্ধের বন্ধনমুক্ত ও স্বচ্ছন্দচারী। তাই তিনি প্রয়োজন মতো

৬। পৃঃ ১৩৯ র-র (১৪), 　　 ৭। ঐ, ঐ, 　　 ৮। পৃঃ ২৫০ ঐ

চরণে পর্ব সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পর পর চরণগুলিকে করিয়া তুলিয়াছেন অসমদীর্ঘ। এই প্রকার অসমীর্ঘ চরণের ছন্দকে বলা হয়—'মুক্তক' অর্থাৎ স্তবক-বন্ধনমুক্ত। মাইকেলের নীতিগর্ভ কবিতাতেই অক্ষরবৃত্ত-জাতীয় মুক্তকের প্রথম আবির্ভাব হয় (৪০৯পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহার ব্যাপক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। 'বলাকা' কাব্যে ব্যবহৃত বলিয়া ইহা 'বলাকা-ছন্দ' নামে বেশী পরিচিত। মুক্তকের দৃষ্টান্ত ঃ—

তুমি কি কেবল ছবি | শুধু পটে লিখা। ... ৮ + ৬ অক্ষর
ওই যে সুদূর নীহারিকা ... ০ + ১০ "
যারা ক'রে আছে ভিড় ... ৮ + ০ "
আকাশের নীড় ... ০ + ৬ "
ওই যারা দিনরাত্রি ... ৮ + ০ "
আলো হাতে চলিয়াছে | আঁধারের যাত্রী ... ৮ + ৬ "
গ্রহ তারা রবি ... ০ + ৬ "
তুমি কি তাদের মতো ... ৮ + ০ "
সত্য নও।
হায় ছবি } ... ৮ + ০ "
তুমি শুধু ছবি॥ ... ০ + ৬ "

—বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রীয় মুক্তকের সুপরিণত রূপ বলাকা কাব্যে প্রকাশিত হইলেও অপরিণত রূপ দেখা দিয়াছে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত সমিল অমিত্র ছন্দে। রবীন্দ্রীয় অমিত্র ছন্দের নূতনত্ব কেবল তথাকথিত চরণের অন্ত্যানুপ্রাসে নহে, ইহার নূতনত্ব রহিয়াছে চরণের অসমতায় অর্থাৎ মুক্তক-ধর্মিতায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমিত্র ছন্দের পূর্ণ চরণ সমূহের মধ্যে মধ্যে পর্ব-বিলুপ্ত অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া ইহাকে করিয়া তুলিয়াছেন অসমপদী। মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ কিন্তু সমপদী, রবীন্দ্রীয় অমিত্র

ছন্দের ন্যায় অসমপদী নহে। রবীন্দ্রনাথ যেমন পয়ারে তেমনি মহাপয়ারেও অমিত্র ছন্দ রচনা করিয়াছেন এবং উভয়বিধ অমিত্র ছন্দই হইয়া উঠিয়াছে ছদ্মবেশী অপরিণত মুক্তক। রবীন্দ্রীয় অমিত্র ছন্দের শ্রুতিসম্মত রূপ ঃ—

[রবীন্দ্র-কৃত পংক্তিতে নিম্নপ্রকার ফাঁক নাই।]

(১) গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা | রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে
তীর্থ স্নান লাগি।

—দেবতার গ্রাস

(২) ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে | মন্দার মালিকা
হে মহেন্দ্র নির্বাপিত | জ্যোতির্ময় টীকা
মলিন ললাটে।

—স্বর্গ হইতে বিদায়

(৩) চঞ্চল আলোক ছায়া | কতকাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি | কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি পরে সোনার বিস্মৃতি।

—কৃতজ্ঞ

(৪) অন্ধকারে ঢাকে নিশি | নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন
বাহিরিনু সেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বর তলে | ধূসর প্রসর রাজপথে।

—এবার ফিরাও মোরে

এইগুলিকে ছদ্মবেশী বলিবার কারণ আছে ; এইগুলি প্রকৃত অসমপদী হইয়াও সমপদিতার ভাণ করে। সেকালে এই ছদ্মবেশের কিছুটা প্রয়োজনীয়তা ছিল। পয়ার বা মহাপয়ারের একটানা প্রবাহের মধ্যে আকস্মিক পর্ব-বিলুপ্তি বা অঙ্গচ্ছেদ ছিল সেকালের পাঠকের অপ্রত্যাশিত। ক্রমভঙ্গকে ছন্দোভঙ্গ বোধ হইতে পারে, এইরূপ

আশঙ্কা ছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ কৌশলে পাঠকের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইয়া প্রকৃত অসমদীর্ঘ চরণকে সমদীর্ঘতার ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন। তিনি এই সব ক্ষেত্রে পরবর্তী চরণ হইতে অস্বাভাবিকভাবে পর্ব টানিয়া আনিয়া উহাকে অপূর্ণ চরণের সহিত এক পংক্তিতে বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে তাঁহার পয়ার-চরণে আদর্শ চৌদ্দ অক্ষর ও মহাপয়ার চরণে আদর্শ আঠারো অক্ষর অব্যাহত আছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়। উল্লিখিত চারিটি দৃষ্টান্তের অপূর্ণ চরণগুলির ছদ্মবেশ নিম্নপ্রকার :—

(১) তীর্থস্নান লাগি। | সঙ্গীদল গেল জুটি ... ৬ + ৮

(২) মলিন ললাটে। | পুণ্যবল হল ক্ষীণ ... ৬ + ৮

(৩) তারি পরে সোনার বিস্মৃতি। | কত রাত্রি গেছে রেখে ১০ + ৮

(৪) নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। | বাহিরিনু সেথা হতে ... ১০ + ৮

ইহাদের পংক্তিতে চরণের আদর্শ অক্ষরসংখ্যা বজায় আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পর্ব-বিন্যাসের বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এইগুলিতে চক্ষুকর্ণের বিবাদ সৃষ্টি হয়; কারণ এই পংক্তিগুলিকে এক একটি চরণ বলিয়া চক্ষু স্বীকার করিলেও কর্ণ স্বীকার করে না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ষড়ক্ষর পর্ব ও দশাক্ষর পর্ব অন্ত্যপর্ব মাত্র, ইহাদের স্থান চরণান্তে এবং ইহাদের যতি সকল সময়েই দীর্ঘ যতি (৯ম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ সূত্র)। অপরপক্ষে অষ্টাক্ষর পর্ব হইতেছে মুখপর্ব ; ইহার স্থান চরণের আদিতে, ইহার যতি হ্রস্বযতি। জবরদস্তিতে জাতীয় উচ্চারণবিধির পরিবর্তন হয় না। তাই এই সকল দৃষ্টান্তে রবীন্দ্র-সৃষ্ট দৃষ্টি-বিভ্রম স্থায়ী হয় না। চক্ষুকর্ণের বিবাদে কর্ণই জয়লাভ করে; উল্লিখিত নিম্নরেখ ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর পর্বগুলি উচ্চারণকালে পূর্ববৎ অসমদীর্ঘ অপূর্ণ চরণরূপেই থাকিয়া যায় ; অতিরিক্ত অষ্টাক্ষর পর্বগুলি অপরের পংক্তি ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে পরবর্তী চরণে ফিরিয়া আসে এবং মুখপর্বরূপেই

উচ্চারিত হয়। মোটকথা, অমিত্র ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে-রূপে পংক্তি সজ্জা করেন, উচ্চারণকালে সেরূপ থাকে না, পংক্তি-বিপর্যয় হইয়া যায়। রবীন্দ্রকৃত পংক্তি বিন্যাস ও উহার উচ্চারিত রূপ পরস্পর তুলনা করিলে এই অপূর্ব কাণ্ড বুঝা যাইবে। যথা—

রবীন্দ্রকৃত পংক্তি বিন্যাস—

পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানব গৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে। স্বর্গ হতে মর্ত্য ভূমি
করিছ বিহার। সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল। উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা। পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তল তল ছল ছলে
ললিত যৌবনখানি।

—মানসসুন্দরী

ইহার উচ্চারিত রূপ ঃ—

পরজন্মে তুমি কিগো | মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে | নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্য সুন্দরী।
এখন ভাসিছ তু**মি** | অনন্তের মাঝে।
স্বর্গহতে মর্ত্যভূ**মি** | করিছ বিহার।
সন্ধ্যার কনক ব**র্ণে** | রাঙিছ অঞ্চল।
উষার গলিত স্ব**র্ণে** | গড়িছ মেখলা।
পূর্ণ তটিনীর জ**লে** | করিছ বিস্তার
তল তল ছল ছ**লে**
ললিত যৌবন খানি।

[উচ্চারিত রূপে চরণান্তিক মিল মধ্যপর্বান্তিক মিলে পরিণত।]

লক্ষ্য করিতে হইবে—চরণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া কৃত্রিমভাবে দুই পংক্তিতে লেখা হয় বলিয়া চরণ পংক্তি লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রীয় অমিত্র ছন্দকে বলা হয় 'পংক্তি-লঙ্ঘক'। মধুসূদনের অমিত্র ছন্দে বাক্যই চরণকে লঙ্ঘন করে, চরণ পংক্তিকে লঙ্ঘন করে না ; কারণ চরণ কখনও একাধিক পংক্তিতে বিন্যস্ত হয় না। সুতরাং মাইকেলী ছন্দে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ও বিবাদ-ভঞ্জন নাই ; পংক্তি লঙ্ঘনের চমৎকৃতি সৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

[রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার রচনারীতি বিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

—৪—

রবীন্দ্রনাথের পরে বঙ্গ সাহিত্যে যে সকল কবি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ছন্দোরচনায় রবীন্দ্র-শিষ্য ; রবীন্দ্রপূর্ব যুগের শৈথিল্য বর্জন করিয়া সকলেই রবীন্দ্রোচিত সুপরিচ্ছন্ন ছন্দো রচনাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য বর্তমানের হিসাবে রবীন্দ্র-যুগকেই ছন্দ-ইতিহাসের অন্ত্যযুগ বলা যায়। রবীন্দ্রযুগে সকলেই গতানুগতিক, কেবল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিশিষ্ট।* তিনি বিচিত্র ছন্দোরচনায় রবীন্দ্র-শিষ্য হইয়াও মণ্ডনকলায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিক রূপ সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ অতুলনীয়। পর্বের ধ্বনি-বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিরঙ্কুশ—কোন বিশেষ প্যাটার্নের বন্ধন স্বীকার করেন নাই, কিন্তু নির্দিষ্টক্রমে লঘু-গুরু ধ্বনি বিন্যাসের দ্বারা পর্ব-প্যাটার্ন সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। এই প্যাটার্ন-সৃষ্টির দ্বারা তিনি একদিকে সংস্কৃত বৃত্তছন্দকে অপরদিকে ইংরেজি শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দকে বাংলায় আমদানি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

*ছন্দের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালেরও অভিনবত্ব কতকটা স্বীকার্য। (বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)
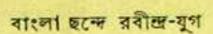
করিয়াছেন। কেবল ক্লাসিক ছন্দোগঠনে, অলংকরণে ও অনুবাদে নহে, ছন্দ-তত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিভাবান অগ্রদূত—'ছন্দ-সরস্বতী' নামক বিখ্যাত রচনায় ইনিই প্রথম বাংলা ছন্দের তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। বলবৃত্ত ছন্দের পর্ব দৈর্ঘ্য যে সাড়ে চার মাত্রা তাহা ইনিই প্রথম বুঝিতে পারেন। পাঠক সমাজে সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দ-যাতুকর' নামে প্রসিদ্ধ ; ইহা মোটেই অত্যুক্তি নহে।

বাংলায় ছন্দ-অনুবাদের সূচনা সত্যেন্দ্রনাথ হইতে নহে, প্রথম বঙ্গসাহিত্যের চর্যাপদ হইতেই প্রাকৃত মাত্রাছন্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত বৃত্তছন্দের প্রথম আমদানি প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে। আধুনিক যুগে অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভারতচন্দ্র, বাসবদত্তা কাব্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ললিত কবিতাবলীতে বলদেব পালিত, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দঃকুসুম গ্রন্থে ভুবনমোহন রায়চৌধুরী, দশাননবধ কাব্যে হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, যজ্ঞভস্ম কাব্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত বৃত্তছন্দকে বাংলায় অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় কাহারও অনুবাদ সার্থক অনুবাদ হয় নাই। ইঁহাদের অধিকাংশের রচনায় ছন্দকে কৃত্রিমভাবে ভাষায় চাপানো হইয়াছে মাত্র, ভাষায় ছন্দ স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—প্রাচীনকালে বৈষ্ণব পদাবলীতে শশিশেখর লিখিয়াছিলেন—

তব কোপ বড়ে অভিমান চড়ে

এবং আধুনিককালে যজ্ঞভস্ম কাব্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—

অনলের কণা পড়িছে খসিয়া

কবিদ্বয়ের উদ্দেশ্য উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দে নিম্নপ্রকার উচ্চারণ :—

তব কো'ও' | প বড়ে'এ' | অভি মা'আ' | ন চড়ে'এ'

এবং—

অনলে'এ' | র কণা'আ' | পড়িছে'এ' | খসিয়া'আ'

কিন্তু বাঙ্গালীর উচ্চারণ-প্রবৃত্তি অন্যরূপ। বাঙ্গালী পাঠক ঐগুলিকে নিম্নপ্রকারে পড়িয়া থাকেন ঃ—

তব কোপ বড়ে | অভিমান চড়ে

এবং—

অনলের কণা | পড়িছে খসিয়া

ফলে 'তোটক' প্রকাশ পায় না এবং কবিদ্বয়ের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। বাংলায় তোটকের অধিকাংশ চরণকে সুপরিচিত লঘুত্রিপদীর ষড়ক্ষর পর্বে ভাগ করিয়া পড়া চলে বলিয়া ইহাকে তবু ছন্দ বলিয়া চেনা গিয়াছে, কিন্তু সত্যেন্দ্র-পূর্ব কবিদের মালিনী, শিখরিণী, রুচিরা, মন্দাক্রান্তা, দ্রুতবিলম্বিত প্রভৃতি ছন্দের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালীর ছন্দোবোধ উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই। যথা—

(১) কুবাসনা খলহৃদয়ে সদা রহে
মহাসুখী সুজনগণের পীড়নে।
প্রবঞ্চকে কখন করে কি ভাবনা
অকারণে সরল মনে দিতে ব্যথা।

—রুচিরা ছন্দ, ভুবনমোহন রায়চৌধুরী

(২) কহ কিজন্য মহৎ সমরাঙ্গনে
অমরবর্গ অলক্ষিত এক্ষণে ?
উচিত সৈন্যসহ স্থিতি সঙ্গরে
সতত রক্ষি সবন্ধু নরেশ্বরে।

—দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ, হরগোবিন্দ

(৩) লজ্জা কহিল 'হবে
কিলো তবে
কতদিন পরাণ রবে
অমন করি।

হইয়ে জলহীন
যথা মীন
থাকিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি !'

—শিখরিণী ছন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ

সংস্কৃত বৃত্তছন্দের বঙ্গানুবাদে কবিদের ব্যর্থতার কারণ আছে। ছন্দ যদিও অর্থনিরপেক্ষ এবং ভাষামুক্ত, তথাপি ভাষার সহিত সহিত ছন্দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া উঠে। ভাষাভেদে উচ্চারণভঙ্গি পৃথক্ হয় এবং ভাষার বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারিত শব্দের মধ্য দিয়াই জাতীয় ছন্দ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য জাতীয় উচ্চারণ ভঙ্গির সহিত ছন্দের সংযোগ প্রায় অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে। বাংলা শব্দে বঙ্গীয় উচ্চারণ ভঙ্গির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গি ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি বাংলায় ফুটাইয়া তোলা সুকঠিন। আবার এইপ্রকার কৃত্রিম উচ্চারণেরও বিপদ আছে। সাহিত্য ব্যক্তি-গত ব্যাপার নহে, জাতীয় ব্যাপার। কবি বিজাতীয় কৃত্রিম উচ্চারণে ছন্দোরচনা করিতে পারেন, কিন্তু পাঠকও জাতীয় উচ্চারণ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ও অদ্ভুত উচ্চারণ করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদকেরা এই কথাটি বুঝেন নাই। তাঁহারা জবরদস্তি করিয়া কৃত্রিম উচ্চারণে বাঙ্গালী জাতিকে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর স্বাভাবিক জাতীয় উচ্চারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর অভিযোগ ও আক্ষেপ স্মরণীয়। সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গানুবাদ পড়িতে যাইয়া বাঙ্গালীরা—

[উদ্ধৃতাংশে ইলেক (') অকারান্ত সূচক এবং (-) দীর্ঘত্ব সূচক।]

লঘুকে- গুরু সম্ভা-ষে- | দী-র্ঘ বর্ণে- কহে- লঘু-।
হ্রস্বদী-র্ঘে- সমজ্ঞা-নে- | উচ্চা-রণ' করে- সবে- ॥

হসন্ত প্রা-য়' সন্তা-ষে- | শব্দে-র' শে-ষ' অক্ষরে- ।
বর্ণা-ন্তস্থ 'অ'কা-রে-রে- | লুপ্তা-কা-রে- পঠে- সদা- ॥
এই কুৎসিত' সংস্কা-রে- | দে-শ' ভা-ষা- দিনে- দিনে- ।
হয়ে-ছে- সম্পদ' ভ্রষ্টা- | দী-ন' ভা- বে- ভ্রমে- সদা- ॥

ভুবনমোহন তাই বাঙ্গালী পাঠককে 'বাঙ্গালী' উচ্চারণ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

চলিত ব | চন' অস্থ | রো-ধ' বি | সর্জন'
করিয়া- | অক্ষর' | পঠিলে- ।
শ্রাব্য ম | ধুর' হই | বে- পর | মা- দৃত
উচিতো | চ্চারণ' | করিলে- ॥

ভুবনমোহনের ন্যায় অনুবাদকদিগের এই প্রকার পণ্ডিতী বিকৃত মনোভাবই আসলে সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গানুবাদকে ব্যর্থ করিয়াছে।

কেবল উচ্চারণ-ভঙ্গির পার্থক্য নহে, বাঙালীর কণ্ঠশক্তির সীমাবদ্ধতাও অনুবাদ-ব্যর্থতার জন্য দায়ী। সংস্কৃত ছন্দের পর্ব-দৈর্ঘ্য বিচিত্র; কিন্তু চতুরক্ষর হইতে অষ্টাক্ষর এবং দশাক্ষর পর্বের উচ্চারণেই বাঙ্গালীর কণ্ঠশক্তি সীমাবদ্ধ। তাছাড়া বাংলা ভাষায় পদ্যছন্দের ধারণা পর্ব-সম্মিতির উপরেই নির্ভর করে, পর্ব-সঙ্গতির উপরে নহে। সত্যেন্দ্র-পূর্ব অনুবাদক কবিরা এই সত্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। একমাত্র হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী এইটুকু মাত্র বুঝিয়াছিলেন—দীর্ঘ স্বরবর্ণে নহে, হলন্ত অক্ষরেই বাংলায় ধ্বনির দীর্ঘত্ব স্বাভাবিক। সেইভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল বুঝিয়াছিলেন—সংস্কৃত দীর্ঘ পর্বকে খণ্ড খণ্ড করিলে তবেই বাঙ্গালীর কণ্ঠোপযোগী হইতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করিয়াছেন একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ।

সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এক ভাষার ছন্দ সকল অন্য ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ভাষান্তরিত হইতে পারে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় ভাষার কিছু কিছু সাধারণ প্রকৃতি থাকে। এই সাধারণ প্রকৃতিকে ভিত্তি

করিয়াই কোন কোন ছন্দের ভাষান্তরিত হওয়া সম্ভব। সংস্কৃত ও বাংলা এই উভয় ভাষার সাধারণ ক্ষেত্র আবিষ্কারের মধ্যেই রহিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদকে প্রকৃত সার্থক বলা চলে; অন্যত্র তিনি বাংলায় অন্য ভাষার ছন্দের কতকটা আভাস আনিয়াছেন মাত্র, যথার্থ অনুবাদে সফল হন নাই। তথাপি এই আভাসও কিছু পরিমাণে বাংলা ছন্দকে অলংকৃত করিয়াছে; কারণ তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, চীনা ও ফার্সীর ছন্দকে বাংলায় ফুটাইতে না পারিলেও অনুবাদে বাংলা ভাষারীতি ও বাঙ্গালী উচ্চারণকে বিকৃত করেন নাই, বরং অনুবাদ-প্রচেষ্টায় বাংলা ছন্দের সীমা কিছু পরিমাণে বাড়াইয়াছেন।

সাধারণতঃ বলবৃত্ত ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছন্দ। তথাপি ছন্দ অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মাত্রাবৃত্তকেই নির্বাচিত করিয়াছেন; কারণ প্রথমতঃ মাত্রাবৃত্তের পর্ব-সীমা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত—চার মাত্রা হইতে সাত মাত্রা পর্যন্ত; দ্বিতীয়তঃ একমাত্র মাত্রাবৃত্তকেই অলংকৃত করিয়া উহাতে সংস্কৃত বৃত্তছন্দের আভাস আনা সম্ভব। তাছাড়া মাত্রাবৃত্তপর্বের বিশেষ বিশেষ স্থানে গুরু অক্ষর প্রয়োগে শ্বাসাঘাতের আভাস আনা যায় ও এই শ্বাসাঘাতের সাহায্যে কয়েকটি ইংরেজি ছন্দকে বাংলায় অনুবাদ করা যাইতে পারে। ছন্দ-অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ বলবৃত্তকে যে ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে, তবে এই ব্যবহার অত্যন্ত অল্প। বৈদিক ছন্দ মাত্রা-নিরপেক্ষ বলিয়া 'গায়ত্রী' ছন্দের অনুবাদে তিনি বলবৃত্ত ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

> ´ ´
> জয়্ কবি জয়্ | জগৎ প্রিয়
>
> ´ ´
> বরেণ্য হে | বন্দনীয়
>
> ´ ´ ´
> অগম্ শ্রুতির্ | শ্রোত্রিয় জয়্ | জয়্।

প্রাণ্ প্রণবের্ | দ্রষ্টা নব

গান্ সে অস | পত্র তব

অমৃত সম্ | উদ্ভব জয়্ | জয়্ ॥

—শ্রদ্ধা হোম

এই অনুবাদ সার্থক অনুবাদের দৃষ্টান্ত নহে। সত্যেন্দ্রনাথও ইহা বুঝিয়াছিলেন তাই তিনি কেবল 'গায়ত্রী' নামের পরিবর্তে ছন্দের নাম দিয়াছেন—'গৌড়ী গায়ত্রী'। মূল গায়ত্রীর কোন গৌড়ীয় রূপ বৈদিক ভাষায় নাই। মূল গায়ত্রী চরণ ত্রিপর্বিক, প্রতি পর্বে অষ্টাক্ষর, চরণে মোট ২৪ অক্ষর। কিন্তু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের চরণে অক্ষর সংখ্যা ২৫, শেষ অন্ত্যপর্বের একাক্ষর 'জয়' গায়ত্রী-বিরোধী। গায়ত্রীর গাম্ভীর্য-মহিমা ইহাতে নাই।

বলবৃত্তের পর্ব সাধারণতঃ একই প্রকার—পর্ব দৈর্ঘ্য স্থির-নির্দিষ্ট এবং পর্বের অক্ষর বিন্যাস প্রায় বৈচিত্র্যহীন ; ইহাকে অলংকৃত করা বা ইহাতে বিজাতীয় ছন্দের আভাস আনা সুকঠিন। তবে অলংকরণের দিক দিয়া ইহার গুরু তিন অক্ষরের বিশেষ পর্বকে ছন্দের সাধারণ পর্বরূপে ব্যবহার করিয়া ইহাতে যে কতক পরিমাণে বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব আনা যায়, তাহা সত্যেন্দ্রনাথই দেখাইয়াছেন। বারংবার শ্বাসাঘাতের জন্য নিম্নোদ্ধৃত ছন্দটি ইংরেজি-গন্ধি :—

খো-কন্ ধন্ | ঘুম্ চায়্ গো | ঘুম্ আয়্ গো।

চোখ্ পিট্ পিট্ | মিট্ মিট্ মিট্ | ঘুম্ পায়্ গো | ঘুম্ আয়্ গো ॥

—ঘুমপাড়ানি গান

ইংরেজ কবি 'স্কটে'র 'মারমিয়ন' কাব্যের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত 'ইয়ং

লকিনভার' উপাখ্যানের ছন্দকে* বাংলায় আমদানি করিতে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ উল্লিখিত ত্রি-গুরু অক্ষরের বলবৃত্ত পর্বকেই ছন্দের সাধারণ পর্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন :—

(ওই) সিন্দুর্ টিপ্ । সিংহল্ দ্বীপ্ । কাঞ্চন্ ময়্ । দেশ্ ।
(ওই) চন্দন্ যার্ । অঙ্গের্ বাস্ । তাম্বুল্ বন্ । বেশ্ ॥

—সিংহল

এই দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে বাঙ্গালীর কণ্ঠে প্রথমটিতেই বলবৃত্তত্ব অপরিহার্যভাবে দেখা দেয় ; কারণ প্রথম দৃষ্টান্তে পর্বস্থ শব্দগুলির অধিকাংশ শব্দই পরস্পর পৃথক্ একাক্ষর শব্দ এবং সেইজন্য সহজে শ্বাসাঘাত প্রাপ্ত, কিন্তু দ্বিতীয় (সিংহল) দৃষ্টান্তটিতে এই ব্যাপার নাই ; বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহাতে ষণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্তে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাও সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি ইংরেজি-গন্ধি ছন্দ ; কারণ ইহাতে মূল 'ইয়ং লকিনভারে'র লঘু-লঘু-গুরু অক্ষরের পর্বের ছন্দ ফুটে নাই, শ্বাসাঘাতযুক্ত ইংরেজি ছন্দের আভাসমাত্র ফুটিয়াছে।

সাধারণ বলবৃত্ত-পর্বের মধ্যেই একটু অসাধারণতার বীজ আছে। একটি হলন্ত অক্ষরযুক্ত চতুরক্ষর পর্বই বলবৃত্তের সাধারণ পর্ব ; এই প্রকার পর্বেই যদি সমগ্র কবিতা রচিত হয়, তাহা হইলে কবিতাটিতে ছন্দোগত উভচরত্ব আসিয়া যায়। ইহা দুইভাবে পাঠ্য।

---

* মূল কবিতার ছন্দের পর্ব কিন্তু ত্রিগুরু অক্ষরের নহে, চরণের প্রথম পর্ব লঘু-গুরু, অন্যান্য পর্ব লঘু-লঘু-গুরু অক্ষরের। যথা—

O yóung | Lochinvár | is come óut | of the wést,
Through all | the wide bor | der his steed | was the best.
... ...
So faith | ful in love | and so daunt | less in war
There ne | ver was knight | like the young | Lochinvar.

ইহার হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহা বলবৃত্তই থাকে, আবার বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়া যায়। ইহাকেও 'সমুদ্রাষ্টকে' সত্যেন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। যথা—

সিন্ধু তুমি | বন্দনীয় | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী
দীপ্ত তুমি | মুক্ত তুমি | তোমায় মোরা | প্রণাম করি।
অপার তুমি | নিবিড় তুমি | অগাধ তুমি | পরাণ প্রিয়
গহন তুমি | গভীর তুমি | সিন্ধু তুমি | বন্দনীয়।

—সমুদ্রাষ্টক

সত্যেন্দ্রনাথের মণ্ডনকলার চুড়ান্ত প্রকাশ মাত্রাবৃত্তে। প্রতি পর্বের নির্দিষ্ট স্থানে হলন্ত অক্ষর প্রয়োগেই হইয়াছে মাত্রাবৃত্তের অলংকরণ; স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ হলন্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাত আসিয়া ছন্দগুলিকে করিয়া তুলিয়াছে—বলবৃত্ত-গন্ধি মাত্রাবৃত্ত। ইহা বঙ্গীয় ছন্দো-ভাণ্ডারে সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট দান। এইগুলিতে স্থির-নির্দিষ্ট হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে শ্বাসাঘাতযুক্ত ইংরেজি ছন্দের আভাস আসে এবং বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে সংস্কৃত বৃত্তছন্দের ধ্বনি ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য সত্যেন্দ্রনাথ এই বলবৃত্ত-গন্ধি মাত্রাবৃত্তকে সংস্কৃত, ইংরেজি প্রভৃতি ছন্দের অনুবাদে ব্যবহার করিয়াছেন।

সংস্কৃত বৃত্তছন্দের সাতটির বঙ্গানুবাদ সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় উল্লেখযোগ্য, যথা—(১) শার্দূল বিক্রীড়িত ('বিদ্যুৎবিলাস' কবিতা), (২) মালিনী ('রিক্তা' কবিতা), (৩) মন্দাক্রান্তা ('যক্ষের নিবেদন' কবিতা), (৪) পঞ্চচামর ('সিন্ধুতাণ্ডব' কবিতা), (৫) রুচিরা ('তখন ও এখন' কবিতা), (৬) বিদ্যুন্মালা ('পিয়ানোর গান' কবিতা) ও (৭) তোটক ('জাফরানের ফুল' কবিতা)। তাছাড়া 'যশোধন' কবিতায় (পরে দ্রষ্টব্য) কবির অজ্ঞাতসারে 'স্রগ্বিনী'কেও কবি অনুবাদ করিয়াছেন। এইগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রকৃতি অনুসরণে স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব প্রকাশ করিতে কেবল বিশ্লিষ্ট হলন্ত অক্ষর

ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার শার্দূল বিক্রীড়িত ও মালিনী ছন্দের বঙ্গানুবাদ সার্থক হয় নাই। অনুবাদকের অক্ষমতা-দোষ নহে' বঙ্গীয় ছন্দোধর্মই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। শার্দূল বিক্রীড়িত ও মালিনী দুইটিই অসমমাত্রিক পর্বের ছন্দ—শার্দূল বিক্রীড়িতের চরণের পর্বদ্বয় ১৮ ও ১২ মাত্রার এবং মালিনীর চরণের পর্বদ্বয় ১০ ও ১২ মাত্রার। পর্বের এই প্রকার অসমমাত্রিকতা বাংলা ছন্দের বিরোধী। সত্যেন্দ্রনাথ শার্দূল বিক্রীড়িতের এক চরণকেই তিন চরণের চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—

৪ ৪ ৫
সিন্দুর্ | রোল্, মেঘে | ভিড়্‌ল আজ্ }
গরজে বাজ্ } ... ১৮ মাত্রা

৪ ৩ ৫
বিদ্যুৎ | বিলোল্ | রক্ত চোখ্। ... ১২ মাত্রা

ঝঙ্কার্ | দোল্ সারা | সৃষ্টিময়্
জাগে প্রলয়্
তাণ্ডব্ | বিভোল্ | ছায়্ দ্যুলোক্॥

—বিদ্যুৎ বিলাস

[**আদর্শ :**—মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবা | রূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং]

ইহার তৃতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্ব (বিলোল) এবং ষষ্ঠ চরণের দ্বিতীয় পর্ব (বিভোল) ত্রিমাত্রিক, সেইজন্য ইহারা এই চতুর্মাত্রিক ছন্দের ছন্দ-পতন ঘটাইয়াছে। এই দুইটি চতুর্মাত্রিক হইলে (যথা— 'বিদ্যুৎ | প্রোজ্জ্বল | রক্ত চোখ্' এবং 'তাণ্ডব্ | বিহ্বল্ | ছায় দ্যুলোক') বাংলা ছন্দ অবশ্য রক্ষা পায়, কিন্তু তাহা হইলে আর শার্দূল বিক্রীড়িত থাকে না। মালিনী ছন্দের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার

ঘটিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ মালিনী চরণকে ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের দুই চরণে রূপ দিয়াছেন :—

৬ ৪
উড়ে চলে গেছে | বুল্‌বুল্ ... ১০ মাত্রা
৮ ৪
শূন্যময় স্বর্ণ | পিঞ্জর্। ... ১২ মাত্রা
ফুরায়ে এসেছে | ফাল্গুন্
যৌবনের জীর্ণ | নির্ভর ॥

—রিক্তা

[আদর্শ :—অসিত গিরি সমং স্যাৎ | কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে]

এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের প্রথম অষ্টমাত্রিক পর্বই সম্মিতিহানি ঘটাইয়াছে ; এই দুইটিকে ছয় মাত্রার পর্বে পরিণত করিলে (যথা— 'শূন্যময় রে | পিঞ্জর' এবং 'যৌবন-শেষ | নির্ভর') বাংলা ছন্দ বজায় থাকে, কিন্তু মূল মালিনী ছন্দ বিলুপ্ত হয়। মান্দাক্রান্তাও অসম-মাত্রিক পর্বের ছন্দ, ইহার চরণ ৮ + ৭ + ১২ মাত্রায় তিন পর্বে গঠিত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ইহাকে সুকৌশলে সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করিয়া বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। যথা—

৮ ৭ ৭ ৫
(পিঙ্গল্ বিহ্বল্) ব্যথিত নভতল্ | কই গো কই মেঘ্ | উদয়্ হও।
(সন্ধ্যার্ তন্দ্রার্) মূরতি ধরি আজ্ | মন্দ্র মন্থর্ | বচন্ কও ॥

—যক্ষের নিবেদন

[আদর্শ :—যাচ্ঞা মোঘা | বরমধি গুণে | নাধমে লব্ধকামা]

মূল আট মাত্রার প্রথম পর্ব এখানে অতিপর্বিক ধ্বনিমাত্রে পর্যবসিত হইয়া বাংলা মন্দাক্রান্তাকে পর্ব-সম্মিতি হানি হইতে রক্ষা করিয়াছে। মূলের ১২ মাত্রার অন্ত্যপর্ব এখানে ৭ + ৫ মাত্রায় দ্বিখণ্ডিত।

লঘু-গুরু বিন্যাসের দুইটি ত্রিমাত্রিক পর্বকে সংযুক্ত করিয়া ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত পর্বের রচনা দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা পঞ্চচামর

ছন্দে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে যেমন পর্বখণ্ডন, পঞ্চচামর ছন্দে সেইরূপ পর্বযোজন সত্যেন্দ্রনাথের কৌশল :—

মহৎ : ভয়ের্ | মুরৎ : সাগর্ | বরণ্ : তোমায় | তমঃ : শ্যামল্।
মহে : শ্বরের্ | প্রলয়্ : পিণাক্ | শুনাও : আমায়্ | শুনাও : কেবল্॥

—সিন্ধু তাণ্ডব

[আদর্শ :—জটা | টবী | গল | জ্জল | প্রবা | হ পা | বিত | স্থলে]
ইহার হলন্ত অক্ষরগুলিকে সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে শ্বাসাহত হয় এবং ইংরেজি iambus ছন্দের ধ্বনি ফুটিয়া উঠে।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের রুচিরা ছন্দ পঞ্চচামরের মতোই যণ্মাত্রিক পর্বের ছন্দ হইয়াছে। সংস্কৃতের মতো ইহাও হইয়াছে ত্রিপর্বিক—প্রথম পর্ব চতুরক্ষর, দ্বিতীয় পর্ব পঞ্চাক্ষর ও তৃতীয় পর্ব চতুরক্ষর। যথা—

তখন্ কেবল্ | ভরিছে গগন্ | নূতন্ মেঘে।
কদম্ কোরক্ | দুলিছে বাদল্ | বাতাস্ লেগে॥

—তখন ও এখন

[আদর্শ :—অভূম্ৃপো | বিবুধ সখঃ | পরন্তপঃ]
এই রুচিরার সহিত ৪৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভুবনমোহনের রুচিরা তুলনীয় (কুবাসনা | খল হৃদয়ে | সদা রহে)।

সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি সার্থক অনুবাদ—তোটক। সার্থকতার জন্যই ইহা হইয়াছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সংস্কৃত তোটকের প্রতি চরণের প্রথম দুই অক্ষরকে অতিপর্বিক অংশে পরিণত করিয়া উহাকে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করা সত্যেন্দ্রনাথের অভূতপূর্ব কৌশল। মূলের লঘু-লঘু-গুরু বিন্যাসের পর্বকে তিনি গুরু-লঘু-লঘু বিন্যাসের পর্বে পরিণত করিয়াছেন। যথা—

(ওকে) ফুটল গো | ফুটল দি | গন্ত ভ | রি।
(কারা) জাগ্‌ল ধু | সর্ ধুলি | শয্যা প | রি॥

—জাফরানের ফুল

[আদর্শ :—প্রণমা-মি শিবং শিব কল্পতরুম্]

ইহার অতিপর্বিক অংশ বাদ দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ইহার অন্য এক রূপ দেখাইয়াছেন 'দূরের পাল্লা' কবিতায়—

পান্ বিনে । ঠোঁট্ রাঙা । চোখ্ কালো । ভোম্‌রা ।
রূপ্ শালী । ধান্ ভানা । রূপ্ দেখো । তোম্‌রা ॥

হলন্ত অক্ষরগুলিকে সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে এর ছন্দ হইয়া উঠে ইংরেজি dactyl.

সত্যেন্দ্রনাথের 'পিয়ানোর গান' ও 'চরকার গান' কবিতার ছন্দকে যেমন সংস্কৃত বিদ্যুন্মালার অনুবাদ তেমনি ইংরেজি spondeeর অনুবাদও বলা যাইতে পারে। ইহা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে spondee এবং বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে বিদ্যুন্মালা। ইহার পর্বের অক্ষর-বিন্যাস গুরু-গুরু। যথা, 'পিয়ানোর গান'—

তুল্ তুল্ । টুক্ টুক্ । টুক্ টুক্ । তুল্ তুল্ ।
কোন্ ফুল্ । তার্ তুল্ । তার্ তুল্ । কোন্ ফুল্ ॥
[আদর্শ :—বিদ্যুন্মালা শ্লিষ্টোঽম্ভোদঃ]

ফার্সী মুতাক্কারিব্ ছন্দ, চীনা একাক্ষর ছন্দ এবং জাপানী 'তান্‌কা' ছন্দও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফার্সীর অনুবাদটি প্রায় নিখুঁত। মুতাকারিব্ সংস্কৃত ভুজঙ্গ-প্রয়াতের মতো 'হ্রস্ব-দীর্ঘ-দীর্ঘ' ক্রমের ত্র্যক্ষরপর্বিক ছন্দ। 'তাজের প্রথম প্রশস্তি' এই ছন্দে লিখিত। বাংলায় ইহা পঞ্চমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্তে পরিণত হইয়াছে—

জগৎ সার্ । চমৎকার্ । প্রিয়ার্ শেষ্ । শেজ্
অমল্ ভায় । কবর্ ছায়্ । তহর্ তায়্ । তেজ্ ॥

ইহারই শেষ খণ্ড পর্বকে পূর্ণ পর্বে পরিণত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'ঝর্ণার গান' :—

চপল্ পায়্ । কেবল্ যাই । কেবল্ গাই । পরীর্ গান্ ।
পুলক্ মোর । সকল্ গায়্ । বিভোল্ মোর্ । সকল প্রাণ ॥

চীনা একাক্ষর শব্দের ছন্দকে সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দ-সরস্বতী'তে ষণ্মাত্রিক মাত্রাছন্দের মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন। দীর্ঘহ্রস্ব ক্রমের দুইটি পর্বকে সংযুক্ত করিয়া ইহার পর্ব রচিত হইয়াছে; সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ইহাকে trochee ছন্দ বলা যায়। যথা—

শিষ্ কে : দেয়্ গো | আজ্
তার্ কি : ভিন্ গাঁ | ঘর্
দুখ্ সে : তার্ কি | পর্
চাঁদ্ সে : তার্ কি | তাজ্?

পাঁচ চরণে রচিত মোট একত্রিশ অক্ষরের ছন্দোবন্ধ* হইতেছে জাপানী 'তানকা'। সত্যেন্দ্রনাথ ইহাকে স্বাধীনভাবে তিন চরণের ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করিয়াছেন। 'কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণে' তাঁহার 'তানকা সপ্তক' রচিত হইয়াছে। বিখ্যাত 'বৈকালী' কবিতার ছন্দও এই 'তানকা'। যথা—

(১) অশ্রুর দেশে | হাসি এসেছিল | ভুলে
সে হাসিও শেষে | মরণে পড়িল | ঢুলে
অশ্রু সায়র | কূলে।

—তানকা সপ্তক

(২) পদ্মের মতো | নয়গো এ আঁখি | নয়
তবু যদি নাও | নিতে যদি সাধ | হয়
দিতে করিব না | ভয়।

—বৈকালী

সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত অনেকগুলি নূতন প্যাটার্নের ছন্দ ঠিক সজ্ঞান অনুবাদ নহে; বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পর্বের মাত্রাবৃত্তকে হলন্ত অক্ষরের দ্বারা বিচিত্ররূপে সজ্জিত করার ক্লাসিক মনোবৃত্তি হইতে এই ছন্দ-গুলির উৎপত্তি। হলন্ত অক্ষরগুলির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে শ্বাসাঘাত আসিয়া যায় বলিয়া এইগুলিতে বলবৃত্ত-ভ্রান্তি হয়। সুতরাং

* 'তানকা'র পাঁচ চরণের বিন্যাস যথাক্রমে ৫, ৭, ৫, ৭, ৭ অক্ষর।

অনুবাদিত ছন্দগুলির মতো এইগুলিও বলবৃত্ত-গন্ধি মাত্রাবৃত্ত। বিশেষ করিয়া (ক) পাঁচ মাত্রার ও (খ) সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্তে এই নূতন ছন্দগুলি রচিত। যথা—

(ক) পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত—

(১) পর্ব প্যাটার্ন ⏑ ⏑ ⏑ —

হর-মু : কুট | হর-মু : কুট
ভূ-স্বর : গের্ | সুমেরু : কূট।
গগনে : প্রায় | ভিড়ায় : কায়
করিতে : চায় | তারকা : লুঠ ॥

—হরমুকুট গিরি

(২) পর্ব প্যাটার্ন — ⏑ — [সংস্কৃত স্রগ্বিনী ছন্দ কবির অজ্ঞাতে রচিত হইয়া গিয়াছে।]

দাও কে : বল্ | যশ্ অ : মল্ | কীর্তি : সার | কৃত্তি : বাস্।
স্বর্ণ : নয় | হর্ম্য : নয় | দাস্ দা : সীর্ | নেইক : আশ্ ॥

—যশোধন

[আদর্শ :—বর্জয় | ত্যা জনৈঃ | সঙ্গমে | কান্ততঃ]

এই প্যাটার্নের পর্বকে ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের অন্ত্যপর্বরূপে ব্যবহার করিয়া এবং একাধিক প্রতীক চরণরূপে প্রয়োগ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ একটি নূতন ও চমৎকার ছন্দোবন্ধ প্রবর্তন করিয়াছেন—

পাখী ডেকে ওঠে | ওই গো : ওই
বয় ভো : রের্
হিম্ বা : তাস্।
জাগ্‌ল : কার্
শান্ত : চোখ্
কুট্‌ল : কার
পুষ্প : হাস ॥

—মাতা মহ

(খ) সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত—

(১) পর্ব-প্যাটার্ন — — ⌣ —

শক্তির্ : গরুড়্ | ভক্তির্ : চাতক্।
আত্মার্ : গভীর্ | শান্তির্ : সাধক্ ॥

(২) পর্ব-প্যাটার্ন — ⌣ — —

ঝর্‌ছে : ঝর্ ঝর্ | ঝর্‌ছে : ঝম্ ঝম্
বজ্র : গর্জায়্ | ঝঞ্ঝা : গম্ গম্।
লিখ্‌ছে : বিদ্যুৎ | মন্ত্র : অদ্ভুত্
বল্‌ছে তিন্ লোক্ | 'বম্ ব : বম্ বম্ ॥

—ছন্দ হিন্দোল

এইখানে বলা যাইতে পারে, পর্ব-প্যাটার্নের ক্লাসিক রীতি সত্যেন্দ্রনাথেরই রীতি, রবীন্দ্রনাথের নয়। রবীন্দ্রনাথের প্যাটার্ন গঠনের চেষ্টা সার্থক হয় নাই। 'ছন্দ-হিন্দোল' কবিতার উপরি-উদ্ধৃত গুরু-লঘু-গুরু-গুরু' আদর্শের রবীন্দ্র-রচিত নিম্নলিখিত ছন্দোবন্ধটির অপূর্ণতা দ্রষ্টব্য—

কই পা : লঙ্ক | কই রে : কম্বল্
কপ্‌নি : টুক্‌রো | রইল : সম্বল্
একলা : পাগ্‌লা | ফির্‌বে : জঙ্গল্
মিট্‌বে : সংকট্ | ঘুচ্‌বে : দ্বন্দ্ব।

— ছন্দ

রবীন্দ্র-রচিত দৃষ্টান্তে পর্বান্তিক অক্ষরের গুরুত্ব প্রথম তিন চরণের প্রথম পর্বে এবং চতুর্থ চরণের শেষ পর্বে পরিস্ফুট হয় নাই।

বিংশ অধ্যায়

ছন্দোগন্ধি রচনা ও বর্ণ-সঙ্কর ছন্দ

—১—

উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্যে ছন্দ-প্রবৃত্তি দ্বিবিধ এবং এই দুই প্রবৃত্তি বিপরীতমুখী। এই শতকে যেমন একদিকে হইয়াছে সুমার্জিত ও নির্দোষ ছন্দোগঠনের চেষ্টা, তেমনি অপরদিকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে ইচ্ছাকৃত ছন্দোভঙ্গের প্রয়াস। ছন্দ-পাতন চেষ্টার মূলে কিন্তু কবিদের মানস বিকৃতি নাই। উনবিংশ শতকের বস্তুতান্ত্রিক জীবননিষ্ঠাই ছন্দোভঙ্গ চেষ্টার প্রকৃত কারণ। জীবনের রূঢ় সত্যতা মানবচিত্তকে অখণ্ড সৌন্দর্য-লোকে বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে দেয় না, ভালোমন্দ-মিশ্রিত কঠিন বাস্তব জগতে বার বার নামাইয়া আনে। তাহার ফলে রূপ-রচনায় অপূর্ণতা, সঙ্গীতে সুরহানি, নৃত্যে তালভঙ্গ ও কাব্যে ছন্দ-পতন ঘটিয়া যায়। বিভিন্ন কাব্যশাখার মধ্যে নাটক, হাসির কবিতা ও গদ্য-কবিতা অপেক্ষাকৃত অধিক জীবননিষ্ঠ। বঙ্গসাহিত্যের এই সকল শাখাতেই সেইজন্য নিয়মিতরূপে ছন্দোভঙ্গ দেখা দিয়াছে। এই সকল ছন্দোভগ্ন রচনার রচনারীতি গদ্য নহে, ইহাদের ছন্দোগোত্রীয়তা সুস্পষ্ট, আবার যথার্থ ছন্দও নহে, কারণ নিয়মিত ছন্দোভঙ্গই ইহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য এই রীতিকে বলিতে হয় ছন্দোগন্ধি।

ছন্দোগন্ধি রচনা, নাটকে

বঙ্গসাহিত্যে নাটকেই ছন্দোগন্ধি রচনার প্রথম প্রকাশ হইয়াছে। এখানেও মাইকেল মধুসূদনই নূতনত্বের প্রবর্তক। ছন্দোগন্ধি রীতি কিন্তু অমিত্রছন্দ নহে। মাইকেলের অমিত্রছন্দে ছন্দোদমন আছে, ছন্দোবিপর্যয় নাই; অপরপক্ষে মধ্যে মধ্যে ছন্দোবিপর্যয়ই ছন্দোগন্ধি

রীতির বৈশিষ্ট্য। বঙ্গসাহিত্যে ছন্দোগন্ধি রচনার সূত্রপাত মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকে। এই নাটকের সাধারণ রীতি গদ্য। অল্প দুই একটি ক্ষেত্রে অমিত্রছন্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে 'কলি'র উক্তি নূতন ছন্দোগন্ধি রীতিতে রচিত। যথা—

কলি। (স্বগত) ওই শুন	...		৪ অক্ষর
বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুদ্ধে এবে	...	(৮+৬)	"
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)	...	৪	"
এই অবসরে যদি আমি	...	১০	"
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি	...	(৮+৬)	"
তাহলে কামনা মোর হবে ফলবতী।	...	(৮+৬)	"
একি! ওই না সে পদ্মাবতী?	...	১০	"
আয় লো কামিনী—	...	৬	"
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা	...	(৮+৬)	"
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা	...	(৮+৬)	"
বিহঙ্গী উড়িয়া পড়ে নিষাদের ফাঁদে।	...	(৮+৬)	"

এই সংলাপেই প্রথম মধুসূদন তাঁহার পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরত্বের বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। ইহার প্রথম চরণে চার অক্ষর ('ওই শুন'), সপ্তম চরণে দশ অক্ষর ('একি! ওই না সে পদ্মাবতী') এবং অষ্টম চরণে ছয় অক্ষর ('আয় লো কামিনী') দ্রষ্টব্য। পরবর্তীকালে নাটকীয় সংলাপ রচনায় এই আদর্শই দৃঢ়তর ভাবে ব্রজমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনুসরণ করেন। সে-যুগে এই রীতিকে বলা হইত 'ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর' (রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গে'র ভূমিকায় ব্যবহৃত), পরে গিরিশচন্দ্রের বহুল ব্যবহারের ফলে এই রীতির নাম হয় 'গৈরিশ

ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দ

ছন্দ'। ব্রজমোহনের 'দানব বিজয়' নাটকে চতুর্থ গর্ভাঙ্কে এবং পঞ্চম অঙ্কে এই 'ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর' ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা*—

সাক্ষী রহ মহাগুরু দেব শূলপাণি, ... (৮ + ৬) অক্ষর
সাক্ষী রহ জগৎস্রষ্টা দেব নারায়ণ, ... (৮ + ৬) "
সাক্ষী রহ— ... ৪ "
অনন্ত আকাশ আর নক্ষত্র মণ্ডল, ... (৮ + ৬) "
শুন সবে, শুন সবে প্রতিজ্ঞা আমার— ... (৮ + ৬) "
যে জ্বালায় জ্বলিছে অন্তর, ... ১০ "
যে জ্বালা দিয়েছে কালী এ কাল সমরে, ... (৮ + ৬) "
তার প্রতিফলে রীতিমত ... ১০ "
প্রতিফল প্রদানিব আজ। ... ১০ "

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের অমিত্রাক্ষরও এই প্রকার 'ভঙ্গ'। যথা—

বহিছে গঙ্গার বারি ধীরি ধীরি গতি ... (৮ + ৬) অক্ষর
নির্জন প্রদেশে। ... ৬ "
তরী নাহি একখানি ... ৮ "
কেমনে হবেন পার রাম গুণমণি ... (৮ + ৬) "
লক্ষ্মণের সনে ? ... ৬ "
অয়ি গঙ্গে পতিত পাবনি, ... ১০ "
পার কর ভবসিন্ধু-পার-কাণ্ডারীরে ... (৮ + ৬) "
দয়াময়ি। ... ৪ "

—পৃঃ ৪৭ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, রাজকৃষ্ণ রায়

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের 'গৈরিশ ছন্দ'—

(১) কারে নাথ দাও হে বিদায় ... ১০ অক্ষর
আমি ছায়া তব ... ৬ "

---

* ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড (১ম সং) ৩৪৫ পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত।

বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে	...	১২ অক্ষর
বরি নাই 'রাজা নল'।	...	৮ "
আমি পত্নী তব,	...	৬ "
কোথা রব তোমা ছেড়ে ?	...	৮ "
আমি দাসী	...	৪ "
ভালোবাসি তব সেবা।	...	৮ "
বঞ্চনা কি হেতু কর প্রভু ?	...	১০ "
যদি অপরাধী পদে	...	৮ "
স্বামি—	...	২ "
তোমা ছেড়ে কোথা যাব আমি ?	...	১০ "

—নল দময়ন্তী, ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক

(২)

শান্ত ?	...	২ অক্ষর
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি।	...	১২ "
পুত্রশোকাতুরা	...	৬ "
উন্মাদিনী করালিনী আমি।	...	১০ "
শান্ত ?	...	২ "
শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা ?	...	১০ "
ধরা যদি পশে রসাতলে	...	১০ "
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহতারা	...	১০ "
নিভে দিনকর	...	৬ "
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি	...	(৮ + ৬) "
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে	...	১০ "
অষ্টবজ্র চলে	...	৬ "
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণু রূপে	...	১০ "
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা।	...	(৮ + ৬) "

—জনা, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক

লক্ষ্য করিতে হইবে—মধুসূদন হইতে ব্রজমোহনে, ব্রজমোহন হইতে রাজকৃষ্ণে এবং রাজকৃষ্ণ হইতে গিরিশচন্দ্রে চতুর্দশাক্ষর চরণের ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমেই পর্ব-স্বাধীনতা বাড়িয়াছে। মধুসূদন সন্তর্পণে সসঙ্কোচে অল্প দু-একটি ক্ষেত্রে প্রথাগত সংস্কার মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন ; ব্রজমোহন ও রাজকৃষ্ণের আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর, তাঁহাদের রচনা অপেক্ষাকৃত সবল ও নির্ভীক, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের রচনা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ, স্বচ্ছন্দ ও নিরঙ্কুশ। 'গৈরিশ ছন্দ'ই 'ভঙ্গ অমিত্রাক্ষরে'র সুপরিণত রূপ।

লক্ষ্য করিতে হইবে—গৈরিশ ছন্দ অক্ষরবৃত্ত 'মুক্তক' গোত্রীয়, কিন্তু প্রকৃত মুক্তক নহে। মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতাবলী ও রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের প্রধান ছন্দকেই যথার্থ মুক্তক বলিতে পারা যায়। সমসংখ্যক পর্বের চরণবন্ধন হইতে 'মুক্তক' মুক্ত। সেই জন্য মুক্তকের চরণগুলি হয় অসমসংখ্যক পর্ব-সমাবেশে অসমদীর্ঘ। কিন্তু অষ্টাক্ষর, ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর, এই ত্রিবিধ পর্বের বন্ধন হইতে মুক্তক মুক্ত নহে। সেইজন্য যথার্থ মুক্তকে কথনোই ছন্দ-পতন থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে মুক্তক-চরণে মধ্যে মধ্যে ছন্দ-পতন ঘটানোই গৈরিশছন্দের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে ইচ্ছা করিয়া দুই, চার, বারো প্রভৃতি অক্ষরের নূতন পর্ব প্রয়োগে অক্ষরবৃত্তের আদর্শচ্যুতি ও ছন্দোভঙ্গ ঘটানো হইয়া থাকে (উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহের নিম্নরেখ পর্বগুলি দ্রষ্টব্য)। তথাপি গৈরিশ ছন্দের চরণে চরণে ছন্দো-রক্ষণই বেশী, ছন্দ-পাতন অল্প, তাই গৈরিশ ছন্দ ছন্দোগন্ধি।

বাংলা নাটকে গৈরিশছন্দের কৃতিত্ব সামান্য নহে, ইহা বাংলা নাটককে নাট্যরস প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। গৈরিশছন্দ প্রবর্তনের পূর্বে নাটকীয় সংলাপ সাধারণ গদ্যে ও সমিল পয়ারে রচিত হইত ; প্রাচীন গদ্য ও পদ্য কাহারও নাটকীয় যোগ্যতা ছিল না। নাটকের গদ্য ছিল আড়ষ্ট ও পঙ্গু ; ইহার অলংকরণও
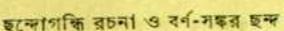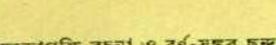
ছিল উৎকট ও অস্বাভাবিক। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত সীতাহরণ যাত্রায় সীতার নিম্নোদ্ধৃত সালংকার উক্তি[১] দ্রষ্টব্য :—

'হায় হায় কোথায় আমার দেবর লক্ষ্মণ, একবার বিপদকালে শীঘ্র আইস, মৃগতৃষ্ণা ন্যায় আমার মৃগ আন-ন (আনয়ন) হইএছে।''

মধুসূদনের নাটকের গদ্য অনেকটা সুপরিণত তথাপি উৎকট পণ্ডিতী অলংকারে আড়ষ্ট। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কয়েকটি গদ্য-সংলাপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে :—

(১) দিল্লীর অধিপতি বা অন্য কোন যবন-রাজ জনরব-স্বরূপ বায়ু-সহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা রাখবে ?

(অহল্যার উক্তি, ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

(২) যেন প্রলয়কালে বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্যটন কচ্চে।

(কৃষ্ণকুমারীর উক্তি, ৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

(৩) উঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্চেন।

(রাজার উক্তি, ৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

(৪) ভগবতি! মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ ?

(রাজার উক্তি, ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

আড়ষ্ট হইলেও তবু বাংলা নাটকের গদ্য-সংলাপ ছিল কতকটা নাটকোচিত এবং অভিনেয়, কিন্তু সেকালের পদ্যে রচিত সংলাপ ছিল পাঁচালীগানের মতো কৃত্রিম এবং অভিনয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বাংলা সাহিত্যের আনুমানিক প্রথম মৌলিক নাটক 'কীর্তি বিলাসে'র (১৮৫২ খ্রীঃ) সংলাপ[২] দ্রষ্টব্য :—

সহচরী। ভুজঙ্গ অশেষ খল জগতে বিদিত।
রাজপুত্র। সত্য বটে সত্য বটে রমণী ব্যতীত॥

১। পৃঃ ৩৪ বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (সুকুমার সেন), ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং

২। পৃঃ ২৭-২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (সুকুমার সেন) ২য় খণ্ড, ১ম সং

সৌদামিনী। গগনে বসিয়া ভানু উল্লাসিত মনে।
কুতূহল করে কত নলিনীর সনে ॥
সহচরী। সহবাসে কখন কি প্রেমের জনন।
তাহা হলে ভেক হয় কমল রমণ ॥

তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী' নাটকে (১৮৫৮ খ্রীঃ) 'হরমোহিনী'র নিম্নোক্ত স্বগত উক্তি[৩] পাঠ্য কবিতামাত্র ঃ—

হাদেরে বল্লাল তোরে যাই বলিহারি।
কুটিনীর কাছে তুই মানাইলি হারি ॥
তারা সব পর নিয়া করে কারবার।
কুলীনের পুঁজি পাটা নিজ পরিবার ॥
এর হৈতে আর কিরে পাতক অধিক।
কন্যার কুটিনী হই ধিক শত ধিক ॥

এইরূপ পয়ারের দুরবস্থা হইতে গৈরিশছন্দই নাটকের সংলাপকে উদ্ধার করিয়াছে। নাটকের গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ ও পৌরাণিক মহিমা সৃষ্টিতে গৈরিশছন্দ যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—২—

বাংলায় ছন্দোগন্ধি রীতিকে একদিকে যেমন পৌরাণিক গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে নাটকে ব্যবহার করা হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হইয়াছে হাসির কবিতায় ও গানে। হাস্যরসের মূলে রহিয়াছে—আকস্মিক অসঙ্গতি। পরিবেশের সহিত ঘটনার, মূল ভাবের সহিত আনুষঙ্গিক ভাবের, অর্থের সহিত ধ্বনির ইত্যাদি নানাধরণের অসঙ্গতি হইতে পারে। ইহাদের প্রতিটিই হাস্য উৎপাদক। বাংলা

হাসির কবিতায় ছন্দোগন্ধি-রীতি

৩। পৃঃ ৫১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (সেন), ২য় খণ্ড, ১ম সং

হাসির কবিতার ছন্দে ত্রিবিধ উপায়ে অসঙ্গতি ও হাস্য সৃষ্টি দেখা যায়—প্রথমতঃ ছন্দোযুক্ত পদ্য কবিতায় অপ্রত্যাশিত গদ্য প্রয়োগে, দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাকৃত ছন্দ-পাতনে, তৃতীয়তঃ হঠাৎ বিজাতীয় শব্দ ও উচ্চারণ-ভঙ্গির আমদানিতে। এই তিনটি রীতির প্রতিটিতেই বাংলা ছন্দ বিপর্যস্ত হয়, অথচ ছন্দের আভাসও ফুটিয়া উঠে। এইজন্য এই প্রকার হাসির কবিতার রীতিকেও বলিতে হয় 'ছন্দোগন্ধি'। নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে ত্রিবিধ উপায়ে ছন্দোগন্ধি রচনা দ্রষ্টব্য :—

(ক) 'জনান্তিকে' স্বগত উক্তির ন্যায় পদ্য কবিতার মধ্যে হঠাৎ 'গদ্য' প্রয়োগ (নিম্নরেখ বা মোটা হরফের অংশ গদ্য) :—

(১) বিঘোরে বিহারে | চড়িনু এক্কা।
(লাগে) ধুবধাব তায় | বিষম ধাক্কা॥
রোদে চাঁদি ফাটে | ধুলা ঢুকে পেটে | সাজগোজ তায় | এমনি পাক্কা,
আঁকা বাঁকা গলি | বেগে যেতে চলি | কায়া মায়া যদি | ছাড়য় চাক্কা,
(তবে) নর্দমায় পড়ি | ভাবে গড়াগড়ি | আঁখি মুদে হেরি | মদিনা মক্কা॥
যদি বল তার রূপ কেমন, তবে শ্রবণ কর :—
(কিবা) বাঁকা দুটি বাঁশ | শোভে দুই পাশ | মাঝখানে তায় | সকলি ফক্কা
(দেয়) লতাপাতা দিয়ে | আসন গড়িয়ে | ছেঁড়ে যদি পথে | অমনি অক্কা

—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) কৃষ্ণ বলে— | শুনি 'হরি' | লোকে আমায় | কয়।
(আর) রাধা বলে— | লোকের কথা | ক'রো না প্র | ত্যয়।
(লোকে) কী না বলে।
কৃষ্ণ বলে— | রাধে তোমার | কী রূপেরই | ছটা।
(আর) রাধা বলে— | হাঁ হাঁ কৃষ্ণ | **হাঁ হাঁ তা তা বটে**।
(সেটা) সবাই বলে।

—দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

(৩) গোপীকৃষ্ণ | প্রভু
জানত না তো | কভু

সুশীলা যে | অন্যের স্ত্রী— | অনিবার্য | যুক্তি।
গোপীকৃষ্ণ | পেতে পারে | বে-কসুরী | মুক্তি।
কিন্তু ঐ যে | হাঁড়ি মুখো | বানর বেটা | ছেলে—
আজ্ঞা হোক এ | ক্ষুনি ওকে | পাঠিয়ে দিতে | জেলে।
উনি আবার জজ ! | বদ্‌মাস পাজি | আরে খেলে | যা—
নিজে চুরি | করে নালিস্— | **যা বেটা** | যা-জেলে | যা !

—দ্বিজেন্দ্রলাল

(খ) হঠাৎ অসাধারণ ও অপ্রচলিত 'পর্ব' প্রয়োগে ইচ্ছাকৃত ছন্দ-পাতন (এ-গুলিও স্বগত উক্তির ন্যায় উচ্চার্য)—

(১) নাকগুলো সব | কাটো।
কানগুলো সব | ছাঁটো।
পা গুলো সব | উঁচু করে | মাথা দিয়ে | হাঁটো॥
হামাগুড়ি দাও | **লাফাও** | ডিগবাজি খাও | ওড়ো।
কিংবা চিৎপাত হয়ে | পাগুলো সব | ছোঁড়ো॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল

(২) বরাবরই | বলে গেছি।
আহার এবং | নিদ্রাই সার | অন্য সবই
তদ্ভিন্ন | অন্য সবই | মিছিমিছি।
ঠ্যাং ভাঙ্‌লে বা | হলে জখম্
দেখ্‌বে সবাই | একই রকম্
ছেড়ে দিলেই | বকম্ বকম্ | গলা টিপে—
দেখ্‌বে সব | গলা টিপে | ধর্লে চিঁ চিঁ॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল

[নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে বলবৃত্তের চতুরক্ষর পর্বের সহিত তিন ও দুই অক্ষরের অপ্রচলিত পর্ব যথেচ্ছ মিশাইয়া ইচ্ছাকৃত ছন্দোভঙ্গ করা হইয়াছে—]

(৩) (যদি) জান্‌তে চাও | আমি ঠিক | কী রকম স্ত্রী | চাই—
ফর্সা-কি | কালো-কি | মাঝা-রি | রং

লম্বা-কি | বেঁটে-কি | ক্ষীণা পী | না
দেখতে ঠিক | পরী-কি | দেখতে ঠিক | সং
(শোনো) তাতে আমার | আ-সে- | যায় নাক অ | ধিক
চল্‌তে জানে | য-দি- | বাঁচিয়ে ক | দিক
তার উপর | ডা-কে- | আমায় সো | হাগে—
পোড়ার মুখো | মিন্‌-সে- | ও হত ভা | গা,
তাহলে | হাঃ-হাঃ—
(সেতো) সোনায় সোহা | গা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

(গ) ছন্দে বাংলা শব্দের সহিত অপ্রত্যাশিত সংস্কৃত বা ইংরেজি শব্দ এবং উহাদের উচ্চারণ-ভঙ্গি আমদানি—

(১) উঠিল কুটিল্-অ প্রশ্ন | সমস্যা- জটিলা- অতি—
শা-স্ত্রী-য় কি অশা-স্ত্রী-য় | কচুপো-ড়া-হি ভক্ষণ্-অ।···
বঙা-লী- মহিমা-কী-র্তি | কলা-প্-অ কা-হিনী- যদি
শুন মন্-অ দিয়া- বা-বা- | **পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে-** ॥

—(অনুষ্টুপ্ ছন্দ) দ্বিজেন্দ্রলাল

(২) (যদি) জানতে চাও | আমরা | কে—
আমরা | Reformed | Hindoos.
আমাদের | চেনেনা ক | যে,
(Surely) he is an | awful | goose.
(কেননা) আমরা | Reformed | Hindoos.
(It) must be | under | stood—
(যে একটু) heterodox | আমাদের | food.
(কারণ) চলে মাঝে মাঝে | এটা ওটা সেটা | যখন we | choose.
[কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি, if you think]
(তা'লে) you are an | awful | goose.

—দ্বিজেন্দ্রলাল

—৩—

নাটকের গৈরিশ ছন্দে এবং হাসির গান রচনায় ছন্দ-পাতন বিশেষ ঘটনা মাত্র, সাধারণ ঘটনা নহে। এ সকল ক্ষেত্রে ছন্দো-রক্ষণই সাধারণ ব্যাপার। ইহার বিপরীত কাণ্ড দেখা যায় 'গদ্য-কবিতা'য়। ইহাতে ছন্দোবর্জনই সাধারণ ঘটনা, ছন্দোরক্ষণ বিশেষ ঘটনা। কেবল পদ্যছন্দকে নহে, গদ্যছন্দকেও পরিহার করিবার চেষ্টা গদ্য-কবিতার বৈশিষ্ট্য। পদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্য পর্ব-সম্মিতি (পর্বগুলির দৈর্ঘ্য-সমতা) এবং গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্য পর্ব-সঙ্গতি (পর্ব সমূহের দৈর্ঘ্যের আ-সমতা)। চরণের বহুপর্বিকতা ব্যতীত এই পর্ব-সম্মিতি বা পর্ব-সঙ্গতি—কোনটিই সম্ভব নহে। যথা—

গদ্য কবিতায় ছন্দোগন্ধি 'গন্ধিকা'

কালো দীঘিজল | তারি সুশীতল | মায়া তব দুটি | চোখে

ইহাতে ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব তিনটি ও একটি দুই মাত্রার অন্ত্য ভগ্নপর্ব আছে। পূর্ণপর্বগুলির সমদীর্ঘতার জন্য এখানে পর্ব-সম্মিতি ও পদ্যছন্দ পরিস্ফুট। আবার—

আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম : এত সূক্ষ্ম যে আছে কিনা বোঝা কঠিন—তোমাদের
বুদ্ধি স্থূল : এত স্থূল যে কতখানি আছে বোঝা কঠিন।

এখানেও চরণ বহুপর্বিক, পর্ব সংখ্যা চার, ইহাদের দৈর্ঘ্য পরস্পর সম নহে, আ-সম (দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৮, ১৪, ৮, ১৬ মাত্রা) ; সেইজন্য পর্ব-সঙ্গতি ও গদ্যছন্দ এখানে পরিস্ফুট। এই উভয়বিধ ছন্দোবন্ধন —সর্ব-সম্মিতি ও পর্ব-সঙ্গতি এবং উভয়ের বহুপর্বিকতা, সমস্তই অস্বীকার করিয়াছে গদ্য-কবিতা। গদ্যের সাধারণ ধারাবাহিকতা বর্জন করিয়া দীর্ঘযতি-বিচ্ছিন্ন চরণে চরণে থামিয়া থামিয়া কাটা কাটা বাক্য রচনা গদ্য-কবিতার রীতি ; ইহাতেই গদ্যকবিতায় পদ্যছন্দের আভাস আসে। চরণ-বদ্ধতা-জাত এইপ্রকার পদ্যাভাসকে কেহ কেহ বলিয়াছেন—'অস্পষ্ট ছন্দ-ঝঙ্কার' বা 'পদ্যের রং'। চরণ-

বদ্ধতার জন্য গদ্য-কবিতার রচনারীতিকে সাধারণ গদ্য বলিবার উপায় নাই; গদ্যছন্দও বলা চলে না, কারণ গদ্যের ছন্দই 'গদ্যছন্দ'। তাই রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতার রচনারীতির নাম দিয়াছেন—'গদ্যিকা'[৪]।

গদ্যিকা অর্থাৎ গদ্যকবিতার রচনারীতি যদিও ছন্দোবর্জিত তথাপি চরণবদ্ধতা-জাত পদ্যাভাস ইহাতে আছে; এই কারণে কোন কোন ছন্দোমুগ্ধ ব্যক্তি প্রচার করিয়াছেন, গদ্যকবিতায় গুপ্তছন্দ বা ভাবছন্দ বর্তমান। কিন্তু বিখ্যাত 'নীরব কবি' কথাটির ন্যায় এই 'ভাবছন্দ' বা 'গুপ্তছন্দ' শব্দ অর্থহীন। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যে কাঠ জ্বলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মতো নীরব হইয়া থাকে, তাহাকে কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব।[৫] ছন্দ-সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। গুপ্ত নহে, অব্যক্ত নহে, প্রকাশিত ধ্বনি-সৌন্দর্যই ছন্দ। গদ্য কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন—"এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বল্‌লেও সেটাকে বলবো স্পর্দ্ধা।"[৬] মোটের উপর যেহেতু গদ্যিকায় ছন্দ না থাকিলেও ছন্দের আভাস আছে, সেইহেতু গদ্যিকা-রীতি ছন্দোগন্ধি।

অনেকের ধারণা আছে, গদ্যিকা ভারতীয় রীতি নহে, অবক্ষয়খিন্ন যুদ্ধোত্তর ইউরোপে গদ্য-কবিতার প্রবর্তন হইয়াছে এবং বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পুনশ্চ-কাব্যে (১৯৩২ খ্রীঃ) ইহাকে বাংলায় আমদানি করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা ইতিহাস-সম্মত নহে। গদ্য-কবিতা ও গদ্যিকা স্বাভাবিকভাবে বাংলার মাটি হইতে উদ্ভূত, কাহারও অনুকরণ-জাত নহে এবং জীবনের ব্যর্থতা ও অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া

৪। পৃঃ ২৬৫ রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪)

৫। পৃঃ ৭৪০, র-র (১৩)

৬। পৃঃ ২৬৬ ঐ (১৪)

হইতেও জন্মগ্রহণ করে নাই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রবর্তক নহেন। অবশ্য বহুল ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে (১৮৮৫খ্রীঃ) কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'বর্ষার মেঘ', 'বর্ষার গোলাপ' প্রভৃতি কবিতায় গদ্যিকা রীতির (রাজকৃষ্ণের ভাষায় 'পদ্যপংক্তিক গদ্যে'র) প্রয়োগ করেন। তাঁহার রচনায় আধুনিকতম গদ্যিকার সুপরিণত পরিচ্ছন্নতা দেখা যায়। যথা—

সাধের ফুল, ভিজে গেছিস ?
তোর অধরে ও টল টল কোচ্চে
সুধা ? মধু ?
না, ওযে মেঘের জলবিন্দু।
মেঘ কি নিষ্ঠুর, ছি ছি !
সে কারই আদর জানে না,
আদরের বদলে কষ্ট দেয়—পীড়ন করে,
তুই তার সাক্ষী।
আহা বসন্ত সময়ে তোকে দেখেছি
এখনও দেখছি,
কিন্তু সে-তুই আর এ-তুই যেন এক তুই নয়।

—বর্ষার গোলাপ, অবসর সরোজিনী

ইহার সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের গদ্যিকা—

ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।

বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল গ্রামের মেয়ের মতো।
ভাঙে না ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

—কোপাই, পুনশ্চ

রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যান্তর্গত কথোপকথনেও গদ্যিকা প্রয়োগ করিয়াছেন—

"স্বর্গ তবে কী রে?"
"ওরে শুনিতে কি ইচ্ছা কর?"
"করি বৈকি।"
"শুন তবে—স্বর্গ সে নরক!
কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, মদ, অহঙ্কার
এই সব স্বর্গে আছে।
সত্য কিনা শাস্ত্রে দেখ।"
"স্বর্গে কি রে প্রেম নাই?"
"আছে বৈকি,—অবিশুদ্ধ।"

—পঞ্চম অঙ্ক, নিভৃতনিবাস কাব্য (১৮৮৮ খ্রীঃ)

বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের দ্বারা গদ্যিকা বিচিত্রতর হইয়াছে। ছন্দোহীন পর্বহীন সাধারণ গদ্যিকার কোন কোন চরণে পর্ববহুত্ব আমদানি করা হইয়াছে, এমনকি মধ্যে মধ্যে গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দ ভেজাল দিয়া গদ্যিকাকে করা হইয়াছে অতিমাত্র সুস্বাদু। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার কতকগুলিতে গদ্যিকা চরণ যথেষ্ট পরিমাণে বিচ্ছিন্ন নয়, উহাদিগকে এক পংক্তিতে বসাইলে গদ্যছন্দই ফুটিয়া উঠে।

(১) নিম্নের দৃষ্টান্তটি গদ্যিকার ছদ্মবেশে গদ্যছন্দ ঃ—

কত রাত হল?—উত্তর মেলে না।

কেননা : অন্ধকাল যুগযুগান্তরের গোলক ধাঁধায় ঘোরে—পথ অজানা—
পথের শেষ কোথায়—খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার—মৃত রাক্ষসের চক্ষু কোটরের মতো—
স্তূপে স্তূপে মেঘ—আকাশের বুক চেপে ধরেছে:
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা : গুহায় গর্তে সংলগ্ন।
মনে হয়—নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা—ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ওকি কোন অজানা দুষ্ট গ্রহের : চোখ রাঙানি—
ওকি কোন অনাদি ক্ষুধার : লেলিহ লোল জিহ্বা!

—শিশুতীর্থ, রবীন্দ্রনাথ

(২) নিম্নের দৃষ্টান্তটি রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা 'বাঁশি'র শেষাংশ; কিন্তু দৃষ্টান্তের অধিকাংশ চরণই গদ্যিকাবেশী পদাছন্দের :—

হঠাৎ খবর পাই মনে	...	...	০ + ১০	অক্ষর
আকবর বাদশার সঙ্গে	...	...	০ + ১০	”
হরিপদ কেরানীর | কোনো ভেদ নেই।		...	৮ + ৬	অক্ষর
বাঁশীর করুণ ডাক বেয়ে—	...	...	০ + ১০	”
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র | মিলে চলে গেছে		...	৮ + ৬	”
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।	...	...	৮ + ০	”
এ গান যেখানে সত্য	...	...	৮ + ০	”
অনন্ত গোধূলি লগ্নে	...	...	৮ + ০	”
সেইখানে—				
বহি চলে ধলেশ্বরী | তীরে তমালের ঘন ছায়া			৮ + ১০	”
আঙিনাতে—				
যে আছে অপেক্ষা করে তার	...	...	০ + ১০	”
পরণে ঢাকাই শাড়ি | কপালে সিঁদূর।		...	৮ + ৬	”

অতিপর্বিক অংশ রূপে নিম্নরেখ শব্দ-দুইটি বাদ দিলে ইহা হইয়া উঠে

'মুক্তক' ছন্দ এবং বাদ না দিলে হয় 'গৈরিশ ছন্দ'। লক্ষ্য করিতে হইবে, ইহার ভাষাও পদ্যধর্মী—'বহি চলে ধলেশ্বরী' গদ্য নহে।

গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দের ন্যায় গদ্যিকারও কাব্যিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। বিশাল গম্ভীর ভাবের ও বিরাট জীবনের মহাকাব্য-ধর্মী রচনায় উপযুক্ত বাহন গদ্যছন্দ। কেবল ভাবমূলক গীতিকাব্যের উপযুক্ত বাহন পদ্যছন্দ। সেই রূপ জীবনমূলক বা চিন্তা-মূলক খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতার যোগ্য বাহন গদ্যিকা। তাছাড়া যে সকল বিদেশী ও বিজাতীয় কবিতায় মূল উচ্চারণ ভঙ্গি জানা নাই, সেই সকল কবিতার বঙ্গানুবাদে পদ্যছন্দ বা গদ্যছন্দ অপেক্ষা গদ্যিকাই অধিকতর উপযোগী। ধ্বনিধর্মে গদ্যছন্দ ক্লাসিক, পদ্যছন্দ রোমান্টিক এবং গদ্যিকা রিয়ালিস্টিক। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে বস্তুতান্ত্রিকতার প্রাবল্যের জন্য গদ্যিকার সমাদরই বেশি। ইংরেজি কবিতার অনুকরণে সাম্প্রতিক বঙ্গ সাহিত্যেও গদ্যকবিতা ও গদ্যিকার যুগ চলিতেছে।

—৪—

ইচ্ছাকৃত ছন্দ-পাতন ও ছন্দোবর্জনের ন্যায় বাংলা ছন্দে শব্দের বিকৃত উচ্চারণের প্রবর্তনও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। 'একটা নতুন কিছু করো'র প্রবৃত্তি এই বিকৃতি-সাধনের কারণ। বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক শব্দোচ্চারণ পদ্ধতি বর্জন করিয়া বলবৃত্ত জাতীয় উচ্চারণ ভঙ্গি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে একপ্রকার সঙ্কর অক্ষরবৃত্ত ও সঙ্কর মাত্রাবৃত্ত*। অষ্টাদশ শতকে রচিত রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে সঙ্কর মাত্রাবৃত্তের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। গানে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, দাশুরায় এমন কি রবীন্দ্রনাথও সঙ্কর মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করিয়াছেন।

বর্ণসঙ্কর ছন্দ

* বলবৃত্ত-ভঙ্গির জন্য এই সঙ্কর ছন্দকে 'দীর্ঘায়ত বলবৃত্ত' বলা যাইতে পারে।

পাঠ্য কবিতার ক্ষেত্রে সঙ্কর মাত্রাবৃত্ত ও সঙ্কর অক্ষরবৃত্ত উভয়কেই ব্যাপক ও নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করিয়াছেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার বিখ্যাত 'আলেখ্য' কাব্যে (১৯০১ খ্রীঃ)। পাঠ্য কবিতায় এই বর্ণসঙ্কর ছন্দ প্রবর্তনকে কেহ কেহ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার নিদর্শন বলিয়া প্রচার করেন ; কিন্তু এই 'প্রতিভাবত্তা' ধীর ভাবে বিচার্য।

উচ্চারণ-ভঙ্গি জাতীয় ভাষাগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত নহে ; সেই-জন্য ব্যক্তিগত খেয়ালে ছন্দে জাতীয় উচ্চারণভঙ্গির পরিবর্তন চলে না। কবি জবরদস্তি করিয়া বিকৃত উচ্চারণে কোন একটি ছন্দ গঠন করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ জাতীয় উচ্চারণ বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম ও অদ্ভুত উচ্চারণে উহা পাঠ করিবে—ইহা আশা করা দুরাশা। কবি-প্রতিভার নূতন সৃষ্টির সীমা আছে ; তাহা কখনোই মূল বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন করে না। সীমাজ্ঞান-হীনতা প্রতিভার পরিচায়ক নহে।

চরণের পর্বদৈর্ঘ্যভেদেই বাংলা ছন্দে জাতিভেদ অর্থাৎ উচ্চারণ-ভঙ্গিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্তিগত খেয়ালে উৎপন্ন হয় নাই। বলবৃত্তের ভঙ্গি অনুকরণে সঙ্কর ছন্দের জন্ম বলিয়া বলবৃত্তের ভঙ্গিটি স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। বলবৃত্ত ছন্দও পর্ব-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষ, যে কোন পর্বের ছন্দকে বলবৃত্ত করা চলে না। চরণের সাধারণ পূর্ণ পর্ব-গুলি যদি চতুরক্ষরে গঠিত হয় এবং এই চতুরক্ষরের মধ্যে অন্তত পক্ষে একটিও যদি গুরু হলন্ত অক্ষর হয়, তবেই ছন্দ হইয়া উঠে বলবৃত্ত। উহার পর্বাদ্যে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে এবং পর্বস্থ সমস্ত হলন্ত অক্ষরই সংশ্লিষ্টভাবে একস্বরে উচ্চারিত হয়—ইহাই বলবৃত্তভঙ্গি। বলবৃত্তের নিম্নদৃষ্টান্তে হলন্ত অক্ষরের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ সুস্পষ্ট হইবে—

গাছের্ ডালে | তখন্ তারা | উট্ রাখিল | বেঁধে

বাঙ্গালীর মুখে ইহার উচ্চারণ হয়—

গাছের্ডালে | তখন্তারা | উট্রাখিল | বেঁধে

(gāchherḍāle | takhantārā | uṭrākhila | bendhe)

[এই দৃষ্টান্তে 'গাছের' 'তখন' ও 'উট' শব্দের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ দ্রষ্টব্য]
মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত হইতেছে দীর্ঘতর পর্বের ছন্দ, ইহাদের উচ্চারণ ভঙ্গিও পৃথক্। এইগুলিতে শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষর সংশ্লিষ্ট একস্বরে নহে, বিশ্লিষ্ট দ্বিস্বরে উচ্চারিত হয়। যথা মাত্রাবৃত্তে—

গাছের ডালেতে | তখন তাহারা | উট রাখি গেল | বেঁধে
(gāchheer ḍālete | takhaan tāhāra | uuṭrākhi gela | bendhe)

আবার অক্ষরবৃত্তে—

গাছের ডালের তলে তখন তাহারা গেল
উট রাখি বেঁধে
(gāchheer ḍāleer tale takhaan tāhāra gela
uuṭ rākhi bendhe)

মাত্রাবৃত্তে ও অক্ষরবৃত্তে 'গাছের্ডালে' 'তখন্তাহারা' ও 'উট্রাখি' উচ্চারণ চলিতে পারে না। অথচ এই প্রকার অস্বাভাবিক উচ্চারণেই রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি গান রচনা করিয়াছেন। যথা—

(১) রামপ্রসাদ ঃ—

ভণে 'রাম্প্রসাদ্' | 'মায়েরেকি' স্বত্র
[মূল—'রামপ্রসাদ', 'মায়ের একি'
—এই গ্রন্থের ৩৪০ পৃঃ, ২৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য

(২) কৃষ্ণকমল গোস্বামী ঃ—

(বঁধু) 'আম্রা' কুলনারী | কিঙ্করী তোমারি |
'সৈতে' নারি 'দারু | ন্বিরহ' বেদন।
[মূল—'আমরা', 'সইতে', 'দারুন বিরহ'
—এই গ্রন্থের ৩৪১ পৃঃ, ৫-৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য

(৩) দাশরথি রায় ঃ—

'কাল্পেয়ে' অমনি | দংশিবে 'কাল্ফণী' | হৃদয় মন্দিরে | এসে।
[মূল—'কাল পেয়ে', 'কাল ফণী'
—এই গ্রন্থের ৩৯৭ পৃঃ, ১৭ পংক্তি দ্রষ্টব্য

(৪) বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় :—

বিবিধ বরণে | বিভূষিত করে |
'তার্ক পরে' 'তোমা | নামটি' লিখেছ।

[মূল—'তার উপরে', 'তোমার নাম'টি
—'এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে', গান

(৫) রবীন্দ্রনাথ :—

আঁধারেতে জাগে | 'তোমার'াখি' তারা
'তোমার্ভক্ত' কভু | হয় না পথহারা

[মূল—'তোমার আঁখি', 'তোমার ভক্ত'
—'হরি তোমায় ডাকি', ধ্রুবের গান, 'রাজর্ষি'

বর্ণসঙ্কর ছন্দের এই প্রকার বিকৃত উচ্চারণ সত্ত্বেও এইগুলি বিনা প্রতিবাদে বাংলা সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে ; তাহার কারণ দৃষ্টান্তগুলির প্রতিটিই 'গেয়' কবিতা, 'পাঠ্য' কবিতা নহে। গেয় কবিতা মাত্রই গায়ক-সাপেক্ষ। গায়ক গানের সময়ে ছন্দের পূর্ণতা সাধন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ছন্দকে অপূর্ণ রাখাই গান রচনার সাধারণ বিধি। সুরের স্রোতে শব্দের সঙ্কোচন বা প্রসারণ কর্ণপীড়া-দায়ক নহে। এই কারণে গানের ছন্দ সঙ্কর হইলেও চলে। কিন্তু এই সঙ্কর ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"গানের সুরে সাঁচ্চা হতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করে পড়বার প্রয়োজনে তা ঝুটা।"[৭] বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গানের রীতিতেই অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া এই কথা বুঝেন নাই ; সেইজন্য 'আলেখ্য' কাব্যের পাঠ্য কবিতাতেও সাঙ্গতিক রীতি নির্বিচারে প্রয়োগ করিয়াছেন। ষড়ক্ষর পর্বিক মাত্রাবৃত্তে ও অষ্টাক্ষর পর্বিক অক্ষরবৃত্তে শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরে বলবৃত্তোচিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ প্রয়োগই দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য এই কাব্যে কবি-

৭। পৃঃ ১৩৯ র-র (১৪)

প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ছন্দ বজায় রাখিতে গেলে ভাষা বিকৃত হইয়া যায় এবং ভাষায় স্বাভাবিক উচ্চারণ অব্যাহত রাখিতে গেলে ছন্দ হুঁচোট খায়। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে ছন্দোরক্ষার ফলে ভাষা-বিকৃতি দ্রষ্টব্য :—

(১) জাস্তায়াক চিন্তায়াক | তোমায়ামি প্রিয়তমে | ষোল বছরাগে।
আমাজীবন্তোমাজীবন্ | পৃথগ্ গতি এ সংসারে | ছিল পৃথগ্ ভাগে॥

—বিপত্নীক ২, ১৮ চিত্র

(২) নির্মেঘমাবস্থা রাত্রি | শুয়ে আছি ঊর্ধ্ব মুখে | হাতে মাথা রাখি।
বাড়ীসর্বাই ঘুমিয়ে গেছে | জেগে আছি বাড়ীর্মধ্যে | আমিই একাকী॥

—সত্যযুগ, ১৯ চিত্র

(৩) রাত্রি প্রভাৎ হয়ে আসে | পুর্ব দিকে মেঘের্গায়ে |
প্রভাত স্থর্যে কিরণেসে লাগে।
ডেকে ওঠে কুঞ্জে পাখী | ধীরে বহে স্নিগ্ধ বাতা |
স্পুষ্পবনে স্থর্যমুখী জাগে॥

—রাখাল বালক, ১৩ চিত্র

নিম্নের দৃষ্টান্তগুলির স্বাভাবিক উচ্চারণ অক্ষত রাখিলে প্রতিপদে ছন্দ স্খলিত হয়—

(১) কেহ করে গল্প | কেহ উচ্চ হাস্য |
ভৃত্যে ডাকে কেউ "এই | বেয়ারা।
ছিলম্ লে আও, হুইস্কি | লেআও, সোডা লেআও" |
নানাবিধ বদ | চেহারা॥

—নর্তকী, ৮ চিত্র

(২) শুনেই আসছি শুদ্ধ | ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী
গর্ভাধানের টিকি | মাহাত্ম্যর।
শুনেই আসছি আমরা | ছিলাম ভারি বড'
সন ছুশ সত্তর কি | বাযাত্তর॥

—ভক্ত, ১৫ চিত্র

কোন বিশিষ্ট ছান্দসিক দ্বিজেন্দ্রলালের এই সঙ্কর ছন্দ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিতভাবে লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব সিলেবিক ছন্দে স্বরবৃত্তের (বলবৃত্তের) চটুলতা ও অক্ষরবৃত্তের একটানা সুর বর্জিত হয়ে একটি অভিনব পৌরুষ-শক্তি জেগে উঠেছে।" কিন্তু লেখক বঙ্গীয় উচ্চারণের বিকৃতি-সাধনকেই গৌরবজনক পৌরুষ-শক্তি বলিয়া ভুল করিয়াছেন। জবরদস্তিমূলক অস্বাভাবিক উচ্চারণে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু গৌরব থাকিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্কর ছন্দের প্রয়োগ যে পাঠ্য কবিতায় অচল, তাহার প্রমাণ কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের স্বীকারোক্তি—"এ ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের পরে বড় কেউই লেখেন নি।"[৮] এসম্বন্ধে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন—

> "সেই ছন্দ (আলেখ্য কাব্যের সঙ্কর ছন্দ) যে কবিতার ছন্দ নয়—ছন্দের সঙ্গে কবিতার প্রাণের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক যে আর থাকে না, গদ্যপদ্যের ভেদ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়—এই ধরণের কবিতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।"[৯]

কিন্তু আলেখ্য-কাব্যের সকল কবিতার ছন্দই কর্ণপীড়াদায়ক বা অপাঠ্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের অষ্টাক্ষর পর্বিক সঙ্কর অক্ষরবৃত্তের এমন কয়েকটি নিদর্শন আছে, যেখানে চতুরক্ষর পর্বিক বলবৃত্ত ছন্দের আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা সুস্পষ্ট। এইগুলির অষ্টাক্ষর পর্বকে চতুরক্ষর পর্বে ভাগ করিয়া পড়া চলে। যথা—

(১) স্তব্ধ ভুবন ⁝ স্তব্ধ গগন ধরণীটি ⁝ নিদ্রা মগন
চাঁদের কিরণ ⁝ পড়েছে তার ⁝ মুখে।
শস্যক্ষেত্রে ⁝ বনস্থলে কালো দীঘির ⁝ কালো জলে
বিজন পথে ⁝ বিজন মাঠের ⁝ বুকে॥
—বিধবা, ১০ চিত্র

৮। পৃঃ ৬৩ ছান্দসিকী
৯। পৃঃ ৪৬ বাংলা কবিতার ছন্দ (১ম সং)

(২) শ্রান্ত দেহে : সন্ধ্যা কালে | ফিরে এসে : যখন
আপন ঘরে : যাবো।

কাহার কাছে : বসব এসে | তখন আমি : কাহার
মুখের পানে : চাবো?

—বিপত্নীক, ৫ চিত্র

এইপ্রকার চতুরক্ষর পর্বে ভাগ করিয়া পড়িলে আলেখ্য কাব্যের অষ্টাক্ষর পর্বিক ছন্দ আর নবপ্রবর্তিত সঙ্কর অক্ষরবৃত্ত থাকে না, পুরাতন নিখুঁত বলবৃত্ত ছন্দেই পরিণত হয়।

[বলা বাহুল্য—প্রচলিত পুরাতন রীতিতে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ দুর্বল নহে। সাধারণ কবিতার পদ্য ছন্দে এবং বিশেষ করিয়া নাটকীয় সংলাপের গদ্য ছন্দে তাঁহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে সু-প্রমাণিত।]

ক্রোড়পত্র

বৈদিক, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার প্রচলিত ছন্দের
বর্ণানুক্রমিক তালিকা

('ছন্দঃ কৌস্তুভ', ছন্দঃকোষ ও 'বৃত্তসার' গ্রন্থের কয়েকটি অতিরিক্ত ছন্দ অপ্রচলিত বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।)

[সাঙ্কেতিক অক্ষর :—উ = উপনিদান সূত্র, ঋ = ঋক্ প্রাতিশাখ্য, ছ = ছন্দোমঞ্জরী, নি = নিদান সূত্র, পরি = বৃত্তরত্নাকর-পরিশিষ্ট, পি = পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্র, প্রা = প্রাকৃত পৈঙ্গল, বৃ = বৃত্তরত্নাকর, মল্লি = মল্লিনাথ, শ্রু = শ্রুতবোধ, স = সর্বানুক্রমণী (ঋক্)]

(ক) বৈদিক অক্ষর ছন্দ

বিঃ দ্রঃ—মোটা হরফের নামগুলি ছন্দোগোষ্ঠীর, সংখ্যাগুলি আনুষঙ্গিক ছন্দের সমগ্র অক্ষর-সংখ্যা।

[অনিয়মিত-গঠনের ছন্দের বিশেষ অভিধা :—নিচৃৎ=একাক্ষর ন্যূন, বিরাট্=দুই অক্ষর ন্যূন, ভুরিক্=একাক্ষর অধিক, স্বরাট্=দুই অক্ষর অধিক। দীর্ঘ ছন্দে একটি পাদ পাঁচ অক্ষরের হইলে 'শঙ্কুমতী', ছয় অক্ষরের হইলে 'ককুম্মতী'। মধ্যপাদ ক্ষুদ্রতর হইলে পিপীলিক মধ্যা' এবং বৃহত্তর হইলে 'যবমধ্যা'।]

অতিজগতী বা বিধৃতি	৫২
অতিধৃতি	৭৬
অতিশক্বরী	৬০
অত্যষ্টি	৬৮
অনুষ্টুপ্	৩২
" আর্চী (পি)	২৪
" আর্ষী (পি)	৩২
" আসুরী (পি)	১৩
" উপরিষ্টাজ্জ্যোতিঃ (নি)	৩২
" কাবিরাড্ (স্ব)	৩০
" দৈবী (পি)	৩
" নষ্টরূপা (স্ব)	৩২
" পিপীলিক মধ্যা (নি)	৩২
" পুরস্তাজ্জ্যোতিঃ (নি)	৩২
" প্রাজাপত্যা (পি)	১৬
" বিরাট্ (স্ব)	৩০ বা ৩৩
" ব্রাহ্মী (পি)	৪৮
" মধ্যেজ্যোতিঃ (নি)	৩১
" মহাপদ পঙ্ক্তি (স্ব)	৩১
অনুষ্টুপ্ যাজুষী (পি)	৮
" সাম্নী (পি)	১৬
অভিকৃতি	১০০
অষ্টি	৬৪
আকৃতি	৮৮
উৎকৃতি	১০৪
উষ্ণিক্	২৮
" অনুষ্টুব্ গর্ভা (স্ব)	২৯
" আর্চী (পি)	২১
" আর্ষী (পি)	২৮
" আসুরী (পি)	১৪
" ককুপ্ (পি)	২৮
" তনুশিরা (স্ব)	২৮
" দৈবী (পি)	২
" ন্যঙ্কুশিরা (স্ব)	২৭
" পুরঃ (পি)	২৮
" পরা (পি)	২৮
" পিপীলিক মধ্যা (স্ব)	২৮
" প্রাজাপত্যা (পি)	১২

(খ) সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৃত্তছন্দ

(১) সমবৃত্ত

বিঃ দ্রঃ—সমচতুষ্পাদের প্রতি পাদের অক্ষর-সংখ্যা প্রদর্শিত হইল

অক্ষর পংক্তি (শ্রু) বা পংক্তি (বৃ) বা হংস (প্রা) ৫
অচল ধৃতি (ছ) বা গীত্যার্যা (পি) ১৬
অতিশায়িনী (পি) ১৭
অদ্রিতনয়া (ছ) বা অশ্বললিত (পি) ২৩
অনঙ্গশেখর (পরি) ২৮
অনবসিতা (বৃ) ১১
অনুকূলা (ছ) বা কুড্মলদন্তী (পি) বা মৌক্তিকমালা (বৃ) ১১
অপবাহক (পি) ২৬
অপরাজিতা (পি) ১৪
অবিতথ (পি) বা নর্দটক (ছ) ১৭
অমিঅগঈ [অমৃত গতি] (প্রা) বা ত্বরিত গতি (ছ) ১০
অর্ণ (ছ) ৩০
অশোক পুষ্প মঞ্জরী (পরি) ২৮
অশোকমঞ্জরী (ছ) ৩৩
অশ্বগতি (পরি) বা লীল [নীল] (প্রা) ১৬
অশ্বগতি (পরি) ১৮
অশ্বললিত (পি) বা অদ্রিতনয়া (ছ) ২৩
অসম্বাধা (পি) ১৪
ইন্দিরা (ছ) ১১
ইন্দুবদনা (বৃ) বা বর সুন্দরী (পি) ১৪
ইন্দ্রবংশা (পি) ১২
ইন্দ্র বজ্রা (পি) [প্রা ইন্দ বজ্জা] ১১
উজ্জ্বলা (বৃ) ১২
উদ্ধর্ষিণী (পি) বা বসন্ততিলকা (পি) ১৪
উপচিত্র (বৃ) ১১
উপজাতি (পি) [প্রা-উবজাই] ১১
উপমালিনী (পরি) ১৫
উপস্থিত (বৃ) বা শিখণ্ডিত (পরি) ১১
উপস্থিত (পরি) ১৩
উপস্থিতা (পি) ১০
উপেন্দ্র বজ্রা (পি) [প্রা-উবিন্দ বজ্জা] ১১
ঋষভ (পরি) ১৫
ঋষভ গজ বিলসিতা (পি) ১৬
এলা (বৃ) ১৫
কনক প্রভা (পি) বা প্রবোধিতা বা মঞ্জুভাষিণী (ছ) ১৩
কন্দ (প্রা) ১৩
কন্দুক (পরি) ১৩
কন্যা (বৃ) বা তিণ্ণা (প্রা) ৪
কমল (প্রা) ৩ ও ৮

(২) অর্দ্ধসমবৃত্ত

(৩) বিষমবৃত্ত

অমৃতধারা (পি)
আপীড় (পি)
উদ্গাতা (পি)
উপস্থিত-প্রচুপিত (পি)
পদ চতুরূর্ধ্ব (পি)
প্রত্যাপীড় (পি)
বর্ধমান (পি)
মঞ্জরী (পি)
লবলী (পি)
ললিত (পি)
শুদ্ধ বিরাড়্‌ঋভ (পি)
সৌরভক (পি)

বি: দ্র:—গায়ত্র্যাদি বৈদিক ছন্দগুলিও সংস্কৃতে বিষমবৃত্তের অন্তর্গত। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের অপর নাম বক্ত্র।

(গ) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ মাত্রাছন্দ

(মোটা হরফের নামগুলি ছন্দোগোষ্ঠীর)

অডিল্লা বা অলিল্লা (প্রা)
অপরান্তিকা [বৈতালীয়] (পি)
অহীর (প্রা)
আপাতলিকা [বৈতালীয়] (পি)
আর্যা (পি)
আর্যাগীতি (পি)
উকচ্ছা বা রসিকা (প্রা)
উগ্‌গাহা (প্রা) বা
গীত্যার্যা (পি)
উদ্গীতি [আর্যা] (পি) বা
বিগ্‌গাহা (প্রা)
উপগীতি [আর্যা] (পি) বা
গাহু (প্রা)
উপচিত্রা [মাত্রাসমক] (পি)
ঔপচ্ছন্দসক [বৈতালীয়] (পি)
কুণ্ডলিআ (প্রা)
খঞ্জ (প্রা)
খন্ধা (প্রা)
গগণাংগ (প্রা)
গন্ধাণা (প্রা
গাহা (প্রা) বা পথ্যার্যা (পি)
গাহু (প্রা) বা উপগীত্যার্যা (পি)
গাহিনী বা সিংহিনী (প্রা)
গীতি (ছ)
গীত্যার্যা (পি)
চউপঈআ (প্রা)
চউবোলা (প্রা)
চপলা [আর্যা] (ছ)

নির্ঘণ্ট

[পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক আনুষঙ্গিক সংখ্যায় 'শতকে'র সংখ্যা পুনরুল্লেখ না করিয়া হাইফেন (-) দেওয়া হইল। সঙ্কেত :—ক = কবি, কা = কাব্য, গ্র = গ্রন্থ, ছ = ছন্দ, না = নাটক, পা = পাদটীকা]

—০—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৫	বরেনিয়ম্	বরেণিয়ম্
২০	৩	'া, ি, ী, ˌ ˌ'	'া, ি, ী, ু, ূ'
৮৪	৭	হা, দি, ভি, জি	হা, দি, তি, জ
৮৭	১৬	ইষদ্গুরু	ঈষদ্গুরু
৯৪	২১	লয়ের	বিলয়ের
১১৫	২০	তাল-প্রধান	তান-প্রধান
১৫৬	৯	অশেস গুণ | সাগর	অশেষ গুণ সা | গর
১৬৩	২	কিম্ভুত কিমাকার	কিম্ভূত কিমাকার
১৭৮	১৯	দেহের ছায়া	দেহের ⁝ ছায়া
১৭৯	১০	অমিয় মাখা	অমিয় ⁝ মাখা
২১৯	২০	শুধু	শুধ্
২২৪	১৯	পুনরার্তন	পুনরাবর্তন
২৮৪	২৩	সে সে	কে সে
২৮৭	১৮	নায়ানীতি	নায়াসীতি
৩১৬	৭	বড় চণ্ডীদাসের	বড়ু চণ্ডীদাসের
৩২৫	১২	শ্বাসাঘাত	শ্বাসাঘাত
৩৩২	২৫	'মু' চাহি সব	'মুখ চাহি সব'
৩৯৮	৬	জলুক যতো জলতে পারে	জলুক যতো | জলতে পারে
৪৬১	১৪	ছন্দোবর্জনের ন্যায়	ছন্দোবর্জনের ন্যায়
৪৬৪	২২	সাঙ্গতিক রীতি	সাঙ্গীতিক রীতি

•

"রচিহুঁ ছন্দ বহু ভাঁতি ইম
মাত্রা-বর্ণ-বিভেদ,
শুনত শ্রবণ-সুখ হোত অতি
নাশত কবিকুল-খেদ।
পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মথি
লাখ লক্ষণ পরকার,
কিংবা সংস্কৃত গ্রন্থবর
'ছন্দ-সমুদ্র' নিহার,
রচিহুঁ আনন্দ হিয়
ছন্দ মম চিত্ত-প্রিয়॥"

[অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব মহাজন কবি নরহরি চক্রবর্তীর 'গৌর চরিত-চিন্তামণি' গ্রন্থের প্রস্তাবনা। 'সাহিত্য,' ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৫৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।]

ছন্দোবিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা

(কালানুক্রমিক)

১৩২১ সাল, 'বাঙ্গলা ছন্দঃ' প্রবন্ধ (প্রবাসী, শ্রাবণ)
—শশাঙ্ক মোহন সেন

১৩২৩ „ 'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল' প্রবন্ধ (পরিচারিকা, ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা) বাঁকিপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পঠিত
—রাখাল রাজ রায়

১৩২৫ „ 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধ (ভারতী, বৈশাখ)
—সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত

১৩২৯-৩০ „ ছন্দ-প্রবন্ধাবলী (প্রবাসী)
—প্রবোধ চন্দ্র সেন

১৩২৯ „ 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' প্রবন্ধ (মানসী ও মর্মবাণী)
—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩৩২-৩৪ „ 'ছন্দের কথা' প্রবন্ধাবলী (বঙ্গবাণী)
—কালিদাস রায়, কবিশেখর

১৩৩৯ „ 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' গ্রন্থ
—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

১৩৪৩ „ 'ছন্দ' গ্রন্থ
—রবীন্দ্রনাথ

১৩৪৭ „ 'ছান্দসিকী' গ্রন্থ
—দিলীপকুমার রায়

১৩৪৮-৪৯ „ 'মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবন্ধাবলী (শনিবারের চিঠি)
—মোহিতলাল মজুমদার

১৩৬২ „ 'বাংলা ছন্দ' গ্রন্থ
—সুধী ভূষণ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

রাষ্ট্রপতির সম্মান-প্রাপ্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ডঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম.এ., পি.এইচ.ডি. বিদ্যাবাচস্পতি লিখিয়াছেন—

I have great pleasure to certify that I have gone through several chapters of the manuscript of a book entitled "Chhanda-tattva O Chhando-vivartana" written by Professor Tarapada Bhattacharya M.A., P.R.S., Senior Professor of Bengali in the Asutosh College, Calcutta. It seems to me that the book is a unique production by Professor Bhattacharyya who must have worked hard for many years in preparing this work. I do not know if any other scholar has traversed the path of Bengali Prosody and Metres in the way which the writer adopted. He is a learned but silent worker in the particular field of his researches. His treatment of his theme is very scholarly and written in a critical mood. I congratulate the writer of the book and admire his erudition.

রাষ্ট্রপতির সম্মান-প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষার কবি, ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম.এ., ডি.লিট. লিখিয়াছেন—

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য এম.এ., পি-আর-এস. মহোদয় প্রণীত ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি কিয়দংশ পাঠ ও আলোচনা করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। বৈদিক ছন্দঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ছন্দঃ পর্য্যন্ত যেভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয়। তিনি ছন্দঃ সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ যেভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং চিত্তাকর্ষক। সংস্কৃত ছন্দের সহিত প্রাকৃত বাঙ্গলা প্রভৃতি ছন্দের তুলনামূলক সমালোচনাও অতি মনোরম হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ছন্দকে বুঝিবার জন্য এবং বুঝাইবার জন্য কেহ যে এত পরিশ্রম করিতে পারে, ইহা এই গ্রন্থ না পড়িলে বুঝা যায় না।